Registered No. C 583.

৬ষ্ঠ বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩১৮ সাল। [১ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কলিকাতা, ১০ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট উৎসব কার্য্যালয় হইতে—শ্রীযুত ননীলাল রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

বৈশাখ।

সম্পাদকের প্রার্থনা।

উৎসবের গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই আমাকে শীঘ্র শীঘ্র গীতা শেষ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরও ইচ্ছা গীতা শীঘ্র শেষ হয়। সেই জন্য গত আশ্বিন মাস হইতে গীতার অগ্রিম মূল্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যাঁহারা গীতার অগ্রিম মূল্য পাঁচ টাকা দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা অন্যত্র দেওয়া গেল।

৩০০ গ্রাহকের নিকট আমরা টাকা চাহিয়াছিলাম, তন্মধ্যে যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহা লইয়াই গীতা ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন আমার শেষ প্রার্থনা যাহা তাহা জানাইতেছি। অর্থসংগ্রহের অন্য উপায়ে যোগ্যতা আমার নাই বলিয়াই, আমি সকলের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি।

যাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত এবং যাঁহারা উৎসব পড়িয়া পরিচিত, তাঁহাদিগকে আমার নিবেদন যেন তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন নাম তালিকাভুক্ত করিয়া ও গীতার অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়া, আমাকে এই কার্য্যে সহায়তা করেন।

আজকাল অনেকেরই আর্থিক সচ্ছলতা নাই সত্য; কিন্তু যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা এই কার্য্যের সহায় হইতে মনে করিলে যে সহায়তা করিতে পারেন না, ইহা আমি মনে করি না। ইঁহারা সকলে একটু তৎপর হইলে, আমি শীঘ্রই গীতা যে তাঁহাদের হস্তে দিতে পারিব, তাহার আশা করিতে পারি। এখন আপনাদের এই করুণার উপর গীতার সত্বর প্রকাশ নির্ভর করিতেছে। ইহা না হইলে দায় উদ্ধার না হইয়া, দায়ে জড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনাই অধিক।

যদি অন্য সকলে অগ্রিম মূল্য প্রদান করেন, তবে আমরা, যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ তাঁহাদিগকে গীতা বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারিব, ইহা বলাই বাহুল্য। এই সুবিধা, সমর্থ গ্রাহকগণ অসমর্থদিগকে করিতেছেন, আমি নিমিত্ত মাত্র।

শেষ কথা এই যে, যদি গীতার গ্রাহকগণের সকলের অথবা অধিকাংশের নিকট অগ্রিম মূল্য পাওয়া যায়, তবে আমরা ভারত সমর দুই খণ্ড, নূতন করিয়া উৎসবের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ এক সঙ্গে, এবং মনোনিবৃত্তি প্রথম খণ্ড গ্রাহকগণকে উপহারস্বরূপ দিতে পারিব আশা করি। কিন্তু অধিকাংশ গ্রাহকের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য আদায় না হইলে উপহার ছাপান অসম্ভব।

শ্রীরামদয়াল দেবশর্ম্মণঃ।

পুনশ্চ :—সম্পাদকের প্রার্থনা পড়িয়া পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৯ জন গ্রাহকের পর যে কয়েক জন গ্রাহক টাকা দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা অন্যত্র দেওয়া গেল। এখনও অনেকেই টাকা পাঠান নাই। গ্রহকগণ সত্বর হউন; ইহাই আমাদের সানুনয় নিবেদন।

১৫ই চৈত্র হইতে ২০ শে বৈশাখ পর্য্যন্ত যাহারা টাকা দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা।

পূর্ব্ব-প্রকাশিত চৈত্র সংখ্যায় মোট টাকা আদায় ... ... ৬৩৭৲

(১৪০) ১৬৬ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দু নাথ চট্টোপাধ্যায়, পোঃ মটিয়ারি, নদীয়া ৫৲
(১৪১) ৭০৪ " দীননাথ সান্যাল, মৈনম পোঃ ... ২৲
(১৪২) ১১৫৬ " মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী, ১১৫নং কাসন্দিয়া রোড ৫৲
(১৪৩) " জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত, ২৮নং বাদুড় বাগান, ২য় লেন ... ... ৫৲
(১৪৪) ১০৭৪ " প্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী, হেডপণ্ডিত বালি স্কুল ... ৫৲
(১৪৫) ২৬২ " পান্নালাল দাস, হাটখোলা পোঃ ... ৫৲
(১৪৬) ৭৩০ শ্রীমতী সুশীল মালতী সরকার, ৩৩নং গড়পার রোড ৫৲
(১৪৭) ১১৭৯ শ্রীযুক্ত অনিশ চন্দ্র মিত্র, ৯নং পদ্ম পুকুর রোড, ভবানীপুর ৫৲
(১৪৮) ৩৩৮ " অনাথবন্ধু পালিত, পোঃ দরিয়াপুর ... ৫৲
(১৪৯) ১৯৭ " প্রভাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮১নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট ৫৲
(১৫০) ৬৭২ " হেমচন্দ্র লাহিড়ী, হাইকোর্ট ... ৫৲
(১৫১) ১২২৭ " হেমলাল দত্ত, পোঃ কুমীরা ... ২৲
(১৫২) " হরিমোহন ঘোষ, বড় সাহেবের হাট (২৪ পরগণা) ২৲
(১৫৩) ১২৪৯ " শশিকুমার চক্রবর্ত্তী, পোষ্টমাষ্টার চরণপুর ... ৫৲
(১৫৪) ৪৪০ " ভুবনমোহন বিশ্বাস, বড় সাহেবের হাট, (২৪ পরগণা) ... ... ৩৲
(১৫৫) ৯৬১ " নরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া ... ৫৲
(১৫৬) ৩২৪ " প্যারিনাথ নাগ, ৭৩।২নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট ... ৫৲
(১৫৭) ২০২ " কালিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ৭৮নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট ১॥০
(১৫৮) ৫৬২ " জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়, ৩নং রাজেন্দ্রনাথ সেনের লেন ৩৲
(১৫৯) ৮৭১ " মনোরঞ্জন কুণ্ডু, দক্ষিণ বাঁটরা ... ৩৲

(১৬০) ১২৫০ শ্রীযুক্ত কালিচরণ মুখোপাধ্যায়, ৩৮।৫নং বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট ১৲
(১৬১) ১১৮ „ মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, টারাইল, টাঙ্গাইল ... ৩৲
(১৬২) ১০১৮ „ কুমুদিনী কান্ত চক্রবর্ত্তী, অষ্টগ্রাম ... ৩৲
(১৬৩) ৫০৬ ডাক্তার উমাপ্রসাদ মাইতি, এগরা পোঃ ... ৫৲
(১৬৪) ১২৫৪ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, ৩নং হরিমোহন রায়ের লেন ১৲

পূর্ব্ব-প্রকাশিত সংখ্যায় যাঁহারা ক্রমে টাকা দিতেছেন তাঁহাদের নাম—
১০২৪ শ্রীযুক্ত অন্নদাবন্ধু দাস গুপ্ত ... ৩৲
৮ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ... ৪৲
১১৬০ শ্রীযুক্ত চণ্ডিচরণ পাল ... ২৲
৯৬৮ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ... ২৲

মোট টাকা ৭৪২৷৹

সর্ব্ব-চিত্তের আরাধনা করা যায় না। যাঁহারা গীতা শীঘ্র প্রচার করিতে বলিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মত উৎসব হইতে গীতা বাহির করিয়া পৃথক্ ভাবে মুদ্রিত করা হইতেছে। এক গীতা ভিন্ন অন্য কোন পুস্তক এভাবে উৎসব হইতে বাহির করিয়া পৃথক্ ছাপা হইবে না। কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করেন বলিয়া, এই কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা হইল।

এই মাসে আমরা গীতার অগ্রিম মূল্যদাতাদিগকে ১০ ফর্ম্মা গীতা পাঠাইলাম। নূতন বন্দোবস্ত বলিয়া মাত্র ১০ ফর্ম্মা হইয়াছে। আশা করি আগামী মাস হইতে অন্ততঃ ২০ ফর্ম্মা করিয়া পাঠাইতে পারিব।

শ্রীননীলাল রায় চৌধুরী।

গীতা-মাহাত্ম্য বৈশাখে শেষ হইয়া গেল। গীতা পরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ উৎসবে প্রকাশিত হইবে।

উৎসব।

—:*:—
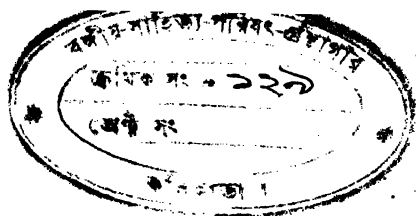
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায়ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৬ষ্ঠ বর্ষ] ১৩১৮ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

বসন্তে রাম রাম রং মাখান।

গাছের সঙ্গে ভাব করেচ
দেখ্‌লে বোঝা যায়।
গায়ের রং মাখিয়ে গেছ
যত পাতার গায়।
কেউ পাছে দেখে ব'লে এসে থাক রাত্রিকালে
প্রভাত হ'লে মিশিয়ে থাক
আপনি আপনায়।
গাছের সঙ্গে ভাব ক'রেচ
দেখ্‌লে বোঝা যায়।
শাখাগুলি হেলে দুলে, সোহাগে প'ড়চে ঢ'লে
ছড়িয়ে পাতা কইচে কথা, বইয়ে মলয় বায়।
মনস্মুখে রহিয়াছে, ফলে ফুলে সাজিয়াছে
নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে আছে
তোমার প্রতীক্ষায়।
গাছের সঙ্গে ভাব করে'চ
দেখ্‌লে বোঝা যায়।
গায়ের রং মাখিয়ে গেছ
যত পাতার গায়।

শ্রীমতী..........

৺কাশীধাম।

বিশ্বাসের ধর্ম্ম।

তুমি আছ এই বিশ্বাসে বড় শান্তি। তোমার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ ত করিবই—এবিষয়ে আলস্য করিব না। শুধু তাই নহে—তোমার আজ্ঞাপালন করিব, সর্ব্বকার্য্যে তোমায় পূজা করিব, মানসে বাহিরে তোমায় জানিতে স্বাধ্যায় করিব। এ ত করিবই—কিন্তু মূলসূত্রে থাকিবে তুমি আছ এই বিশ্বাস।

তুমি আছ, তুমি আমার আছ, তুমি সকলের আছ! যে তোমায় চায় তার ত আছই; যে তোমায় চায় না তা'কেও তুমি ত্যাগ কর না—তুমি তারও আছ।

যে তোমায় মানিতে চায় না, যে তোমায় ভজিতে চায় না, যে তোমায় জানিতে চায় না—তুমি তারও জীবিকা উচ্ছেদ কর না। যে তোমায় অভক্তি করে, যে তোমায় গালিগালাজ দেয় তুমি তারেও ক্ষমা করিয়া থাক। কত ক্ষমা তোমার! যে আমার সঙ্গে একবার শত্রুতা করে, তাহাকে আমরা ক্ষমা করিতে পারি না, তুমি শুধু যে ক্ষমা কর তা নয়—তুমি তাহাকে ভালবাস; যে তোমার সঙ্গে শত্রুতাও করে তারেও তুমি ভালবাস; তারও তুমি সেবা কর, নতুবা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে কে? সর্ব্বেশ্বর তুমি—জীবের সমস্ত অপরাধের দণ্ড যদি তুমি দাও, তবে জীবকে বহুবার দেহধারণ করিতে হয়, বহুবার জন্মিতে হয়, নতুবা তার সমস্ত পাপের সাজা একদেহে কুলায় না; একদেহে ভোগ হইতে পারে না।

তোমাকে কখন দেখার মত করিয়া দেখি নাই—শুধু নাম শুনিয়াছি, শুধু গুণ শুনিয়াছি। নাম শুনিয়া, গুণ শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছি।

কেন বিশ্বাস করিয়াছি? না করিয়া থাকিতে পারি না, তাই বিশ্বাস করিয়াছি। শুধু বিশ্বাস নয়, ভালবাসিয়াছি। এই ভালবাসার জন্য বিশ্বাস করিয়াছি তুমি আছ—তুমি আমার আছ, তুমি সকলের আছ।

ভালবাসা কি তা জানি না। কিন্তু দেখি প্রাণ যেন ভালবাসিতে চায়; কিছু একটা ভাল না বাসিলে যেন আমি থাকিতে পারি না।

প্রাণে ভালবাসা আছে। কত দিন ধরিয়া যা একটু ভাল লাগিয়াছিল তাহাকেই ভালবাসিতে ছুটিয়াছিলাম। কিন্তু যাহা তুমি নও তা'কে যে ভালবাসা যায় না; তাহা ঠেকিয়া ঠেকিয়া বুঝিয়াছি। ক্ষুদ্রকে ভালবাসা যায় না,

বিষয়কে ভালবাসা যায় না, অপবিত্রকে ভালবাসা যায় না—অনেক ঠকিয়া ইহা ধারণা হইয়াছে।

কাজেই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী জগতের কোন কিছুই ভালবাসা যায় না। অনেক ঠকিয়া ইহা বুঝিলাম—কিন্তু কাহাকেও ভাল না বাসিলে ত থাকিতে পারি না। প্রাণ ত ভালবাসিতে চায় অথচ কি ভালবাসিব, কাহাকে ভালবাসিব তাহা ত দেখিতে পাই না।

এই অবস্থায় তোমার নাম শুনিলাম, তোমার গুণের কথা শুনিলাম। সাধু সজ্জন সবাই তোমার কথা কন; শাস্ত্রে তোমার নাম, তোমার গুণ বর্ণিত—শুনিয়া বিশ্বাস করিলাম তুমি আছ। না করিয়া যে পারি না—প্রাণ যে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না অথচ ভালবাসার আর কেহ নাই। কাজেই আপনা হইতে তোমার প্রতি মন ছুটিল। তোমার নাম শুনিয়া তুমিই ভালবাসার বস্তু বুঝিলাম। বুঝিয়া বিশ্বাস করিলাম তুমি আমার আছ, তুমিই সকলের আছ।

বিশ্বাস করিলাম—তুমি আছ—করিয়া জানিলাম তোমার আজ্ঞাপালনই ধর্ম্ম।

কোথায় তোমার আজ্ঞা আছে—কি তোমার আজ্ঞা তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল। বেদ তুমি—বেদে তুমি তোমার আজ্ঞা জানাইয়াছ শুনিতে লাগিলাম। শ্রুতি স্মৃতিতে তোমার আজ্ঞা আছে জানিলাম। ব্যভিচারী হৃদয় যে তোমার আজ্ঞা ধরিতে পারে না তাহাও বুঝিলাম; কারণ ব্যভিচারী হৃদয় স্বার্থপর, নিজের সুখের জন্য ব্যভিচারকে তোমার আজ্ঞা মনে করিয়া লয়। লইয়া বহু বিপদ ঘটায়; ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিভিন্নতা সৃজন করে; পৃথিবীতে শান্তি না আনিতে পারিয়া মতভেদ সৃষ্টি করে; করিয়া পৃথিবীকে অশান্ত করিয়া তুলে। তাই শাস্ত্র বলেন:—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম॥

ঠিক হইয়া গেল—বেদ, গীতা, মনু ইত্যাদিতে তোমার আজ্ঞা আছে।

ক্রমে গুরু মিলিল। শ্রীগুরুতে শ্রদ্ধা জন্মিল। কারণ গুরু শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিয়া—আপনি আচরণ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন। গুরু ও বেদান্তে বিশ্বাসই

শ্রদ্ধা। যতদিন শুধু শাস্ত্র দেখা যায় ততদিন হয় না—মহাপুরুষের সঙ্গ ব্যতীত শাস্ত্রআজ্ঞা মত জীবন গঠন হয় না।

তবে পাইলাম তুমি আছ বিশ্বাসটি প্রথম, তার পরের কর্ম্মগুলি তোমাকে ভজনা করা; শেষের কর্ম্ম তোমাকে জানিয়া তোমাতে স্থিতিলাভ করা। ইহাই পূর্ণ ধর্ম্ম। বিশ্বাস এই ধর্ম্মের মূল বলিয়া বলা হইল বিশ্বাসের ধর্ম্ম। ধর্ম্মের পূর্ণরূপ আমরা পরে দেখিতে চেষ্টা করিব।

গীতায় জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম।

যত দিন মানুষ পাপ ছাড়িতে না পারে, ততদিন মানুষ আপনার জীবনকে ঠিক মত চালাইতে পারে না। শরীর, বাক্য ও মন যত দিন ছন্দমত স্পন্দিত না করিতে পারিল, ততদিন মানুষ নিজেও সুখ পায় না, অন্যকেও সুখী করিতে পারে না। কাজেই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বিফল; সমাজ ও জাতীয় জীবন দুঃখময়।

পাপই তাপ। দুর্ব্বলতাই পাপের ভিত্তিভূমি। দুর্ব্বল চিত্তকে সবল কর, তখন আর পাপ হইবে না। তখন মনুষ্যজীবন পবিত্র হইবে, সমাজ ও জাতি পবিত্র হইবে।

মনুষ্যের চিত্ত সবল কিরূপে হইবে? আজ পর্য্যন্ত জগতে যতগুলি উপায় বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে মানুষকে ধার্ম্মিক করাই চিত্ত সবল করিবার একমাত্র উপায়। ধার্ম্মিক না হইতে পারিলে পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই— কিছুতেই আর পবিত্র হওয়া যাইবে না। যে জীবনে পবিত্রতা নাই, সে জীবন প্রার্থনীয় নহে।

সকল মানুষের চিত্ত একরূপ নহে; কাজেই এক উপায়ে সকল মানুষের চিত্ত সবল হইবে না। যে যাহা পারে তাহা ধরিয়াই তাহাকে পুরুষার্থ করিতে হইবে। শরীর মন ও বাক্য ছন্দমত স্পন্দিত করিতে পারিলেই চিত্ত ঈশ্বর-মুখী হইল। যাহার চিত্ত যত ঈশ্বরমুখী তাহার চিত্ত তত সবল; সে তত

নিষ্পাপ; সে তত জীবের উপকার করে। যে পাপী সে নিজের অপকার করে এবং অন্যের অপকার ত করিবেই।

জগৎকে সুখী করিতে যদি ধর্ম্মই একমাত্র উপায় হয়, ধর্ম্ম ভিন্ন যদি জগতের দুর্ব্বলতা নিবারণের আর অন্য উপায় না থাকে, ধর্ম্ম ভিন্ন যদি পাপ আর কিছুতেই না যায়, তবে জগতের পূর্ণ ধর্ম্মটি কি তাহার আলোচনা বৃথা হইবে না।

গীতা পূর্ণধর্ম্মের যে যে অঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন আমরা গীতার দ্বাদশ অধ্যায় হইতে তাহাই দেখাইতেছি। সকল জাতির ধর্ম্ম ইহারই অঙ্গ। আমরা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা হইতে সর্ব্বনিম্ন অবস্থা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছি।

(১) অক্ষর, অব্যক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা।

(২) সগুণ ব্রহ্ম উপাসনা।

(৩) অভ্যাসযোগে বিশ্বরূপের উপাসনা।

(ক) যোগীর উপাসনা।

(খ) ভক্তের উপাসনা।

(৪) মৎকর্ম্ম পরম হইবার সাধনা।

(৫) মদ্যোগ আশ্রয়ে সাধনা।

এই পঞ্চাঙ্গে যে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ তাহাই জগতের পূর্ণ ধর্ম্ম। পূর্ণ ধর্ম্মের মুখ যিনি না দেখিয়াছেন তিনি এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের বিরোধ দেখিবেনই।

বহু অন্ধের হস্তিদর্শনে—যেমন কোন অন্ধের কাছে হস্তী কুলার মত, কোন অন্ধের কাছে হস্তী থামের মত, কোন অন্ধের কাছে হস্তী সম্মার্জ্জনীর মত—কাজেই অন্ধদিগের মতভেদ ও বিবাদ অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু চক্ষুষ্মানের নিকটে সকল অন্ধের মতের মধ্যে যেমন সত্য অংশটি দৃষ্টিগোচর করা সহজ, সেইরূপ পূর্ণ ধর্ম্মটি যিনি দেখিয়াছেন তিনি জানেন সকল জাতির ধর্ম্মে সত্য অংশ কোন্‌টি আর কোথায় বা অন্ধদিগের বিরোধ হইতেছে।

পূর্ণ ধর্ম্মটি দর্শন করাতে জগতের প্রভূত মঙ্গল আছে বলিয়া মনে হয়। গীতা সেই পূর্ণ ধর্ম্মটি দেখাইতেছেন বলিয়াই গীতা সকল জাতির আদরের ধর্ম্মগ্রন্থ।

প্রথম—অক্ষর, অব্যক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনা।

নির্গুণব্রহ্মোপাসকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসক। ধার্ম্মিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা এই নির্গুণ উপাসনা দ্বারা অর্জ্জিত হয়।

উপাসনার অর্থ (১) সমীপে থাকা। উপ-সমীপে ; আসন-বসা।
(২) স্থিতিলাভ করা।

নিগুর্ণ উপাসনায় যে "উপাসনা" শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহার অর্থ স্থিতি। নিগুর্ণ নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিলাভ করাই নিগুর্ণ উপাসনা। এই শ্রেণীর উপাসক সদ্যোমুক্ত। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে'। নিগুর্ণ উপাসকের প্রাণের উৎক্রামণ হয় না। এই খানেই প্রাণ বিলীন হইয়া যায়। জীব মৃত্যুকালে শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতি লাভ করিয়া স্বস্বরূপেই অবস্থান করে।

দেখা যায় মৃত্যুকালে সকল জীবেরই প্রাণ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। প্রাণের উৎক্রামণ সময়ে জীব নিদারুণ যাতনা ভোগ করে। নিগুর্ণ উপাসক হইলে আর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না—এই ভাবিয়া যাঁহারা নিগুর্ণ উপাসকশ্রেণীভুক্ত হয়েন—তাঁহারা ঐ উপাসনার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে কিনা যদি ইহার বিচার না করেন, তবে একটা আত্মপ্রতারণায় পড়িয়া বিড়ম্বিত হন কি না তাহা সুন্দররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদের দেশে আজকাল অনেক স্ত্রীলোক ও অনেক পুরুষ বিশেষ কিছু তপস্যা না করিয়াই বলিতে চাহেন "আমি ব্রহ্ম"। আর কিছুই নাই—আমিই আছি। জগৎও মিথ্যা, দেহও মিথ্যা, মনোজগতও মিথ্যা।

প্রকৃত জ্ঞান যখন এইটি—অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—যখন আমি এই জ্ঞান শুনিলাম, তখনই আমার বিশ্বাস জন্মিল একমাত্র সত্যবস্তুই ব্রহ্ম-অন্য সমস্তই মিথ্যা—এই হইলে সোহং জ্ঞান আমার জন্মিল। এইরূপ যাঁহাদের বিচার, তাঁহারা যে নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি ও নিতান্ত ভ্রান্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গীতা এই মূঢ়বুদ্ধি মানুষকে সতর্ক করিবার জন্য বলিতেছেন :—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভির বাপ্যতে॥

যাঁহারা অব্যক্তাসক্তচিত্ত তাঁহাদের সাধনক্লেশ শুধু অধিক নহে, অন্য অপেক্ষা অধিকতর। যতদিন আমার দেহ এইরূপ বোধ আছে ততদিন নিগুর্ণব্রহ্ম বা অব্যক্তপদ প্রাপ্তি অতি ক্লেশেই লাভ হয়।

ভাবার্থ এই যে যাহাদের দেহাভিমান দূর হয় নাই, দেহের সুখ দুঃখবোধ যাঁহাদের আছে, তাহাদের নিঃসঙ্গ ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করা নিতান্ত ক্লেশকর। নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও একবারে অসম্ভব নহে। কঠোর সাধনা দ্বারা ঐ অবস্থা লাভ করা যায়—যদি কঠোর সাধনা কেহ করে তবে। কঠোরতা ত দূরের কথা- যৎসামান্য সখের চিন্তা ভিন্ন কোনরূপ সাধনাই নাই অথচ আমি সোহং হইয়া গিয়াছি এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি। জগতের অনিষ্টের জন্যই ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন।

নির্গুণ উপাসনায় ভয়ানক আত্মপ্রবঞ্চনা থাকে বলিয়া আমরা নির্গুণ উপাসনার কথা আরও কিছু আলোচনা করিব।

"আত্মা অসঙ্গ, উদাসীন ইহা জানিলেও ভোগাভিমান ত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ হয় না"। যে ব্যক্তি ভোগের আস্বাদ গ্রহণ করে না, ভোগ্যজ্ঞান তাহাকে কিরূপে বদ্ধ করিবে" ?

ইহা ভগবান্ বশিষ্ঠের উক্তি। মূল শ্লোক এই :—

সদেহা বাস্তদেহা বা মুক্ততা বিষয়ে ন চ।
অনাস্বাদিত ভোগস্থ কুতো ভোজ্যানুভূতয়ঃ ॥

বাক্সে টাকা আছে এই বিশ্বাস করিলে একটা নিশ্চিন্ত ভাব আসিতে পারে সত্য ; কিন্তু যতক্ষণ না বাক্সের টাকা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ের দৃঢ়তা হয় না। অপরীক্ষিত বিষয়ে আত্মপ্রতারণা থাকাই সম্ভব।

সেইরূপ আমি আপনিই আপনি এইটি শুধু বিশ্বাস করিয়া রাখিলেই চলিবে না।—অন্য কিছুই নাই ইহাও নিশ্চয় করিতে হইবে। যতক্ষণ আত্মা ব্যতীত বস্তু আছে ততক্ষণ ভোগও আছে। যদি বল আত্মা ব্যতীত কিছু যদি থাকে তাহা মিথ্যা বলিয়া যখন জানিয়াছি, তখন আর ভোগেচ্ছা থাকিবে কিরূপে ? মিথ্যা বিষয়ের ভোগে কি রুচি হয় ? সত্য। সেই জন্যই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে আমি আপনিই আপনি এই ভাবে কতক্ষণ স্থিতিলাভ করিতে পারি। আপনিই আপনি এই ভাবে স্থিতিলাভ করিলে যদি দেহটা না থাকে প্রকৃত জ্ঞানী এই ভয়ে কখন স্থিতিলাভে সঙ্কুচিত হইতে পারেন না। দেহ যখন মিথ্যা, প্রারব্ধ ভোগাদি সমস্তই যখন মিথ্যা—তখন দেহটা যাইবে বা প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হইবে এই মিথ্যা দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া স্বস্বরূপ হইতে দূরে অবস্থান করা বুদ্ধিমানের কথা নহে। স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে গেলে দেহ

থাকে না—এই আশঙ্কা প্রকৃত জ্ঞানীর হইতে পারে না। দেহ থাক্ বা না থাক্ উভয়ই যখন মিথ্যা, তখন দেহ রাখার দিকে যত্ন যখন আছে তখন আত্ম-বঞ্চনা একটু আছে, আসক্তি একটু আছে—ইহাই নিশ্চয়। একটু ভোগের ইচ্ছাও তবে রহিল। তাই বলা হইতেছিল যতদিন পর্য্যন্ত ভোগত্যাগ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিঃসঙ্গ উদাসীন ভাবে স্থিতিলাভ হইতেই পারে না।

মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ভোগ করায় কোন দোষ হইতে পারে না, ইহাও কাহারও কাহারও যুক্তি। এ ভোগটা যথাপ্রাপ্ত বস্তুর ভোগ মাত্র। ভোগ আসি-লেও যা, ভোগ না আসিলেও তাই। তিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী। দেহটি রক্ষা করিবার জন্য নিত্য ঔষধটি সেবন আছে—ফুরাইয়া গেলে আবার আনাটিও আছে—অথচ বলা হইতেছে ভোগটি মিথ্যা—এইরূপ ব্যবহারে আত্মপ্রতারণা আছেই। ভোগ করাও যা, ভোগ না করাও যখন তাই—তখন ভোগত্যাগের দিকেই না হয় রুচিটা হউক তবেইত শাস্ত্র মান্য করা হইল।

ফলে যিনি যথার্থ জ্ঞানী তাঁহার ঐশ্বর্য্যগুলির ও বিকাশ হইবেই। তিনি বিভূতি আকাঙ্ক্ষা করেন না সত্য, কিন্তু বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করিবেই। এতদ্ভিন্ন যে জ্ঞান সেটা জ্ঞান নহে জ্ঞানের অভিমান মাত্র অথবা সেটা কপট জ্ঞান। যতদিন না দেহে আত্মবোধ বিগলিত হয়, যতদিন না বহির্জ্জগৎ মন হইতে মুছিয়া যায়, যতদিন না দেহ হইতে, জগৎ হইতে, সংস্কার হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া এ সমস্ত ভুলিয়া না থাকা যায়, ততক্ষণ আপনাতে আপনি থাকা যায় না; ততক্ষণ নির্গুণ উপাসনার অধিকারও জন্মে নাই। এই কারণে সাধনবর্জ্জিত দেহাত্মাভিমানীর নির্গুণ উপাসনা হইতেই পারে না। যে ভাবে স্থিতিলাভ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা আর নাই, তাহা বিনা সাধনায় লাভ হইতে পারে না। জগৎ নাই, জগৎ নাই, কোটিকল্প ধরিয়া চিৎকার করিলেও মন হইতে জগৎ মুছিয়া যাইবে না অথবা জগৎ মিথ্যা এই বোধ হইবে না। সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ, বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস করিতে হইবে। আরও বিনা ভক্তিতে ও বিনা বৈরাগ্যে জ্ঞান কিছুতেই জন্মিবে না অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশ কিছুতেই হইবে না। শ্রীভগবান্ বলেন—

"মদ্ভক্তি বিমুখানাং হি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মঃশতৈরপি॥

দ্বিতীয় সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। বেদে ব্রহ্মের দুইটি রূপের উল্লেখ আছে।

কিছুই আর নাই, এই জগৎও সৃষ্ট হয় নাই; কেবল ব্রহ্মই আছেন এই একরূপ; দ্বিতীয় রূপটি হইতেছে জগতে যাহা আছে তাহাই ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম; সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অস্তি ভাতি প্রিয়টিই সর্ব্বত্র আছেন; নাম রূপের অবরণটি ইন্দ্রজাল মাত্র। নামরূপটি মায়া মাত্র। এই ব্রহ্মকে বলে সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাধিগত ভেদ ভিন্ন মূলে কোন ভেদ নাই। অবিজ্ঞাত স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই মায়া আশ্রয়ে সগুণ হয়েন। সগুণ হইলেও তিনি আপনাতে আপনিই থাকেন; তাঁহার স্বস্বরূপের বিচ্যুতি ক্ষণতরেও হয় না। কেহ বলেন স্বস্বরূপে থাকিয়াও সগুণ হওয়া—এই উক্তিতে আত্মনাশকর আত্মবিরোধ আছে। আমরা বলি ইহা আদৌ অসম্ভব নহে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধ থাকিয়াও যেমন বালক সাজিতে পারে; নাট্টাভিনয়ে ভদ্রলোক ভদ্রলোক থাকিয়াও যেমন চামার সাজিতে পারে; যাত্রারদলের বালক, যাত্রার বালক থাকিয়াও যেমন কৃষ্ণ সাজিতে পারে সেইরূপ তুরীয় ব্রহ্ম তুরীয় অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিয়াও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে অভিমান করিয়া খেলা করিতে পারেন। সগুণ ব্রহ্মের অবতার হওয়াটাও অভিনয় মাত্র। আবার যে অভিনয়ে যত আত্ম বিস্মৃতির প্রাবল্য থাকে সেই অভিনয়ই তব স্বাভাবিক হয়। কুকুর অভিনয় করিয়া চিরদিন ঘেউ করা থাকিলে, শৃগাল অভিনয় করিয়া চিরদিন ফেউ করা থাকিলেই তবে অভিনয় স্বাভাবিক হইল।

এই গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" আবার তৎক্ষণাৎ বলিতেছেন"ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্"ইত্যাদি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া যিনি গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদির বিচার শ্রবণ করেন,—করিয়া যিনি সগুণ ব্রহ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়া "আমি সমস্ত" এই ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারেন, তিনিই বিশ্বরূপের উপাসক। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ইহাই।

তৃতীয়—অভ্যাস যোগে বিশ্বরূপের উপাসনা। যিনি বিশ্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে না পারেন, তিনি কোন একটি অবলম্বনে চিত্ত একাগ্র করিয়া সেই অবলম্বনটিকেই বিশ্বরূপে ভাবনা করিবেন। অভ্যাসযোগের অবলম্বনটি দুই প্রকারের হইতে পারে। (১) ভিতরের অবলম্বন, (২) বাহিরের অবলম্বন। ভিতরের অবলম্বনটি জ্যোতিও হয়, প্রণবও হয় অথবা ভিতরের মূর্ত্তিও হয়। বাহিরের অলম্বনটি স্থূল মূর্ত্তি বা প্রতিমা। যাঁহারা যোগী তাঁহারা যম, নিয়ম,

আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহাররূপ বহিরঙ্গের সাধনা দ্বারা মনকে বিষয় শূন্য করেন; করিয়া ধারণা, ধ্যান, সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ সাধনা দ্বারা অন্তর্জ্যোতিকে বিশ্বরূপে ভাবনা করেন। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাও ভিতরের সূক্ষ্ম মূর্ত্তি বা বাহিরের স্থূল মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপের আরোপ করিয়া উপাসনা করেন। মূর্ত্তিটি ক্ষুদ্র হইলেও যিনি ভাবনা করিতে পারেন এই মূর্ত্তিই সেই অব্যক্তের মূর্ত্তি; ইনিই অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে বিদ্যমান আছেন; ইনিই অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং হইয়া আছেন; ইনিই মূলে অবিজ্ঞাতস্বরূপ, ইনিই আবার সগুণ বিশ্বরূপ—ইনিই মহত্তত্ত্ব, ইনিই অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত; ইনিই মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তি, ইনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, ইনিই অন্তর্য্যামী পুরুষ, ইনিই জীবের কর্ম্মফলপ্রদাতা, ইনিই মোক্ষদাতা; ইঁহারই সম্বন্ধে বলা হয়—

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি পুনঃ, তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥

ইনিই স্বরূপে সচ্চিদানন্দ তটস্থ লক্ষণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা—মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া এই ভাবে যিনি অভ্যাসযোগ সাধনা করেন, তিনিও সিদ্ধিলাভ করিয়া বিশ্বরূপে স্থিতিলাভ করেন; তৎপূর্ব্বে দেহত্যাগ হইলেও শ্রীভগবান্ তাঁহাকে মৃত্যুসংসার-সাগর পার করিয়া দিয়া থাকেন। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ" ইতি।

চতুর্থ মৎকর্ম্ম পরম হইবার সাধনা। যিনি অভ্যাসযোগও না পারেন, তিনি ভগবৎভক্তি-উৎপাদক কর্ম্ম করিবেন। এই সাধক প্রথমে নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম এবং অবতারের কথা শ্রবণ করিবেন,—করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া, শ্রবণ হইতে আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির কর্ম্মগুলি করিয়া যাইবেন।

শ্রীভগবান্ আছেন এই বিশ্বাসে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার কর্ম্মে ভক্তি জন্মে। একাদশী ব্রত, শ্রীমন্দির মার্জ্জন, বিগ্রহের নিকটে দীপদান, পূজার দ্রব্য আয়োজন, পুষ্প-বাটিকা প্রস্তুতকরণ, তুলসীমঞ্চে জলদান, পূজা, ভোগ, আরত্রিক, মন্দির

প্রদক্ষিণ, প্রেমভরে নৃত্যগীতাদি কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তি জন্মে। সর্ব্বজীবে শ্রীভগবান্ আছেন—সর্ব্বক্ষণের জন্য ইহা স্মরণ করিয়া সর্ব্বজীবের সেবা, কোনরূপে জীবের অবমাননা না করা—এই সমস্ত দ্বারা ক্রমে অভ্যাস-যোগে সামর্থ্য জন্মে এবং তদ্দ্বারা বিশ্বরূপের উপাসনাতে পৌঁছান যায়।

যে সাধক ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহার জন্য ভক্তি-উৎপাদক কর্ম্মগুলি শাস্ত্র অন্যভাবেও নির্দ্দেশ করেন।

(১) সৎসঙ্গ

(২) মৎকথালাপ—ভক্তিগ্রন্থ চর্চ্চা।

(৩) ভগবানের গুণ স্মরণ।

(৪) উপনিষদাদিতে ভগবৎ-বাক্যের ব্যাখ্যা।

(৫) আচার্য্যকে অকপটে ঈশ্বর ভাবনা করিয়া তাঁহার সেবা।

(৬) পুণ্য কর্ম্ম করা, যমনিয়মাদি সেবা, ভগবানের পূজায় নিষ্ঠা।

(৭) ভগবানের মন্ত্রজপ ও প্রার্থনা।

(৮) মদ্ভক্তের সেবা, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি, বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য, শম বা অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ, দম বা বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ সাধনা।

(৯) তত্ত্ববিচার।

এই সাধনা দ্বারা "ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেম লক্ষণা শুভ লক্ষণে" হে শুভ লক্ষণে এই সাধনা দ্বারা প্রেম ভক্তির বিকাশ হইবে।

মানস পূজা, স্বাধ্যায়,যোগ, ভিতরে প্রণাম প্রদক্ষিণ ইত্যাদি ব্যাপারেও ভক্তি জন্মে।

পঞ্চম—মদ্যোগ আশ্রয়ে ফলসন্ন্যাস করিয়া কর্ম্ম করা।

যিনি মৎকর্ম্মপরম হইতেও পারেন না ;—ভক্তি-উৎপাদক কর্ম্ম করিতে গেলে যাঁহার মনে হয় "আমার অনেক কর্ত্তব্য আছে ; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবারের উপর কর্ত্তব্য আছে, হাটবাজার আছে, পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, রুগীর সেবা আছে ; প্রবন্ধ লেখা আছে, সভাসমিতি করা আছে, বক্তৃতা করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া আছে, সংবাদপত্র পড়া আছে, চাকুরী বজায় রাখা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কর্ত্তব্য যাহার আছে এইরূপ ব্যক্তি "মৎকর্ম্ম পরম" হইতে পারিবে না। এইরূপ ব্যক্তিও তাহার কর্ম্মগুলিকে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে অভ্যাস করুক। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া ঈশ্বর প্রীতি জন্য—দাস যে

ভাবে প্রভুর আজ্ঞা পালন করে, সেই ভাবে "তুমি প্রসন্ন হও" স্মরণ রাখিয়া, অহং অভিমান না রাখিয়া, তাহার সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া করুক—ইহাতেও ফলসন্ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্মসন্ন্যাসের অধিকার জন্মিবে; তখন মৎকর্ম্মপরমের উপাসনা দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হইবে, পরে অভ্যাস যোগ দ্বারা চিত্ত একাগ্র করিয়া সেই সাধক বিশ্বরূপের উপাসনা করিতে পারিবেন; পারিয়া নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিলাভ করিয়া উপাসনার চরম ফল যে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি তাহাই লাভ করিতে পারিবেন।

সমগ্র ধর্ম্মটী এই। যে কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহাই করুক না কেন—সমগ্র ধর্ম্মটীর কোন না কোন অঙ্গ লইয়া তিনি থাকিবেনই।

যদি কেহ সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়া দেখিতে পারেন, তবে তিনি দেখিবেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, পারসীর ধর্ম্ম ইত্যাদি এই সমগ্র ধর্ম্মেরই অঙ্গ। পূর্ণটী দেখা হয় নাই বলিয়াই বিরোধ। হিন্দুধর্ম্ম এই জন্য কোন ধর্ম্মের নিন্দা করেন না। পূর্ণ, অংশের নিন্দা করিতে পারেন না, কিন্তু অংশগুলি পূর্ণটি না দেখা পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ করিবেই। কবে জগৎ পূর্ণধর্ম্মটি দেখিবে?

শক্তিসঞ্চার।

এমন কথা আছে যাহা নিতান্ত জড় অবস্থাকেও জীবন্ত করিয়া তুলে। নিম্নলিখিত বাক্যের শক্তি ঐরূপ।

প্রথমেই ভাবনা কর মরণ ত আছেই; তবে কুকুর, গাধা, ছাগল, শৃগালের মত মরিবে কেন, হরি হরি করিয়া মর; মানুষের মত মর।

মরিতেই যদি হয় তবে ভগবানের নাম করিয়া মর। আলস্য করিবার অবসর কোথায়? সর্ব্বদা হরি হরি কর, একটি শ্বাসও যেন হরি না স্মরিয়া না পড়ে, নিশ্চয়ই শ্রীহরি আশ্রয় দিবেন। প্রবল শক্তিসঞ্চার এই ভাবে হইবে। সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম এইটি স্মরণে কর, নূতন জীবনলাভ হইবে।

বুদ্ধদেবের উত্তেজনা বাক্য স্মরণ কর।

ইহাসনে শুষ্যতি মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্ অস্থি মাংস প্রলয় হউক, বহুকল্পদুর্ল্লভ জ্ঞান না পাওয়া পর্য্যন্ত আসন হইতে শরীর যেন না চলে। ইহাই জাগ্রত বাক্য।

মন বসান।

মনকে আত্মকর্ম্ম করিতে বসান প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ঋষিগণ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া যে প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা মনের জড়তা নষ্ট করিয়া মনকে আত্মকর্ম্মে বসাইবার জন্য।

এখন প্রাতঃস্নান অনেকেরই সহ্য হয় না—এজন্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া হাত, মুখ, চক্ষু, বেশ করিয়া ধুইয়া, সুন্দররূপে দন্তমার্জ্জন করিয়া, আর্দ্র বস্ত্রে শরীর ভাল করিয়া পরিষ্কার করিলেও অনেক কার্য্য হয়। মুখ ধুইবার সময় প্রথমেই এক মুখ জল মুখে রাখিয়া, ধীরে ধীরে চক্ষে জলের ছিটা কতকক্ষণ ধরিয়া দিতে অভ্যাস করা উচিত। ইহাতে যে শুধু জড়ত্ব কাটে তাহাই নহে, কিন্তু ইহাতে ৪০ বৎসরেও চস্‌মা নিতে হয় না। চক্ষের দৃষ্টি বরাবর ভাল থাকে।

তাহার পর নেঙ্গট পরিধান করিয়া তাহার উপর কাপড় পরিয়া আহ্নিকে বসিতে হয়।

প্রথমেই বৈরাগ্য চিন্তা করা উচিত। জীবনে যদি কাহারও মৃত্যু দেখা হইয়া থাকে, তবে বৈরাগ্য চিন্তা সহজ হয়। মৃত্যুকালে অন্যের যে অবস্থা হইতে দেখা গিয়াছে, সেই অবস্থা আমারও হইতে পারে—এই ভাব মনে আসিলেই মন আমিষশূন্য হইয়া বিরাগী হইবে। সে সময়ে অন্য চিন্তা করিতে ইহার রুচি হইবে না। বিষয়চিন্তাই আমিষ।

মন ইচ্ছা ত্যাগ করিলেই ইহাকে উপাস্য বস্তুটি দেখান উচিত। মূর্ত্তি

অবলম্বন হৃদয়ে বা বাহিরে করিয়া, অথবা কূটস্থে জ্যোতি অবলম্বন করিয়া অথবা নামটি ভ্রূমধ্যে জ্যোতির মধ্যে লিখিয়া, অথবা প্রণব বা মন্ত্রটি জ্যোতির মধ্যে লিখিয়া—যাহার যাহাতে রুচি সেই মতে ধ্যেয়বস্তুর উপরে প্রথম ভাবটী আরোপ করিতে হয়। আমার ধ্যেয়বস্তুটিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এইটি সর্ব্বব্যাপী, এইটি চেতন, আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী, ইঁন আমার চারিধারে আছেন। ইনিই বহুরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-আকার ধরিয়াছেন; স্থূল প্রতি-বস্তু এবং সূক্ষ্ম মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চিত্ত সমস্তই হইয়াছেন; আমার উপাস্যটিই ভিতরে বাহিরে রহিয়াছেন। ইনি আমাকে মুক্তি দিবেন, ইনিই আমাকে শক্তি দিতেছেন ইত্যাদি ভাবে ইঁহাকে জীবিত ভাবনা করিয়া প্রাণায়াম বা জপ বা সন্ধ্যাপূজায় বসিতে হয়। প্রাণায়াম বা জপ বা পূজা করিতে করিতে যদি আলস্য আইসে, তবে প্রথমে আসনের উপর দণ্ডায়মান হইয়াই ১০০০টি ইষ্টমন্ত্র প্রার্থনার সহিত জপ করিয়া লইতে হয়। ইহাতেও আলস্য না যায়, তবে নৃত্যের সময়কার মত অঙ্গস্পন্দন করিতে হয়; ইহাতেও না হয়, তবে একপায়ে দাঁড়াইয়া জপ করিয়া লইতে হয়; ইহাতেও আলস্যাদি না যায়, তবে পায়চারী করিতে করিতে হাজার জপ করিয়া লইতে হয়। পরে আবার আসনে বসিয়া কার্য্য করিতে হয়। ইহাতে নিশ্চয় আলস্য যাইবে এবং মন আত্ম-কর্ম্মে বসিবেই।

তবে ক্ষুদ্র রকমের আলস্য হইলেই এত করিতে হয় না; দুই চারিটা প্রাণায়াম বা দু'একটা মুদ্রা করিলেই হয়।

প্রারব্ধভোগ ত করিতেই হইবে—মৃত্যু ত আছেই—এ কার্য্যে প্রাণপণ করিব, এই ভাবে দেহাদির সচ্ছন্দতার প্রতি অনাস্থা করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কার্য্য করিতে হইবে। অভ্যাস হইলে আর কোন ক্লেশ হইবে না।

প্রারব্ধ ক্ষয়।

কর্ম্মফল আশ্রয় না করিয়া যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তিনিও একাধারে সন্ন্যাসী এবং যোগী।

শ্লোকটি বলা হইল। কি বুঝিলে?

প্রথম কথা। কর্ত্তব্য কর্ম্মটি কি?

যে জন্য সংসারে আসিয়াছ, তাহা সুচারুরূপে প্রতিপালন করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কি জন্য সংসারে আসিয়াছি?

প্রারব্ধ ভোগের জন্য।

বুঝিলাম না।

শোন বলিতেছি। কারাগার কেন তাহা ত জান?

লোকে অন্যায় করিলে জেলখানায় যায়। আবার কেহ কেহ জেলখানা দেখিতে যায়—যদি কোন দুঃখীকে মুক্ত করিয়া দিতে পারে। শেষোক্ত যাঁহারা, তাঁহারা কিন্তু যখন ইচ্ছা তখনই জেলখানা হইতে বাহির হইবে পারেন। ইঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে কেহ পারে না। ইঁহারা মুক্তপুরুষ।

মনে কর দেহের মধ্যে প্রবেশ করাই জেলখানা। কেহ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-সমূহের ভোগের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাদিগকে জোর করিয়া দুষ্কর্ম্মের ভোগের জন্য জেলে দেওয়া হয়। ইহারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম মধ্যে যে সমস্ত কর্ম্ম উপস্থিত ফল প্রদান করিবে—সেই কর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত যে দেহরূপ কারাগার তাহাতে প্রবেশ করে—দুষ্কর্ম্মের দণ্ডভোগ জন্য।

আর যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া কর্ম্মগৃহে আবদ্ধ হয়, তাঁহারা কয়েদীদিগকে উদ্ধার জন্য আইসেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই দেহে অহং বোধ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যান।

আচ্ছা যাঁহারাই দেহধারণ করেন, তাঁহারাই কি প্রারব্ধভোগ জন্য দেহ ধারণ করেন? ভগবান যে দেহধারণ করেন, তাহাও কি প্রারব্ধভোগ

জন্য? ভক্তের জন্য ভগবানের দেহ ধারণ, ইহাতেও কি প্রারব্ধ ভোগ আছে?

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ভক্তের অভিসম্পাত সফল করিবার জন্য দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তবে ত ঐ অভিসম্পাত ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি দেহ-কারাগার ছাড়িতে পারেন না।

ইহার বিচার কি?

সুদামার শাপে কৃষ্ণকে অবতার হইতে হইয়াছিল; আরও ধর্ম্মের গ্লানি দূর করা এবং সাধুর রক্ষা জন্য তাঁহাকে আসিতে হয়। যতদিন না ইহা শেষ হয়, ততদিন তাঁহাকে দেহ রাখিতে হয়। এই কার্য্য শেষ হইলেই তিনি দেহ ছাড়িতে পারেন। ইচ্ছা করিয়াও কাপড় ছাড়ার মত ছাড়িতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের দ্বারা শরবিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিলেন, ইহাও তাঁহার প্রারব্ধ; কিন্তু দেহত্যাগে তাঁহার কোন ক্লেশ নাই। তিনি সমাধি গ্রহণ করিয়া, দেহকে বস্ত্রত্যাগের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

যাঁহারা সমাধি দ্বারা দেহ ছাড়েন তাঁহারা মুক্তপুরুষ। তাহা যাঁহারা তাঁহারা পারেন না, তাঁহারা মুক্ত নহেন। সাধনা দ্বারা উচ্চ অবস্থা লাভ করিতেও কেহ পারেন; কিন্তু যদি সমাধিদ্বারা তিনি দেহ ছাড়িতে না পারেন, তবে তাঁহাকে অবতার বা সিদ্ধ বলা যায় না।

বলদেব যোগে দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যোগে দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সকলকে লইয়া মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। শ্রীশঙ্কর সমাধি দ্বারা নিজের মস্তক তান্ত্রিককে দিতে চাহিয়াছিলেন। ইঁহারা মহাপুরুষ।

কিন্তু যাঁহারা এতদূর নহেন, দেহত্যাগে যাঁহারা অসমর্থ; সাধনা দ্বারা ক্লেশকে ক্লেশ মনে করেন না, রোগ হইলেও অন্যের মত কাতর হন না; প্রারব্ধ এইরূপ জানিয়া রোগের যাতনা সময়েও শ্রীভগবানের স্মরণে সমস্ত দুঃখ অগ্রাহ্য করিতে পারেন; অন্য সময়ে সমাধি আনিতে পারিলেও মরণ মূর্চ্ছায় যদি আনিতে নাও পারেন, তবে ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে উচ্চ সাধক বলা যায়।

ইঁহারাও উচ্চ জীব। ইঁহারা সমস্ত জীবনধরিয়া এই শিক্ষা দিয়া যান যে, জীবের কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রারব্ধভোগ করা। জীবের দেহধারণ প্রারব্ধভোগ জন্য।

সুচারুরূপে প্রারব্ধ ভোগ যিনি করিয়া যাইতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয় ইহা যিনি শিক্ষা দিয়া যান, তিনিই কর্ত্তব্যপরায়ণ।

যিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য; যিনি অবিজ্ঞাতস্বরূপ—তিনি যে আপনার স্বরূপ ত্যাগ করিয়া বিরাট্ দেহ ধারণ করেন, তাহাও জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া মুক্তিসুখ দিবার জন্য। কর্ম্মগুলি ক্ষয় না হইলে, জীব কিছুতেই মুক্তিসুখ অনুভব করিতে পারে না। তাই অক্ষর পুরুষ জীবের কর্ম্মভোগ জন্য দেহ ধারণ করেন।

যাঁহারা প্রারব্ধ ভোগ কিরূপে করিতে হয় জানিয়াছেন, তাঁহারা প্রারব্ধক্ষয়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইতেও পারেন অথবা মিলিয়া এক হইতেও পারেন।

যাঁহারা মিলন-সুখ চান, তাঁহারা ভক্ত, আর যাঁহারা এক হইয়া থাকেন তাঁহারা জ্ঞানী।

কিরূপে প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে হয়?

কোন্ বিষয়ে প্রাণ একাগ্র হয়—সেইটি নিশ্চয় করিয়া তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। সেই একটি অবলম্বন করিয়া, অন্য যাহা হয় তাহা অবিচলিত ভাবে সহ্য করিয়া গেলেই প্রারব্ধ ভোগ হইয়া যায়।

কেহ কেহ নিঃসঙ্গভাবে থাকিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হয়েন। ইঁহাদের ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই। যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে ইঁহারা স্পন্দিত হয়েন মাত্র। ইঁহারা সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী।

কেহ কেহ শ্রীভগবানের লীলা, রূপ, নাম ইত্যাদি চিন্তা করিয়া সমাধিস্থ হইতে প্রবল বাসনা করেন। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম তাঁহাকে বাধা দেয় বলিয়া তিনি নাম, রূপ, লীলাতে পুনঃ পুনঃ আগমন করিতে থাকেন এবং সুখে দুঃখে প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যান। এক জন্মে ইঁহাদের নাও হইতে পারে, কিন্তু ইহাদেরও আর পতন হয় না।

ইঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম্ম করেন না। সকল কর্ম্মই করেন, কিন্তু ভগবানের প্রসন্নতা ভিন্ন অন্য কোন ফলে তাঁহাদের ইচ্ছা থাকে না। কর্ম্ম সফল হউক বা নিষ্ফল হউক; জয় হউক বা পরাজয় হউক; লাভ হউক বা ক্ষতি হউক ইহা তাঁহারা দেখেন না। হরি হরি করিয়া, প্রারব্ধ ভোগ হইতেছে জানিয়া, তাঁহারা ভগবান্ প্রসন্ন হও এই চিন্তা করিতে করিতে কর্ম্ম করিয়া যান। ইঁহারাও সমাধি জন্য চেষ্টা করেন। প্রারব্ধ অন্যরূপ

বলিয়া সমাধি আনিতে না পারিলেও ইঁহারা বিচলিত হন না। ধ্যান পুনঃ পুনঃ করিতে থাকেন। ইঁহারা এ দেহ ত্যাগের পরেউপযুক্ত দেহ ধারণ করিয়া, সমাধিসুখে দেহ যখন ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারেন। ইঁহাদের মুক্তি ক্রমমুক্তি।

যাঁহারা ধ্যানও পারেন না, তাঁহারা ধারণা লইয়া প্রারব্ধ ভোগ করেন।

যাঁহারা ইহাও পারেন না, তাঁহারা ভগবানের জন্য কর্ম্ম করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভে চেষ্টা করেন। তাহাও যাঁহারা পারেন না, তাঁহারা নিজের সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন।

এতদ্ভিন্ন যাঁহারা, তাঁহারা সাধক নহেন। কাজেই তাঁহাদের কারাগার হইতে কারারাগে যাইতে হয়। এইরূপ বহুবার জেলখানার কষ্ট পাইয়া যখন তাঁহাদের বিবেক আইসে, তখন প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ইঁহারা উন্নতিলাভ করেন। কিন্তু বিনা পুরুষকার প্রয়োগে কোন জীব প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে পারে না।

মানব জাতির লক্ষ্য কি হওয়া উচিত?

আত্যন্তিক শোক-নিবৃত্তিই মানবের লক্ষ্য।

কি জন্য এই শোক হয়?

অজ্ঞান জন্য।

অজ্ঞান টা কি?

আমি যাহা নহি তাহাকে আমি ভাবাই প্রধান অজ্ঞান। আমার যাহা নহে তাহাকে আমার ভাবাই অজ্ঞান।

কি আমি? কিই বা আমার?

আমি আপনি আপনি। আমি চেতন। জড় আমি নই, দেহ আমি নই। চেতনই আমি। চেতনের আমার বলিতে কিছু নাই। জড় আমার নহে, দেহ আমার নহে, জগৎ আমার নহে। চেতনই চেতনের।

এই অজ্ঞান যাইবে কিরূপে?

জ্ঞানলাভ হইলেই অজ্ঞান যাইবে। আত্মজ্ঞান ভিন্ন শোক চিরতরে দূর হইবে না।

এই আত্মজ্ঞান কিরূপ?

(১) জ্ঞানী বলেন, আমিই আমি। চৈতনই চেতন। ইহার মধ্যে অংশাঅংশী হয় না।

(২) ভক্ত বলেন—পরিপূর্ণ চৈতন্যই ভগবান্। জীব-চৈতন্য অংশ মাত্র। জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ—জীব নিত্যদাস।

নিত্যদাস হইয়া মানস পূজা, জপ, ধ্যানও হইবে।

জ্ঞানী হও বা ভক্ত হও, সঙ্কল্প ত্যাগ ভিন্ন স্থিতি নাই। জ্ঞানী একবারে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন; ভক্ত শুভ সঙ্কল্প করিয়া তাহাও ত্যাগ করেন।

তার পরে।

তার পরে আমি দেখিলাম আমার দিব্যরূপ হইয়াছে। আমি পুরে শয়ন করিয়া আছি। আমি পুরুষ। আমার দেহ হইয়াছে। আমার দুই দেহ। মুখ্য দেহটাই চিত্ত। গৌণ দেহটা আকারবিশিষ্ট।

কিন্তু আমাকে এত চঞ্চল করে কে? কত যেন শান্ত ছিলাম, কি যেন অশান্তি ভোগ করিতেছি। কেন এ অশান্তি?

মনই অশান্ত হয়। মনই সুখ দুঃখ তোলে। মনই শান্ত হয়। মন সুখ দুঃখ ভোগে বলিয়াই আমি ভুগি। মন কি আমি?

নাই হই—কিন্তু মন যাই করুক না কেন, মন যাহাই হউক না কেন— ইহাকে শান্ত না করিতে পারিলে আমার গতি হইবে না।

মন কখন ভাল, কখন বিবেচক, কখন পাগল। কখন বেশ সুন্দর কথা কয়, কখন ভারি অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে। আমি এক কাজ পাইলাম মনকে উপদেশ দেওয়া। মনকে প্রত্যহ উপদেশ দেওয়া আমার নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠিল। মনকে উপদেশ না দিলে আমি কিছুই যেন বুঝিতাম না।

আমি বলিতাম—দেখগো তুমি এত অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতেছ কেন? এত দুঃখই বা কর কেন? এত বেহুঁসই বা হও কেন? তুমিই যে সেই। তুমিই আমি।

হে সুহৃৎ! তুমি কেন পিশাচবৎ ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছ? তুমিই যে সেই। তুমি ত পাগল নও। কি অজ্ঞানের কথা তুমি কও?

এস এস একবার স্বরূপ দেখ। দেখ-দেখি কেমন তুমি! দেখিতেছ—তুমিই মূলে পরমশান্ত চলনরহিত নির্ম্মল আত্মদেব। তোমার আপনস্বরূপে তুমিই পরিপূর্ণ—আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ব্যাবহারিক ইন্দ্রজাল তোমার উপর উঠিয়াছে। হাহা হুহু চারিদিকে হইতেছে, কিন্তু কিছুই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। তুমি আপনি আপনি। তুমি নিঃসঙ্গ। তুমিই অবিজ্ঞাতস্বরূপ।

আবার তুমিই স্পন্দিত হও,—হইয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে ভাসমান হও। আপনার পরমশান্ত নির্ম্মল রূপের উপর বিশাল চিত্তস্পন্দন-কল্পনা তুলিয়া, কত আকার ধারণ কর। জগৎও সাজ তুমি—আবার জগৎ শাসনও কর তুমি। তোমার প্রশাসনেই চন্দ্রসূর্য্য আপন আপন স্থানে বিধৃত থাকে। তোমার প্রশাসনেই নদী প্রবাহিত হয়; দিবারাত্রি হয়, বাতাস বয়, আকাশ দাঁড়াইয়া থাকে। তুমি এত বড়, তুমি এত শক্তিমান্। তবে কেন এই পাগল-বেশে ক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছ?

তুমিই যে জগৎরূপে সাজিয়া, আপনাকে যেন অনন্তরূপে রূপান্বিত করিয়া এক হইয়াও যেন পৃথক্ হইয়াছ। ঠাকুর দেবতার যে মূর্ত্তি, সে যে তোমারই মূর্ত্তি। প্রণব যে তুমিই। নাভিদেশে সরস্বতী ব্রহ্মা, হৃদয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ, আর ললাটদেশে হরপার্ব্বতী, আবার বিন্দুস্থানে যার যা ইষ্ট। সূর্য্যমণ্ডলের যে জ্যোতি প্রণব ঘেরিয়া আছে—জ্যোতিও যে তুমি। জ্যোতিও যে বিজ্ঞানের জ্যোতি—তেজ বরণীয় ভর্গ। আবার পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, সব ইন্দ্রিয় এ যে তুমিই। ইন্দ্রিয়ও তুমি, ইন্দ্রিয়ের রাজাও তুমি। "ত্বমেব তত্ত্বম্"। তুমি ধ্যান কর কার? দুঃখ কর কি? "নির্ল্লজ্জ ধ্যায়সে কথম্"। নির্গুণও তুমি, সগুণও তুমি, বিশ্বরূপও তুমি, মূর্ত্তিও তুমি।

যে ধ্যান করে সেও তুমি, যাকে ধ্যান করে সেও তুমি, যা বলিয়া ধ্যান করে তাও তুমি।

এই সুখের দুঃখের অবস্থা ছাড়িয়া, পাগল অবস্থা ছাড়িয়া, পিশাচ অবস্থা ছাড়িয়া,—একবার আপনাকে আপনি দেখ দেখি, আপনার স্বরূপ চিন্তা কর

দেখি—দেখ-দেখি তুমি প্রবুদ্ধ হও কি না ? নিত্য আমি তোমাকে তোমার স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিব—তুমি স্থির হও।

ভয়:ত কিছুই নাই। দেহ যায় যাবে তা'তে তোমার কি ? তোমারইত কল্পনা এটা। মৃত্যুও ত একটা অজ্ঞান তোমার উপরে। সবই ত মিথ্যা। তুমি মাত্র সত্য। আপন নিঃসঙ্গস্বরূপে স্থিতিলাভ করনা একবার ? করিতে কি নাই ?

না কর, আপনাকে আপন কল্পিত ইন্দ্রজাল হইতে না হয় পৃথক্ বিচার কর। যে মুহূর্ত্তে বিচার করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই দেখিবে তুমি সব হইতে ভিন্ন। তুমি পূর্ণ। তুমি নিত্য সত্য বুদ্ধ মুক্ত।

ইহাও না কর, তোমার ভুবনমোহনরূপ সেই বৃক্ষতলে - কখন দক্ষিণামূর্ত্তির তপস্যা, কখন রত্নসিংহাসনে বিন্দুমধ্যে নয়নাবদ্ধ মূর্ত্তি। ইঁহাকে ভাব—ভাবিয়া আপনার মূর্ত্তিকে আপনি পূজা কর, সেবা কর; করিয়া ধ্যান কর, আহা! সেই কেয়ূর কুণ্ডল ধৃত, বিদ্যুৎ জড়িত নবীন মেঘ শত সৌদামিনী যাহার অঙ্গে খেলা করে—মরি মরি! কি দৃষ্টি, কি হাসি; কি সুন্দর বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত ভাল-তট; কি সুন্দর দন্তরাজি; কি সুন্দর গমনভঙ্গি—মরি মরি কেমন সুন্দর মূর্ত্তি! এই যে চক্ষের উপর দাঁড়াইয়াছ। এই যে আজ্ঞার ভিতরে সমসূত্র-স্থানে ত্রিকোণমণ্ডলপারে অপূর্ব্ব সাজে চক্ষের উপর দাঁড়াইয়া হাসিতেছ, আর আমি একদৃষ্টে চাহিয়া আছি। তুমি যেন আমার দিকে চাহিয়াও চাহিতেছ না, কিন্তু লোলজিহ্বা কর্ত্তন করিয়া কি যেন রঙ্গ করিতেছ। রে চিত্ত! ভরসা কর না—তোমার সত্তাই যে সে সেই চিৎ, সেই চিন্ময়ী, সেই চিৎময়। নিত্য আপনার স্বরূপ স্মরণ কর--পাগলামী করিও না। তুমি পাগল নও। অসম্বন্ধ প্রলাপ তোমার নাই। তুমিই সেই। শান্ত হও। শান্ত হইয়া বল :—

হে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন আধার, হে ভূর্ভুবস্ব, হে স্থাবর জঙ্গমাত্মক, হে সর্ব্বজনবরণীয়, হে সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী প্রকাশস্বরূপ, হে পরমাত্মন্, হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্—তুমি আপনিই আপনি; তুমি প্রসন্ন হও! তুমি ক্ষুদ্র নও; তুমি অসম্বন্ধ প্রলাপী নও। তুমিই তুমি।

অযোধ্যায় দর্শন জন্য।

অযোধ্যা যাইব মনে বড় আনন্দ হইতেছে, শ্রীরামসীতা দর্শন করিব। বেলা ১০॥ দশটা বাজিয়াছে। ইষ্টিসানে পৌঁছিলাম। ট্রেণ কখন্ আসিবে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। ১১টা বাজিল। বৃহৎ হস্তীর ন্যায় দ্রুত-বেগে ট্রেণ আসিয়া থামিল। আমরা উঠিয়া বসিলাম। গাড়ীকে বলিলাম, শ্রীরাম দেখিব শীঘ্র চল। তোমার রাম আমার রাম। তুমিও দেখিবে, আমিও দেখিব। বলিতে বলিতে ট্রেণ ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ ছুটিল,—যেন পায়ে কতকগুলি অলঙ্কার পরিয়া ঝমর ঝমর করিয়া ছুটিতেছে; আর বলিতেছে দেখ আমার কত শক্তি! কত লোক লইয়া কত ছুটিতে পারি। ছোট ইষ্টিসানের নিকটে যাইয়া, সে দিকে যেন না চাহিয়া আরো ছুটিতে থাকে। মনে হয় যেন ছোট ইষ্টিসান চ'কে অঞ্চল দিয়া রোদন করিয়া বলিতেছে,—আমি ছোট, তুমি মহৎ;—তাই ব'লে কি এত অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। তুমি এত শীঘ্র চলিয়া গেলে যে, আমি একবার তোমায় ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। যদ্যপি আমি ভগবানের কৃপায় কখন দিন পাই, বড় হইতে পারি তো ৫ মিনিটের জন্যও তোমাকে পাইব। আমি ট্রেণকে বলিলাম কেবল বিরক্ত করিলে হয় না, যাহাতে ভগবানের নাম নাই তাহার সকলি বৃথা! আশ্চর্য্য ব্যাপার—একটু পরে শুনিলাম ট্রেণ নাম করিতেছে—সেই যে ঝমর ঝমর শব্দ হইতেছিল—তাহাতেই অযোধ্যাপতি রাম, অযোধ্যাপতি রাম এই শব্দ বাহির হইতেছে। আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। ট্রেণকে নমস্কার করিয়া কত প্রশংসা করিলাম। ধন্য-বাদ দিয়া ট্রেণের সঙ্গে ঐ নাম করিতে লাগিলাম। বেলা অপরাহ্ণ, অযোধ্যার ইষ্টিসানে ট্রেণ পৌঁছিল; আমরা নামিলাম। ট্রেণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

মালদহের রাণী শ্রীমতী ভূতেশ্বরী দেবী চৌধুরাণী মাতা আমাকে লইয়া গিয়া-ছেন। মানুষ-ঠেলা গাড়ী দেখিয়া রাণীমাতাকে বলিলাম, ঐ গাড়ীতে উঠিতে হইবে; তিনি তাহাই করিলেন। স্নেহময়ী আমাকে বড়ই স্নেহ করেন; তাঁহাদের সঙ্গে আমিও সেই গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী চলিল। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় বৃক্ষ

এবং মাঠভরা শস্য যাহা দেখিলাম—সকল বৃক্ষের পাতায় পাতায়, শস্যের গায় গায় রাম রাম রং মাখান। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাদের কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা যেন কি বলিল, আমি বুঝিতে পারিলাম না। কতক্ষণে বাসায় পৌঁছিলাম। সরযূর ধারে বাসা হইয়াছে। মনে হইল বেশ হইয়াছে—সরযূতে যাইয়া রাম রাম করিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিব। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরযূতে যাইলাম, কিন্তু আমার চিৎকার করিয়া রোদন করা হইল না; যেহেতু সঙ্গীরা তা নয়। লুকায়ে লুকায়ে কাঁদিলাম—একবার এস, তোমায় একবার দেখি।

বাসায় আসিতে ইচ্ছা হইতেছে না, কিন্তু আমি যে পরাধীনা তাই আসিলাম। বাসার সকলের মধ্যে সেই বাড়ীর কথা। খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি বাজে কথা। বড়ই বিরক্তিকর লাগিতেছে, কি করিব চুপ করিয়া রহিলাম; মনের কথা বলিতে গেলেই লোকে পাগল বলে। সে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে সকলে সরযূতে যাইলাম। দেখিলাম, পাণ্ডাঠাকুরেরা গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন। আমি সরযূর জলের ধারে যাইয়া বসিলাম। পাণ্ডাঠাকুর আমার হাতে এক শুক্‌নো নারিকেল আর একটি টাকা দিলেন। আমি জলে ফেলিয়া দিয়া পাণ্ডার মুখের দিকে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলাম সঙ্কল্পে প্রয়োজন নাই। আমি রাম দেখিব। পাণ্ডাঠাকুর অবাক্ হইয়া যেন চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর নারিকেল ও টাকাটি জল হইতে উঠাইয়া লইলেন। আমার উপর রাগ করিলেন না। আমি স্নান করিয়া তীরে উঠিলাম। ভুজ্যি উৎসর্গ করিতে হইবে; কিন্তু ভুজ্যির অবস্থা দেখিলে আর তাহা উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করে না। পেতলের ছাতা-পড়া থালা; ঐরূপ গেলাস, চারটি দাল, চাল, লবণ। আমার আর তাহা উৎসর্গ করা হইল না; যেহেতু ইচ্ছা হইল না। একটি গাভী আছে, দুই আনা চারি আনা দিলে তাহাও উৎসর্গ হয়; আমার ভাগ্যে তাহাও হইল না; যেহেতু মন চাহে না। ঐরূপ ব্যাপার আর পাণ্ডাদের গণ্ডগোল দেখিয়া মনে হইল—একি তীর্থে আসা? তীর্থে আসিয়া প্রাণ দিয়া কার্য্য করিবে। সরযূতে স্নান করিয়া, সকলে একত্র হইয়া বসিয়া, একমনে রাম রাম করিয়া ডাকিবে। তা নয়। একবার মন স্থির করিবার যো নাই। পাণ্ডাদের সন্তোষের জন্য যাহা দিবার দিলেই তো মিটিয়া যায়। এত আড়ম্বরে প্রয়োজন কি? যে জন্য

আসা হইল, সে অনুসন্ধান নাই, কেবল গণ্ডগোল। মনে হইল ছুটিয়া পালাইয়া যাই। যেখানে কেহ নাই সেখানে যাইয়া রাম বলিয়া ডাকি।

এইরূপ কতক্ষণ পরে সকলের সরযূর কার্য্য শেষ হইল। আমরা শ্রীরাম দর্শনে চলিলাম। সকলের সঙ্গে যাইতেছি কিন্তু দূরে দূরে একলা থাকি। মনে হয়, একলা হইলেই সে ধন পাওয়া যায়। সত্যই একলা হইয়া কাঁদিতে পারিলে পাওয়া যায়। কিন্তু সে জল কি চক্ষে সকল সময় থাকে? যখন চক্ষে সে জল আসে তখন ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে। নির্জ্জনে হইলে তিনি আসিয়া তো আঁখির জল মুছাইয়া দেন। বড় ব্যস্ত হইলে লোকের অদৃশ্যে আসিয়া নয়নের জল মুছাইয়া দেন। কত ভালবাসি বলেন। বনবাসী জটাবল্কল, ধনুর্ব্বাণ হস্তে নবদূর্ব্বাদল শ্যাম কমল আঁখি বড় সুন্দর, বড় ভাল বাসি। রাজা রামের সম্মুখে যাইয়া প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া দর্শন কর—আর সে ভুবনসুন্দর বনবাসী শ্রীরামচন্দ্র দর্শন করিলে, ছুটিয়া গিয়া চরণযুগল ধরিয়া শ্রীমুখ পানে আকুল নয়নে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। বালিকা বয়সে সেই যে পিতা আমাকে শ্রীরামায়ণ পাঠ করিতে দিতেন, সেই সময় হইতেই বনবাসী শ্রীরাম-ছবি হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাই রাম বলিয়া কাঁদিলে প্রাণ শীতল হয়।

আমরা যাইয়া প্রথমে শ্রীহনুমান দর্শন করিলাম। পরে অন্য সকল মন্দিরে যাইয়া দর্শন হইতে লাগিল। যেখানে ফুল ফুটিয়া থাকে, সেই খানেই ছুটিয়া যাইয়া রাম রাম রং মাখান পাতাগুলির গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাদের সীতা-রামের কথা জিজ্ঞাসা করি। মনে হয় স্থির হইয়া দাঁড়াইলে তাহারা কি বলে বুঝিতে পারিব। কিন্তু বড় ব্যস্ত। কেবল শীঘ্র এস, শীঘ্র এস। আমার তখন মনে হইল তোমরা চলিয়া যাও। মনে ভাব আমি হারাইয়া গেছি। আমি এই অযোধ্যার রাস্তায় রাস্তায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইব। আমার কেহ নাই, আমি ফিরে আর যাব না। কে আর শুনিবে সে কথা? আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। বাসায় পৌঁছিলাম। তীর্থের কার্য্যের মধ্যে কেবল চরণ পূজাই আমার ভাল লাগিল। যে পাণ্ডার নারিকেল জলে ভেলিয়া দিয়াছিলাম, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া চরণ পূজা করিলাম। পাণ্ডাঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। আহারাদির পর এষ্টেসনে যাইব; আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। এবার সকলের দিকে একেবারে পেছন হইয়া বসিলাম; চ'কের জল আর গোপন

করিতে পারি না কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাম রাম রং মাখান লতাপাতা বৃক্ষদের বলিলাম—মনে ছিল অযোধ্যায় আসিয়া রাম পাইব। কৈ রাম তো পাইলাম না। তোমাদের রাম আসিলে বলিও, কাঙ্গালিনী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

গীত।

গাছের সঙ্গে ভাব করেছ দেখ্‌লে বোঝা যায়,
গায়ের রং মাখিয়ে গেছ যত পাতার গায়।
কেউ পাছে দেখে ব'লে, এসে থাক রাত্রিকালে,
প্রভাত হইলে পরে, চলে যাও নিজ আলয়।
শাখাগুলি হেলে দুলে, সোহাগে প'ড়ছে ঢ'লে,
ছড়িয়ে পাতা, কইচে কথা, বইয়ে মলয় বায়।
মনসুখে রহিয়াছে, ফলে ফুলে সাজিয়াছে,
নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে আছে তোমার প্রতীক্ষায়।

শ্রীমতী............
৺কাশীধাম।

নূতন।

নূতন দ্রব্য দেখিলেই মানবের মন মুগ্ধ হইয়া যায়। নূতনের সকলই ভাল নূতনের কুৎসিতও ভাল। ঘরে একটি উৎকৃষ্ট দামী জিনিষ আছে, আর একটি অল্প দামের চক্‌চকে দ্রব্য দেখিলেই মন ভুলিয়া গেল। অমনি সেইটিকে আনিয়া রাখিলেন। নূতন প্রণয় বড় ভাল লাগে। পরমাসুন্দরী স্ত্রী ঘরে আছেন, তিনি পুরাতন হইয়াছেন; আর তাঁহার দিকে চাহিতে ইচ্ছা করে না। কোন নূতন লোকের দিকে দৃষ্টি পড়িল, অমনি মন ভুলিয়া গেল। কুৎসিতা হইলেও সে তখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও গুণবতী। পুরাতন হইলেই আর রূপ গুণের গৌরব থাকে না। তাই বলিতেছি রূপেও মুগ্ধ করে না, গুণেও মুগ্ধ করে না; মন ভুলায় নূতনে। তবে অনুসন্ধান করিয়া দেখ নূতনে কি আছে? বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই নূতন দেখিলে পাগল। গ্রহণ করুন বা না করুন একবার চক্ষেও দেখিবেন। নিত্য পুরাতন কথা ভাল লাগে না। যিনি নিত্য নূতন কথা কহিতে পারেন তাঁহার কাছেই বসিতে ইচ্ছা করে। নূতনেরই কি গুণ আছে, নূতনই এত ভাল লাগে কেন? পুরাতনে ঘৃণা, নূতনে এত আসক্তি কেন? জীব এক দিন সেই পরম সুন্দরকে দেখিয়াছিল। তাই মন সকল বস্তুতেই তাঁহারই

অনুসন্ধান করে। নূতন দ্রব্যগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইল তাহাতে কিছুই পাইল না। তখন সেটি পুরাতন হইয়া গেল, আর ভাল লাগে না; আবার নূতন চাই। কেন যে মন এত নূতন চায়, জীবের সে দিকে দৃষ্টি নাই। নূতন প্রণয় বড় ভাল লাগে। শ্রীভগবান্ প্রেমময়, তাই জীবের প্রেম বড় ভাল লাগে। কিন্তু হায়! একি সে প্রেম? এ প্রেম যে ক্ষণস্থায়ী, সে প্রেম যে চিরস্থায়ী। এ সুখ যে চকিতে ফুরাইয়া যায়, সে সুখ যে ফুরায় না। এ জগতের রূপগুণ দিয়া মনকে ভুলাইতে চাও, কিন্তু মন তাহাতে ভুলিবে কেন? সে যে এক দিন অসীম রূপগুণে ডুবিয়াছিল, কিন্তু নিজ কর্ম্মদোষে দূরে পড়িয়া গিয়াছে; তাই বলিয়া কি সে সে বস্তু ছাড়িয়া থাকিতে পারে? সদা সর্ব্বক্ষণ কাজে কর্ম্মে, আহারে বিহারে তাঁহারই মধুর স্বাদ গ্রহণ করিতেছে, তাঁহাকেই খুঁজিতেছে; কিন্তু জীব তাহা বুঝিতে পারে না। এ জগতের বলিয়া ভোগ করিয়া সকলই নষ্ট করে। সকল বস্তুতে তাঁহারই রস। তিনি রসময়। নূতন পুরাতন সকলেই তিনি আছেন, কিন্তু পূর্ণভাবে তো পাইবে না। নূতন পুরাতন পরিত্যাগ করিয়া, নিজে নূতন হইয়া সেই পরমপুরুষকে অনুসন্ধান কর, অবশ্য পাইবে। শ্রীমতী............

৺কাশীধাম।

শেষ নিবেদন।

প্রভু! শেষ নিবেদন পায়

আমি বলি বারে বারে কহিব না কথা স্বভাব নাহিক যায়।
ভাবময় তুমি যখন যে ভাবে অন্তরে বিরাজ হরি!
তোমারে দেখাতে তোমার মূরতি তাই না লেখনী ধরি॥
হৃদয়ের ছবি বাহিরে আঁকিতে পাগল পরাণ চায়।
আমি না পারি রচিতে নিপুণের মত হিজিবিজি হ'য়ে যায়॥
সুষুম্না ভিতরে অক্ষরে অক্ষরে সৃজন-কৌশল কত।
ভুলিয়া থাকিলে মধুর ঝঙ্কার আভাসে পিয়ার মত॥
গুরুবীজরূপে চক্রে চক্রে তুমি শ্রীপদ ফেলিলে পরে।
ফুটে উঠে সব কমলনিচয় কত মকরন্দ ক্ষরে॥
সৃজনকৌশল দেখিয়া তোমার অবাক্ হইয়া থাকি।
আসি সমাপিবে আমার করম তাই না ফেলিয়া রাখি॥
জানি না শিল্পবিজ্ঞান-ব্যাপার গড়িতে অনেক বাকী।
মাথাটি রাখিয়া চরণসরোজে নীরবে কেনবা থাকি॥
পড়িয়া রহিব যুগ-যুগান্তর শ্রীগুরু গোবিন্দ স্মরি।
যা করিতে হয় করিও গোঁসাই, তুমি যে দয়াল হরি॥

শ্রীমতী............

বসন্তে শ্রীভগবান্।

বসন্ত আসিয়াছে। ফলে ফুলে, জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কি এক মোহন বাঁশীর মোহন সুরে সমস্ত জগৎ প্রাণ পাইয়াছে। সকলেই কি এক ভাবে মাতিয়াছে। সকল পদার্থেই যেন একটা পিপাসা, একটা তৃষা, একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। মন যেন কি চায়, ফুলে যেন কি আছে, শব্দ যেন কি বলে, প্রাণ যেন কাহার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

বিরহী কিম্বা বিরহিণী নও।—জগতের সুখের বস্তু সকলই নিকটে আছে, তোমার প্রিয়তম নিকটে বসিয়া কত মিষ্টালাপ করিতেছেন; তবু কেন হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এক একবার আকুল পিপাসা জাগিয়া উঠিতেছে? তবু কেন থাকিয়া থাকিয়া প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিতেছে। বসন্তের সমীরণ বড়ই সুখস্পর্শ; অঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গেল, বড়ই স্ফূর্ত্তি হইল। কিন্তু যেন কাণে কাণে কি বলিয়া গেল।

কোকিলের কুহু রব বড়ই মধুর; মধুরের মধুপানে প্রাণে সুখ হইবার কথা, কিন্তু এ সুখের মধ্যে মন ব্যাকুল হয় কেন? এ মধু-মাসের প্রতি ঝঙ্কারে মনকে পাগল করিয়া তুলিতেছে; জীব সকল আকুল হইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে; সকলেই আনন্দের জন্য অধীর হইয়া যথাসাধ্য আনন্দ লাভের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কই কেহই ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না! হৃদয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব উদয় হইয়াছে, কেহই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। মনকে কতই সুখের বস্তু আনিয়া দিতেছে, মনের কিছুতেই মন উঠিতেছে না। সে যেন কি চায়, তা যেন পায় না; তাই সে অতৃপ্ত। এত করিয়া মন তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছে, তবু তো তুমি তাহার অন্তরের কথা বুঝিবে না; তাহার প্রিয় বস্তু তাহাকে দিতে পারিতেছ না; তাই সে তোমার বৃথা সুখে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। মনের সুখ নাই, তাই তুমি পুনঃ পুনঃ সুখাস্বাদ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছ না, আশাও মিটিতেছে না। কি করিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছ না। প্রিয় সঙ্গে কখনও ঘরে, কখনও বাহিরে, কখনও উদ্যানে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছ। যদি অস্থির না হইবে, এত ছুটাছুটী করিতেছ কেন? কই এক স্থানে উপভোগ করিতেও ত পারিতেছ না। শান্তি নাই। শান্তি থাকিলে এত চঞ্চল হইবে কেন? এত ভোগ করিয়াও এত জ্বালা কেন? যতই যা কর, সংসারের প্রিয় বস্তু লইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। ভাই বন্ধু, পতি, পুত্র সকলই ত পাইয়াছ। সকলকে লইয়া ত খেলিয়া দেখিয়াছ,

কই শান্তি ত মিলে নাই। তবে আর কেন? ইহলোকের প্রিয় সহবাসে এ জ্বালা যাইবার নয়। যাঁর জন্য প্রাণ আকুল, তাঁহাকে না পাইলে আনন্দ নাই। ক্ষণস্থায়ী সুখে কি মন শান্তি পায়? সে তোমার কাছে স্থায়ী সুখ চায়। মন ত শিশু নয় যে, তাহাকে রাঙ্গা ছড়ি কিম্বা লাড্ড দিয়া ভুলাইবে। ঠেকিয়া শিখিয়াছে লাড্ডুতে সুখ নাই তাহা বুঝিয়াছে; তাই ক্ষুদ্র ক্ষণিক সুখে ভুলে না। প্রাণ জুড়ান ধন চায়; জীবাত্মা পরমাত্মায় রমণ করিতে চায়, বিন্দু সিন্ধুতে মিশিতে চায়। প্রকৃতি পরমপুরুষের সহিত ক্রীড়া করিতে চায়। সতী পতির অন্বেষণে কাঁদিয়া বেড়ায়, পরকে লইতে চাহিবে কেন? নাগরী আপন নাগরের জন্য পাগল। ইতর পুরুষে তাহার মন মজিবে কেন? জীব-কৃষ্ণের নারী শ্রীকৃষ্ণ দরশনে ছুটিয়াছে, ধরার সুখ তাহার ভাল লাগিবে কেন? বসন্তদূতী এই সংবাদ লইয়াই উপস্থিত। জীব বুঝিতে পারে না। বসন্তের সমীরণ কাণে কাণে এই কথাই বলে। কোকিলের সুমধুর কণ্ঠস্বর এই গীতই গাহিয়া থাকে। বসন্তের প্রতিশব্দ এই ভাবেরই ইঙ্গিত করে। বসন্তকালে শ্রীভগবানের ভাব সর্ব্বত্রই বিকশিত। বৃক্ষে তাঁর ভাব, লতায় তাঁর ভাব, ফুলে তাঁর ভাব, ফলে তাঁর ভাব সকল বস্তুতেই শ্রীভগবানের মধুর ভাব ছড়ান রহিয়াছে। তাই এসময় জগতের যে বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়ে, তাহাতেই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। হৃদয়ে আকুল পিপাসা জাগিয়া উঠে। আজ ভগবানের সেই অনন্ত প্রেমর শির দিকে দৃষ্টি না করিয়া, নশ্বর সুখের দিকে ধাবিত হইয়া, আপনার দুঃখের পথ আপনি পরিষ্কার করিতে চলিল। বসন্তের শত কথা শুনিল না। তাহার হিত উপদেশ মানিল না। বসন্ত দেখিল তাহার গূঢ় ভাব কেহ গ্রহণ করিল না, তখন সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল; বোধ হয় যেন অভিমানিনীর তীব্র দৃষ্টিরূপ গ্রীষ্ম আসিয়া জীবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। আবার জীবের দুঃখ দেখিয়া দয়ার্দ্র বর্ষাদেবী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল। গ্রীষ্মের নয়ন-বারি বর্ষা হইল।

সমীরণ শ্রবণ-দ্বারে বলে এসে ধীরে ধীরে,
বসন্তে প্রাণ ব্যাকুল নয় এ প্রিয়জন তরে।
কাহার বিরহে মন, দহিতেছে নিশিদিন—
জাননা জীব-অজ্ঞান, দোষ দাও ফুলশরে।
কেন যে এত অধীর, ভেবে দেখ হ'য়ে স্থির,
বসন্তে এ ভাব যার খুঁজে লও সেই প্রেমিকেরে।
কভু না হবে বিচ্ছেদ, মিলনে সুখ কত—
সেই প্রেমে হও রত, আনন্দ পাবে অন্তরে।
যোগী প্রেমী মুনি যাঁরা, যাঁর প্রেমে পাগল পারা—
তাঁর প্রেমে হও মাতোয়ারা, ভজ সেই প্রাণেশ্বরে। শ্রীমতী ....

৺কাশীধাম।

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥৪৪॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥৪৫॥
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥৪৬॥
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥৪৭॥
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥৪৮॥
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥৪৯॥
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০॥

৪৪। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন : পার্থ! গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার সার-সর্ব্বস্ব; গীতা আমার অত্যুগ্র ও অব্যয় জ্ঞান।

৪৫। গীতা আমার উত্তম (নিবাস) স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার গুহ্য (পদার্থ), গীতা আমার পরম গুরু।

৪৬। গীতাশ্রয়ে আমি বাস করি, গীতা আমার পরম আবাস স্থান; গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমি ত্রিলোক পালন করি।

৪৭। গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্দ্ধমাত্রা গীতা নিত্যা ও শ্রেষ্ঠা এবং অনির্ব্বচনীয়-পদস্বরূপিণী।

৪৮। হে পাণ্ডব! তুমি অবধান হইয়া শ্রবণ কর, আমি গীতাশাস্ত্রের গূঢ় নাম তোমার নিকট বলিতেছি। তাহা কীর্ত্তন করিলে মুহূর্ত্তে সমস্ত পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৪৯।৫০। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি-ব্রহ্মাবিদ্যা,

ইত্যেতানি জপন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাঽন্তে পরমং পদম্ ॥৫১॥
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাঽত্র সংশয়ঃ ॥৫২॥
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥৫৩॥
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরং।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥৫৪॥
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুক্তঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণোভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥৫৫॥
অধ্যায়াঽর্দ্ধং চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬॥

ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী।

৫১। এই নাম সকল যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি নিত্য জ্ঞান সিদ্ধিলাভ করেন এবং দেহাবসানে পরমপদ লাভ করেন।

৫২। সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ হইলে অর্দ্ধেক পাঠ করিবে। তাহা হইলে গোদানজ পুণ্য লাভ করিবেন—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৫৩। যিনি এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করেন, তিনি সোমযাগ-অনুষ্ঠানের ফল লাভ করেন। যিনি ষষ্ঠাংশ পাঠ করেন, তিনি গঙ্গাস্নানের ফললাভ করেন।

৫৪। যিনি নিত্য দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং এক কল্প তথায় বাস করেন—ইহা ধ্রুব।

৫৫। যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া এক অধ্যায় নিত্যপাঠ করেন, তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া চিরকাল বাস করেন।

৫৬। যিনি নিত্য এক অধ্যায়ের অর্দ্ধ বা একপদ পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তর সম কাল সূর্য্যলোকে বাস করেন।

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্বোকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥৫৭॥
গীতার্থমেকপাদং চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদং ॥৫৮॥
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯॥
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬০॥
গীতাঽধ্যায় সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥৬১॥
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যদ্যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠ প্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৬২॥

৫৭। যিনি গীতার দশটী, সাতটী, পাঁচটী, চারিটি, তিনটী, দুটী, একটী বা অর্দ্ধ শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করেন।

৫৮। যিনি গীতার এক পাদ, এক অধ্যায় বা একশ্লোকের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।

৫৯। যিনি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত গীতার্থ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি মহাপাতকযুক্ত হইলেও মুক্তির অধিকারী হয়েন।

৬০। যিনি গীতাপুস্তক সংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত আনন্দ উপভোগ করেন।

৬১। গীতার এক অধ্যায়ও যাহার নিকটে সংযুক্ত থাকিয়া যাহার দেহত্যাগ হয়—তাহা হইলে তাহার মনুষ্যলোকে জন্ম হয়; এবং (পূর্ব্বসংস্কার-বলে) পুনরায় গীতা অভ্যাস করিয়া উত্তম মুক্তি লাভ করেন।

৬২। গীতা এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মৃত্যু হইলে সদ্গতি হয়। গীতা পাঠ করিয়া যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, সেই সেই কর্ম্ম নির্দ্দোষ হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যাতি স্বর্গতিম্ ॥৬৩॥
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥৬৪॥
গীতাপুস্তক দানং চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥৬৫॥
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবঃ ॥৬৬॥
শতপুস্তক দানং চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥৬৭॥
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যন্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬৮॥
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদানয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥৬৯॥

৬৩। যিনি পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকালে গীতা পাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন এবং নরক হইতে স্বর্গলোকে গমন করেন।

৬৪। গীতা পাঠ দ্বারা শ্রাদ্ধতর্পণ-পরিতৃপ্ত পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া, পুত্রগণকে সদা আশীর্ব্বাদ করেন এবং পিতৃলোকে গমন করেন।

৬৫। যিনি ধেণুপুচ্ছ সহিত গীতা পুস্তক দান করেন, তিনি সেই দিনেই সম্যক্ কৃতার্থতা লাভ করেন।

৬৬। যিনি স্বর্ণ সংযুক্ত করিয়া গীতা পুস্তক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।

৬৭। যিনি একশত সংখ্যক গীতা পুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন; এবং তাঁহার পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব।

৬৮। (তিনি) গীতাদানজনিত পুণ্যপ্রভাবে সপ্তকল্প পরিমিতকাল বিষ্ণুলোকে অবস্থান করেন, এবং ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করেন।

৬৯। গীতার অর্থ, বিশেষ ভাবে শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা পুস্তক দান করেন, তাঁহার প্রতি শ্রীভগবান্ প্রীত হন এবং অভীপ্সিত ফল দান করেন।

দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বাঽমৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥৭০॥
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥৭১॥
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥৭২॥
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥৭৩॥
যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥৭৪॥
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়োভবেৎ ॥৭৫॥

৭০। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মধ্যে যে কোন বর্ণে (মানব) জন্মগ্রহণ করিয়া, যদি গীতারূপ অমৃত শ্রবণ বা পঠন না করে,—তবে হস্তস্থ অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে।

৭১। সংসারদুঃখে কাতর মানব গীতাজ্ঞান সম্যক্ লাভ করিবে। গীতামৃতপানে ভক্তিলাভ করিয়া ইহলোকে সুখী হইবে।

৭২। জনকাদি বহু ক্ষিতিপতি গীতাকে আশ্রয় করিয়া ইহলোকে পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৭৩। ব্রহ্মস্বরূপিণী গীতা, যিনি ইঁহার উচ্চারণ করেন অথবা যিনি ইঁহার সমগ্র জ্ঞানও লাভ করেন—ইহাঁতে গীতার বিশেষত্ব নাই, উভয়ই সমান। [ভক্তিপূর্ব্বক গীতাপাঠ করিলেও শেষে সমগ্র জ্ঞানলাভ হইবে]।

৭৪। যিনি অভিমান ও শ্লাঘাপূর্ব্বক গীতার নিন্দা করেন, তিনি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ঘোর নরক ভোগ করেন।

৭৫। অহঙ্কারপূর্ব্বক যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি গীতার্থের অবমাননা করে, সে কল্পক্ষয় পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে।

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥৭৬॥
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতাযাঃ পুস্তকং য সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনং চ বৃথা ভবেৎ ॥৭৭॥
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥৭৮॥
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যং চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থাং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥৭৯॥
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥৮০॥

সূত উবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্‌গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্ত ফলভাগ্ ভবেৎ ॥৮১॥

৭৬। গীতার অর্থ কথিত হইতেছে দেখিয়া, নিকটে থাকিয়াও যে শ্রবণ না করে, সে অনেকবার শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়।

৭৭। যে গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনয়ন করে, তাহার কিছুই সফল হয় না এবং তাহার গীতাপাঠ বৃথা।

৭৮। যে গীতার অর্থ শ্রবণ না করিয়া, পরমার্থলাভ হইয়াছে এই মনে করিয়া আনন্দলাভ করে,—তাহার প্রমত্তের চেষ্টার ন্যায় ইহলোকে সমস্তই নিষ্ফল।

৭৯। গীতা শ্রবণ করিয়া দানোদ্দেশ্যে সুবর্ণ, ভোজ্য, পট্টবস্ত্র পরমাত্মার প্রীতির জন্য নিবেদন করিবে।

৮০। গীতাপাঠককে বহু দ্রব্য, বস্ত্র ও উপকরণ দ্বারা প্রীতি ও ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। তাহাতে শ্রীভগবান্ হরি সন্তুষ্ট হইবেন।

৮১। সূত বলিলেন—ইহাই কৃষ্ণকথিত পুরাতন গীতামাহাত্ম্য। যিনি গীতাপাঠান্তে ইহা পাঠ করেন, তিনি যথাকথিত ফল ভোগ করেন।

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥৮২॥
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ।৮৩॥
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥৮৪॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তং ॥

ওঁ তৎসৎ

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু ॥

৮২। যে ব্যক্তি গীতা পাঠ করিয়া গীতামাহাত্ম্য পাঠ না করে, তাহার গীতাপাঠের ফল হয় না ; তাহার শ্রমই সার।

৮৩। যিনি মাহাত্ম্য সহিত গীতা পাঠ করেন বা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন—তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন।

৮৪। অর্থসংযুক্ত গীতা শ্রবণান্তে যিনি মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত সুখের আকর বা কারণ পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

পুরারিগিরি সম্ভূতা শ্রীরামার্ণবসঙ্গতা।
অধ্যাত্মরামগঙ্গেয়ং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥৫॥
কৈলাসাগ্রে কদাচিৎ রবিশতবিমলে
মন্দিরে রত্নপীঠে
সংবিষ্টং ধ্যাননিষ্ঠং ত্রিনয়নমভয়ং
সেবিতং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
দেবী বামাঙ্কসংস্থা গিরিবরতনয়া
পার্ব্বতীভক্তিনম্রা
প্রাহেদং দেবমীশং সকলমলহরং
বাক্যমানন্দকন্দম্ ॥৬॥

---

(৩) মনুষ্যলোকে শৌনক বাল্মীকি ভরদ্বাজাদি দ্বারা শ্রোতাসমূহকে পবিত্র করিতেছেন।

প্রসিদ্ধ গঙ্গা, পাপীকেও স্বর্গারোহণে সামর্থ্য দিতেছেন। রামগঙ্গাও পাপীদিগের অন্তঃকরণশুদ্ধিকর জ্ঞান দ্বারা উহাদিগকে মুক্ত করিতেছেন। এই সমস্ত কারণে গঙ্গা অপেক্ষা অধ্যাত্মরামগঙ্গাই শ্রেষ্ঠ।

কৈলাসশিখরে শত সূর্য্য প্রতীকাশ মন্দির। মন্দিরের মধ্যে রত্নজড়িত সিংহাসনে অভয়দাতা ত্রিলোচন ধ্যানমগ্ন। সিদ্ধগণ সেবানিরত। গিরি-রাজকুমারী ভগবতী পার্ব্বতী তাঁহার বামাঙ্কে সমাসীনা। ভগবতী পার্ব্বতী কোন একসময়ে ভক্তিনম্রা হইয়া সর্ব্বানন্দমূলস্বরূপ দেবদেব মহেশ্বরকে সর্ব্ব-পাপনাশকর এই বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

পার্ব্বতী বলিলেন—হে দেব! হে জগন্নিবাস! সমস্ত জগৎ আপনাতেই অবস্থিত। আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। আপনার সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি—আপনিই পরমেশ্বর! আমি উত্তম পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের সনাতন তত্ত্ব (যথার্থস্বরূপ) জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ আপনিও সনাতন পুরুষ ॥ ৭ ॥

যাহা অত্যন্ত গোপনীয়, অন্যের নিকট প্রকাশযোগ্য নহে, তাহাও মহাত্মাগণ ভক্তের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। হে দেব! আমিও আপনার ভক্ত,

পার্ব্বতী :—

নমোনমঃ দেবদেব ! জগন্নিবাস !
পরম ঈশ্বর, দৃষ্টি সর্ব্বত্র সমান।
উত্তম পুরুষ-তত্ত্ব, করহ প্রকাশ
সনাতন ভাব ; প্রভু ! তুমি সনাতন ॥ ৭ ॥
যদিও অত্যন্ত গুহ্য বলিবার নয়
ভক্ত জনে মহাত্মার কি আছে গোপন ?
আমি ভক্তিমতী দেব ! তব রাঙ্গাপায়
বল প্রিয় ! যাহা আমি করিব জ্ঞাপন ॥ ৮ ॥

৫। পুরারিগিরীতি রামার্ণবেতি চ রূপকে। অধ্যাত্মরামগঙ্গেতি অধ্যাত্ম-রামশব্দো অধ্যাত্মরামায়ণপরস্তদেবগঙ্গেতি। অনেন রূপকেণ সর্ব্বমহাপা .কাদীনা-মপি নাশ ইতি সূচিতম্। গঙ্গায়াস্তন্নাশকত্বস্য সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বাৎ ॥

৬। সকল মলহরং-বস্তুবিষয়ত্বাৎ বাক্যস্য সকলমলহরত্বম্ আনন্দকন্দম্— ঈশীশবিশেষণম্। এতস্যৈবানন্দস্যমাত্রামুপজীবন্তি। ইতি শ্রুতেরস্যসর্ব্বানন্দ-মূলত্বেনানন্দকন্দত্বম্।

৭। দেবো দ্যোতনাৎ জগন্নিবসত্যস্মিন্ জগতিনিবসতীতিবা জগন্নিবাসস্তৎ-সম্বুদ্ধিঃ তে তুভ্যং নমঃ অস্তু যতঃ ত্বং সর্ব্বাত্মদৃক্ = সর্ব্বস্বরূপ আত্মা সর্ব্বাত্মা রূপং। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ। তমনিশমাত্মরূপতয়াপশ্যতীতি সর্ব্বাত্ম-দৃক্ অত এব পরমেশ্বরোঽসি। অতঃ পুরুষোত্তমস্য = সর্ব্বেভ্যঃ পুরুষেভ্য উত্তমস্ত তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সনাতনম্ = উপাধিরহিতম্ সোপাধেরূপস্যজ্ঞানোত্তরং নাশান্ন-সনাতনত্বম্ তত্ত্বং পৃচ্ছামি। নত্বসনাতনেন ময়া কথং তদ্বক্তুং শক্যমত আহ ত্বং চ সনাতনোঽপি ত্বমপি স এবাসীতি ত্বদজ্ঞানং ন কিঞ্চিদিতি ভাবঃ ॥

৮। অত্যন্ত গোপ্যম্ ইদং তু তে গুহ্যতমমিতি গীতোক্তেঃ।

অনল্পবাচ্যং—ভক্ত্যাস্তেষুবক্তু মযোগ্যম্ অহো তদপি ভক্তেষু বদন্তি অতো মে গুহ্যং যত্তত্ত্ব নিশ্চয়েন বদ হে দেব যতোঽহং তবভক্তা। নন্বমদ্ভক্তাত্বং কুত আহ যতস্ত্বং মে প্রিয়োসি।

পার্ব্বত্যুবাচ ঃ—

নমোঽস্তুতে দেব! জগন্নিবাস!
সর্ব্বাত্মদৃক্ ত্বং পরমেশ্বরোঽসি।
পৃচ্ছামি তত্ত্বং পুরুষোত্তমস্য
সনাতনং ত্বঞ্চ সনাতনোঽসি ॥৭॥
গোপ্যং যদত্যন্তমনন্যবাচ্যং
বদন্তি ভক্তেষু মহানুভাবাঃ।
তদপ্যহোঽহং তব দেব! ভক্তা
প্রিয়োঽসি মে ত্বং বদ যত্তু পৃষ্টম্ ॥৮॥

আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার উত্তর প্রদান করুন; কারণ আপনি আমার প্রিয় ॥ ৮ ॥

যে জ্ঞানে মন্দবুদ্ধি লোক সংসার পার হইতে পারে, যে জ্ঞানের ফল অপ-রোক্ষানুভূতি, যে জ্ঞান, অনুভক্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত, সেই জ্ঞান আপনি শাস্ত্রোক্ত প্রমাণে এরূপ বিশদ্‌ভাবে নিশ্চিত করিয়া প্রকাশ করুন যেন স্ত্রীলোক হইয়াও আমি তাহা জানিতে পারি ॥ ৯ ॥

জ্ঞান=শ্রবণ ও মনন জনিত পরোক্ষ জ্ঞান। সমস্তই ব্রহ্ম এই জ্ঞানের নাম পরোক্ষজ্ঞান।

বিজ্ঞান=নিদিধ্যাসন বা ধ্যান পরিপাকজ–অপরোক্ষানুভূতি। সবই ব্রহ্ম ইহার অনুভবে আমি ব্রহ্ম অনুভব করা অপরোক্ষ জ্ঞান। বৈরাগ্য বিনা এই জ্ঞান হয় না। ভক্তি বিনা বৈরাগ্যও হয় না। ভক্তির পশ্চাৎ অনুভক্তি-জায়মান যে বৈরাগ্য তদ্‌যুক্ত জ্ঞান।

মিত=পরিমিত=শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ নিশ্চিত।

বিভাস্বং=বিশেষরূপে প্রকাশমান! শ্রবণমাত্র ঝটিতি অর্থ বোধ হয় এইরূপ যুক্তিযুক্ত।

হে কমললোচন! অপর একটি রহস্য আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি

যেই জ্ঞানে জীব সংসার তরিবে,
কিসে সেই জ্ঞান অনুভব হ'বে?
বিষয়-বৈরাগ্য যা লাগি উচিত,
যাহার সাধনে ভক্তি সমুচিত,
সেই জ্ঞান বল এইরূপ ক'রে,
স্ত্রীজাতিও যেন পারি বুঝিবারে ॥ ৯ ॥
পরম রহস্য অন্য সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা
করি আমি, বল দেব! কমল লোচন।
সর্ব্বতত্ত্বসার যেই রাম-ভক্তি কথা,
সংসার-সিন্ধু তরণে প্রসিদ্ধ তরণী ॥ ১০।

৯। জ্ঞানমিতি॥ যেন জ্ঞানেন জনাস্তরন্তি পুনর্জন্মাদি সংসারং ন প্রাপ্নুবন্তি তৎসবিজ্ঞানং জ্ঞানং ব্রূহি। বিজ্ঞানং=নিদিধ্যাসনপরিপাকজম-পরোক্ষজ্ঞানং তৎসহিতং তৎফলকমিতি যাবৎ।

জ্ঞানং=শ্রবণমননজং পরোক্ষং জ্ঞানং ব্রহ্মৈবসর্ব্বম্। ব্রহ্মৈবাহমিতি চ। তরতি শোকমাত্মবিৎ ইতি শ্রুতেঃ। তদ্‌ব্রূহি=তজ্জনকবাক্যং ব্রূহীত্যর্থঃ। তজ্‌-জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং বিনা; বৈরাগ্যং চ ন ভক্তিং বিনেত্যত আহ। অনুভক্তি বৈরাগ্যযুক্তং চেতি ভক্তেঃ পশ্চাদনুভক্তিজায়মানং যদ্বৈরাগ্যং তদ্‌যুক্তম্। তদুপায়বোধকবাক্যযুক্তং চেত্যর্থঃ। তথা চ পাতঞ্জলসূত্রম্। দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। ইতি। অনুশ্রবোবেদস্তদ্বোধিতঃ স্বর্গা-দিরানুশ্রবিকঃ ভক্তিরীশ্বরানুরাগঃ তথামিতং মিতশব্দবৎ। বিভাস্বং=বিশেষেণ ভাস্বং। শ্রুতিমাত্রেণ ঝটিত্যর্থপ্রত্যায়কশব্দবোধজনক বাক্যং যুক্তিযুতং ব্রূহি। যথাযোষিদপ্যহং ত্বদুক্তং জানামি॥

১০। অগ্রে—প্রথমতঃ
দৃঢ়াভক্তিঃ প্রসিদ্ধা নৌর্ভবতি—ভবসাগরতরণায়েতিশেষঃ॥

১১। তদেবাহ ভক্তিরিতি॥

৬ষ্ঠ বর্ষ।]　　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল।　　　[২য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কলিকাতা, ১০ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট্
উৎসব কার্য্যালয় হইতে—শ্রীযুক্ত ননীলাল রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

জ্যৈষ্ঠ।

উৎসব।

—:*:—

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৬ষ্ঠ বর্ষ।] ১৩১৮ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা।

দীনের পূজা।

বাসহীন বনজ প্রসূনে
পূজাসাধ মিটাইতে হায়!—
গেঁথে ছি'নু ক্ষুদ্র মালা গাছি
সমর্পিতে দেবতার পায়।

দেখিলাম মণি-মুকুতায়
কত যত্নে কত আয়োজন,
পত্র-পুষ্প-গন্ধ-অর্ঘ-ভারে
করিয়াছে ভক্তে নিবেদন।

রত্নোজ্জ্বল দিব্য সিংহাসন,—
ভক্তকণ্ঠে গদগদ ভাষা—
অতুলিত চরণে তোমার
আর্ত্তকণ্ঠে জানায় পিপাসা।

ধূপ ধূনা অগুরু চন্দনে
সুবাসিত মন্দিরে তোমার,—
আনে দেব-প্রীতি-কামনায়
কত জনে কত উপহার।

সেথা দিতে ক্ষুদ্র মালাগাছি
দীনের এ' ক্ষীণ আয়োজন;
কণ্ঠে মোর রুদ্ধ হ'ল ভাষা,—
অশ্রু এ'ল ভ'রে দু'নয়ন।

যাই যাই পারি না যাইতে
ফুলমালা লুকানু আঁচলে,
কে আছে কে আশ্বাসে আমারে
ফিরে আসি কাঁদিনু বিরলে।

সঙ্গোপনে লুটিনু চরণে
অবরুদ্ধ হৃদয়ের ভার,—
অন্তর্যামী জান ত' সকলি,—
সমর্পিনু চরণে তোমার॥

শ্রীমতী মৃঃ.....

প্রভাতে হিত-চিন্তা।

সীমাশূন্য তুমি! শুনি তোমার এক অতি ক্ষুদ্র দেশে এই সৃষ্টিতরঙ্গ ভাঙ্গিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, তীরে আছাড় খাইতেছে, আবার তোমাতে বিলীন হইতেছে।

এই অতি ক্ষুদ্র স্থানের জগৎ তরঙ্গ, জগতের ভাঙ্গা গড়া ব্যাপার কি এক অজ্ঞান বশে আমার কাছে—যেন নিতান্ত দুষ্পার হইয়া উঠিয়াছে। আমি এই স্থানটুকু পার হইতে পারিতেছি না। তুমি কৃপা কর—আমাকে শক্তি দাও। আমি পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ নহি। পরিশ্রম করিতেছি—তুমি সহায় হও।

অনন্ত চিন্মণি তুমি! নিরন্তর তোমা হইতে ঝলক উঠিতেছে। ঝলক কতক দূর উঠিয়া দুই প্রবাহে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। এক প্রবাহ তোমা হইতে দূরে ছুটিয়া আসিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। আর এক প্রবাহ তোমা হইতে উঠিয়াই আবার তোমার সঙ্গে মিশিতেই ছুটিতেছে।

অজ্ঞানেই এই উক্তি। এ'টি মাত্র কথার কথা। একটা বলিতে হয় বলিয়া বলা হইল। কারণ তুমি যখন পরিপূর্ণ তবে আর খালি স্থান কোথায়? আকাশই যদি সর্ব্বত্র পূর্ণ থাকিল তবে এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি বস্তু হইতে এবং সকলের সমষ্টি হইতে যে বরণীয় ভর্গ, যে ঊর্দ্ধ প্রবাহিত তেজোরাশি তোমার দিকে যাইতেছে, আমার বুদ্ধিকে তুমি বরণীয় ভর্গ দেখাইয়া দাও। বুদ্ধিও তেজঃ পদার্থ—বুদ্ধি সেই ভর্গের সঙ্গে একত্র হউক, হইয়া তোমার ক্ষুদ্র দেশের জগৎতরঙ্গ অতিক্রম করুক।

এই ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র জগদাড়ম্বরের পরেই তোমার পরম পদ। ইহাতে স্থিতিই স্থিতি। তদ্ভিন্ন নিরন্তর গমনশীল জগতে স্থিতির স্থান কোথাও নাই।

সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশস্বরূপ তত্ত্বই তোমার পরম পদ। যাহা পরম পদ—তাহাই আপনার অতি ক্ষুদ্র দেশে জগৎতরঙ্গ তুলিয়া ভ্রান্তবুদ্ধির কাছে বিরাট জগদ্রূপে—বিশ্বরূপে দাঁড়াইয়া আছেন। পরম পদটি তত্ত্ব। জগৎ উঠান কল্পনায় হইতেছে। কল্পনার জগৎ স্থূল হইয়া বিশ্বরূপ। আবার এই বিরাট বিশ্বরূপ—অতি ক্ষুদ্র মায়া মানুষরূপে ও ভক্তকে সংসার পার করিয়া দিতে আসিতেছেন; নিয়তই আসিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ জগৎ, ঈশ্বর, জীব, ইহারা মায়ার। যিনি আছেন তিনিই পরিপূর্ণ ভাবেই আছেন। সর্ব্বসঙ্কল্প বর্জ্জিত, সর্ব্বচলন রহিত পরম শান্ত পরম পদই চাই।

আমার গন্তব্য স্থান বুঝিলাম। তাহার জন্য তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা-রূপ প্রথম কার্য্যও বুঝিলাম। তুমি কৃপা করিয়া অন্য কর্ম্মগুলিও দেখাইয়া দিলে। লোকসঙ্গের কার্য্যও বলিতেছ, একান্তের কার্য্যও বলিতেছ। লোক-সঙ্গের কার্য্যগুলি ব্যাবহারিক জগতে করিতে হইবে আবার একান্তের কার্য্যগুলিও সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রকৃত আমিতে স্থিতিলাভ করিতে হইলে মনরূপ ভুল আমিকেই প্রথমে জাগাইতে হইবে। রাজা মানুষের দীনহীন ভান করার মত, মন আপনাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ভান করিয়াছে—অথবা তাহারও অবসর ইহার নাই, যাহা পায় তাহাতেই মগ্ন রহিয়াছে। পূর্ব্বাভ্যাসবশে ভুল আমি নানা প্রকার অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে। প্রথমেই বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা ইহাকে সৎকর্ম্মে জাগ্রত করা চাই। তার পরেই জোর করিয়া নাম জপ দ্বারা ইহার অসম্বন্ধ চিন্তা ক্ষণকালের জন্যও নিবারণ করা চাই। তার পরে নিত্যক্রিয়া দ্বারা ইহাকে আরও জাগ্রত করা চাই। পরে স্বাধ্যায় দ্বারা ইহাকে ইহার গন্তব্য স্থান দেখাইয়া ইহার সমস্ত শক্তিগুলি নাড়া চাড়া করা চাই। স্বাধ্যায় পরে যোগ অভ্যাস চাই। যোগের এক কর্ম্ম অজপা মন্ত্র দ্বারা অভ্যাস। ইহাতে পরম পদের সহিত নিজের অভেদ স্থাপন অভ্যাস হইবে। যোগের দ্বিতীয় ক্রিয়া দ্বারা বিশ্ব-রূপের সহিত তেজের ঊর্দ্ধপ্রবাহকে মিলাইতে হইবে। ঊর্দ্ধপ্রবাহের নামই প্রণব। প্রণব উচ্চারণে যে ঊর্দ্ধপ্রবাহ উঠে, তাহা ধরিয়া কার্য্য করা চাই। তবেই মন শান্ত হইয়া আসিবে।

যোগের পরে আবার স্বাধ্যায়। এই স্বাধ্যায় দ্বারা বিচার অভ্যাস। স্বপ্নে স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু যেমন সত্য বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ অবিদ্যাদীর্ঘ স্বপ্নে এই দৃশ্য-প্রপঞ্চ সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু যাঁহাদের এই অবিদ্যা দীর্ঘ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে তাঁহারা বলিয়াছেন, যাহা দেখিতেছ তাহা স্বপ্নে। স্বপ্নে দেখিতেছি স্বপ্নে দেখিতেছি, পুনঃ পুনঃ বিচার কর, জগৎ দর্শন মুছিয়া যাইবে; তখন তুমি কখন যে পরম পদে স্থিতি লাভ করিবে তাহা জানিবেও না। ইহা আয়ত্ত কর সুখ হইবে।

কিসের জন্য উদ্যম।

কি চাও ?

চাই তোমার পরম শান্ত, পরম রমণীয়, পরমানন্দ, পরমপদে স্থিতি। তোমার পরমপদ চাই—যে পদে জগৎ তরঙ্গ উঠে না ; যে পদে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ নাই ; যে পদ মহাপ্রলয়েও ব্যথিত হয় না ; যে পদ শুধু জ্ঞানময়, শুধু আনন্দময়।

ইহাতেই হইবে ?

পরম পদে বিশ্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও যখন তুমি আপনার বিন্দুমাত্র স্থানে নিতান্ত ক্ষুদ্র একদেশে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড উঠাও, যখন স্থির সমুদ্রের একবিন্দু মাত্র স্থানে বহু অস্থির তরঙ্গ উঠাও—আবার অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র তুমিই মায়া সাহায্যে বিশ্বরূপ সাজিয়া দাঁড়াও, আবার এই মায়াতরঙ্গে মুহ্যমান জীবচয়কে মায়ার তরঙ্গটুকু পার করিয়া দিবার জন্য তুমি আপনি অবতার সাজিয়া তোমার ভক্তকে কোলে করিয়া পরপারে লইয়া যাও—পরমপদ, বিশ্বরূপ এবং রমণীয় দর্শনরূপে তোমার যে কার্য্য তাহাই দেখিতে চাই আর অনুভব করিতে চাই। কখন পরম পদে থাকিতে চাই আবার নিত্য পরম পদে থাকিয়া চিত্ত-স্পন্দন কল্পনায় বিশ্বরূপে ও ভক্তচিন্তানুসারে আত্মমায়ায় জন্মলাভ—ইহাই চাই। পূর্ণ তুমি, তোমাকে পূর্ণ ভাবেই চাই।

চাওয়াটা কতক্ষণের জন্য ? আর কিছু পাইলে এই ইচ্ছা প্রবল থাকে কি ?

না—উহাই চাই। অন্য ইচ্ছা রাখিতে চাই না। ঐ দৃঢ় সঙ্কল্পই চাই। অন্য সমস্ত অভিলাষ তুচ্ছ বলিয়া একবারে ত্যাগ করিয়া উহাই চাই।

শুধু চাওয়ার বিষয়টা জানিলে—আরও চাওয়ার জন্য দৃঢ় ইচ্ছা করিলে তাহাতেই কি পাইবে ?

না ! তাহার জন্য—ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেই চাই।

যে উপায়ে পাওয়া যাইবে সেই উপায় জানিয়া সেই মত কার্য্য করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে চাই। উপায় গুরু বলিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ যাহা চাই তাহার আলোচনা ; লাভ জন্য প্রবল ইচ্ছা করা ; ইচ্ছা পূর্ণ জন্য কর্ম্ম করা—ইহাই প্রতিদিনের অনুষ্ঠান। তুমি প্রসন্ন হও—হইয়া আমায় করাও।

আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্ম।

উপস্থিত সময়ে সভ্য জগৎ নিশ্চয় করিয়াছেন যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই আর্য্যবংশধর।

এই আর্য্যজাতির ধর্ম্মকেই আর্য্যধর্ম্ম বলা হইতেছে।

উপস্থিত কালে প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহের মূলে যে আর্য্যধর্ম্ম আছে তাহাই এখানে আলোচিত হইবে।

মন দ্বারা জগতের উপকার।—যখন একান্তে থাক তখন মনকে জগতের সমস্ত প্রাণীর জন্য মঙ্গল কামনা করিতে বল। বল, জগতের মঙ্গল হউক, ভাই ভাই বিরোধ দূর হউক; জীবহিংসা দূর হউক। জীবহিংসাজনিত রক্তস্রোত জগতকে যেন আর কলঙ্কিত না করে; স্বজাতীর রক্তস্রোতে জগৎ যেন আর দুর্গন্ধময় না হয়। এক বৃক্ষের পুষ্প রাশির মত জগতের সকলেই আপন আপন সৌগন্ধ বিস্তার করিয়া ভুবনত্রয় রূপ স্বদেশকে আমোদিত করুক। সকলেই সুখী হউক—কেহই যেন দুঃখী না থাকে। পরস্পর পরস্পরকে সেবা করাই যে প্রকৃত সুখ, জগৎ তাহা বুঝুক। শত্রুতা করায় সুখ নাই, দুষ্টতা করায় সুখ নাই, হিংসা করায় সুখ নাই, জগৎ ইহা বুঝুক। শত্রুকে উপেক্ষা না করিয়া জগৎ শত্রুকেও ভালবাসিতে শিক্ষা করুক—তজ্জন্য নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিখুক। ইহাই বিশ্বপ্রেমের মূল ভিত্তি।

বাক্য দ্বারা জগতের উপকার,—আবার বাহিরের লোকব্যবহারে যখন মানুষ নিযুক্ত হইবে তখন বাক্য দ্বারা অন্যকে সুখী করুক; ক্রোধী ব্যক্তিকেও সুশীতল মধুর বাক্যে সুখ দিতে চেষ্টা করুক; যদি আত্মসংযমী না হইলে শীতল বুলী বলা অভ্যাস না হয় তবে মানুষ আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া শীতল বাক্য বলিতে শিক্ষা করুক; হাস্যমুখে মধুর বাক্যে উপদেশ দিয়া বা কথা কহিয়া মানুষ অন্যকে সুখী করুক—দুর্ব্বাক্য বলিয়া গালিগালাজ দিয়া মানুষকে ভাল করা যায়—এই অজ্ঞান একবারে ত্যাগ করুক। মানুষকে ঘৃণা না করিয়া মানুষের অজ্ঞানকে ঘৃণা করুক, পাপীকে অবজ্ঞা না করিয়া পাপকে অবজ্ঞা করুক।

হস্ত পদ দ্বারা জগতের উপকার—হস্ত পদ দ্বারা মানুষ মানুষকে সুখী করুক। কাহাকেও প্রহার করিয়া সুখ দেওয়া যায় না; কাহারও হিংসা করিয়া তাহাকে

সুখী করা যায় না—মানুষ ইহা বুঝুক। হস্ত দ্বারা জীবের উপরে দয়া বিতরিত হউক—পদ দ্বারা জীব সেবা প্রাপ্ত হউক।

নির্জ্জনে একান্তে মন শুভ চিন্তা করুক এবং লোকসঙ্গে বাক্য, হস্ত, পদ—জীবের সন্তোষে, জীবের সেবায় নিযুক্ত হউক। যে ধর্ম্ম এই শিক্ষা দিতেছেন তাহাই আর্য্য ধর্ম্ম। আর্য্য ধর্ম্মের এই আর্য্য শিক্ষা যিনি প্রতিপালন করিতে পারিতেছেন তিনি প্রকৃত আর্য্যবংশধর আছেন। ইহার বিপরীত যেখানে সেখানে আর্য্যবংশধরেরও বিপরীত ভাব আসিয়াছে। প্রকৃত আর্য্যবংশধর দেবতা, ভ্রষ্ট আর্য্যবংশধর অসুর। দেবতার অহিংসাই ধর্ম্ম, অসুরের ধর্ম্ম হিংসা।

দেবতাগণকেও সময়ে সময়ে অসুরকে শাসন করিয়া তাহার দেবভাব আনাইতে হয়।

হয় সত্য। প্রথমেই দেব ভাবে বশ করিতে চেষ্টা করা উচিত। তাহাতে না হয় অসুর ভাব অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু শাসনে আনিয়াই অসুর ভাব ত্যাগ করিয়া দেবভাব দ্বারা শাসিতকে সুখী করিতে চেষ্টা করা উচিত। এই জন্য রাজনীতি সাম দাম ভেদ ও দণ্ড ব্যবস্থা করেন।

সাম ও দাম দ্বারা শাসনে আনা দেবভাবে বশীভূত করার কথা; ভেদ ও দণ্ড দ্বারা বশীভূত করা অসুর ভাবে বশ করা। ভেদ দণ্ড দ্বারা বশীভূত করিয়াও সাম দাম দ্বারা বশীভূত না করা পর্য্যন্ত ঠিক একবারে কাহাকেও বশ করা যায় না।

আর্য্যজাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রেম দ্বারা জীবকে বশীভূত রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন।

আর কবে দেখা দিবি মা হরমনোরমা।

দেখা দাও! কত দিন গেল! কত দিন ধরিয়া ডাকিতেছি! আর কবে দিবি মা!

অন্ধকার আসিতেছে। এ অন্ধকারে ত চক্ষে দেখিতে পাইব না, কাণে শুনিব না, জিহ্বায় বলিতে পাইব না। তবে তখন আর দেখা দিয়া কি হইবে তাই বল্!

দেখা দাও! শুনি, ডাকিলে দেখা পাওয়া যায়, তাই ডাকি। কাতর হইয়াই ডাকি।

প্রিয়জনের মৃত্যুর দৃশ্য চক্ষের উপর রাখিয়াই ডাকি। সে সময়ে সে যেমন অসহায় হইয়াছিল, যেমন নিরাশ্রয় হইয়াছিল, যেমন কাতর চক্ষে চাহিয়া কত কি বলিয়াছিল; যে দৃষ্টির অর্থ বুঝি নাই; যে নিঃশব্দে রোদনের ভাব বুঝি নাই, শুধুই কাতর দৃষ্টি, শুধুই নিঃশব্দে রোদনে যেন কি বলিয়া গেল, অনুমান করি মাত্র; সেইরূপ অবস্থা স্মরণ করিয়া, মনে মনে সেদিন আমার আসিলে কি করিব ভাবিয়া—কাতর হই—হইয়া ডাকি, তবু ত দেখা পাই না।

বুঝি সর্ব্বদা সে কাতরতা থাকে না, তাই পাই না! বুঝি লোকসঙ্গে সে কাতরতা ভুল হইয়া যায়! বুঝি আহার কালে মনে থাকে না—নিজে ত কাল-সর্প-ধৃত ভেকের মত মৃত্যুমুখে চলিয়াছি, তথাপি কালসর্প-কবলিত ভেকের মুখে পতঙ্গ পড়িলে, সে যেমন নিজের অবস্থা ভুলিয়া ভোগ করে, বুঝি আমারও সেইরূপ হইয়া যায়, বুঝি ভোগে রুচি লাগিয়া যায়।

হায়! তখন যেন ক্ষণতরেও কাতরতা ভুল হইয়া যায়—হায়! মায়া! ব্যথিতের উপরেও তোমার এ অস্ত্রাঘাত কেন? কেন আর আমাকে ভুলাইয়া দাও! হে মায়াধীশ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম—আমায় অনুগ্রহ কর, আমায় দেখা দাও। অনুগ্রহ কর! তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন তোমায় দেখা যাইবে না।

আর্ত্তভক্তের দর্শনপিপাসার কথা বলা হইল।

২

দেখা দাও!

শাস্ত্রমত দেখিবার জন্য যত্ন কর!

কি?

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

আত্মদর্শন কিরূপে হইবে?

তজ্জন্য প্রথমে শ্রবণ কর।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ।

শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণকে শ্রবণ বলে। মাণ্ডুক্যশ্রুতির অর্থ অবধারণ কর—পুনঃ পুনঃ কর; গুরুমুখে অর্থ শ্রবণ কর। একখানি শ্রুতিতে না হয়, ১০খানি উপনিষদের অর্থ অবধারণ কর; তাহাতেও না হয়, ৩২ খানি; তাহাতেও না হয়, ১০৮ খানি। হইবেই।

অথবা গীতার অর্থ অবধারণ কর হইবে। অথবা যোগবাশিষ্ঠের অর্থ অবধারণ কর—শ্রবণ হইবে। অথবা অধ্যাত্মরামায়ণের অর্থ অবধারণ কর—শ্রবণ হইবে। অথবা চণ্ডী বা ভাগবতের অর্থ অবধারণ কর—শ্রবণ হইবে।

শ্রবণের পরে?

শ্রবণের পরে মনন।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।

যুক্তির দ্বারা উপপত্তির নাম মনন। শ্রবণের পরে যুক্তি দ্বারা নিশ্চয় কর। শ্রুতিবাক্যে শুনিলে আত্মা জন্মান না, মরেন না। যুক্তি খোঁজ। নিজের মধ্যে আত্মা কোন্ বস্তুটি। মৃত্যুটিই বা কোন্ বস্তু। আত্মা ও মৃত্যু মিলিত হয় না কিরূপে? এইরূপ সমস্ত শ্রুত বিষয়ের অর্থ অবধারণা যাহা করিলে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যুক্তি খোঁজ। যুক্তি দ্বারা বেদবাক্য যে সত্য তাহা ধারণা কর।

গীতার অর্থ অবধারণ কর। পরে যুক্তি দ্বারা তাহা মনে মনে নিশ্চয় কর। তাহা হইলে ঐ চিন্তাপ্রবাহ সর্ব্বদাই মনে অবস্থান করিবে। ইহাই মনন।

মননের পরে?

নিদিধ্যাসন।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো

মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।

মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ।

মনন করিবার পর সর্ব্বদা মননের বিষয়টিকে চিন্তা কর—ইহাই ধ্যান। ইহাই নিদিধ্যাসন।

মনন দ্বারা যে চিন্তাপ্রবাহ উঠিল তাহা সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক রাখ, তবেই ধ্যান বা নিদিধ্যাসন হইবে।

এই তিনটি কর, আত্মদর্শন মিলিবে। জ্ঞানী ভক্তের দর্শন ইহা।

পাথেয় সংগ্রহ।

১। বেলা নাই। এখন পসার তুলিতে হইবে, তুলিয়া যাইতে হইবে।

২। আলো থাকিতে থাকিতে না গেলে পরপারে যাওয়া হইবে না। এ পারের আলো ক্ষীণ হইয়া নদীতীরস্থ গভীর কাননের অন্ধকারে মিশিয়াছে। অন্ধকার মধ্যেই নদী। নদী পার হইলেই আবার আলো। নদীর পরপারে যাইতে হইবে।

৩। দুই দিবাভাগের মধ্যে যেমন রাত্রি, সেইরূপ দুই পারের আলোর মধ্যে ঘন অন্ধকার। নদী তীরের গভীর কাননে বহু ভীষণ বন্য জন্তু। ইহারা অসাবধান পথিককে পাইলেই বহু ক্লেশ দিয়া সংহার করে।

৪। নদীর এপারে হাট। হাটে পসার পাতিয়া বসা হইয়াছিল। বেলা নাই, এখন যাইতে হইবে।

৫। কাহার কখন বেলা ফুরায়, জানা নাই। কাহার কখন সময় হয়, কেহ জানে না। হঠাৎ বাজারে লোক আসিয়া বলিবে 'নিকলো"। যাইতে হইবে মনে রাখিয়া বাজারে পসার মিলিবে। যেন এক দণ্ডে পসার তুলিয়া যাইতে পার। আর যে পারে সে "নিকলো" বলিবার পূর্ব্বেই বাহির হউক।

৬। বাজারের কেনা বেচায় মূল ধন হারাইয়াছ বলিয়া কাঁদিয়া আর কি করিবে? যাইতেই হইবে। এখন চল্‌তি মুখে "পার কর" পার কর" বলিয়া রওয়ানা হও।

৭। বালক অবস্থায় আর করিব না বলিয়া অনেকবার ক্ষমা পাইয়াছ। এখন একবার বল আর করিব না। বলিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়। ঘোটক যেমন পৃষ্ঠের গুরুভার ফেলিয়া দিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হয় তেমনি করিয়া ব্যাকুল হও। এখনও উপায় আছে।

৮। সব হারাইয়াছ তবুও আর করিব না বলিয়া কৃপা চাও। সে যে পারের কর্ত্তা আছে বার্ত্তা তাই ডাক তাহারে। তার নামই তোমার পাথেয়। পাথেয় সংগ্রহ করিয়া চল। আর করিও না। চল। চলিতে চলিতে কাতর হইয়া নাম কর। বনের পশু আর অত্যাচার করিতে পারিবে না। নদীর হিংস্র জলচর ধরিবে না। ঝড়েও ভয় নাই। নৌকাও ডুবিবে না। কাণ্ডারি বড় হুসিয়ার। ভয় করিও না। বিশ্বাসে নাম কর। সর্ব্বদা কর। এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিও না। এখনও চেষ্টা কর। ভয় নাই।

আর করিব না।

১। নাম কর আর সর্ব্বদা নজর রাখ নামের বিঘ্ন কিসে হয়। শ্বাসটি মূল ধন। শ্বাস খরচে নাম হয় না। শ্বাসে শ্বাসে নাম কর।

২। অনেক আহার করিয়াছ। অধিক আহারে নামের বিঘ্ন হয়। আহার সংযম কর। গ্রাস গুনিয়া আহার কর। পূর্ব্ব অভ্যাসে আহারকালে লালসায় আহার বাড়িয়া যায়। লোভ আর করিও না। অনেক খাইয়াছ। খাওয়ার রস আর কি ভোগ করিবে?

৩। আহার সংযম করিয়া নাম কর। শ্বাসে শ্বাসে নাম কর। কুম্ভকে নাম কর। বহুক্ষণ ধরিয়া নাম কর। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, নিয়ম করিয়া নাম কর। রাত্রির অন্ধকারস্বরূপ ভীষণ স্বপ্নসঙ্কুল নিদ্রানদী নিতান্ত জড়তাময় তমঃনদী পার হইবার আর ভয় থাকিবে না। লয়, বিক্ষেপ বা তম ও রজ পার হইতে পারিবে, যদি বহুক্ষণ ধরিয়া তিন বেলায় নাম কর।

৪। হাল ছাড়িয়া দিও না। নামের হাল ধরিয়া থাক। যত তুফান উঠে উঠুক। ভয় নাই।

৫। যদি কখন নিয়ম ভঙ্গ হয়, আর করিব না বলিয়া পরক্ষণেই নিয়ম ভঙ্গকারীকে দণ্ড দাও। অধিক করিয়া নাম কর। ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। দণ্ড ভোগ আর নিয়ম ভাঙ্গিতে পারিবে না।

৬। অভ্যাস কর আর বৈরাগ্য আশ্রয় কর। অভ্যাস ও বৈরাগ্য সমকালে অবলম্বন কর। অভ্যাস আলোচনা কর, বৈরাগ্য আলোচনা কর। আগে অভ্যাস পরে বৈরাগ্য—ভাবনা করিয়া সর্ব্বদা নাম লইয়া থাক।

বৃষকেতু।

[বৃষকেতু কুরুক্ষেত্র সমরের প্রসিদ্ধ মহাবীর কর্ণের একমাত্র পুত্র। শিশু পরম বৈষ্ণব। কর্ণ—কুন্তীর পুত্র। জন্ম সময়ে পরিত্যক্ত এই কুন্তীপুত্র মহাভারতে সূতপুত্র নামে পরিচিত। মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে পাণ্ডবদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী করিবার জন্য ইঁহাকে অঙ্গ রাজ্যের রাজা করেন। অঙ্গ রাজ্যের রাজপাট মহাত্মা কালী সিংহের মতে আধুনিক মুঙ্গের, মুঙ্গেরে এখনও কর্ণের নির্ম্মিত প্রস্তরময় দুর্গ এবং কারানিবাসের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এবং তাহা অদ্যাপি "কর্ণচৌড়া" বলিয়া প্রসিদ্ধ। আধুনিক ভাগলপুরেও কর্ণগড় বলিয়া একটী স্থান আছে। এই কর্ণগড়ের উপরে কিছু দিন পূর্ব্বে পুলিস শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত ছিল। কর্ণের মত প্রতাপশালী রাজার বহুস্থানে দুর্গ থাকা অসম্ভব নয়। ধর্ম্ম যে জীবনের ভিত্তি সেখানে অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না। তখনকার রাজা, মহারাজা, ধর্ম্মের জন্য কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতেন— আজ এই ধর্ম্মহীন সময়ে সেই পুরাতন কথা আলোচনা করিলে কি কোন উপকারের সম্ভাবনা? বৃষকেতুর এই জীবন, দাতা কর্ণ মধ্যে নিহিত। প্রবন্ধ দাতাকর্ণ অবলম্বনে রচিত।]

অঙ্গ দেশাধিপতি কুন্তীপুত্র মহারাজ কর্ণের দানশীলতা অনন্য সাধারণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণের দানশীলতা পরীক্ষা করিবার জন্য একদা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার নিকট গিয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েন। মহারাজ কর্ণ পাত্র মিত্র সহ সভাগৃহে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে ভিক্ষার্থী রাজ সভায় প্রবেশ করিলেন।

হিন্দু রাজাদিগের নিকট ব্রাহ্মণের পথ অবারিত। কর্ণ ব্রাহ্মণ দেখিয়া যথাযোগ্য শিষ্টাচার ও বন্দনাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন— মহারাজ! আমি ভিক্ষার্থী; কিন্তু আমার ভিক্ষার বস্তুটি কিছু বিভিন্ন। আপনি অঙ্গীকারবদ্ধ হইলে চাহিতে পারি।

মহারাজ কর্ণ বলিলেন আমার আপনাকে কিছুই অদেয় নাই। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি কল্য হইতে উপবাসী। তুমি আমাকে পারণ করাও। মাংস ভিন্ন আমার ব্রতের পারণা হইবে না। কিন্তু মহারাজ! পক্ষী, ছাগ বা মৃগ মাংসে আমার তৃপ্তি হইবে না; আমি নরমাংস চাই, তোমার পুত্র

বৃষকেতুর মাংস আমাকে ভোজন করাও। তোমরা পতি পত্নীতে অকাতরে বৃষকেতুর শিরচ্ছেদ কর; করিয়া সেই মাংস রন্ধন কর। সেই মাংস দ্বারা আমাকে তৃপ্ত কর।

মহারাজ ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় চিন্তাকুল হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, প্রতি মহাব্রত নিজ বক্ষের উষ্ণ শোণিত দিয়া উদ্‌যাপন করিতে হয়। নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া পূজা না দিলে অভীষ্টদেব প্রসন্ন হন না।

রাজা জ্ঞানী, রাজা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; নিজের কর্ত্তব্য অল্প সময়ে স্থির করিলেন। কিন্তু রাণীকে জানাইবেন কিরূপে? রাণীকে না জানাইলেও কার্য্যোদ্ধার হয় না। রাজা নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে মহারাণী পদ্মাবতী পূজা আহ্নিক ও গৃহদেবতার সেবা শেষ করিয়া—স্বামী, পুত্র, পৌরবর্গ ও অতিথি সকলের সেবার জন্য আয়োজন করিতেছেন—এমন সময়ে রাজা বিষণ্ণমুখে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাণী দূর হইতে রাজাকে দেখিয়া প্রফুল্ল মুখে নিকটে আসিলেন কিন্তু রাজার মুখ দেখিয়া একক্ষণেই হর্ষবিষাদে পরিণত হইল। রাণী ম্লান মুখে জিজ্ঞাসিলেন মহারাজ! তোমার কি হইয়াছে? তুমি এত বিষণ্ণ কেন? রাজা চঞ্চল হইয়াছেন—রাজা অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পরে বলিলেন রাণি! আজ আমি এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে তুমি ও আমি দুজনে অম্লানবদনে কুমার বৃষকেতুর মস্তক করপত্রে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই মাংস রন্ধন করিয়া এক বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভোজন করাইব।

রাণী রাজাকে চিনিতেন। প্রতিজ্ঞা শুনিয়া নিতান্ত অস্থির হইলেন। তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, শ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। কতক্ষণ কিছুই বলিতে পারিলেন না। যখন কথা কহিবার ক্ষমতা আসিল তখন বলিতে লাগিলেন—মহারাজ! আপনার ধর্ম্ম আছে, প্রজাপালন আছে, অন্য রাজকার্য্য আছে আমার আর কিছুই নাই। আপনার সেবাই আমার পরম ধর্ম্ম। আর আপনার প্রতিকৃতি এই সন্তান—ইহাই আমার একমাত্র অবলম্বন—আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। আমার এমন কি অপরাধ হইল—যাহাতে আমার স্নেহের পুতুলি, জীবনের সর্ব্বস্ব, ভগবান কাড়িয়া লইতেছেন। আমার বৃষকেতুর এখনও পঞ্চমবর্ষ পূর্ণ হয় নাই।

রাজা—রাণি! তুমি যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছ—আমার হৃদয় তদপেক্ষা অস্থির হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যজীবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনিবার পর হইতেই বিচার করিতেছি। আমার নিশ্চয় হইয়াছে এই অসার-জীবনে ধর্ম্মরক্ষা করাই এক মাত্র সারকর্ম্ম। আমি জীবনের মমতায় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিব না। রাণি! নিতান্ত নৃশংস হইলে তুমি এই কর্ম্মে আমার সহায় হও। তুমি সহধর্ম্মিণী—তুমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর।

মহারাণী ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া। অধোমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বৃষকেতুর মুখ মনে পড়িল। চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারা বহিল। পদ্মা বলিলেন,—মহারাজ! এই অত্যন্ত নিষ্ঠুর আজ্ঞা আমায় করিবেন না।

রাজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—পদ্মা! এই হৃদয়বিদারক কার্য্য অপেক্ষা নিষ্ঠুর কার্য্য আর হইতে পারে না। তথাপি ইহা করিতে হইবে। তুমি আমার হৃদয় দেখিয়াছ—তথাপি এস—আমরা ধর্ম্মের জন্য, প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য আত্মবলিদান করি। রাণি! প্রতিজ্ঞার নিকট জীবন তুচ্ছ। বিশেষ তুমি, আমি, পিতা, পুত্র—এ সমস্ত সম্বন্ধ, মায়ার বিকার মাত্র। ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। ঈশ্বরতৃপ্তির জন্য এই মায়িক বিকার তুচ্ছ করিতে না পারিবে কেন? রাজা যতদূর পারেন দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন। রাণী অধোমুখে। রাজা রাণীর মুখ দেখিয়া অতি কষ্টে দৃঢ়তা রক্ষা করিতেছেন। রাজা আবার বলিলেন—রাণি! তুমি সতী! স্বামীর আজ্ঞাই সতীর জীবন। তুমি এই কার্য্যে আমার সহায় হও। প্রফুল্ল হইয়া স্বপ্নে এই কার্য্য করিতেছ ভাবিয়া—আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। পদ্মা! ধর্ম্ম আছেন।

রাণী স্বীকার করিলেন। কুমারকে আনিতে লোক প্রেরিত হইল। কুমার আসিল। কুমার আসিয়াই মাতার গলা জড়াইয়া ধরিল। মাতার ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিল। পদ্মাবতী বৃষকেতুকে বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ কর্ণের চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। রাজা প্রবল উত্তেজনায় চক্ষের জল চক্ষেই শুষ্ক করিলেন।

বৃষকেতু সমস্তই শ্রবণ করিল। হরিভক্ত বালক ভীত হইল না। কোথা হইতে তাহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্বভাব উদয় হইল। বৃষকেতু বলিতে লাগিল :—

মা! এইজন্য তুমি কাঁদিতেছ। পিতঃ! আপনি আমায় দিয়া ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করুন। ব্রাহ্মণে আমার মাংস ভোজন করিবে, ইহা অপেক্ষা এই জীবনের

আর কোন্ শ্রেষ্ঠব্যবহার হইতে পারে? কত বালকের দেহ ত কৃমি কীটে আহার করে। কত লোক ত ব্যাধিতে মরে।

মা! পিতঃ! আমার ভাগ্যের কি সীমা আছে? ব্রাহ্মণে আমার মাংস ভক্ষণ করিবেন। মা! ব্রাহ্মণ যে নারায়ণ! পতিপুত্র ত চিরদিন থাকিবে না—নারায়ণ যে সর্ব্বকালের সহায়। তুমি ভগবান্ হইতে আমাকে পাইয়াছ। আবার আমাকে তাঁহাতে সমর্পণ করিতেছ। তাঁহার বস্তু তাঁহাকে দিতে কষ্ট কেন হইবে? মা! তুমি ভগবানে আত্মসমর্পণ কর। আমার জীবন সার্থক হউক। তোমাদেরও ধর্ম্মরক্ষা হউক। আর এক কথা স্মরণ কর—যদি ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যান, তবে কি আমি বাঁচিব? তোমাদেরও ধর্ম্মনষ্ট হইল, আমারও প্রাণরক্ষা হইল না।

হরিভক্ত পুত্রের বাক্যে পিতামাতার বল আসিল। মাতা ভগবানে চিত্তসমর্পণ করিয়াছেন। মাতার ক্রোড়দেশে পুত্র। প্রাণে উৎসাহ আসিয়াছে। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে দরবিগলিত ধারা বহিতেছে। মাতা মনে মনে যুক্তকরে, শ্রীহরির নিকটে পুত্রের জীবনভিক্ষা করিতেছেন। আর পুত্র, পিতার সত্যরক্ষার জন্য শ্রীহরির চরণ আশ্রয় করিতেছেন।

কর্ণের বিলম্ব দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ডাক দিয়া বলিতেছেন। শুন—মহারাজ! তুমি দাতা। তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ। যদি অঙ্গীকার রক্ষা করিতে না পার—বল, আমি অন্যত্র যাই।

পুত্র মাতার ক্রোড় ছাড়িল, ছাড়িয়া বলিল—আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? বিলম্ব হইলে ব্রাহ্মণ রুষ্ট হইবেন। মাতা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকটে আগমন করিলেন। বৃষকেতু তখন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। সর্ব্বাঙ্গে ব্রাহ্মণের পদধূলি মাখিল। তখন তিনজনে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

শিশুর সর্ব্বশরীর তখন পুলকে কণ্টকিত হইল। শিশু স্থির হইয়া পূর্ব্ব মুখে বসিল। বসিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিল। আর পিতামাতা করপত্র লইয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রাহ্মণও যেন এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন কেহই কাতর হইতে পারিবে না। হাসিয়া পুত্রকে কাটিতে হইবে। বিপ্র ধন্য ধন্য করিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। শিশু আনন্দে কৃষ্ণগুণ গাহিল।

আর পিতামাতা মুণ্ড কাটিয়া ভূমিতে ফেলিলেন। অদ্ভুত কার্য্য তখন হইল। কাটামুণ্ড কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া উঠিল।

কর্ণ পুত্রকে ধন্য ধন্য করিলেন। পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন ধন্য পুত্র! আজ তোমা হইতে পিতামাতার ধর্ম্ম ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল।

মা পাষাণে বুক বাঁধিয়া পুত্রের মাংস রন্ধন করিলেন। আরও পরীক্ষা বাকী আছে। পদ্মাবতী পুত্রের মস্তকটী লুকাইয়া রাখিয়াছেন। অভিলাষ— ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে বৃষকেতুর মস্তক লইয়া রোদন করিবেন।

রন্ধন হইল। বুভুক্ষু ব্রাহ্মণকে আহারের জন্য ডাকা হইল। ভক্তবৎসল শ্রীহরি আরও পরীক্ষা করিবেন। মনে মনে সমস্ত জানিয়াছেন। ভাবিলেন —এই মুণ্ড দিয়া অম্বল রন্ধন করাইব।

ব্রাহ্মণ ভোজনগৃহে আসিয়াছেন। মহারাজা কর্ণ অতিথিতৃপ্তি জন্য যোড়হস্তে দণ্ডায়মান। আহারের একটীমাত্র স্থান দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, আরও তিনটী স্থান কর। আমি একা খাইব না। তোমরাও আমার সহিত আহার করিবে।

আর এক কথা—বিনা অম্বলে আমি খাইতে পারি না। পদ্মাবতী বৃষকেতুর মস্তক লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই মস্তক দিয়া পদ্মা অম্বল রাঁধুক। আমি অপেক্ষা করিতেছি। তুমি ক্রীড়া স্থান হইতে একজন বালক ডাকিয়া আন।

কর্ণ রাণীকে ব্রাহ্মণের আজ্ঞামত কার্য্য করিতে বলিয়া—বাহিরে গিয়াছেন। রাণী রন্ধনাগারে গিয়া মস্তক দেখিয়া রোদন করিতেছেন। কখন মূর্চ্ছিত হইতেছেন।

অদ্ভুত কৃষ্ণের মায়া। কর্ণ, বালক ডাকিতে গিয়া দেখেন—বৃষকেতু। বৃষকেতু পিতাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া পিতার ক্রোড়ে উঠিল। পিতা পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া শতবার মুখচুম্বন করিলেন। অতি দ্রুতপদে বাড়ীতে আসিলেন। বৃষকেতু মা বলিয়া ডাকিল। রাণী আলুথালু কেশে উন্মাদিনী বেশে ছুটিয়া আসিলেন। যাহা দেখিলেন—তাহা অপূর্ব্ব। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নাই। বৃদ্ধব্রাহ্মণ গোপীজনবল্লভ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বৃষকেতুকে ক্রোড়ে লইয়াছেন। মহারাজ কর্ণ ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেছেন। পদ্মাবতী তেমন প্রণাম করিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কর্ণ তুমিই যথার্থ দাতা। তোমার কীর্ত্তি তোমাকে চিরদিনের জন্য অমর করিয়া রাখিবে। রাণি! তোমার পুত্র গ্রহণ কর। শ্রীভগবানে সমস্ত অর্পণ কর—হৃত বস্তু পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। মহারাণি! তুমি ধন্যা হইলে।

রাণী কুসুমকামিনী দেবী, —বলিহার।

দশহরায় হরিদ্বার।

আমরা ৺কাশীধাম হইতে রওনা হইয়া যথা সময়ে হরিদ্বারে পঁহুছিলাম। গ্রীষ্মকাল, তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই। থাকিয়া থাকিয়া শীতল বায়ু বহিতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। আমরা ষ্টেসন হইতে বাহির হইলাম। যাইব মায়াপুরী, পথ চিনিনা। একজন কুলিকে সঙ্গে লইলাম। সেও পথ চিনে না। যাহা হউক অন্ধকারের ভিতর এদিক ওদিক দিয়া আমরা অবশেষে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। তখন অন্ধকার ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কোথাও একটা কোকিল, কোথাও একটা পাপিয়া থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কার তুলিতেছে। মা গঙ্গার শীতল বায়ু স্পর্শে, শ্রীগুরুর উপদেশ বাক্যে অজ্ঞান রাশির ন্যায়, আমাদের পথশ্রান্তি দূর হইল। আমরা আনন্দ সহকারে মায়াপুরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ অন্বেষণের পর আমরা মায়াপুরী পাইলাম। সেখানে স্বামী কেশবানন্দের একটি আশ্রম আছে। আশ্রমে জনকয়েক সাধু থাকেন। স্থানটি বড় মনোহর। ঠিক গঙ্গার উপরে। চারিদিক নানা প্রকার বৃক্ষলতাদিতে পরিবেষ্টিত। বেল গাছই বেশী। সাধুরা অনেক দিন কেবল বেল খাইয়াই থাকেন। আশ্রমটির একপাশে একটু উদ্যানের মত আছে। মধ্যে একটি প্রকাণ্ড চবুতারা। তাহার নীচে কতকগুলি গুফা প্রস্তুত করা হইয়াছে। আগন্তুক সাধু সন্ন্যাসীরা তাহার ভিতরে থাকিতে পারেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে একবার ভ্রমণ করিলাম। দেখিলাম দুইদিকে দুইটি অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা এবং মধ্যে পুণ্যতোয়া পতিতপাবণী মা জাহ্নবী। ঠিক মনে হয় যেন বৃদ্ধ হিমালয় দুই পার্শে দুই হস্ত প্রসারিত শিশুকন্যার গতি পরিচালিত করিতেছেন। মা'র এখানকার রূপের বর্ণনা হয় না। দেখিলে আপনা হইতে স্তব করিতে ইচ্ছা হয়। ব্রহ্মস্বরূপিণী মা যে দ্রবীভূত হইয়া জগতের পাপরাশি ধুইয়া দিবার জন্য সবেগে চলিয়াছেন ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কি এক আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য কবিতে করিতে ছুটিয়াছেন। মা আমার চিরকালই নৃত্যপ্রিয়া, কখনও শোনিতসাগরে নৃত্য করেন, কখনও যমুনাপুলিনে নৃত্য করেন। মহাদেবের জটাটবীমধ্যে অবস্থিতি কালে বিশাল তরঙ্গ তুলিয়া না জানি কতই নৃত্য করিয়াছিলেন। হরিদ্বারে যদিও মা শিবের জটা হইতে

বাহিরে আসিয়াছেন, কিন্তু নাচিতে নাচিতে এতই বিভোর হইয়াছিলেন যে, এখনও যেন তিনি এ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারেন নাই। তাই অস্ফুট মধুর কুলুকুলু-ধ্বনিতে গান করিতে করিতে মা আপন মনে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন। পথের দিকে দৃষ্টি নাই, বাধা বিঘ্নের দিকে লক্ষ্য নাই, কোথায় যাইতে হইবে তাহাও যেন চিন্তা করা হয় নাই। যেন ভিতরে কোন এক ভাব লক্ষ্য করিয়া উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছেন।

এখানকার গঙ্গায় ও আমাদের দেশের গঙ্গায় অনেক প্রভেদ। মা'র এখানে কুমারীমূর্ত্তি আর আমাদের দেশে, সায়ংকালের গায়ত্রীর ন্যায় বর্ষীয়সীমূর্ত্তি। মা এখানে কৃশাঙ্গী—তাহাতে বালিকাস্বভাবসুলভ চপলতা যেন প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে প্রকাশ হইতেছে। সংসারের মলিনতা যেন এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই—তাই জল এখানে স্বচ্ছ, শুদ্ধ স্ফটীকের মত নির্ম্মল। গঙ্গা এখানে গভীর বড় জোর এক বুক, প্রস্থে আমাদের দেশের গঙ্গার চতুর্থাংশ হইবে কিনা সন্দেহ। জল দুইদিকের তটভূমির সংলগ্ন। ভিতরে কাদা কি বালি নাই—আছে অজস্র প্রস্তর খণ্ড, মা যেন সেইগুলি নাড়েন চাড়েন আর খেলা করেন। এই প্রস্তর গুলি বিবিধ আকারের ও বিবিধ বর্ণের, দেখিতে বড় সুন্দর—গঙ্গাগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া উভয়তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত এই গুলি ছড়ান আছে। আমরা যখনই বাহিরে যাইতাম দু পাঁচ খানি কুড়াইয়া আনিতাম। শেষে এত জমিয়া গেল যে অনেক গুলি সেখানে ফেলিয়া আসিতে হইল। তথাপি যাহা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় আধ মন হইবে।

গঙ্গার জল এখানে কি শীতল এবং কি সুমিষ্ট তাহা যে এখানে আসিয়াছে সেই স্বীকার করিবে। প্রথমে জলে নাবিতে মনে হয় যতটা জলে নাবিতেছি ততটা যেন অবশ হইয়া যাইতেছে। কোন প্রকারে একটা ডুব দিতে পারিলে সমস্ত শরীর যেন জুড়াইয়া যায়, আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। মায়াপুরী পঁহুছিয়া স্নান আহ্নিক ইত্যাদি সারিতে প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল তাহার পর পাকের বন্দোবস্ত। সকালবেলা ঘুরিয়া শরীর বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, স্নান করিয়া অনেকটা সুস্থ হওয়া গেল। কিন্তু বৈশাখ মাস। বেলা বেশী হওয়াতে বড় পিপাসা হইল। গঙ্গায় নাবিয়া জল পান করিতে করিতে এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি করিয়া কত যে জল খাইলাম তাহার ঠিক নাই। সত্যই জল পান করিয়া যেন আশা মিটে না। এমন জল আমি আর কোথাও

দেখি নাই। তৃতীয় প্রহরে আহারাদি শেষ হইল। বৈকালে একবার বেড়াইতে বাহির হইলাম। গঙ্গার ধার দিয়া নীলগঙ্গার তীরে যাওয়া গেল। ইহা গঙ্গারই একটি শাখা মাত্র, চণ্ডীর পাহাড়ের নীচে দিয়া গিয়াছে। জল গঙ্গারই মত নির্ম্মল তবে বর্ণ তত স্বচ্ছ নয়। আমরা যতদূর গেলাম, লোকজন দেখিতে পাইলাম না। আশ্রম হইতে বাহির হইয়াই জনকয়েক সাধুকে মাত্র যাইতে আসিতে দেখা গিয়াছিল। স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন। বৃক্ষলতাদিতে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে দুই একটা পাখীর ডাক ও গঙ্গার অনন্ত কুলুকুলুধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। সন্ধ্যার পর আমরা ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে আর কোন প্রকার আহারের উদ্যোগ না করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গঙ্গাজল পান করিয়া থাকা গেল।

পরদিন দশহারা। বিশেষ উৎসাহের সহিত আমরা হরিদ্বারে চলিলাম। হরিদ্বার মায়াপুরী হইতে প্রায় দুই মাইল হইবে। স্থির হইল ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে হইবে। বাজারের কাছে আসিয়া দেখা গেল অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। তাহার মধ্যে সাধুও আছে, গৃহীও আছে। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ভিড় ক্রমে ততই বাড়িতে লাগিল। দোকানপাট বিস্তর বসিয়াছিল। আমরা অবশেষে রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া গঙ্গার ধার দিয়া চলিতে লাগিলাম। এদিকে গঙ্গার ঘাট বহুদূর পর্য্যন্ত বাঁধান, জলে নাবিবার জন্য বেশ ধাপ করা আছে। ঘাটের উপর পাণ্ডাদের বড় বড় বাড়ী। যাত্রীরা আসিয়া এখানে থাকিতে পারে। স্থানে স্থানে মন্দিরও আছে। সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা এখানে কিছু বেশী দেখিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডে পঁহুছিয়া আমরা এক জায়গায় বস্ত্রাদি রাখিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে বসিলাম। এখানে গঙ্গার মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। বৃক্ষলতাদিতে উহারা পরিপূর্ণ, মনে হয় যেন কোন ঋষির তপোবন। প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানেও খুব সুন্দর। পর্ব্বতমালাবেষ্টিত অনন্ত নীল আকাশের তলে এখানকার এই শঙ্খেন্দু কুন্দোজ্জ্বল গঙ্গার রূপ বড়ই মনোহর। দেখিতে দেখিতে যেন মনের মধ্যে কত কি জাগিয়া উঠে। তাহার পর যখন এই জলরাশির কলকল শব্দের উপর লক্ষ্য পড়ে তখন চিত্ত যেন শূন্য হইয়া যায়। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জলে নাবিলাম। মা'র নিকট দশবিধ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্নান করিলাম। পরে সন্ধ্যাদি সমাপ্ত করিয়া আশ্রমে ফিরিলাম। মাকে ছাড়িয়া আসিবার সময়ে একবার প্রণাম করিলাম। ছাড়িয়া আসিলাম

কিরূপে তাহা বলিতে পারি না। এখানে ত আমরা মা'র ক্রোড়েই বাস করিতেছিলাম—একমুহূর্ত্তও ছাড়া থাকি নাই। আসল কথা মা সঙ্গে সঙ্গেই থাকিলেন, কিন্তু আমি মনে মনে মাকে ছাড়িয়া আসিলাম। এ প্রকার ভুল আমার নিত্যই হইতেছে। মা নিজে এ ভুল না দূর করিয়া দিলে বুঝি এ ভুল ঘুচিবে না। মায়াপুরীতে ফিরিতে প্রায় ১২টা বাজিল। তাহার পর আহারাদি করিয়া আমরা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। শরীর অসুস্থ হওয়াতে বৈকালে আর বাহিরে যাওয়া ঘটিল না। সন্ধ্যার সময় সায়ংকৃত্যাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ সৎসঙ্গ করা গেল। পর দিবস একাদশী। দৈববশতঃ আজও কোথাও বাহির হইতে পারিলাম না। মধ্যাহ্নে এক সাধু গীতা পাঠ করিলেন ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলেন। তাঁহার সহিত সদালাপে সে দিন কাটিয়া গেল। দ্বাদশীর দিন মা গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া আমরা ৺কাশীধামে ফিরিবার জন্য হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিলাম। ঋষিকেশ যাইবার বড় ইচ্ছা ছিল। অদৃষ্টবশতঃ এবার তাহা ঘটিল না। আশা করি মা শীঘ্রই সে বাসনা পূর্ণ করিবেন।

শ্রী… …..

শ্রীগীতার শ্লোক

ও

শব্দনির্ঘণ্ট।

শ্রীগীতার শ্লোক ও শব্দনির্ঘণ্ট।

বিজ্ঞপ্তি।

অনেক সময়ে দেখা যায় শ্লোকের কোন অংশ স্মরণ হইয়াছে কিন্তু শ্লোকটি কোন অধ্যায়ের মনে হইতেছে না। পুনঃ পুনঃ পুস্তক দেখিয়াও বাহির করা যায় না।

কখন কখন শ্রীগীতা একই বিষয়ে কতবার কতস্থানে একটী শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন জানিলে ঐ বিষয় পূর্ণভাবে জানিবার বিশেষ সুবিধা হয়।

সত্যকথা শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া অনুসন্ধান করিলে যাহা চাই তাহাই তিনি একবারে দেখাইয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণে তাহা পারে না এবং সকল সময়ে সাধকেরও তাহা ঠিক হয় না। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারগুলির সুবিধার জন্য এই নির্ঘণ্ট।

প্রতি শ্লোককে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিভাগের আদ্যক্ষর বর্ণ-মালাক্রমে সাজান হইয়াছে। আর এই চারিভাগের প্রত্যেক ভাগে যে যে প্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাও বর্ণমালাক্রমে ঐ সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে।

এই সূচীতে শ্লোক বা শব্দ কিছুই ত্যাগ করা হয় নাই। সাধারণ ক্রিয়া ও চ বা তুহি ইত্যাদি ভিন্ন প্রায় সমস্তই ইহাতে থাকিবে।

শ্লোকের সংখ্যা থাকাতে প্রতি শব্দের উপর ভাষ্যকারগণের বক্তব্য যাহা তাহাও অনতিবিলম্বে পাওয়া যাইবে। এই নির্ঘণ্টকেও যথাসম্ভব উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ইতি।

১৩১৮ সাল। বৈশাখ মাস। কলিকাতা।

লাভ, কল্যাণপ্রাপ্তি কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নাই। শ্রীরামের বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়াই বলিতেছি ইনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কেবল পরোপকার জন্য তিনি গুরূপদেশ প্রার্থনা করেন। ভগবান বশিষ্ঠের উপদেশ শুনিয়া অন্য অধিকারী পুরুষও চিত্তবিশ্রান্তি লাভ করুক—লোকহিতার্থে রাম উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান বশিষ্ঠই রামের গুরু। তিনিই যথার্থ উপদেষ্টা।

মহামুনি বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন—আমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত করিয়া আড়িবক হইয়া যখন যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন নিষধ-পর্ব্বতের প্রস্থদেশে ভগবান কমলযোনি আমাদিগকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আপনার অবশ্যই স্মরণ আছে। আপনি রামচন্দ্রকে সেই যুক্তি-জ্ঞানের উপদেশ করুন, তৎশ্রবণে ইনিও বিশ্রান্তিলাভ করুন। রামকে উপদেশ করায় আপনার কদর্থনা (বহু ক্লেশ) হইবে না। রামই উপদেশের যথার্থ পাত্র। বিষয়-বৈরাগ্যহীন অপাত্রে উপদেশ করা আর অপবিত্র কুক্কুরচর্ম্মের পাত্রে দুগ্ধ রাখা সমান।

ব্রহ্মেব ব্রহ্মণঃ পুত্রো বশিষ্ঠো ভগবান্মুনিঃ।

ভগবান বশিষ্ঠ ব্রহ্মার পুত্র। তিনি ব্রহ্মারই মতন। তিনি স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন আপনার আদেশ আমি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিব। আমি জ্ঞানোপদেশ দ্বারা রাজপুত্রের মনোমালিন্য দূরীভূত করিব।

ভগবান বশিষ্ঠ তখন মহোৎসাহে লোকসকলের অজ্ঞানশান্তির জন্য মোক্ষলাভের কথা সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন।

৩য় সর্গ।

ভূয়োভূয়ঃ সৃষ্টিবর্ণন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা লোকের দুঃখশান্তির জন্য যে জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়াছিলেন সেই জ্ঞানশাস্ত্র বলিতেছি।

রাম—ভগবন্ ইহা ত শুনিবই। পরন্তু "ইমং তাবৎ ক্ষণং জাতং সংশয়ং মে নিবারয়।" আমার উপস্থিত সংশয় নিবারণ করুন। শুকের পিতা ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগুরু ও মহাত্মা। তিনি বিদেহমুক্ত হইলেন না—শুক মুক্ত হইলেন—ইহা কি?

বশিষ্ঠ—বিদেহমুক্তি কি তাহা ত বুঝিয়াছ?

রাম—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ যে পরমানন্দপ্রাপ্তি যাহাতে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ সপ্রকাশ আত্মামাত্রই কেবল স্বস্বরূপে বিরাজ করেন, তাহাই বিদেহমুক্তি। এই মুক্তি জ্ঞানসাধনার ফল। সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব ইহা লাভ করিতে পারিলেন না কেন? কেবল জ্ঞানের অনিত্য ফলমাত্র লাভ করিলেন? কিন্তু জ্ঞান হইলেই অজ্ঞাননাশ হইবেই। তখন ত জীবন অসম্ভব হয়। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলেই যদি জীবনের অভাব হয়, তবে সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হয়। যদি উচ্ছেদ না হয়, তবেত অনির্ম্মোক্ষই সিদ্ধ হইল। যদি বলেন জ্ঞানফল যে মুক্তি তাহা মরণোত্তরে লাভ হইবে, তবে জীবন্মুক্তি বলিয়া যে কথা আছে সেই জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হইল কিরূপে?

বশিষ্ঠ—রাম! অবিদ্যা জন্যই বন্ধাবস্থা। সেই অবিদ্যার স্বরূপ যতক্ষণ না জানা যায়, এবং অবিদ্যার সাক্ষী যে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বাধার চিৎস্বরূপ তাঁহাকে যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ পরমসূর্য্যকে জানিতে পারিলে অবিদ্যা ত্রসরেণু আপনা হইতে লয় হইয়া যাইবে; সেই জন্য আমি প্রথমেই সেই সর্ব্বসাক্ষী চিৎস্বরূপ পরমসূর্য্যের কথা আলোচনা করিতেছি। দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপ অবিদ্যানাশের জন্য —দৃশ্যপ্রপঞ্চ যে, পরমসূর্য্যের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র—বাস্তবিক যাহা নাইই তাহাই বলিতেছি!

হে রাম !

পরমার্ক প্রকাশান্ত স্ত্রিজগত্রসরেণবঃ
উৎপত্যোৎপত্য লীনা যে ন সংখ্যামুপযান্তিতে ॥

পরমসূর্য্য প্রকাশ হইলে ধূলিকণার মত কত অসংখ্য জগৎ যে, উৎপন্ন হয় ও লয় হয় তাহার সংখ্যা করে কে ?

বর্ত্তমানেও যে কোটি কোটি ত্রৈলোক্য রহিয়াছে, তাহারই বা সংখ্যা কে করিতে পারে ? ভবিষ্যতেও আবার পরমাত্মসমুদ্রে কত জগৎ-সৃষ্টিতরঙ্গ যে ভাসিবে, তাহার সংখ্যা করিতেও ত কেহ নাই। কাজেই অসংখ্য জগতে অসংখ্য ব্যাসাদি উৎপন্ন হইতেছেন বুঝিতে হইবে।

রাম—যে সকল জগৎ সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যতে হইবে তাহার সংখ্যা কেহ করিতে পারে না বুঝিলাম,---কিন্তু বর্ত্তমানেও যে অনন্ত সৃষ্টি আছে তাহা বুঝিব কিরূপে ? অসংখ্য জগৎ গত হইয়াছে এবং অনন্ত জগৎ ভবিষ্যতে হইবে—ইহার মধ্যবর্ত্তীকালে অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে সমস্ত সৃষ্টি তাহা ত তবে ভূত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি অপেক্ষা ন্যূনসংখ্যা হইবে? কিরূপ বিচারে বর্ত্তমান সৃষ্টি অসংখ্য বুঝিতে পারিব তাহাই বলুন !

বশিষ্ঠ—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে যে জগৎ উৎপত্তি তাহার আধার হইতেছেন পরমাত্মা। সেই পরমাত্মাতে জগৎসমূহ আরোপিত মাত্র। এখন দেখ এই স্থূলপ্রপঞ্চ কি ?

স্থূলপ্রপঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পঞ্চীকরণে উৎপন্ন। সূক্ষ্মপ্রপঞ্চের কথাই প্রথমে আলোচনা কর।

পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণী যখন যে স্থানে মরিতেছে, সেই স্থানেই তাহাদের প্রত্যগাত্মা ত্রিজগৎ দর্শন করিতেছে। ইহা কিরূপ যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহার উত্তরে বলি :—

আতিবাহিক নাম্নান্তঃ স্বহৃত্থেব জগত্রয়ম্।
ব্যোম্নি চিত্তশরীরেণ ব্যোমাত্মানুভবত্যজঃ ॥

মৃত্যুর পরে জীবের স্থূল দেহ ত পড়িয়া থাকে ; কিন্তু আতিবাহিক দেহটারই পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। অতিবহনমতিবাহো ধূমার্চ্চিরাদিমার্গাভিমানি দেবৈঃ পরলোকপ্রাপণং তত্র সাধুরাতিবাহিকস্তন্নাম্না চিত্তশরীরেণ চিত্তাহঙ্কার-

মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয় প্রাণঘটিতেন বাসনাময়েন সূক্ষ্মশরীরেণ স্বহৃদ্যেবান্তরে যাম্নি দহরাকাশে জগত্রয়ং বাসনাময়মেবানুভবতি ভ্রান্ত্যা বাসনাময়তত্তচ্ছরীরাণি বা প্রাপ্নোতি ক্রমশঃ। বস্তুতস্তু স ব্যোমাত্মা প্রাগুক্তচিদাকাশস্বরূপঃ অতএবাজো জন্মাদি বিক্রিয়ারহিতশ্চেত্যর্থঃ।

আতিবাহিক দেহটা কি? যে দেহটা ধূমমার্গ বা অর্চ্চিরাদিমার্গে ঐ ঐ অভিমানী দেবতাকর্ত্তৃক পরলোকে নীত হয়—অতিবহন হয় বলিয়া আতিবাহিক। এই দেহটা তবে স্থূল দেহ নহে, এটাকে বলে চিত্তশরীর। চিত্ত, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ এই সমস্ত লইয়া যে সূক্ষ্ম দেহ—যেটা বাসনাময় সেইটাই আতিবাহিক দেহ। এই বাসনাময় সূক্ষ্মশরীরে নিজের হৃদয়ে অন্তরাকাশে দহরাকাশে জীব বাসনাময় ত্রিজগৎ অনুভব করে; এবং ভ্রমবশতঃ বাসনাময় তত্তৎ শরীর ক্রমে প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে যে প্রত্যাগাত্মা বাসনাময় জগৎ বা শরীর দেখেন, সেই প্রত্যাগাত্মা বা ব্যোমাত্মা—তিনিও চিদাকাশস্বরূপ—অতএব অজ, জন্মাদি বিক্রিয়ারহিত।

রাম—মৃতব্যক্তির স্বহৃদয়ে পরলোক দর্শন হয়—ইহার বিরুদ্ধ মতও শ্রুতি স্মৃতিতে দেখা যায়। "তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপীত্যাদি।

বশিষ্ঠ—সত্য। কর্ম্ম উপাসনারূপ ব্যবহার দৃষ্টিতে শ্রুতি স্মৃতি ঐরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে "অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে" এই শ্রুতিবাক্যে বুঝা যায় যে, এই পৃথিবী স্বর্গ এই সমস্ত অন্তরে—বাহিরে নহে। এই জন্য অন্তরাকাশে পরলোক কল্পনা করা হয়।

আত্মা ত সীমাশূন্য। অন্তরাকাশ পরিচ্ছিন্ন। বলিতে পার আত্মার হৃদাকাশ কিরূপ? যিনি সাক্ষীস্বরূপ তাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে। কাজেই হৃদয় পরিচ্ছেদরূপ ব্যাপারের নিবারণ হইল। সাক্ষীস্বরূপ নিষ্ক্রিয় আত্মার প্রপঞ্চ দর্শন ব্যাপারটি বাসনামাত্র ইহাই বলা হইল। আত্মার উৎক্রমণ গমনাদিও পরলোক গমনের মত কল্পনা মাত্র।

মৃত্যুকালে সকল জীবই আতিবাহিক দেহে স্বীয় স্বীয় অন্তরাকাশে তবে পরলোক দর্শন করে। কোটি কোটি প্রাণী সর্ব্বদা মৃত্যু অনুভব করিতেছে, করিয়াছে ও করিবে। জীবিতকালে তাহারা যে সমস্ত দৃশ্য দেখে তন্মধ্যে যে

দৃশ্যে তাহাদের অত্যাসক্তি থাকে মৃত্যুকালে সেই দৃশ্যই তাহাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হয় এবং মরণান্তর সে সেই দৃশ্য বা জগৎ প্রাপ্ত হয়। ইহা বাসনাবিলাস মাত্র। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি শ্রবণ কর। মরণকালে যে ভূতের যেমন আশা বা বাসনা প্রবলভাবে স্ফুরিত হয়, সেই ভূত সেই জগৎই প্রাপ্ত হয়। "যদযদ্বস্তি তত্তদাভবন্তি" "যং যং" বাপি স্মরন্ ভাবং ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি বাক্য। তাই বলিতেছি "ভূতানাং যাং জগন্ত্যাশামুদিতানি পৃথক্ পৃথক্"।

এখন বুঝিতেছ বর্ত্তমানকালেও যে সৃষ্টি অনন্ত, ইহা বুঝিবার যুক্তি কি? আরও দেখ জগৎটা বাসনাময়। পরমার্থদৃষ্টিতে এই বাসনাময় জগতের সমস্তই ভ্রমমাত্র। সংসারসর্গটা (অর্থাৎ যাহা কিছু দেখা যায় তাহা সঙ্কল্পনির্ম্মাণমিব, মনোরাজ্যবিলাসবৎ, ইন্দ্রজালরচিত মালার ন্যায়, কথার্থের প্রতিভাস ন্যায়, বায়ুরোগীর ভূকম্পভ্রমের ন্যায়, বালকের কল্পিত পিশাচ দর্শনের ন্যায়, আকাশে মুক্তাবলীর ন্যায়, নৌস্পন্দতরুযানবৎ (নৌকারোহীর তীরতরু প্রচলন দর্শনের ন্যায়) স্বপ্নদৃষ্ট নগরীর ন্যায়, স্মৃতিজাতখপুষ্পবৎ স্মরণ হেতু কল্পিত আকাশ-কুসুমবৎ)।

জগৎসংসার দর্শন বা জগতের অনুভবটা স্বপ্নের মত। এই শরীরে যে জগৎ দর্শন হয় মৃত্যুর পর তাহাই আবার স্মরণ হয়, জন্মের পরে আবার তাহাই অনুভব হয়।

রাম—জগৎসংসার দর্শনটা যদি স্বপ্নের মত তবে সকল লোকে সকল সময়ে ইহাকে একরূপ দেখে কিরূপে?

বশিষ্ঠ—"তত্রাতিপরিণামেন তদেব ঘনতাং গতম্"। অতিপরিণামঃ চিরপরিচয়ঃ। একরূপ স্বপ্ন যদি সর্ব্বদা দেখা যায় তবে তাহা ঘনতা প্রাপ্ত হয়। অতি পরিচয় জন্য পঞ্চীকরণ দ্বারা ইহা স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। পুনঃ পুনঃ দর্শন জন্য ইহা দৃঢ় হইয়া স্থূলজগৎরূপে সর্ব্বদা যেন অবস্থিত এইরূপ বোধ হয়।

ইহলোক যাহা তাহাও যেমন জীবাকাশস্থিত বাসনামাত্র, পরলোকটাও সেইরূপ মরণের পরে অনুভূত জন্মবাসনা মাত্র।

মৃত্যুর পরে স্থূল দেহ যায় কিন্তু তন্মধ্যে বাসনাময় সূক্ষ্ম দেহ থাকে। তাহারও ভিতরে কারণদেহ। দেহাবসানে দেহান্তরপ্রাপ্তি যাহা তাহা এই সূক্ষ্ম দেহটারই হয়। সেই বাসনাময় আতিবাহিক দেহটার স্থূলত্বপ্রাপ্তিটাই জন্মান্তর। কদলীত্বকের ন্যায় তিনটা দেহ পরম পুরুষকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

জন্ম মৃত্যু জগৎ সৃষ্টি ইত্যাদি সমস্তই অলীক। তথাপি জীবের এই জগৎভ্রম দৃষ্ট হয়। অনন্তা নানা প্রসরশালিনী অবিদ্যাই ইহার মূল। অবিদ্যা, চঞ্চল-তরঙ্গশালিনী সৃষ্টিরূপা সুদীর্ঘা নদীর ন্যায়।

পরমার্থাম্বুধে স্ফারে রাম সর্গ তরঙ্গকাঃ।
ভূয়োভূয়োনুবর্ত্তন্তে ত এবান্যে চ ভূরিশঃ॥

পরব্রহ্মসাগরে সৃষ্টিরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা স্বভাবতঃ উঠিতেছে, ভাঙ্গিতেছে। কোন সৃষ্টিতরঙ্গ পূর্ব্বের মত, কোনটা বা নূতন, কোন কোনটার কিছু সাদৃশ্য আছে আবার পার্থক্যও আছে। সৃষ্টিতরঙ্গ কতক পুরাতন, কতক নূতন, কখন সমান, কখন অর্দ্ধসমান—ইহা নানা প্রকার।

এই মহর্ষি বেদব্যাস সৃষ্টিতরঙ্গের দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ। সেই ৩২ জন্মের মধ্যে ১২ জন্ম আয়ু, চেষ্টা, জীবন, আচার ইত্যাদিতে সমান। ১০ জন্ম জ্ঞানে সমান। অন্যান্য ব্যাস, বাল্মীকি ইত্যাদি ঋষি এখনও জন্মিবেন। এইরূপ মনুষ্য দেবতা ঋষি হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। পূর্ব্বে ইঁহাদের আকার যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপ আছে, পরে অন্যরূপও হইতে পারে।

ত্রেতাযুগ অনেকবার হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতেও আবার হইবে। তুমি, আমি কতবার কত রূপ ধরিয়াছি, কতবার আরও ধরিব, তাহার নিশ্চয়তা কি? আমি ব্যাসকে দশবার জন্মিতে দেখিলাম। বহুবার আমি ব্যাস, বাল্মীকির সহিত মিলিয়াছি—বহুবার পৃথক রূপেও জন্মিয়াছি। আমরা আরও কতবার বিভিন্ন আকারে ও সমান অভিপ্রায়ে জন্মিব। কখনও বিজ্ঞ কখনও অবিজ্ঞ হইয়াছি। এই ব্যাস আরও আট বার এই জগতে জন্মিয়া ভারত প্রচার, বেদ-বিভাগ, ব্রাহ্মণ্যস্থাপন করিবেন, করিয়া বিদেহ মুক্তি লাভ করিবেন। এই ব্যাস এখনও ভোগেচ্ছাত্যাগী, বাসনাত্যাগী মনোজয়ী পুরুষ। সুতরাং ইনি জীবন্মুক্ত।

জীবন্মুক্তদিগের কর্ম্ম, বিদ্যা, জ্ঞান, চিত্ত ইত্যাদি সকলবারে সমান থাকে না। তাঁহারা শত শত বার জন্মগ্রহণ করেন; কখন বা বহু কল্পেও জন্মগ্রহণ করেন না।

প্রাণীপ্রবাহটা মায়া মাত্র। ইহাকেও অনাদি বলা যায়। কালসাগরের লহরীমালা কখন একরূপ কখন বা ভিন্নরূপ। জীব নিরন্তর এখানে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ মাত্র পরম শান্ত অবস্থায় থাকেন।

৪র্থ সর্গ।

পুরুষকার প্রশংসা।

আত্মা নিত্যমুক্ত। এই তাঁহার স্বভাব। নিত্যমুক্ত আত্মার অজ্ঞান আবরণই বদ্ধভাব। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নাশের নাম মুক্তি। অজ্ঞান থাকিলে দৃশ্যজগৎ ব্যাঘ্রের মত।

মনোনাম মহাব্যাঘ্রো বিষয়ারণ্যভূমিষু।
চরত্যত্র ন গচ্ছন্তু সাধবো যে মুমুক্ষবঃ॥

মনোরূপ মহাব্যাঘ্র বিষয়বনে ভ্রমণ করিতেছে। যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা রূপ রসাদি বিষয়বনে যাইবেন না। অজ্ঞানেই এই ব্যাঘ্রের বিচরণ। অজ্ঞান নষ্ট হইলে চিত্রব্যাঘ্র মাত্র থাকে। ইহা লইয়াই ব্যবহার কৌতুক। জীবন্মুক্ত ও বিদেহ মুক্তের বিশেষ প্রভেদ কিছুই নাই। কারণ উভয়েরই অজ্ঞান নাই।

জল ও তরঙ্গ দেখিতে ভিন্ন কিন্তু মূলে সমান। সদেহ মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি প্রথম দর্শনে ভিন্ন হইলেও মুক্তিকল্পে সমান।

সদেহ মুক্তের দেহ থাকে বিদেহের তাহাও থাকে না। মুক্তির সহিত দেহের কোন সম্পর্ক নাই। ভোগ যতদিন ততদিন বন্ধন; ভোগের আস্বাদ যখন থাকে না তখনই মুক্তি। দেহ থা'ক্ বা যা'ক্ বিষয়কে বিষয় বলিয়া বোধ না হওয়া দুই অবস্থাতেই হইতে পারে। আত্মা অসঙ্গ উদাসীন ইহা জানিলেও ভোগাভিমান ত্যাগ ব্যতীত মুক্তি নাই।

এই যে ব্যাসদেবকে দেখিতেছ ইনি জীবন্মুক্ত; কেবল কল্পনায় সদেহের মত দেখাইতেছে। দেখিতে সদেহ হইলেও অন্তরে বিদেহ। অন্তরে ইনি দেহাভিমান শূন্য। প্রত্যেক জ্ঞানীই অজ্ঞাননাশে বাধরূপে স্থিতিলাভ করেন। মুক্তি হইলে অর্থাৎ দেহাভিমান শূন্য হইলে সদেহে ও বিদেহে ভেদ কোথায়? প্রবাহ থা'ক্ বা না থা'ক্, বায়ু—বায়ুই, দেহ থা'ক্ বা না থা'ক্ মুক্তি একই।

রাম—জীবন্মুক্তির অধিকারী কি সকল কালেই থাকে?

বশিষ্ঠ—পুরুষ প্রযত্নে সমস্তই সিদ্ধ হয়—তা শমদমাদিসাধনসম্পন্ন শুক-দেবই বা কি অথবা অন্য যুগের অন্য লোকই বা কি?

সর্ব্বমেবেহ সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে ॥

হে রাঘব! সম্যক্‌রূপে পুরুষকার প্রয়োগ করিতে পারিলেই সংসারে সমস্তই লাভ করা যায়।

রাম—পুরুষকার কাহাকে বলিতেছেন?

বশিষ্ঠ—সাধূপদিষ্ট মার্গে মন বাক্য ও শরীরের যে চেষ্টা তাহাই পুরুষকার। অন্য চেষ্টার নাম উন্মত্ত চেষ্টা। উন্মত্ত চেষ্টা বিফল বলিয়া ইহা পুরুষকার হইতে পারে না। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলে চিত্তশুদ্ধি হইবেই। পরে এক নিবিড় আনন্দ উদিত হয়। ইহা পুরুষকারের প্রভাব।

অপ্রত্যক্ষ পুরুষকারকেই মূঢ় লোকেরা দৈব বলে।

রাম—ননু শুকাদানাং শমদমাদিসাধনসম্পন্নানাং শ্রবণং ফলিতং কথমন্যেষামাধুনিকানাং তৎ ফলিষ্যতি। সাধনানাং দুঃসম্পাদ্যত্বাৎ। শুকদেব প্রভৃতি শমদমাদিসাধনসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের জীবন্মুক্তি হইতে পারে। কিন্তু আধুনিকেরা সেরূপ সাধনা করিতে পারে না। তাহাদের জীবন্মুক্তির সম্ভাবনা কি?

বশিষ্ঠ—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে শরীর, বাক্য ও মনকে স্পন্দিত করিলেই চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হইবেই। জ্ঞান হইলেই হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি সন্তাপ অপ্রতিহত একটা আহ্লাদ আসিবেই। ইহাই জীবন্মুক্তিসুখ। শ্রুতি বলেন স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্যেতি।

উচিত নিয়মে চেষ্টা করিলেই ফল প্রাপ্তি হইবেই; তা আধুনিকই বা কি আর পুরাতনই বা কি। যদি বিঘ্নও হয় তবে অর্দ্ধফল ভাগী হইতেও দেখা যায়। পুরুষকারের বলে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, ইন্দ্রত্ব, শিবত্ব পর্য্যন্ত লাভ হয়।

পুরুষকার দুই প্রকার—প্রাক্তন ও ঐহিক। ইহ জন্মের প্রবল পুরুষকার প্রাক্তন পুরুষকারকে অভিভূত করিতে সমর্থ।

অধিক কি বলিব ইহ জন্মের পুরুষকারদ্বারা "মেরবোঽপি নিগীর্য্যন্তে" সুমেরু পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করা যায়, প্রাক্তন পুরুষকারের ত কথাই নাই। তপস্যাই প্রধান পুরুষকার। শাস্ত্রীয় পুরুষকারই সফল হয়; অশাস্ত্রীয় পুরুষকার অনর্থকর।

শাস্ত্রীয় প্রযত্ন শিথিল কর, রাগ দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া যাইবে;

Registered No C 583.

৬ষ্ঠ বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩১৮ সাল। [৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কলিকাতা, ১০ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট
উৎসব কার্য্যালয় হইতে—শ্রীযুত ননীলাল রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

আষাঢ়।

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

ষষ্ঠ বর্ষ] ১৩১৮ সাল, আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

প্রীতি-মিলন।

তুমি আছ, সারা ভুবন জুড়িয়া—
তাই ভ'রে গেছে সব আমি।
আর আমিও তোমারে আপনা করেছি।
তাই স্বরূপ ছেড়েছ তুমি।
তুমি, আপন কুহকে আপনি মজিয়া—
আমারে ডাকিছ নিত্য।
তাই, আমিও তোমার শরণ লয়েছি—
চরণে ঢেলেছি চিত্ত।
তুমি, করুণা করিয়া আমা ল'য়ে আঁক
জগতের যত দৃশ্য।
মুছিয়া দিয়েছ নয়নে আমার—
সে, প্রেম-ললিত-হাস্য।
তাই, তুমিও জেনেছ, আমিও জেনেছি—
তোমাতেই আমি মগ্ন।
যুগে যুগে এই প্রীতি-মিলনের,
খুঁজি দোঁহে শুভ লগ্ন।

শ্রী ....

গীতায় সম্পূর্ণ ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

প্রথম প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি সম্পূর্ণ ধর্ম্মের পাঁচটি অঙ্গ।

(১) নির্গুণ উপাসনা—"আপনিই আপনি" ভাবে স্থিতি।

(২) বিশ্বরূপ উপাসনা—আপনিই বিশ্বরূপ ভাবে স্থিতি।

(৩) অভ্যাস যোগে বিশ্বরূপ—কোন অবলম্বন ধরিয়া তাহাই যে সমস্ত, নিরন্তর এই ভাবনা।

ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে জগতের যে বস্তুই কেন অবলম্বন করনা, তাহার স্বরূপ-টিতে যাও দেখিবে, সমস্ত জগৎ জুড়িয়া সেই একই বস্তু ভাসিতেছে। জগৎটা এই বস্তুকে দেখাইয়া দিতেছে বলিয়া, সেই এক বস্তুটি যেন এই জগৎ রূপে সাজিয়াছে, প্রথমে ইহাই মনে হয়। ইহাই বিশ্বরূপে যাওয়া। কিন্তু বিশ্বরূপে গিয়াও আরও চক্ষু প্রসারিত কর দেখিবে, এক সীমাশূন্য "আপনিই আপনি" পদার্থের তিন পাদ পরমশান্ত, সর্ব্ববিধ চলন রহিত। তিনি স্থির সমুদ্রের মত আপন আনন্দে আপনি বিভোর, আপন জ্ঞানে আপন মগ্ন, আপন ধ্যানে আপনি সমাধিস্থ। অথবা কি ভাবে তিনি আছেন তাহা কে বলিবে? যাঁহাকে বেদও প্রকাশ করিতে পারেন না তাঁহার কথা বলিবে কে? তথাপি যে বলা যায় তাহা যেমন আকাশের এক স্থান দেখিয়া বলা হয় কি মহান্, কি অনন্ত আকাশ দাঁড়াইয়া আছে! আকাশের দেখিলাম ত যতটুকু চক্ষে আঁটে, কিন্তু কি মহান্, কি অনন্ত আকাশ! বলিলাম। মনে মনে যেন কত কি দেখিলাম! মনের উপরেও যদি কিছু থাকে তবে যেন ভিতরকার অনন্তে এবং বাহিরকার অনন্তে কি যেন স্তব্ধ চাওয়াচায়ি হইয়া গেল—যেন অনন্ত অনন্তকে স্পর্শ করিল—মন ও বাক্য সেই নিস্তব্ধ অবলোকনকে ভাষা দিয়া বলিতে গেল—বলিল—কি মহান্! কি অনন্ত! বলা কিছুই হইল না, দেখাও কিছুই হইল না—তথাপি বলা হইল মহান্! অনন্ত! অখণ্ড! অপরিসীম!

একটু দেখিয়া একটু ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়া ভিতরে যাহার আভাস পাওয়া গেল,—ভিতরে যেন কে কাহাকে ছুঁইয়া, ভিতরে যেন আপনাকে আপনি দেখিয়া বাহিরে আসিয়া তাহার কথা বলিতে গিয়া বলা গেলনা—ভাষা সেখানে পৌছিলনা। আপনাতে আপনি স্থিতি হয় কিন্তু এ স্থিতির কথা কেহ বলিতে পারেনা—যেমন

ভাবেই বল অনন্তকে সীমার মধ্যেই আনা হইয়া যাইবে যদি কোন কিছু দিয়া তাহা প্রকাশ করিতে চাও।

বলা হইল "আপনিই আপনি" এইটিই তিনি। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরবয়ব, নিরাকার—তাঁহাতে কোন গুণ দাও বা অবয়ব দাও বা আকার দাও তিনি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা আছেন সত্য কিন্তু তুমি বুঝিলে তাঁহাকে সাকার করিয়া, গুণবান করিয়া, অবয়ব যুক্ত করিয়া। বিশ্বরূপের উপাসনা কর—তাহাও যেমন সাকার, অবতার উপাসনা কর তাহাও সেইরূপ সাকার। বিশ্বরূপের উপাসনাতে, বা প্রতিমার মূর্ত্তিতে যে উপাসনা, এই দুই উপাসনাতে একই কার্য্য করিতে হইবে—জড়টি ভুলিয়া চৈতন্যটিকে স্পর্শ করিতে হইবে—তোমার উপাস্য বিশ্বরূপই হউক বা কোন মূর্ত্তিই হউক তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। যাহাকে চিন্তা করিয়া জড়ভাব বিগলিত করিতে পারিবে তাহাই তোমার তিনি—তাহাই "আপনি আপনি"। জড়ের আবরণটা—শক্তির ব্যক্তাবস্থাটা—সেই অখণ্ডকে যাহোক তাহোক করিয়া দেখান মাত্র। সেই জন্য বলা হইল কোন অবলম্বন ধরিয়া বিশ্বরূপে যাইতে হইবে। বিশ্বরূপে পৌঁছিলে—তবে এই অনন্ত কোটি জগৎ-তরঙ্গ যে সেই পরমপদের সর্ব্ব নিম্ন পাদের এক অতি ক্ষুদ্র স্থানে ইহার ধারণা হইবে। ইহা দৃঢ় ধারণা হইলে পরমপদে স্থিতি হইবে।

ব্রহ্মের তুরীয় পাদটি মাত্র নিরাকার; অন্য পাদত্রয় সাকার। এই সাকার আবার দ্বিবিধ—উপাধিশূন্য সাকার এবং উপাধিযুক্ত সাকার। উপাধিশূন্য সাকার তিন ভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মবিদ্যা সাকার, আনন্দ সাকার এবং উভয়াত্মক সাকার। উপাধিযুক্ত সাকারটিকে বলে অবিদ্যা পাদ। এই অবিদ্যা পাদের এক স্থানে এই জগৎ তরঙ্গ। শ্রুতির চিত্র আমরা দিতেছি।
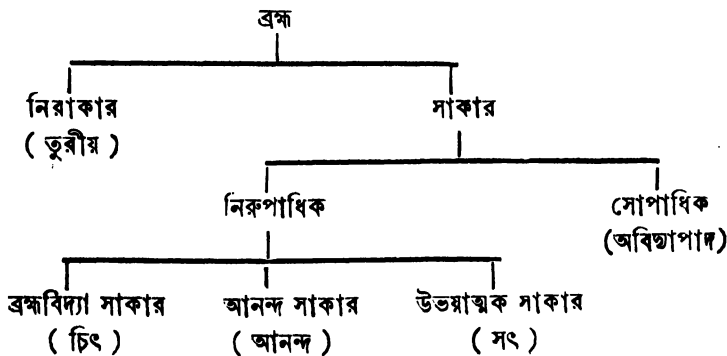
শ্রুতি বলেন—পাদ চতুষ্টয়াত্মকং ব্রহ্ম।
কিং তৎপাদ চতুষ্টয়ং ভবতি?
অবিদ্যাপাদঃ প্রথমঃ পাদো বিদ্যাপাদো দ্বিতীয়ঃ
আনন্দপাদস্তৃতীয় স্তুরীয়পাদশ্চতুর্থ ইতি।

তত্রাধস্তনমেকং পাদমবিদ্যাশবলং ভবতি। উপরিতন পাদত্রয়ং শুদ্ধ বোধাহনন্দ লক্ষণমমৃতং ভবতি। তুরীয়স্তু নিরাকারম্। সাকারঃ সাবয়বো নিরবয়বঃ নিরাকারম্। তস্মাৎ সাকারমনিত্যং নিত্যং নিরাকারমিতি শ্রুতেঃ।

তুরীয় পাদটি মাত্র নিরাকার। এই নিরাকারে স্থিতিই নিরাকার উপাসনা। তদ্ভিন্ন নিরাকারের অন্য কোন রূপ উপাসনা হয় না।

ব্রহ্মের উর্দ্ধ ত্রিপাদ হইতেছে—বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ ও উভয়াত্মক পাদ—এই তিন পাদ শুদ্ধবোধ-আনন্দ-অমৃত স্বরূপ। এই তিন পাদকেও সাকার বলা হইতেছে। তুরীয় পাদটি নিরাকার।

মাতেব হিতকারিণী ভগবতী শ্রুতি আপনিই প্রশ্ন করিয়াছেন—নিরবয়বং ব্রহ্ম চৈতন্যমিতি সর্ব্বোপনিষদ্সু সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধান্তেষু শ্রূয়তে। অথচ বিদ্যানন্দ তুরীয়াণামভেদ এব শ্রূয়তে।

ব্রহ্ম চৈতন্য নিরবয়ব। সর্ব্ব উপনিষদ্ ইহা বলিতেছেন। সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ইহা। আর বিদ্যাপাদ, আনন্দ পাদ, তুরীয় পাদ এই সকলই ত অভেদ। অভেদ যদি, তবে এই সাকার ভেদ কেন?

শ্রুতি উত্তরে বলেন—বিদ্যা প্রাধান্যেন বিদ্যা সাকারঃ আনন্দ প্রাধান্যেনানন্দ সাকারঃ উভয় প্রাধান্যেনোভয়াত্মক সাকার শ্চেতি। বস্তু বস্তু অভেদ, কেবল প্রাধান্য মাত্রেই ভেদ।

ব্রহ্ম চৈতন্য যেমন নিরাকার, নির্গুণ; জীব চৈতন্যও সেইরূপ নিরাকার ও নির্গুণ। মহাভারত শত সহস্র স্থানে বলিতেছেন—

"জীব নির্গুণ ও দেহ শূন্য। কেবল ভ্রান্তবুদ্ধিগণ ভ্রমবশতঃ উহারে সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া গণনা করে" আবার বলিতেছেন "ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন"। অনুগীতা ৩০ অধ্যায়।

নিরাকার পাদটি মাত্র মায়ালেশশূন্য। অন্য ত্রিপাদ মায়াগুণবিশিষ্ট। মায়া পরিচ্ছন্ন বলিয়াই সাকার সাবয়ব বলা হইল। কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম যে ভাবেই কেননা মায়াতে উপহত হয়েন তিনি সর্ব্বদা স্বস্বরূপেই অবস্থিত। সমুদ্রের এক

দেশে তরঙ্গ উঠিলেও ঐ তরঙ্গতাড়িত সমুদ্রাংশের মূলদেশে কিন্তু সেই পরমশান্ত চলনরহিত ব্রহ্মই আছেন। উপরে তরঙ্গ উঠে, ভাসে, ভাঙ্গে মাত্র। ব্রহ্মমায়া-কর্ত্তৃক ঈশ্বর ভাবে—বা জীব ভাবে—যেরূপই কেননা প্রতিবিম্বিত হয়েন তিনি সর্ব্বদাই আপন স্বরূপ ঐ তুরীয় অবস্থায় আছেন। অন্য অবস্থা গুলি মায়া দ্বারা কল্পিত মাত্র—মূলে সেই স্বস্বরূপ। এই স্বস্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান—বা "আপনিই আপনি" ভাবটিতে লক্ষ্য না রাখিলে শ্রুতি বা গীতা ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিরুদ্ধ বোধ হইবে।

শ্রুতি বলেন—"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানোযাতি সর্ব্বতঃ" কঠ ২ বল্লী ২১ শ্রুতি। আসীন হইয়া দূরে ভ্রমণ করেন শুইয়া থাকিয়াও সর্ব্বত্র যান।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। এজতি=চলতি, তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে।

গীতাও এই নির্গুণ ও সগুণ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই সর্ব্বত্র বলিতেছেন "নসত্তন্নাসদুচ্যতে" ১৩।১২; "নির্গুণং গুণভোক্তৃচ" ১৩।১৪; "দূরস্থং চান্তিকেচ" ১৩।১৫; "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" ১৩।১৬। একস্থানে বসিয়াও দূরে ভ্রমণ করেন, শুইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন—এই বাক্যগুলি একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। যিনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ, মায়া গুণান্বিত তিনি মায়া গুণে চলেন, স্বরূপে চলেন না ইত্যাদি।

এই তিনটি অঙ্গের পরে আরও দুইটি অঙ্গ বলা হইয়াছে।

(৪) মৎকর্ম্ম পরায়ণ হও।

(৫) তোমার কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর।

∴ এই শেষ দুইটি—কর্ম্ম, আর প্রথম তিনটি—উপাসনা। ইহার মধ্যে নির্গুণ উপাসনাটি জ্ঞান। উপাসনা ও ভক্তি এক বল ক্ষতি নাই কিন্তু নির্গুণ-উপাসনা বলিলেই বুঝা যায় যাহাকে উপাসনা বা ভক্তি বল তাহাই জ্ঞান।

বেদে যেমন জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড, এই তিনটি প্রকাণ্ড কাণ্ড আছে গীতাও সেই তিনটিকেই দেখাইতেছেন। কর্ম্মগুলি না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না; উপাসনা না করিলে চঞ্চল মন ভগবৎরসে আপ্লুত

হইয়া শান্ত হয় না; মন ভগবৎরসে না ভিজিলে "আপনাতে আপনি" ভাবে স্থিতিলাভ কিছুতেই করিতে পারে না।

কর্ম্ম করিতে গেলেই নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে—যদি এই ভগবৎ আজ্ঞা পালন করিতে যাওয়া যায়, তবে কর্ম্ম করিতে গেলেই, উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনা করিতে গেলে অবলম্বন হইতে বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপ হইতে আপনাতে আপনি ভাবে স্থিতি হইবেই।

যিনি "আপনাতে আপনি" ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারেন—তাঁহার জন্য কর্ম্মও আবশ্যক নহে উপাসনাও আবশ্যক নহে। যিনি বিশ্বরূপ উপাসনা করিতে পারিতেছেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তু হউক না কেন, সেই বস্তু সুরূপ হউক বা কুরূপ হউক, মনুষ্য হউক বা পশু হউক, শত্রু হউক বা মিত্র হউক, বিষ্ঠা হউক বা চন্দন হউক, যিনি সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যকে দেখিয়া—সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখেন, ভেদাভেদ কিছুই দেখেন না, জগৎ যাঁহার নিকট সাক্ষী চৈতন্য, তিনি আবার অন্য কি অবলম্বন করিয়া অভ্যাসযোগ সাধনা করিবেন? যিনি বিশ্বরূপে গিয়াছেন তাঁহার অভ্যাসযোগে প্রয়োজন নাই। কিন্তু যিনি সর্ব্বত্র সেই বস্তুকে দেখিতে পান না বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি এই জ্ঞানে এখনও যিনি পৌঁছিতে পারেন নাই; যিনি সন্ন্যাসী হইয়াও নিজের দেহ রক্ষার জন্য মাংসাদি ভক্ষণরূপ হিংসাবৃত্তি রাখেন, যিনি অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রী করুণ এব চ হইতে পারেন নাই—যাঁহার হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ এখনও যায় নাই যিনি এখনও অন্যের অপেক্ষা করেন, যিনি ভিতরে বাহিরে এখনও শুচি হন নাই, যিনি এখনও সর্ব্বদা অনলস নহেন, বিশ্রাম এখনও যাঁহার দরকার হয়, সান্ধ্যভ্রমণ এখনও যাঁহার চাই, যিনি পক্ষপাতশূন্য উদাসীন এখনও নহেন, যিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী নহেন যিনি শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ সম এখনও হন নাই যিনি সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ এখনও হইতে পারেন নাই, যিনি তুল্য নিন্দা স্তুতিমৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ এখনও নহেন, যিনি এখনও অনিকেতঃ নহেন, তাঁহার জন্য এখনও অভ্যাসযোগ আবশ্যক। মূর্ত্তিপূজাই করুন বা জ্যোতির্ভাবনাই করুন—অথবা বিশ্বাসে যাহাই কেন না অবলম্বন করুন বা কোন গুণের পূজাই করুন তিনি সাকার উপাসক।

উপাসনাতে উঠিতে হইলে সকলের জন্যই কর্ম্ম আবশ্যক। তবে কি

এখানে ইহাই বলা হইল যে যিনি কর্ম্মমার্গে আছেন তিনি উপাসনা করিবেন না ? না, ইহা ভুল।

মৎকর্ম্মপরম হওয়ার অর্থ কর্ম্মদ্বারা তাঁহার উপাসনা—স্থূলস্থূলভাবে মন্দির মার্জ্জনা (দেহ মন্দিরও ধর্ত্তব্য) মালা গাঁথা, আরতি করা ইহা ত থাকিবেই। আবার কর্ম্মার্পণেও মনে মনে স্মরণরূপ উপাসনা ত আছেই। তবেই হইল কর্ম্ম ও উপাসনা সমকালেই করিতে হইবে—স্থূলে উপাসনা ও সূক্ষ্মে উপাসনা উভয়ই চাই ; জীব সেবাতেও উপাসনা চাই আবার মানসেও উপাসনা চাই । সমকালে এই গুলি হওয়া আবশ্যক। এই জন্য আর্য্য-জাতি নিত্যকর্ম্মগুলিকে তিন বেলার কার্য্য রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে যে যেমন অধিকারী তাহাকে সেইরূপ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন।

আমরা গীতা হইতে দেখাইতেছি আত্মা নির্গুণ। জীবাত্মাও নির্গুণ। পরমাত্মাও নির্গুণ। আত্মা সর্ব্বথা "আপনিই আপনি" তাঁহার সদৃশ অন্য কোন বস্তু নাই—তিনি অন্য কোন বস্তুতেও মিশ্রিত হন না। মহাভারতও এই কথা বলিতেছেন। বেদও এই কথা বলিতেছেন। এইটি ধ্রুবসত্য।

আত্মা নির্গুণ হইলেও তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারা তাঁহার গুণ সঙ্গ হয় ; তখন তিনি গুণবান মতন হয়েন।

এ কথা সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে নিতান্ত জড় অবস্থা আসি-লেও মানুষ বলিতে পারে—এখন তমোগুণ আসিয়াছে—তা আসুক, আমি গুণ নহি—আমি আপনিই আপনি, গুণের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। তবে বহু-কাল হইতে গুণের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আমি গুণের বশ হইয়া গিয়াছি। এই গুণবশ্যতা দূর করিবার জন্য আমাকে শক্তির উপাসনা করিতে হই-তেছে। প্রকৃতির হস্ত হইতে, মনের হস্ত হইতে, মুক্তিজন্য আমি কর্ম্ম ও উপাসনা করি।

মনকে রাগ দ্বেষ শূন্য করিবার জন্য আমি জগতের সমস্ত বস্তুর সহিত যে ক্ষণস্থায়িত্বদোষ জড়িত তাহাই আলোচনা করি ; সমস্তই নশ্বর—ইহা দেখিয়া দেখিয়া আমি সর্ব্ববস্তুতে আস্থাশূন্য হই—আরও প্রথম প্রথম আমি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা দ্বারা রাগ দ্বেষ জয় করিতে চেষ্টা করি। আবার মনের কামনা ত্যাগজন্য উপরোক্ত বহিরঙ্গ সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ প্রণব জপ লইয়া থাকি এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা আমি মনকে বশীভূত

করিয়া বিচার দ্বারা প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন ভাবনা করিয়া "আপনিই আপনি" ভাবে স্থিতিলাভ করিতে চাই। ইহার সহিত মনকে সরস করিবার জন্য উপাসনাও করি।

আমরা পুনঃ পুনঃ গীতার সম্পূর্ণ ধর্ম্ম আলোচনা করিতেছি—ইহার উদ্দেশ্য জগতে যে ধর্ম্মগুলি চলিতেছে তাহা এই গীতোক্ত ধর্ম্মের কোন্ অঙ্গ ইহা দেখাইবার জন্য? যদি কেহ আধুনিক কোন ভুলধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন—তাঁহার ভুল কোন স্থানে হইতেছে, অথবা সনাতনধর্ম্মের কোন অঙ্গকে যদি কেহ ভুল প্রমাণ করিতে চাহেন তাহাতেও তিনি নিজে কিরূপ ভ্রান্তির মধ্যে আছেন—আমাদের ধারণা গীতার সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বুঝিতে পারিলে উপরোক্ত ভ্রম সংশোধন করা যায়। তবে, যে গীতা সম্বন্ধে পাওয়া যায়—অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা—অথবা—

কৃষ্ণোজানাতি বৈসম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈথিলঃ॥

সেই গীতা আমরাই যে ঠিক বুঝিয়াছি এরূপ মনে করাও বাতুলতা মনে করি। আমরা প্রাণপণ করি বুঝিতে—এবং এইজন্যই বলিতেছি এই বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হইবে ততই সুধর্ম্মের প্রতি কুধর্ম্মের গাত্রবল অথবা সত্যধর্ম্মের প্রতি অপধর্ম্মের নিন্দা সকলেরই বোধগম্য হইবে—অন্ততঃ ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে কোন্‌টি সত্যধর্ম্ম কোন্‌টি অপধর্ম্ম বা গাত্রবলের ধর্ম্ম।

এতদ্বারা মন সংশয়শূন্য হইলে তবে ঠিক সাধনা করা যাইবে।

সাকার বাদ, নিরাকার বাদ, অবতার বাদ পুজাপদ্ধতি, উপস্থিত জগৎ উন্নত হইতেছে কি না, একবার মানুষ হইলে আবার সে পশু হইতে পারে কি না··ইত্যাদি মতের ভ্রান্তিগুলির মীমাংসা সহজেই করা যায়, যদি আমরা সম্পূর্ণ ধর্ম্মটি বুঝিতে পারি।

গীতা অন্ততঃ একটি সম্পূর্ণ ধর্ম্ম দেখাইতেছেন—আমরা যতই ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব ততই ব্যক্তিগত, জাতিগত, এমন কি সমগ্র মানবজাতির ইহাতে বিলক্ষণ উপকার হইবে। এই সমস্ত কারণে আমরা ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেছি।—

উপস্থিত সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার কোন্ অংশটী লইয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মকে গুণবান্ করিয়া কোথায় আছেন, খৃষ্টধর্ম্মাদি কোন্ কোন্ ভূমিকাতে আছেন, ইহাও সম্পূর্ণধর্ম্মালোচনায় সুন্দর করিয়া দেখান যাইতে পারে।

প্রকৃতি ও পুরুষ -শেষের কথা।

নির্জ্জন স্থান -রমণীয় স্থান। তুমি আমি মিলিয়াছি। এ মিলনে সমস্ত মধু—সমস্তই মধুময় হইয়া গিয়াছে।

মিলনই সুখ; প্রথমেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। বুঝিলেও মিলনের আশা প্রথমে ছিলনা। চেষ্টা করিতেছি—আশা পর্য্যন্ত অনুভবে আইসে না—আশা শূন্য বা শতসংশয়বিশিষ্ট চেষ্টা বড়ই ক্লেশকর। তার পরে কেমন সুযোগ হইতে লাগিল। আশা আসিতে লাগিল। মিলন হইবে। পাইব। আশা উৎফুল্ল করিতে লাগিল। চেষ্টায় আর কষ্ট হইল না। চেষ্টায় আনন্দ আসিল। বুঝিলাম শীঘ্র মিলন হইবে।

মিলন হইল। আর কোন চেষ্টা নাই। সব শান্ত হইয়া গিয়াছে। কি আনন্দ তাহা ত বলিতে পারি না।

এই যে সর্ব্বভাবনাশূন্য অবস্থা, সমস্ত চেষ্টা শূন্য অবস্থা, এই যে আনন্দ অবস্থা—এই যে আমরা নির্জ্জনে আপনাকে আপনি পাইয়াছি—এই যে এখানে আর দ্বিতীয় কিছুই নাই—শক্তি যেমন নিজের মলিন শক্তিগুলিকে অধঃকৃত করিয়া অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়া—পরম নির্ম্মলের নিকটে গমন করে—আমিও সেইরূপ তোমার কাছে আসিলাম; তুমিও সেইরূপ আমার কাছে আসিলে—এখন আমার কিছু বলিবার আছে। পূর্ণানন্দে ভাসিয়াও আমি যেন বুঝিতে চাই তুমি আমি কি? আমি একটি একটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিব।

কর। অনুরাগিনী স্ত্রীর নাম। অনুরাগ স্বামীর নাম। স্বামী স্ত্রীর কথা প্রকাশ করা গেল।

অনুরাগিনী—তুমি কি? আমি কি?

অনুরাগ—আমি পুরুষ তুমি প্রকৃতি। আমি ঈশ্বর তুমি ঈশ্বরী। আমি তোমাকে লইয়াই পুরুষ। তুমি আমাকে লইয়াই শুদ্ধসত্বগুণান্বিতা আমার প্রণয়িণী। আমরাই আদি দম্পতি।

অনুরাগিনী—তোমাকে যেমনটি পাইয়াছি—শুধুই প্রেমময়, শুধুই আনন্দময় এইটিই কি তোমার স্বরূপ?

অনুরাগ—অত্যন্ত প্রেম আমাতে আছে তাই না প্রেমময়, অত্যন্ত আনন্দ আমাতে আছে, অত্যন্ত জ্ঞান আমাতে আছে এই জন্যই না আমি আনন্দময়, অমি জ্ঞানময়।

আমার স্বরূপ কিন্তু এটি নয়। তোমার দ্বারাই আমার এই আনন্দময়, জ্ঞানময় প্রেমময় রূপ। মণির ঝলকের মত আমার ঝলক তুমি। তাই তুমিও আমার মত আনন্দময়ী, প্রেমময়ী, ঝলকের সহিত মণি—এই ঝলক জড়ান মণি—ইহাই আমার এখনকার আকার। আর তুমি মণি জড়ান ঝলক—আমি মাখা তুমি। আমি তরঙ্গ মাখা সাগর—আমি পুরুষ আর তুমি সাগর বক্ষে তরঙ্গ—তুমি প্রকৃতি। আমি চন্দ্রমা তুমি চন্দ্রিকা; আমি সূর্য্য তুমি দিধীতি; আমি অগ্নি তুমি দাহিকা শক্তি।

অনুরাগিনী—তোমার স্বরূপটি কি?

অনুরাগ—তোমাকে লইয়াই আমার রূপ। তোমাকে যখন আমাতে মিশাই তখন আমি "আপনি আপনি"। আমার স্বরূপ "আপনি আপনি"। আমার স্বরূপে সংযোগ বিয়োগ নাই, মিলন বিরহ নাই শুধু থাকে মিশ্রণ, শুধু থাকে "আপনি আপনি"।

অনুরাগিনী—তুমি "আপনি আপনি" হইলে আমার কি হয়?

অনুরাগ—তুমি থাক বা থাক না কেহই বলিতে পারে না। আমার সহিত মিশিয়া তুমি আমি হইয়াই থাক। আমিই থাকি। তোমাকে খুঁজিলে পাওয়া যায় না। তাই লোকে বলে তুমি নাই। কিন্তু স্বভাবতঃ আবার তুমি আমাতে উঠ তাই লোকে বলে আছ। তুমি অনির্ব্বচনীয়া।

অনুরাগিনী—আমি কি তবে তোমার স্বরূপ হইতে তোমাকে অন্যরূপ করি?

অনুরাগ—কর। তুমি হ্লাদিনী। শুধু আনন্দকে আনন্দময় কর। শুধু জ্ঞানকে জ্ঞানময় কর। নিরাকারকে আকারবান্ কর। নির্গুণকে সগুণ কর—পরমশান্তকে লীলাময় কর।

অনুরাগিনী—আমি কি তোমার বন্ধের কারণ?

অনুরাগ - না তুমি নও। হ্লাদিনী তুমি। তোমার স্পন্দন হয় আমার হৃদয় লইয়া। তোমার নৃত্য আমার দিকে। কিন্তু তোমার অঙ্গীভূতা তোমার লোহিত কৃষ্ণা আর দুই সতিনী আছে তাহারা আমাকে বদ্ধ করে মনে করে। যাহাকে বদ্ধ করে সে আমার ছায়া। তুমি ও আমাকে বদ্ধ কর কিন্তু সে বন্ধন তোমার আনন্দভরা দৃঢ় আলিঙ্গনে। আমিও সেই "আপনা আপনির' ছায়া তোমাতে।

অনুরাগিনী—আমি কি তবে সতিনী লইয়া ছিলাম।

অনুরাগ—ছিলে! এখনকার মিলন সুখে তোমার তাহা মনে নাই। আমি ছাড়িয়া দিলেই তোমাকে ক্লীব সংসারের সহিত জটিলা কুটিলা লইয়া থাকিতে হয়। সেই সংসারে থাকা তোমার অতিশয় ক্লেশ। তুমি আমাকে ছাড়িয়া বিশেষ কষ্ট পাও তাই আমি মধুর মুরলিধ্বনি করিয়া তোমায় ডাকি—তুমি নানা কৌশলে আমার সহিত মিলিবার জন্য আগমন কর।

তোমার সহিত মিলিয়া, আমি ও তুমিমিশিয়া, "আপনি আপনি" হইয়া থাকি।

"আপনিই আপনি" এইটি স্বরূপ। স্বভাবতঃ মণি হইতে যে ঝলক উঠে—উঠিবার পরে ঝলকযুক্ত মণিই পুরুষ, মণি আচ্ছাদনকারী ঝলকই প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষের খেলা লইয়া এই জগৎ। এখন প্রকৃতি পুরুষকে যাহা বলিতে হয়—বল।

অনুরাগিনী—আমাকে কোথায় রাখিতে তোমার ভাল লাগে?

অনুরাগ—হৃদয়ে রাখিলে রাসক্রীড়া, মাথায় রাখিলে "আপনি আপনি", হৃদয়ে রাখিলে মিলন—সহস্রারে রাখিলে ক্রমে মিশ্রণ। উভয়ই সুখ। আপনাতে আপনিও সুখ আবার ক্রীড়া করাতেও সুখ। তোমার সহিত তোমার মলিন সত্ত্বের যোগ হইলে—তুমি হও ঘোরা আমি হই বদ্ধ। আর তুমি যখন শুদ্ধসত্ত্ব, তখন আমি তোমার রূপে রূপবান হইয়া তোমার সহিত মিলনে বড় সুখী হই। তোমাকেও সুখী করি।

"আপনি আপনি" থাকিয়াও—নিজ শক্তি স্বরূপিনী যে তুমি তোমাকে পাইবার জন্য আমার আগ্রহ থাকে। আবার শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী তুমি, আমার জন্য তোমার অভিসার—ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ আর নাই।

অনুরাগিনী—অভিসার কেন?

অনুরাগ—সংসারেও জটিলা কুটিলা আছে বলিয়াই প্রেম এত মধুর। ইহাদিগকে ফাঁকি দিয়া তুমি আমার কাছে এস—আসিয়া আবার যাইতে হয়—এই মিলন বিরহের খেলা সুন্দর। আবার শুধু বিরহও সুন্দর। কিন্তু চির বিরহ ভাল নহে।

জ্ঞানীর কাছে প্রকৃতি পুরুষ, ভক্তের কাছে রাধাকৃষ্ণ একই।

কয়েক বিশ্রাম।

প্রথম বিশ্রাম—শুভ সঙ্কল্প।

বর্ষারম্ভে একটি শুভ সঙ্কল্প, বর্ষ ধরিয়া অনুষ্ঠান করিবার জন্য জগন্মাত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে আসিলাম। মা অনন্ত শক্তিময়ি, ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি! ছন্দজননি! আমাকে সঙ্কল্পসিদ্ধি জন্য প্রাণপণ করিবার শক্তি দিতে হইবে। তুমি জগতের জননী। আমিত মা জগৎ ছাড়া নাই তবে তুমি আমারও জননী। আমি আর কার কাছে মা প্রার্থনা করিব?

আমি হতভাগ্য—আমার গর্ভধারিণী মা গত হইয়াছেন। আজ জগন্মাতাকে পূজা করিবার সাধ জাগিয়াছে। হায়! মা আমার যখন প্রত্যক্ষ ছিলেন তখন যদি এক দিনের জন্যও তাঁহাকে পূজা করিয়া রাখিতাম—যদি তাঁহাকে নিরক্ষর বলিয়া অবজ্ঞা না করিয়া, তাঁহার পূজাতে তাঁহার সেবাতে লজ্জা বোধ না করিয়া, সুন্দর খাদ্য, সুন্দর বস্ত্র শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিতাম আর মা আমার প্রসন্ন হইয়া তাহাই হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিতেন তবে আজ আমার এই পূজা সহজ হইত। মা আমি আজ পবিত্র হইয়া সঙ্কল্পে সেই পূজা করিলাম তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও। আমার শত অপরাধ হইয়া গিয়াছে তুমি আজ আমার হইয়া তোমার স্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দদায়িনীর কাছে আমার অপরাধের ক্ষমা চাহিও। আমি আমার উভয় মাতার শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি—আর যদি কেহ আমার মত হতভাগ্য হইতে ইচ্ছা না করেন তবে মা জীবিতা থাকিতে থাকিতে যেন সকল লজ্জা ত্যাগ করিয়া

এ সাধ মিটাইয়া রাখেন। সন্তানের এত অধিক মঙ্গল আর কিছুতেই হয় না।

মা কি? একটু বুঝিলেই এই মাতৃপূজায় কাহারও আপত্তি থাকে না। প্রথমেই বলি মাত! এমন কৃতঘ্ন কে আছে মা! যে তোমায় স্মরণ করা অনাবশ্যক মনে করে, এমন জঘন্য কে আছে মা! যে তোমার উদ্দেশে কিছু করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে?

কি তুমি—তোমার পূজায় জগদম্বার পূজা কিরূপে হয় এ কথা তুমিই বুঝাইয়া দাও।

মা যাহাকে বলে সেইটি নিত্য। চিরদিন ছিল, আছে, থাকিবে। যিনি রক্ষা করেন তিনিই মা। যিনি লালন পালন করিয়া এই জগৎকে রক্ষা করিতেছেন তিনি জগতের মা, আর যিনি নিজ শরীরের রক্ত দিয়া আমার শরীর গঠনের সহায়তা করিয়াছিলেন, যিনি নিজে আহার বিহারে অনাস্থা দেখাইয়া রোগকালে, অসহায় অবস্থায় আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি নিজে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আমায় স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তিনিই মা। আবার বলি—যিনি এই মাতার জন্য কিছু করা অনাবশ্যক মনে করেন তাঁহার মত কৃতঘ্ন আর কে আছে? তাহার মত পাপী আর কে আছে? বিদ্বান যদি মাতৃভক্ত না হয়েন তাঁহার বিদ্যাকে ধিক্। যদি বুদ্ধিমান মাতার গুণ গান করিতে লজ্জা বোধ করেন—মাতার সেবা সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিতে ত্রুটি করেন তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিকে ধিক্।

আত্মা রসময়। ত্রিভুবনস্থ জল, গব্যদুগ্ধাদি, সমুদ্র জাত লবণাদির অন্তরে যিনি রসরূপে অনুভূত হয়েন তিনিই আত্মা। যিনি রসরূপে পৃথিবীকে পুষ্ট করিতেছেন তিনি জগতের আত্মা, তিনিই জগতের জননী। যিনি স্তন্যরস দিয়া শিশুকে রক্ষা করেন বা রক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই শিশুর মাতা। জগন্মাতাই এই মাতা। রস দিয়া আর কেহই রক্ষা করেন না, মাতা ভিন্ন। এই মাতাই অন্নের মধ্যে রসরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুধা নিবারণ করেন জলের মধ্যে রসরূপে থাকিয়া পিপাসা দূর করেন। মাতৃসেবায় মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে অনন্ত শক্তিময়ী জগজ্জননীই মাতৃমুখে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া রমণীয় দর্শন সেই মঙ্গলময়ের পরম পদে স্থিতি দিয়া, জীবকে সংসার সাগর পার করিয়া দিয়া থাকেন। মাতার আশীর্ব্বাদেই সন্তানের দুরিত ক্ষয়

হয়, মঙ্গল সাধিত হয়। মাতাই জীবকে মা নাম উচ্চারণ করাইয়া রক্ষা করেন। তাই পশু পক্ষীও মা নাম উচ্চারণ করে। মাই আপনার মা নাম জীবের মুখ দিয়া আপনি গান করেন এবং গান করিয়াই ত্রাণ করেন, তাই মার নাম গায়ত্রী।

তাই মা বর্ষারম্ভে বর্ষ ভরিয়া নিরন্তর চেষ্টা করিবার জন্য তোমার কাছে একটা প্রার্থনা করিতেছি। মা সর্ব্বমঙ্গলা! আমাদের মঙ্গল কর, জগতের মঙ্গল কর।

দ্বিতীয় বিশ্রাম—জগতের দুঃখ।

"কিসে লোকের দুঃখ দূর হইবে?"

যাহাতে তোমার দূর হয়, তাহাতেই।

"কিসে আমার দুঃখ যাইবে?"

তুমি যাহা, তাহা থাকিলেই তোমার দুঃখ যায়।

"আমি কি? আমি যাহা, তাহাতে কি আমি নাই?

না, তাহাতে নাই বলিয়াই তোমার দুঃখ।

'আমি কি, কে আমায় বুঝাইয়া দিবে?" শুন। বেদপ্রমুখ শাস্ত্র সকল মানুষকে ডাকিয়া সগর্ব্বে ডঙ্কানিনাদ করিতে করিতে বলিতেছেন—মনুষ্য তুমি যে জাতি হও, যে বর্ণ হও, যাহাই হওনা কেন, তুমি আমার প্রদর্শিত পথ ধরিয়া অনুভব কর—

"আমি দেহ নহি, আমি আত্মা। আত্মার দুঃখ নাই, আত্মার রোগ নাই, শোক নাই, মরণ নাই, মরণ ভীতি নাই। আমার সংসার ক্লেশ নাই, আমার কোন প্রকার দুঃখ নাই, আমি নিত্য, আমি আনন্দ স্বরূপ, আমি জ্ঞান স্বরূপ।"

আমি নিত্য আনন্দ স্বরূপ আত্মা, আমার দুঃখ নাই, ভয় নাই, মরণ নাই, ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত। আমি দেহ নই, আমিই আত্মা। আমি জড় নই, আমি চেতন। আবার বলি, বেদ সগর্ব্বে বলিতেছেন—চেতনের কোন দুঃখ নাই, কোন আধি ব্যাধি নাই। মানুষ তুমি যাহাতে পার এই সত্য বেদ বাক্য অনুভব কর—তোমার কোনরূপ দুঃখ থাকিবে না। তোমার সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি হইবে—তোমার পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। ইহাই জীবের একমাত্র করণীয় কার্য্য। এই লক্ষ্য সিদ্ধি করিবার জন্য যাহা করিতে হয় কর—ইহার জন্য দেহ রক্ষা কর, সংসার কর, রাজ্যপালন কর, অর্থ উপায় কর, ইহা বাদ দিয়া

যাহাই কেন কর না তাহাতেই তুমি পাপী। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর, ভক্তি কর, যোগ কর। যাহা কেন উপায় কর না তাহাই তুমি, "আমি চেতন, আমি জড় নহি" ইহার অনুভব জন্য কর। যতদিন "আমিই আত্মা, আমিই ব্যাপক" ইহা নিশ্চিত অনুভূত না হইবে ততদিন তোমার ভয় আর কিছুতেই যাইবে না। ভগবানের নিকটে গিয়াও যদি এই জ্ঞান তোমার লাভ না হয় তবে তোমার পতন হইবে, তুমি নিত্য ভগবৎ সেবা করিতে পারিবে না।

বেদ এই সত্য প্রচার করিতেছেন "আমি আত্মা, আমি দেহ নই" এই সত্য যদি কেহ পার খণ্ডন কর—করিয়া বেদ মিথ্যা কর।

মা এই বর্ষারম্ভে আমার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিজন্য তুমি আমার এই আত্মজ্ঞান লাভে সদা উদ্যোগী করিয়া দাও। আমি যেন "আমি চেতন, আমি জড় নাহি" এই তত্ত্ব অনুভবজন্য জপ. ধ্যান, আত্মবিচার লইয়াই সর্ব্বদা থাকিতে পারি। এই আত্মতত্ত্বলাভজন্য যেন জপকালে সর্ব্বদা তোমায় প্রার্থনা করিতে পারি। ইহা যতটুকু পারিব ততটুকু উৎসবই যেন আমার হয়। ইহা ভিন্ন অন্য কিছুর জন্য যেন আমার উৎসব না হয়।

তৃতীয় বিশ্রাম—যুক্তি।

"আমি চেতন, আমি জড় নহি।" দুঃখ যাহা কিছু তাহাই জড়ে "অহং" অভিমান করা হয় বলিয়া—এই চৈতন্যতত্ত্ব বুঝিবার যুক্তি কি ?

শাস্ত্র নানা কথা বলিয়াছেন সত্য কিন্তু এই মূল কথা কখনও ছাড়িতে-ছেন না। এই অংশে সর্ব্ব শাস্ত্রের সমন্বয় আছে।

যখন জিজ্ঞাসা করি কি হইলে আমার হয় ? যদি উত্তরে বলি ভগবান পাইলে, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে নিরন্তর ভগবান লইয়াই থাকা যাইবে ত ? আর এই থাকাই বা কিরূপে সম্ভবে ? অবশ্য এই স্থূলদেহ লইয়া কেহ ভগবানে নিত্য থাকিতে পারেন না। অমরের কাছে থাকিতে হইলে অমর হইয়া থাকিতে হয়। আত্মা ভিন্ন অমর আর কিছুই নাই। আমিই আত্মা ইহা অনুভব করিয়া, দেহ আত্মা নহে—ইহা অনুভব করিয়া, দেহাত্মবোধ ত্যাগে তবে নিত্য ভগবৎসঙ্গ হইবে। ইহাই মুক্তি। আত্মজ্ঞান ভিন্ন প্রকৃত প্রেম নাই—আত্মজ্ঞানী ভিন্ন যিনি প্রেমের অভিনয় করেন তিনি প্রেমিক নহেন, তিনি কামুক।

যখন এই আত্মতত্ত্ব বিচারের উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে তখন একবার শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আলোচনা করায় দোষ কি ?

ধর্ম্ম ভিন্ন যখন সুখ নাই, তখন যাহা করা উচিত তাহা বুঝিয়া করাই কর্ত্তব্য।

আমি দেহ নহি, আমি আত্মা। দেহ যাহা দেখিতেছি তাহা এক বস্তু আর আত্মা আর এক বস্তু। একটি স্থূল জড়, অন্যটি সূক্ষ্ম জ্ঞানময়। জড়ের সহিত চেতনের কোন সম্বন্ধ নাই—এইটুকু শাস্ত্র যুক্তিতে বুঝিতে হইবে।

ভগবান বশিষ্ঠ বলেন—সজাতীয় পদার্থের একীভাবকে সম্বন্ধ বলে। অ-সজাতীয় জড় ও চেতনের কোন সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ সমান সমান বস্তুরই হইয়া থাকে। সকলেই অনুভব করিয়া ইহা স্পষ্ট দেখেন। দেহ যাহাকে বলি, জড় যাহাকে বলি, তাহা অবিদ্যা। অবিদ্যা ও আত্মতত্ত্ব সমান বস্তু নহে। অবিদ্যার সহিত আত্মতত্ত্বের, দেহের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই।

যদি বল দেহ ও আত্মা সমান পদার্থ না হইলেও একটা সম্বন্ধ ত দেখিতেছি—তবে হয় বল দেহই আত্মা নয় বল আত্মাই দেহ। আত্মাটা দেহ—যেমন চূণ ও খয়ের একত্র করিলে একটা নূতন রং হয় সেইরূপ দেহের বস্তুগুলি এক সঙ্গে মিশিয়া যাহা হইয়াছে, তাহাই আত্মা—যদি ইহা বল, তবে অবিচার করিয়া ইহা বলিতে পাইবে না। বিচার কর।

এক সময়ে এ দেহটা ছিল না—দেহ যখন ছিল না তখন আত্মাও ছিল না ইহা তোমার মত।

আবার মৃত্যুর পরে যখন দেহটা পুড়াইয়া ফেলিবে তখন দেহের চূণ খয়ের পৃথক হইয়া যাইবে, কাজেই আত্মাও থাকিবে না।

যতদিন তবে দেহ থাকিবে, ততদিন ধরিয়া যাহাতে এটার তৃপ্তি দিতে পার, তাহাই কর। চুরি করিয়া তৃপ্তি হয়, তাহাই কর—সুন্দরী পরস্ত্রী দেখিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই কর—ধন পাইলে সুখী হও, তাহাই পাও—কাহারও ভাল জিনিষ দেখিলে তোমার উহা লইতে ইচ্ছা করে, লও। সকলেই ইহা করুক—এক স্ত্রীর জন্য সকলে মারামারি করুক—পৃথিবীর ধন রত্নজন্য সকলে মারামারি করুক—তবে তুমি কোন্ রাজ্যে উপনীত হইলে ? যাহার বল বেশী, সেই বেশী ভোগ করিবে ? ইহা ত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু

দুর্ব্বল ও যে ভোগ করিতে চায়—সেও যে নিজের সুখের জন্য যখন বলে পারে না তখন চুরি করিয়া কৌশলে তোমাকে বঞ্চিত করিতে চায়। যখন তাহাও না পারে তখন নিরন্তর "তুমি মর তুমি জাহান্নবে যাও" এই বলে। আবার তুমি একটু অসাবধান হইলে বহু দুর্ব্বল সমবেত হইয়া যুক্তি করিয়া তোমায় বিষ প্রদান করিতে পারে, তুমি যেখানে চলা ফেরা কর সেখানে সর্প ছাড়িয়া দিতে পারে, তুমি যে জল পান করিবে তাহাতে বিষ মিশাইয়া দিতে পারে। তুমি যে স্ত্রীদেহ ভোগ করিতে চাও সেই স্ত্রী তোমাকে চায় না অন্য একজনকে না না পাইলে তাহার তৃপ্তি হয় না। তুমি যাহাকে বিশ্বাস কর সে তোমারে সংহার কবিতে চায়—তোমার ভোগদ্বারা, কিছু তোমার দাস দাসীর তৃপ্তি হয় না, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তুমি গাড়ী ঘোড়া যদি চড়, তাহারাও তোমাকে ফাঁকি দিতে পারে, কৌশল করিয়া তোমার প্রাণসংহার করিতে পারে—দেহটা গেলেই ত সব ফুরাইয়া গেল। কাহারও প্রাণ সংহার করিলে আর পাপ কি? যখন এইরূপ রাজ্যে তুমি বাস কর তখম সে কিসের রাজ্য? বল দেখি এই দৈত্যরাজ্যে, এই শয়তানের রাজ্যে, এই সন্দেহের রাজ্যে, এই দেহাত্ম-বাদীর রাজ্যে, তুমি দেহের সুখ চাহিয়া কি হইলে? যদি দেহের সংযোগে আত্মা হইয়াছে মান তবে পাপ পুণ্য আবার কি? ভয় আবার কি? গরু যখন যাহার বাগানে যাইবে, তাহাই খাইবে। সিংহ ব্যাঘ্র আজ না "তুমি মারিবে" এই ভয়ে তোমায় খাইতে আসিতে পারে না? তোমার দাস দাসী, স্ত্রী পুত্র তোমায় যে বিষ দেয় না ইহা কিসের ভয়ে? বিষ দিয়া ধরা পড়িলে না হয় মরিল তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু না ধরা পড়িতে যাহাতে পারে সেই কৌশল সে অ শ্য করিবে কেননা তাহার প্রাণ যাহা চায় তুমি তাহাকে তাহা করিতে দাও না। কাজেই তুমি সকলের শত্রু। দেহাত্মবাদী জগতকে শয়তানের জগত করে। যদি বল জগৎ বাস্তবিক শয়তানেরই জগৎ। এখানে ধর্ম্ম ঈশ্বর ইত্যাদি চতুর লোকের ভয় দেখাইয়া কাজ হাসিল করিবার কৌশলমাত্র। যদি এই বল তবে রাজার প্রজা শাসন, স্বামীর স্ত্রী শাসন ইত্যাদি বিষম ফল উৎপন্ন করিবে। সকলেই দেহের সুখ সচ্ছন্দতা যখন চায় তখন শঠ লম্পট ইত্যাদি ভিন্ন জগতে কিছুই থাকিবে না। কেননা শুধু বলে যদি কার্য্য হইত তাহা হইলে কথা ছিল না। পশুরাও ইহা পারে না তাহারাও দলবদ্ধ হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ভগবান আবার কে—যাহার জোর আছে যাহার কৌশল

আছে—সেই শ্রেষ্ঠ। এরূপ শ্রেষ্ঠও কিন্তু স্ত্রী পুত্রের সঙ্গেও সংশয়ে থাকে। বল তাহার ভোগ কিরূপ? বল এই জগৎ তখন নরক নয় কি?

যখন চুন খয়ের বিচ্ছেদ হয় তখনকার যুক্তি ধরিয়া দেখা গেল তোমার এই জগৎ নরক।

আরও একদিক আছে। যখন দেহটা জন্মে তখনকার কথা বিচার কর। দেহের সমস্ত বস্তু ত একবারে গড়া হয় না অল্পে অল্পে দেহটা বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয়। আত্মাটা তবে কোন সময়ে জন্মে? চুন খয়েরের যোগটা কখন হয়? যদি বল মাতৃগর্ভেই এটা হয় তবে সকল শিশু একরূপ কার্য্য করেনা কেন? কেহ ভোগ চায় কেহ ভোগ চায় না! কেহ লাল ভালবাসে কেহ সাদা ভালবাসে। এরূপ হইবে কেন? যদি বল পিতামাতার সংস্কারবশে হয়—ইহাও বলিতে পার না কারণ অনেক পিতামাতার একরূপ রুচি আবার তাহাদের পুত্রকন্যার অন্যরূপ রুচি। একই প্রকার চুন খয়েরের যোগে বিভিন্ন রং হইবে কিরূপে? বিভিন্ন মনোবৃত্তি কিরূপে আসিবে? চুন ও খয়ের যোগে কেহ সুন্দর কেহ কুৎসিৎ, কেহ কাল, কেহ গোরা, কেহ স্ত্রী, কেহ পুরুষ কেন হইবে? আমরা দেহাত্মবাদী নাস্তিকের কথা কেন আলোচনা করিলাম জানি না। বোধ হয় মন যে আত্মার কথা না ভাবিয়া দেহের সুখের ফিকিরে ঘুরিয়া বেড়ায় তাই মনটাকে তিরস্কার করিবার জন্য ইহা চিন্তা করিলাম। রে বিষয়াসক্ত মন— তোমার সমস্ত যুক্তিই অসার। তুমি যে বিষয় ভোগের জন্য আমায় পরামর্শ দাও তুমি যে সর্ব্বদা দেহ চিন্তা, অর্থ চিন্তা—অর্থোপার্জ্জনের ফিকির আমায় করিতে বল, তোমার এই সমস্ত উপদেশ শয়তানের উপদেশ মাত্র। দেহ তুমিই শয়তান—আমি তোমার ভোগের জন্য কিছুই করিতে ইচ্ছা করিনা—আমি সংসারের লোকের দেহের সুখের জন্য কিছুই করিব না—পুত্র কন্যার দেহ মরে মরুক—এ দেহ রক্ষার জন্য আমি কুপথে যাইতে পারিবনা। আমি আত্মা আমি দেহ নহি ইহাই বুঝিতে চাই, ইহাই পুত্র কন্যাকে বুঝাইতে চাই। ইহাই একমাত্র প্রচারের বস্তু। যদি তাহারা ইহা না বুঝিতে চায় তাহাদের উপর আমার কোন দায়িত্ব নাই। আমি ইহাদিগকে দূরে ফেলিয়া আত্মাই ব্যাপক, আত্মাই অজর অমর, আত্মার কোন দুঃখ নাই, আত্মার সংসার নাই, যেখানে ইহা জানিতে পারিব সেখানে ইহা যাইব। যে কার্য্যদ্বারা ইহা পাইব তাহাই করিব। ইহাই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির পথ ইহাই মুক্তির পথ। ইহা ছাড়িয়া শুধু

দেহ রক্ষার জন্য আমি কিছুই করিবনা। দেহ রক্ষা করিব কেন? যদি আত্মাকে জানিতে হইবে কেবল ইহার জন্য দেহ রক্ষা করিতে হয়, আবার দেহ রক্ষার জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা পারি সত্য কিন্তু আত্মাকে জানিতে হইবে এ লক্ষ্য বাদ দিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া খাই দাই থাকি ভাল এ শয়তানিত্ব. এ পশুত্ব আমি করিব না, কাহাকেও করিতে অনুরোধ করি না—যে এরূপ করে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাই। যদি স্ত্রীপুত্র এপথে না যায় তাহাদের সহিত আমার কোন প্রয়োজন নাই, যদি কেহই ইহা না করে, তবে কাহাকেও আমার প্রয়োজন নাই, সেই আমার ভাল। পুত্র কন্যা খাইতে পাইবে না এ দুর্ব্বলতা দেখাইয়া আমি অনন্ত নরকে ডুবিব না। হরি! হরি! বিচার করিয়াই আর্য্যঋষি ধর্ম্মের জন্য সংসার করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন—এই ব্রহ্মচর্য্য যে পালন করে নাই তাহার বিবাহে অধিকার নাই বলিয়া গিয়াছিলেন, সহধর্ম্মিনী যদি না হইল সে স্ত্রীতে প্রয়োজন নাই বলিয়া গিয়াছিলেন, পুত্র যদি ধার্ম্মিক না হইল সে পুত্রের জীবন মরণ পশুর জীবন মরণ তুল্য। ধর্ম্ম শূন্য স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণ জন্য আমি কিছুতেই দায়ী নই—এরূপ সংসার করাতে আমার নরক হইবে! এ সংসার ত্যাগই আমার উচিত। দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিয়া অনন্ত নরক ভোগ করা কিছুই নহে। তোমার পুত্র কন্যা না খাইয়া মরিয়া যাইবে তোমার দয়া হওয়া উচিত? কেন একটা কুকুর বিড়াল না খাইয়া মরিয়া যায় ইহাতে দয়া না হয় কেন? যদি স্ত্রীপুত্রের ধার্ম্মিক হইবার আশা না থাকে তবে তাহারা কষ্ট পাইয়া মরাও যা, শৃগাল কুক্কুরের না খাইতে পাইয়া মরাও তাই। দেহাত্মবাদ বিচার করিতে গিয়া আমরা মনের দুর্ব্বলতা মনের অবিচারে, আমার কি অনিষ্ট হয় তাহাই দেখিলাম।

দেখা গেল চুন খয়েরের যোগ মত একটু বস্তু আত্মা নহে। দেহের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। যদি দেহাত্মার একত্রাবস্থান দেখিয়া কোন সম্বন্ধ আছে বলিতে চাও তবে বল দেহটা বাস্তবিক অবিদ্যা মাত্র। ইহা নাই। শুধু দেহ কেন জগতের নিখিল বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ। জড়ত্ব বলিয়া কিছুই নাই সমস্তই চেতন।

যদি বলা যায় সবই যদি চেতন তবে কাষ্ঠ পাষাণাদি অনুভব হয় কেন?

অবিদ্যাবশে ইহা হইতেছে। কিন্তু তত্ত্ব কথা ধারণা করিয়া, জড় যাহা দেখিতেছ, তাহা বাস্তবিক জড় নহে, তাহা চেতন, ইহা স্বীকার কর, সমস্তই চেতন

বলিয়া অনুভূত হইবে। যেমন সমস্তই জড় ইহা স্বীকার কর বলিয়া আত্মাটাকেও দেহ প্রমাণ করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ কর—সেইরূপ অসত্য দেহাত্মবাদ ত্যাগ করিয়া—সত্য কথা, বেদের কথা, সমস্তই চেতন, ইহা স্বীকার কর "ঈশাবাস্য মিদংসর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—ইচ্ছা কর, অনন্ত সুখলাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

কিরূপে সমস্ত চৈতন্য অনুভূত হইবে দেখ? যাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে সেই একজাতীয়ত্বই অনুভবের কারণ। জিহ্বার সহিত আস্বাদ্য বস্তুর যোগ হইলে যে অনুভবটা হয়, তাহার কারণ, জিহ্বার রস ও আস্বাদ্য বস্তুর রসের এক জাতিয়ত্ব। উহারা সদৃশবস্তু। অথচ জিহ্বা একরূপ দেখিতে এবং মিষ্টান্ন অন্যরূপ দেখিতে। কেবল রস অংশে ইহাদের সাদৃশ্য। দুইই এক। সেইরূপ আত্মা যখন জড় পাষাণাদি অনুভব করেন, তখন কাষ্ঠ পাষাণের নামরূপ যাহাই কেন অবিদ্যা দেখাক্ না, কাষ্ঠ পাষাণাদি জড় পদার্থ নহে, একমাত্র আত্মাই, একমাত্রই চিৎই, কাষ্ঠ পাষাণাদিরূপিণী। ইহার অনুভব হইতে পারে। ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে দৃঢ় কর। সমস্তই চেতন জড় নাই। সমস্তই যদি চেতন না হইত, সদৃশ বস্তু না হইলে অনুভব হইত না। চৈতন্যের সহিত জড় এক হইয়াও অবিদ্যা দ্রষ্টাদৃশ্যরূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে। অবিদ্যাই এই ভ্রমের কারণ। তুমি পুনঃ পুনঃ একদিকে সমস্তই চেতন ইহা অভ্যাস কর, অন্যদিকে আত্মা ব্যাপক ইহা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন কর। জ্ঞান যজ্ঞ জন্য, দ্রব্য যজ্ঞ কর, তুমিই আত্মা ইহা অনুভব করিয়া মুক্ত হইবে।

শ্রীরাধা।

(১)

কি এক পুরাতন যেন নূতন হইয়া আসিল। যখন প্রথম বয়সে ধরিতে ছুটিয়াছি তখনও আনন্দ ছিল, এখনও তাই। তবে সে আনন্দে যেন রিপুর স্পন্দন ছিল, এ আনন্দ যেন নির্ম্মল, শুধু চক্ষে জল আসে। মেঘ দেখিয়া চক্ষু স্থির হইয়া থাকে, জল দেখিয়া পলক পড়ে না, গাছে গাছে নূতন পাতা দেখিয়া মনে হয় কার গায়ের রং মাখান। বাহিরে যাই। বন দেখিলে মনে

হয় যেন কে সেথায় অপেক্ষা করিতেছে। জল দেখিলে মনে হয় যেন কে বলিতেছে "আনা জল ঢেলে ঢেলে আর কতই বা যাব মা।"

কি এই ইচ্ছা? এ যে ব্রজের রস।

"ব্রজ রস গাইতে উপজই আশ"। ভক্ত, কবি—ইঁহাদের এই আশা হইতে পারে। আমার কি আছে? আমার এ কেন? তাঁহারাই বলেন "গিরিবর শৃঙ্গ, পঙ্গু কিয়ে লঙ্ঘব, মূক কহব কিয়ে ভাষ'। পঙ্গু কি গিরি লঙ্ঘন করিবে—মূক কি কথা কহিবে? কেন এই বাসনা? কে এই বাসনা জাগাইল? কে জাগাইল? তুমি কি? যদি তুমি জাগাইয়া থাক তবে অসম্ভব কি আছে? তোমার বন্দনাকালে যে বলা হয়—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপ ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব॥

যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করায়, সেই পরম সুখ স্বরূপ শ্রীমাধবকে আমি বন্দনা করি। তোমায় বন্দনা করি। কিন্তু এ বাসনা কি তুমি জাগাইলে? আমার কি ইহার আস্বাদন হইবে? যাঁরা সাধক, যাঁরা ভক্ত, তাঁহারাও যে বলেন—

করঁহু পসারি কি বামন পরশব
গান সুধারস ধামা।
মোহন মৃদু মধু পিকহুঁ রবামৃত
শুনইতে বধিরক কামা॥

হাত বাড়াইয়া কি বামন আকাশের সুধারসের ধাম চন্দ্রমা স্পর্শ করিবে? না বধির মধুর কোকিলার বরামৃত শুনিতে অভিলাষ করিবে?—যাঁহারা ভাল লোক তাঁহারাও যে এইরূপ বলেন? আমি কি বলিব?

তবুও যে আশা নিবৃত্তি হয় না। আগেও ত রূপ বর্ণনা দেখিয়াছি কিন্তু এমন ত হয় নাই। যাহা ভক্তের পরাণ পুতুলি, তাহাকে ত আমার প্রাণের রূপ বলিয়া ভাবিতে পারি নাই।

প্রাণ ত বড়ই প্রিয়। প্রাণকে ত ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। ইহা ত কিছুতেই যাইতে যেন চায় না। সবই ত ছিল—সবই ত গিয়াছে—ইহাও ত সেই সময়ে লুটাইয়া লুটাইয়া কত কাঁদিয়াছে—কিন্তু তথাপি ভাঙ্গিয়া যায় নাই—যেন কার

আশায় এই দেহপিঞ্জরে এখনও আছে। যেন কি দেখিবার জন্য সব গেলেও এ অপেক্ষা করিতেছে। এই দেখিবার জন্য কি ?

ভাব নাই, ভাষাও নাই, নিজে দেখিতেও পারে না—যাঁ'রা তোমার কৃপা-পাত্র তাঁ'রা যেমন দেখিয়াছেন, সেই দেখিয়া প্রাণের মধুময় মূরতি দেখিতে ইচ্ছা করে—সেই কিসে গড়া মূর্ত্তি, সেই শুধুই সুধাময় গলে বনমালা—সেই ভক্ত-রসিক-হৃদয়-কমলের মকরন্দ পানে, মনোহর হাস মৃদুমন্দ—আমি কি বলিব। আমি প্রণাম করি।

(২)

গলদেশে দোলায়মান মতিমালা স্তনমণ্ডলের নিম্ন পর্য্যন্ত আসিয়াছে। "রাধে উরজাঞ্চল আলম্বিত মোতিম মনিমালে। হেমর তিলফুল নাসা। আধচন্দ্র-বনি বেশর। তনুর লাবণ্য যেন দামিনী। ভক্তের বর্ণনা ধরিয়াও ভিতরে যা'র আভাষ পাই তাহা যেন আঁকিতে পারি না। পামর জনে ইহা পারিবে কেন ?

দৃষ্টি ! চপল চমরির চকিত দৃষ্টি মত, বলা ত হয় না।

মসিভঞ্জন শশি গঞ্জন, খঞ্জন যুত মুখ রঞ্জন
বচনামৃত অলি গুঞ্জন কর কমল রসালে।

অবজনাল-ভুজ-দামিনী—হইল না। বলা গেল না। মহাজনের বাক্যেও পামরের হৃদয় ফুটিল না। তবুও বলিতে ইচ্ছা হয়।

আঁখি শ্যামদরশনে ব্যাকুল, গুণে মন ভোর; সকল ইন্দ্রিয় লইয়া কৃষ্ণানুরাগিনী—দেখিতে কেমন হয় ?

কৃষ্ণানুরাগই প্রিয় দরশন। এই অনুরাগই নাগর। ইহাকেই বলা হইতেছে—

শুন বর নাগর কান।
তুরিতহি বেশ, বনাহ যতন করি
যামিনী ভেল অবসান॥
অনুরাগ আঁচরে রাই মুখ মুছই
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি
অলকা তিলক দেই সিঁথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি—

সিন্দুর দেয়ল সী঺থে
কতহুঁ যতন করি উর পর লেখই
মৃগমদ চিত্রক পাঁতে।
মণিময় নুপুর চরণে পরায়ল
উর পর দেয়লি হার।
নয়নহি অঞ্জন ক ল সুরঞ্জন—ইত্যাদি
অনুরাগের মূর্ত্তির কাছে অনুরাগের মূর্ত্তি বিদায় চাহিল—
দেহ বিদায়, মন্দিরে হাম যাওব
নিশাকর করল পয়ান।
কানুক চিত থির করি সুন্দরী
কুঞ্জসে গমনহি কেল।

এই মূর্ত্তি কেমন? কি যেন মনে জাগিতেছে—প্রকাশ করা যাইতেছে না—কি করিব?

এ চেষ্টা বৃথা। চরণ কমল তলে, যাবক লেখই—আমি বন্দনা করিলাম। কৃষ্ণ দরশনে উন্মাদিনী প্রাণের মূর্ত্তিকে, কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠা স্ফুটিত রসের মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলাম।

আপনি আচরণ করিয়া যাহা শিখাইল তাই ধরিয়া পশ্চাৎ অনুসরণে বাসনা। সর্ব্বত্র যেন তাঁরই অনুসরণ করিতে এখানে ওখানে যাইতেছি।

যখন বসন্তে বাসন্তী বৃক্ষে বৃক্ষে কত বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত করে, তখন মনে হয় কে যেন কি এক অনুরাগে সর্ব্বত্র পুষ্পচয়ন করিতেছে—যেন মালা গাঁথিয়া কাহাকে পরাইবে, যেন তাহার জন্য আপনিও পরিবে যখন "ঘন আঁধিয়ারে রজনী জনি কাজর গরজত বরখত মেহ" এই সময় যেন কে হরি অভিসারে গমন করে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ হইবে কি? নিয়তই প্রণাম করি এই সাধ।

শ্রী আমি—

নির্ভরতা।

সকল কার্য্যেই তোমার সাহায্য ভিন্ন আমার মঙ্গল আর কিছুতেই হইবে না। আমি পরিশ্রম করিতে বিমুখ নই। কিন্তু যেরূপ ভাবে কার্য্য করিলে নিষ্পত্তি হয় আমি সে কর্ম্মকৌশল জানি না। আহার বিহারের নিয়ম, স্নানের নিয়ম, নিদ্রার নিয়ম, ইহাতেও আমাকে তোমার আশ্রয় লইতে হয়। কোন দিন যদি অযুক্তাহার বিহার হইয়া যায়, তবে আমি স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারি না। আমি তোমার আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণপণ করিব। তুমি আমাকে আপনি কৌশল পূর্ব্বক কর্ম্ম করাইয়া লও। সন্ধ্যা বন্দনাদিতেও আমাকে কৌশলপূর্ব্বক কর্ম্ম করাইয়াও লও। আমি যে তোমারই আশ্রিত; আমি যে আপনি কিছুই পারি না; আমার যে বুদ্ধি নাই।

তাই প্রভাতে উঠিয়াই তোমাকে জানাই প্রভাত হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত যাহা করিব সেই সেই কর্ম্ম ফল তোমাতেই অর্পণ করিতেছি। যেন। তোমায় না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি একটি শ্বাস পর্য্যন্তও ত্যাগ বা গ্রহণ না করি আমি খাটিতে প্রস্তুত কিন্তু তুমি আমার দ্বারা তোমার কর্ম্ম নিষ্পত্তি করাইয়া লও।

বৈরাগ্য জ্ঞান উপরতি—বড় বড় কথা। শুনি—বৈরাগ্য কখন হয়? না যখন ভোগ্য পদার্থ হস্তগত হইলেও বাসনার উদয় না হয়—"বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য তদাবধিঃ।" আবার জ্ঞানের শেষ তখন যখন আর অহং ভাবের উদয় না হয়—"অহং ভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমাবধিঃ"। আর উপরতি? উপরতির শেষ তখন যখন চিত্তবৃত্তি শ্রীভগবানে লীন হইয়া আর উদয় না হয়—"লীন বৃত্তেরনুৎপত্তির্ম্মর্য্যাদোপরতেস্তু সা।"

এই সব বড় বড় কথা। আমি অধিকারী বা অনধিকারী জানি না। সন্ধ্যা বন্দন, জপ, প্রাণায়াম, আত্মবিচার, ধ্যান, ভক্তি, ইহাদের দ্বারা ক্রম অনুসারে মিশ্রপথেই চলিতেছি। তুমি শেষ করিয়া দাও। আর আমার কেহ নাই।

তুমি দুর্দ্দশায় পতিত হইবে ; স্বীয় অঙ্গের উপরও তোমার আধিপত্য থাকিবেনা। দেখা যায় শাস্ত্রমতে যত্ন করিয়া কোন পুরুষের পৃথিবীও দুর্ল্লভা নহে ; কিন্তু পুরুষকারশূন্য ব্যক্তির এক বিন্দু জলও দুর্ল্লভ। ইহা পুরুষকারেরই ব্যবহার ও অপব্যবহার।

রাম—অনন্তকোটিকল্পার্জ্জিত বলিয়া প্রাক্তনকর্ম্মও অনন্ত। অল্প অদ্যতন পুরুষকার দ্বারা তাহার জয় কি সম্ভব ?

বশিষ্ঠ—যদিও অনন্ত কর্ম্ম করা হইয়াছে কিন্তু তাহাদের মূল এক। কাজেই মূল বিনাশ করিলে সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হইবে। অজ্ঞান নাশ হইলে সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হইল।

৫ম সর্গঃ।

পৌরুষ স্থাপন।

রাম—শরীর, বাক্য ও মনকে ছন্দমত স্পন্দিত করাই হইল পুরুষার্থ। এই রূপ কর্ম্ম করিতে যে ইচ্ছা হইবে তৎপ্রতি কারণ কি ?

বশিষ্ঠ—"প্রবৃত্তিরেব প্রথমং যথাশাস্ত্রবিহারিণাম্"

শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া যাঁহারা বাঙ্মনকায়দ্বারা ব্যবহার শীল তাঁহাদের পুরুষার্থ সিদ্ধির প্রথম কারণ শাস্ত্রানুসারিণী প্রবৃত্তি। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম যাহা করা যায় তাহা অনর্থই উৎপাদন করে। ফলদানোন্মুখ প্রাক্তন কর্ম্মই দৈব।

আজ যাহা দৈবরূপে উদয় হইয়াছে তাহাই পূর্ব্বের পুরুকার—প্রাক্‌ভবীয় পুরুষকার।

শাস্ত্রমত কর্ম্ম করা, উপাসনা করা এবং জ্ঞান লাভ জন্য চেষ্টা করাকেই শাস্ত্রীয় পুরুষকার বলে। শাস্ত্রীয় পুরুষকারকেই ঐহিক পুরুষকার বলে। ঐহিক পুরুষকার অবলম্বন করিতে গেলেই, প্রাক্তন পুরুষকার অথবা পূর্ব্বকৃত অশাস্ত্রীয় পুরুষকার বাধা দিবেই। শাস্ত্রমত কার্য্যে উদ্যম করিতে গেলেই আলস্য, অনিচ্ছা ইত্যাদি বিঘ্ন আসিবেই।

তবেই হইল প্রাক্তন ও ঐহিক পুরুষকার এই শরীরে মেষদ্বয়ের ন্যায় নিরন্তর উদ্যম সহকারে সম-বিষমভাবে যুদ্ধ করিতেছে। "দ্বৌ হুড়াবিব যুধ্যেতে পুরুষার্থৌ সমাসমৌ।"

শাস্ত্রীয় পুরুষকার প্রয়োগকালে যে আলস্যাদি বিঘ্ন আইসে তাহাকে জয় করিতে হইবে। মনুষ্য যত্নপূর্ব্বক নিরালস্য হইয়া শাস্ত্রীয় ঐহিক পুরুষকারই অবলম্বন করিবে।

"পুংসা তত্ত্রেণ সদ্‌যোগাদেযনাশ্বস্ততনো জয়েৎ।"

যাহা কল্য করিতে হইবে তাহা অদ্যই করিব এইরূপ উদ্‌যোগ বা উৎসাহ সহকারে উদ্যত চিত্তে কার্য্য করিলে অবশ্যই জয়লাভ করা যায়।

শাস্ত্রোক্ত নিয়মে কার্য্য কর শুভ হইবে। শাস্ত্রনিয়ম না মানিয়া ব্যভিচার মত কার্য্য কর অশুভ হইবে।

আরও দেখ যদি শাস্ত্রমত করিয়াও অশুভ ফল আসিতেছে দেখ, তবে জানিও তোমার ঐহিক পুরুষকার অপেক্ষা প্রাক্তন্ পুরুষকারই বলবান। এক্ষেত্রে হতাশ্বাস না হইয়া তুমি পুনঃ পুনঃ প্রবলতর পুরুষকার অবলম্বন করিয়া দন্তে দন্ত বিচূর্ণ করার ন্যায় ঐহিক পুরুষকারজনিত শুভ দ্বারা প্রাক্তন পুরুষকার দূর কর, নিশ্চয়ই শুভ হইবে।

পূর্ব্বদিবসের অজীর্ণদোষ যেমন এই দিবসের লঙ্ঘণাদি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐহিক পুরুষকারদ্বারা প্রাক্তন পুরুষকার নষ্ট হয়।

নিত্য উদ্যোগশালী হও, হইয়া দুরদৃষ্টকে অধঃকৃত কর। যতক্ষণ না পার ততক্ষণ নানা উপায় অবলম্বন কর। উদ্যোগবিহীন পুরুষ, গর্দ্দভ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

উদ্যোগশূন্য গর্দ্দভ না হইয়া শাস্ত্রমত শরীর মন ও বাক্য স্পন্দন কর, নিশ্চয়ই স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হইবেই। সিংহ যেমন শত্রু কর্ত্তৃক পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও নিজ উদ্যোগবলে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া বাহির হয়, তুমিও সেইরূপ নিত্য উদ্যোগী হইয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হও।

রাম—কিরূপে ঐহিক পুরুষকার স্থায়ী করা যায়?

বশিষ্ঠ—মরণ ত আছেই। তবে কুকুর শৃগালের মত মরিব কেন, ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতেই মরিব—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রথমেই কর। সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করিব ইহা একবারও বিস্মৃত হইও না। প্রতিদিন

প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে আপনার দেহকে নশ্বর ভাবিয়া মনে মনে এই দেহটাকে পঞ্চভূতকে ভাগ করিয়া দাও, এটাকে ভাবনায় দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ কর; করিয়া পশুভাব ত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত কার্য্য কর।

পুরুষোচিত কার্য্যই হইতেছে সাধুসঙ্গ ও সংশাস্ত্রাদি অবলম্বন। কামিনী কাঞ্চনের সুখকে কীটের ব্রণাস্বাদন সুখের ন্যায় জঘন্য বিচার করিয়া অনাস্থা কর। যেমন যেমন বিঘ্ন আসিবে, তেমন তেমন উগ্রপুরুষার্থ লাভ করিয়া প্রাক্তন অশুভ চূর্ণ কর।

পরম্পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দ্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভমুদযুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ॥

দুষ্প্রবৃত্তি বা আলস্য বা অনিচ্ছা উদয় হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ বিচার করিবে যে অশুভ প্রাক্তন পৌরুষ আমাকে অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেছে ও নিযুক্ত করিতেছে। অমনি সেই মুহূর্ত্তেই ঐহিক পুরুষকারের বল বাড়াইয়া তদ্দারা তাহাকে পরাহত কর।

প্রাক্তন পুরুষকার ঐহিক পুরুষকার হইতে বলবান নহে। যতক্ষণ না অশুভজনক প্রাগ্ভবীয় পৌরুষ শান্ত হয় ততক্ষণ শাস্ত্রীয় পুরুষকার করিবে। কিছুতেই আলস্যকে প্রশ্রয় দিবেনা। যেরূপে পার তমোভাব ও রজোভাবকে পরাস্ত করাই চাই। বসিয়া বসিয়া জপ প্রাণায়ামাদি করিতে যদি আলস্য আইসে তবে আসন হইতে উঠিয়া একপায়ে দাঁড়াইয়া জপাদি কর—তাহাতেও লয় বিক্ষেপ না যায় তবে পায়চারি করিতে করিতে জপাদি কর; তাহাতেও না যায় তবে নৃত্যাদি দ্বারা হস্তপদাদি অঙ্গগুলিকে তালে তালে স্পন্দন কর—যাহাতে পার, যেরূপে পার, আলস্য জড়তা ও বিক্ষেপাদি জয় কর, করিয়া আসনে পুনরায় উপবেশন করিয়া আবার শাস্ত্রীয় পুরুষকার অবলম্বন কর। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখ, তুমি প্রীত হও বলিয়া কার্য্য কর, লোককে যে ভাবে মরিতে দেখিয়াছ তাহা স্মরণ করিয়া কাতরতা আনিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ কর—এই ভাবে ঐহিক পুরুষকার অবলম্বনে যতক্ষণ না বিঘ্ন দূর হয় ততক্ষণ উদ্যোগ কর। যত্ন দ্বারা যদি হইতেছে না দেখ তবে যত্নবিষয়েই কোথাও ত্রুটী আছে মনে করিয়া পুনরায় নিপুণ ভাবে যত্ন করিতে থাক। হইবেই নিশ্চয়।

পুরুষকার প্রয়োগে ভীত হইও না। ভ্রম বশতঃ আপনার ভুজদ্বয়কে সর্প বোধ করিয়া পলায়ন করিও না। "অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে" বলিয়া গর্দ্দভবৎ চেষ্টাশূন্য হইয়া থাকিও না।

প্রথমেই পুরুষকার অবলম্বনে বিবেক আশ্রয় কর। বিবেক দেখাইয়া দিবে আত্মাই সত্য, অনাত্মা মিথ্যা। আত্মাই আশ্রয়ের বস্তু, অনাত্মা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

এইরূপে বিবেক আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ কর। অনন্তর মোক্ষরত্ন অন্বেষণ কর।

নিয়মিতরূপে সৎশাস্ত্রের আলোচনা, সৎসংসর্গ ও সদাচারপরায়ণ হও, নিশ্চয়ই শুভ হইবে। ইহাই পুরুষার্থের স্বভাব। যাহা কিছু করিতে যাও, কাহারও সহিত কথা কহিতে গেলেও প্রথমে কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মনে মনে শ্রীভগবানকে স্মরণ করা অভ্যাস কর; করিয়া প্রথমেই প্রার্থনা কর, ভগবান আমি অন্যের সহিত কথা কহিতে যাইতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে চালিত কর। এইরূপে প্রথমেই প্রস্তুত হইয়া ব্যবহার কার্য্য কর।

বাল্যকাল হইতে নিয়মিতরূপে সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন, সৎসংসর্গে বাস, সদ্গুরু সেবা ও সদ্গুণাদি অবলম্বনপূর্ব্বক পৌরুষপ্রযত্ন স্থায়ী করিতে পারিলেই শুভ লাভ করিবে। যদি বাল্য যৌবনাদি কালেও বৃথা চেষ্টা হইয়া থাকে তবে অদ্য হইতেই যেন বাল্যকাল আরম্ভ হইল মনে করিয়া—নিত্য উদ্যোগী হও—হইবে।

বাল্মীকি বলিলেন, হে রাজন্! অরিষ্টনেমি ভগবান বশিষ্ঠ এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে সন্ধ্যা হইল। সকলকে তখন সন্ধ্যা বন্দনাদি জন্য প্রেরণ করা হইল। পরদিন আবার সকলে সমাগত হইলেন।

৬ষ্ঠ সর্গঃ।

দৈবনিরাকরণ।

দৈব কি ?

পুরুষের জন্মান্তরীণ কর্ম্ম বা পুরুষকারই দৈব, তদ্ভিন্ন অন্য দৈব নাই। দৈব যখন নাই তখন সাধুসমাগম ও সৎশাস্ত্রপর্য্যালোচনারূপ পুরুষকার অবলম্বনে আপনাকে জরামৃত্যু হইতে উদ্ধার করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

সাধুসমাগম ও সৎশাস্ত্রআলোচনা এই দুই বিষয়েই পুরুষকার অবলম্বন করিতে বলা হইতেছে। পুরুষকারের ফল প্রত্যক্ষ। যেমন যত্ন করিবে সেইরূপ ফল পাইবেই। মানুষ দুঃখে পড়িয়া যখন 'হা অদৃষ্ট' বলে তখন সে প্রাক্তন কর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই ইহা বলে। এখানে দুঃখরূপে পরিণত প্রাক্তন কর্ম্মই দৈব। কর্ম্মই দৈব। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মই এজন্মের দৈব। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদ্বারা যদি শরীর, বাক্য ও মন ছন্দমত স্পন্দিত হইয়া থাকে অথচ কোন কারণে মুক্তিলাভ হয় নাই—মুক্তি লাভের পূর্ব্বে শরীর নষ্ট হইয়া থাকে তবে এইরূপ পুরুষ ইহজন্মে কিছু না করিয়াই আপনা হইতে উচ্চ অবস্থা লাভ করিবেই। লোকে বলে লোকটার কি অদৃষ্ট। এই জন্মে যাহা দৃষ্ট হইতেছে না অর্থাৎ অন্য জন্মের পুরুষকার—তাহাই অদৃষ্ট।

বলবান্ ঐহিক পুরুষকার দৈবকে পরাভূত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যদি অভক্ষ্য ভোজনাদি করা হইয়া থাকে তবে উহা হইতে পবিত্র হইবার জন্য অনুতপ্ত ব্যক্তি প্রাণায়ামাদি প্রায়শ্চিত্তদ্বারা যেমন শুদ্ধিলাভ করে সেইরূপ বর্ত্তমান পুরুষকারদ্বারা প্রাক্তন অশুভ পুরুষকার জয় করা যায়।

উপস্থিত একটু সুখের লোভে যাহারা প্রাক্তন অশুভবিনাশে উদাসীন, সামান্য ইন্দ্রিয় সুখের লোভে যাহারা শাস্ত্রীয় পুরুষকার বিষয়ে অলস তাহারাই প্রকৃত দীন, প্রকৃত মূঢ়, প্রকৃত দৈবপরায়ণ। ইহারাই চির দুঃখী। দৈব অপেক্ষা ঐহিক পুরুষকার সর্ব্বদা বলবান্। প্রাক্তন ও ঐহিক পুরুষকার মেষ-দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধ করে। শুভ করিতে গেলেই পূর্ব্বতন অশুভ পুরুষকার, দৈব, মূর্ত্তি ধরিয়া বাধা দিবেই। ইহা যে জয় করিতে চেষ্টা করে না নিশ্চয়ই সে মানুষ নামের অযোগ্য।

দেখা যায় পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রীয় যত্ন করিলেও কখন কখন সুফল পাওয়া যায় না। সেখানে বুঝিতে হইবে পূর্ব্বকার অশুভ পুরুষকারের বল অধিক। সে স্থলে হতাশ না হইয়া ঐহিক পুরুষকার প্রবল করাই কার্য্য। যত্ন করিলাম হইল না ত কি করিব—ইহা ভাবিয়া মূঢ়ের মত অবস্থান করা নিতান্ত অন্যায়। দৈবকে যতক্ষণ না জয় করা যায় ততক্ষণ বুঝিতে হইবে, যত্নেরই কোথাও ত্রুটি হইয়াছে। যত্ন সম্যকরূপে করিলেই নিশ্চয়ই অশুভ দৈব পরাস্ত হইবেই।

কখন কখন দেখা যায় অমাত্যগণ মঙ্গল হস্তী প্রেরণ করিয়া ভিক্ষুক পুত্রকেও রাজা করে—এখানে ভিক্ষুকের পূর্ব্ব সুকৃতি থাকিলেও অমাত্যগণের পুরুষকার ভিক্ষুকের সৌভাগ্যের সহকারী কারণ। পৌরুষহীন লঘুচেতা মনুষ্যই যত্নশীল মনুষ্যের ভোগ্য। নিরুদ্যম ব্যক্তিগণ শক্তিশালী ব্যক্তির পৌরুষকেই দৈব বলে। সর্ব্বদা পুরুষকার প্রয়োগ কর। দেহ যায় যাক্—কতবারই ত ইহা গিয়াছে সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অবলম্বনে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের আশ্রয় অবলম্বন কর। "পৌরুষংনৃষু!" মনুষ্যের মধ্যে শাস্ত্রীয় পুরুষকারই শ্রীভগবান্। যে পুরুষ শাস্ত্রমত শরীর, বাক্য ও মন স্পন্দনে অনলস, সেই পুরুষই সর্ব্ববিষয়ে জয়লাভ করিবেই।

সম্যক ফল লাভ না হইলেও শোক করা উচিত নহে। শোক না করিয়া পুনঃ পুনঃ যত্ন কর। যতক্ষণ না শুভ হয় ততক্ষণ যত্ন কর হইবেই। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রদ্বারা বুদ্ধিকে নির্ম্মল কর, মৃত্যুসংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবেই। আলস্য জয় করিতে পারিবেই। দুঃখ দূর করিতে পারিবেই।

সৎশাস্ত্র অত্যন্ত আবশ্যক। স্বাধ্যায়ের মত তপস্যার সহায় আর কিছুই হইতে পারে না। মূর্খ ব্যক্তি শাস্ত্রপাঠে বৃথা সময় যায় বলিয়া থাকে। শ্রুতি স্বাধ্যায় ও প্রাণায়ামকে সমকালে অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। যাহারা কিছুমাত্র শাস্ত্র পাঠে সমর্থ তাহারা নিজেই বুঝিতে পারে শাস্ত্রপাঠে মন কিরূপে একক্ষণেই বিষয়বাসনা হইতে প্রত্যাহৃত হয়। হে রাম! যাহারা পশুতুল্য তাহারা ঐহিক শুভকর্ম্ম দ্বারা তুচ্ছ প্রাক্তন কর্ম্ম বিনষ্ট করে না।

ঈশ্বর কাহাকেও স্বর্গেও প্রেরণ করেন না, নরকেও পাঠান না। যে পুরুষকার করে মহাপুরুষকাররূপী শ্রীভগবান্ তাহারই সহায়। শক্তি প্রয়োগে প্রাণপণ কর নিশ্চয়ই মহাশক্তির সাহায্য পাইবে। ঈশ্বর অলসের সহায় কদাপি হন না।

যে ব্যক্তি যত্নশীল, সদাচাররত, উদ্যমশীল, সেই ব্যক্তি মহামোহ অতিক্রম করিতে পারে। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" ইহা এই পরম পুরুষার্থেরই আশ্রয় গ্রহণ করা। প্রথমে আপনাকে খণ্ডচৈতন্য ধারণা করিয়া শাস্ত্রমত কার্য্যদ্বারা অখণ্ডচৈতন্যের শরণাপন্ন হইতে প্রাণপণ কর. যতক্ষণ না হয় কর, নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে। "সময় হইলেই হইবে" যে অধম নিশ্চেষ্ট পুরুষ ইহা বলিয়া অলস হইয়া থাকে তাহাকে দূরে পরিত্যাগ করিবে।

শাস্ত্রবিহিত সুখ-দুঃখ-নিবৃত্তিজনক অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্মের প্রতি যে যত্ন তাহাই পুরুষকার।

সৎশাস্ত্র, সৎসঙ্গ এবং সন্ধ্যা, প্রাণায়াম, মানসপূজা, কুম্ভক, আত্মবিচার ইত্যাদি কর্ম্মদ্বারা নিশ্চয়ই অজ্ঞান দূর হইবে। অজ্ঞান দূর হইলেই হইল জ্ঞান ত আছেনই। যাহারা মনস্থির করিতে গিয়া নানা প্রকার বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়েন—তাহারা স্বাধ্যায়াদিদ্বারা আলস্য অনিচ্ছা দূর করিয়া নিত্য কর্ম্ম করিবেন—করিলেই শুভ অনুভব ক তে পারিবেন। পূর্ব্ব দিবসীয় দুষ্ক্রিয়া এতদ্দিবসীয় সৎ-ক্রিয়াদ্বারা অর্থাৎ অনুতাপ, প্রাণায়ামাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দূর হয়। অবসাদ সর্ব্বদাই দূর করা কর্ত্তব্য।

নিত্য ক্রিয়াদি আরম্ভ করিলে যদি জড়তা আইসে তবে প্রথমেই জড়তা দূর করা উচিত। জপ বা প্রাণায়াম করিতে বসিলে যদি নিদ্রা বা আলস্য আইসে তবে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জপ করা উচিত। তাহাতেও জড়তা যদি না কাটে তবে পায়চারী করিতে করিতে জপ করা উচিত; তাহাতেও যদি না হয় তবে তালে তালে হস্তপদাদিকে স্পন্দিত করিতে করিতে নৃত্য করা উচিত। যতক্ষণে জড়তা না কাটে এইরূপ করা উচিত। জড়তা দূর হইলে আবার প্রথম হইতে ক্রিয়া আরম্ভ করা উচিত।

বেদাদি শাস্ত্রে যে সদাচার, সদনুষ্ঠান ও নিয়মাদির কথা আছে তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর—তাহাতেই হৃদয়ে জ্ঞানের স্ফুরণ হইবে; হইলে প্রথমতঃ তৎসাধনেচ্ছা, তৎপরে তল্লাভের মানস, তৎপরে তদনুযায়িনী শারীর চেষ্টা উৎপন্ন কর। এই চেষ্টার নাম পৌরুষ।

স্বীয় বিচারদ্বারা সৎশাস্ত্রের অনুশীলন, সাধুসঙ্গ অবলম্বন, ও জ্ঞানীগণের সেবা—ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা করিলেই সাধন বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থই

প্রবল হইবে। তখন শমদমাদি পটুতা ও জ্ঞানাধিকার জন্মিবে। জ্ঞানাধিকারী হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সাধুসঙ্গ করা উচিত।

এতদ্দ্বারা জনণমরণরূপ মহারোগকে শান্তি কর।

৭ম সর্গঃ।

পৌরুষ প্রাধান্য।

বশিষ্ঠ—রাম! প্রথমে অল্প মনঃকষ্ট বিশিষ্ট নির্ব্ব্যাধি দেহ লাভ কর। পুরুষকার দ্বারাই এইরূপ দেহ লাভ করা যায়। প্রাণায়াম ও গুরূপদেশমত মুদ্রা অভ্যাসে ইহা হইবেই। কিন্তু প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় ইহা করা চাই। নিয়ম লঙ্ঘন করা কিছুতেই উচিত নহে।

এইরূপ করিয়া চিত্তকে এমন ভাবে সমাহিত করিতে অভ্যাস করিতে হইবে যাহাতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে না হয়। ইহাই হইল উদ্দেশ্য। জরামরণ হইতে মুক্তিলাভ করিব তজ্জন্য শাস্ত্র আজ্ঞা পালন করিয়া চলিব—এই স্থির সঙ্কল্প লইয়া মানুষ জীবন পথে অগ্রসর হউক নিশ্চয়ই এই জীবনেই মনুষ্য পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারিবেই। প্রত্যহ স্বাধ্যায় করুক আবার যোগ অভ্যাস করুক; আবার স্বাধ্যায় করুক—স্বাধ্যায় ও যোগ ইহাদের পরস্পর সাহায্যে জীবন্মুক্তির কর্ম্ম সে দেখিতে পাইবে এবং করিতেও পারিবে।

যাহারা ইহার জন্য পুরুষকার করে না তাহারাই আত্মঘাতী। পুরুষার্থ লাভের উপায় স্ফূর্ত্তি হওয়ার নাম সম্বিদস্পন্দ। সম্বিৎ অর্থে তত্ত্বজ্ঞান আর স্পন্দন অর্থে বিকাশ। সম্বিৎস্পন্দ তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ। প্রথম কথা সম্বিৎস্পন্দ। দ্বিতীয় কথা মনঃস্পন্দ তৃতীয় কথা ইন্দ্রিয়স্পন্দ।

সাধনেচ্ছা বলবতী হওয়ার নাম মনঃস্পন্দ বা দৃঢ়সঙ্কল্প। তৎপরে কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রচলন হওয়ার নাম ইন্দ্রিয়স্পন্দ। ইন্দ্রিয়স্পন্দ অর্থে অনুষ্ঠান রত হওয়া।

যাহা করিতে হইবে তাহা এই। সম্বেদন বা জ্ঞান প্রথম; দৃঢ় ইচ্ছা দ্বিতীয়; অনুষ্ঠানরত হওয়া :

Registered No. C 588.

৬ষ্ঠ বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম্, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কলিকাতা, ১০ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট্
উৎসব কার্য্যালয় হইতে—শ্রীযুত ননীলাল রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

শ্রাবণ।

সম্পাদকের ঠিকানা—৪২ নং হাজরা রোড, বালিগঞ্জ কলিকাতা।

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৬ষ্ঠ বর্ষ] ১৩১৮ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

রাজদরবার।

রাজার দেশে রাজদরবার হইয়া গেল। এবারে আমাদের দেশে হইবে। আমরা অর্থ সামর্থ্য উভয় হীন। আমাদের রাজদর্শন অসম্ভব।

চেষ্টাহীনের আত্মদর্শন যেমন অসম্ভব, আমাদের রাজদর্শন সেইরূপ অসম্ভব। চেষ্টা একবারে যে নাই তাহাও বলিতে পারি না। বলি যে চেষ্টায় তিনি বরণ করেন সে চেষ্টা নাই। শ্রুতি ঠিক বলিয়াছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

এই আত্মা প্রবচন দ্বারা লভ্য নহেন, মেধা দ্বারা নন, শ্রবণ দ্বারাও নহেন। যাঁহাকে ইনি বরণ করেন তাঁহার দ্বারাই লভ্য। এই আত্মা তাহার তনুকে স্বীয় বলিয়া বরণ করেন। অনেক বেদাদি শাস্ত্র-অভ্যাসে এই আত্মা লভ্য হন না। গ্রন্থার্থ-ধারণাশক্তিশালিনী বুদ্ধি দ্বারাও লভ্য হন না। বহু শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও লভ্য হন না। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" কিন্তু ভজনেন প্রসন্ন ঈশ্বরস্বরূপং এষ আত্মা যং বৃণুতে অনুগৃহ্লাতি তেন লভ্যতে। কিন্তু ভজন দ্বারা প্রসন্ন ঈশ্বর স্বরূপ এই আত্মা যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন তাঁহার দ্বারাই

ইনি লভ্য। যিনি নিষ্কাম সর্ব্বসাধনসম্পন্ন, কেবল আত্মকামী, মুমুক্ষু—ভজন দ্বারা প্রসন্ন হইয়া এই ঈশ্বরস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে গুরু মিলাইয়া দেন।

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা যদা ত্বাং সমুপাসতে।
তদা মায়া শনৈর্যাতি তানবং প্রতি পদ্যতে॥
ততস্ত্বজ্ জ্ঞানসম্পন্নঃ সদ্‌গুরু স্তেন লভ্যতে।
বাক্যজ্ঞানং গুরোর্লব্ধা তৎপ্রসাদাদ্বিমুচ্যতে॥

সৎসঙ্গ করিতে করিতে যখন ভক্তিলাভ হয়,—সেই ভক্তি দ্বারা মানুষ যখন তোমার উপাসনা করে, তখন মায়া ধীরে ধীরে সেই উপাসকদিগের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে থাকেন; মায়ার বিক্ষেপশক্তিকে মায়া ত্যাগ করেন। অতএব তিনি তনুতা (কৃশতা) প্রাপ্ত হয়েন। সেই ভক্তিযোগ দ্বারা মায়া ক্ষীণ হইলে, অভেদজ্ঞানবিশিষ্ট সদ্‌গুরু তখন লাভ হয়। সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে তোমার প্রসাদে তুমি সেই হও—এই বাক্যের অখণ্ড অর্থ লাভ করিয়া সাধক মুক্তিলাভ করে।

আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ ইতি শ্রুতেঃ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ইতি স্মৃতেশ্চ॥
যদাসদ্‌গুরুণাযুক্তো বোধ্যতে বোধরূপিণা।
নিবৃত্তদৃষ্টিরাত্মানং পশ্যত্যেব সদা স্ফুটম্॥

আমি জ্ঞানস্বরূপ এইরূপ বোধবিশিষ্ট জীবন্মুক্ত গুরুদ্বারা যুক্ত হইয়া তখন বোধ প্রাপ্ত হয়। তখন বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত-দৃষ্টি হইয়া শুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব আত্মস্বরূপকে পরিষ্কাররূপে সর্ব্বদা দেখিতে থাকেন।

তাই বলা হইতেছে নিষ্কাম সর্ব্বসাধনসম্পন্ন কেবল আত্মকামী মুমুক্ষু—ঈশ্বর-প্রসাদে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্য হইতে আত্মপ্রাপ্তির অর্থ প্রার্থনা করেন। সেই আচার্য্য হইতে "সেই তুমি হও" এই মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ সাধনা দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হন।

কোন্ প্রকারে প্রাপ্ত হন? কথং তত্রাহ "তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্"। তাহার এই আত্মা আপনার শরীরকে প্রকাশ করেন। তস্য ভক্তস্যৈব শারীর আত্মা স্বাং শুদ্ধংচিত্তনুং স্বীকরোত্যয়মস্মীতি।

ঐরূপ সাধক দেখেন যে তাঁহার শরীরস্থ আত্মাই আপনার শুদ্ধ চিন্মাত্র তনু স্বীকার করেন—করিয়া দেখান এই তুমি।

যে জিজ্ঞাসুর এই আপনিই আপনি চৈতন্যটি প্রত্যাগাত্মা, তিনি আপনার শরীর বিষয়ক সাক্ষীরূপ সোহং ভাবে প্রকাশিত হয়েন। সাধনসম্পন্ন নিষ্কাম পুরুষ আচার্য্য দ্বারা মহাবাক্য শ্রবণ করিলে আপন আত্মাকে এইরূপে জানিতে পারেন।

বলিতেছিলাম রাজদর্শন ত ভাগ্যে নাই, কিন্তু মনে মনে রাজদর্শন ত হইতে পারে, মনে মনে প্রার্থনাও ত হইতে পারে? সর্ব্বজীবে নারায়ণ দেখিতে হইবে—সকল সাধকেরই ইহা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের ত ইহা বিশেষতঃ। সর্ব্বজীবে যখন নারায়ণ আছেন তখন রাজার মধ্যে তিনি বিশেষভাবে আছেন। রাজার মধ্যে নারায়ণের বিভূতি বিশেষ ভাবে আছে। সেই জন্য মনে মনে প্রার্থনা করিলেও তাহা রাজার নিকট পৌঁছিবে। আমরা ভারতের ব্রাহ্মণ! হে প্রভু! আমাদের আর অন্য প্রার্থনা কি? আমরা নিরুপদ্রবে তপস্যা করিতে পারি ইহাই তুমি করিয়া দিও। আমাদের তপস্যার বাহ্যিক সমস্ত বিঘ্ন যাহাতে দূর হয় তুমি তাহাই করিয়া দাও। হে নরনাথ! আমাদের আর অন্য প্রার্থনা নাই। আর এক প্রার্থনা—ইহা আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা - ইহা আপনার সকল প্রজারই কর্ত্তব্য।

হে ভারতেশ্বর! আমরা স্থূলে তোমার দরবারে উপস্থিত হইতে না পারিলেও ভারতের ঈশ্বর সূক্ষ্মভাবে জীবের মধ্যে যে দরবার করেন আমাদিগকে একবার সেই দরবার দর্শনের অধিকার দাও। ব্রাহ্মণের অপর অভিলাষ কিছুই থাকিতে পারে না।

এই শরীররূপী পুরী আমাদের রাজদরবারের স্থান। এই পুরীর একাদশ দ্বার। ওঁ পুরমেকাদশ দ্বারম্"। প্রতি দ্বারেই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা, দ্বারপাল-রূপে দ্বার রক্ষা করিতেছেন। রাজরাজেশ্বর আত্মদেবের সভা করিবার জন্য তিনটি স্থান নির্দ্ধারিত আছে। মুখ্য সভার স্থান মস্তক। এই স্থানে নেত্ররূপ সিংহাসনের উপর উপবেশন করিয়া প্রভু আম দরবার করেন।

দ্বিতীয় দরবারের স্থান কণ্ঠ। কণ্ঠস্থানে হিতানাম্নী নাড়ীরূপী সিংহাসনে বসিয়া শ্রীভগবান্ আত্মদেব খাস দরবার করেন।

• তৃতীয় স্থান হৃদয়। হৃদয়স্থানে এক অতি চমৎকার বাঙ্গলা। এই হৃদয়রূপী বাঙ্গলাতে সমস্ত সভা সামগ্রী হইতে পৃথক্ হইয়া আপন আনন্দময়ী মহারাণীকে লইয়া আত্মদেব শয়ন করেন।

রাজার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী চারি জন। মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার। শ্রেষ্ঠ মন্ত্রীদিগের নিকট ইন্দ্রিয়রূপ কার্য্যাধ্যক্ষগণ সমস্ত পদার্থকে আপনারাই লইয়া যান। নানাপ্রকার বৃত্তি ও নানাপ্রকার যুক্তি এই রাজাধিরাজের সৈন্য সামন্ত। চিদাভাস, রাজার সেনাপতি। আর সগুণ ব্রহ্ম ইহার পুর-পালক।

মহারাজ আত্মার যে বিশাল অভিষেক বস্ত্রাবাস তাহার সপ্ত দ্বার ঊর্দ্ধে, দুই দ্বার নিম্নে—ঠিক মধ্যস্থানে নাভিমণ্ডলে এক দ্বার এবং সর্ব্ব উচ্চে ব্রহ্মরন্ধ্রে এক দ্বার। রাজদরবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

ব্রাহ্মণ রাজা।

জগতের কল্যাণ হউক, আমাদের কল্যাণ হউক, আমার কল্যাণ হউক এই শুভবাসনা মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে রহিয়াছে। এই কল্যাণ-প্রবৃত্তি মানুষকে শুভকর্ম্মে প্রেরিত করে। কিন্তু সকলের দৃষ্টি সমান নহে বলিয়া কাহারও শুভবাসনা এবং শুভকর্ম্ম নিতান্ত সীমাবদ্ধ, কাহারও শুভবাসনা ও শুভকর্ম্ম সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

মানুষ যতক্ষণ আপনার উপযোগী শুভকর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করেন; ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আপন কর্ম্ম দ্বারা সমকালে নিজের উন্নতি ও সমাজের উন্নতি সাধন করিয়া আপনার চিত্তকে প্রসন্ন করিতে পারেন না। শুভকর্ম্ম দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তম স্থায়ী হইতে পারে না। উত্তম স্থায়ী না হইলে কখন আশা, কখন হতাশা হৃদয় অধিকার করিবেই। ইহাতে উন্নতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকিবার কথা।

সংযম, বিদ্যা ও অর্থ এই তিনটির একত্র সমাবেশ ভিন্ন স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না। যথার্থ সংযমী, প্রকৃত বিদ্বান্ ও যথার্থ অর্থব্যবহারজ্ঞ ধনবান্ যে শুভকার্য্য সম্পাদন জন্য একত্র হইয়াছেন, সেই শুভকার্য্য শুভফল নিশ্চয়ই উৎপন্ন করিবে। অথবা এক জনের মধ্যে এই তিনটির যদি সমাবেশ হয় তিনি প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ।

উপস্থিত সময়ে এই পতিত জাতির উন্নতিকল্পে যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন

তাঁহারা সকলেই যে একরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহা বলা যায় না। কাহারও জাতীয় উদ্ধারের সীমা অতি প্রসারিত, কাহারও অতি ক্ষুদ্র। অতি প্রসারিত উদ্ধার যিনি গ্রহণ করিয়াছেন তিনি আপন বাসনাও কর্ম্মের কোন শুভফল প্রত্যক্ষ না করিয়াই যদি ধরাধাম পরিত্যাগ করেন তবে শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে এই বলিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইবে যে "আমি কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না"। যাঁহাদের কর্ম্মশক্তি অধিক ছিল তাঁহারা এই বলিয়া হৃদয়কে শান্ত রাখেন যে, আমার কর্ম্ম বরাবর চলিবেই। কিন্তু তিনি যতটুকু উন্নতি দেখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা দেখিতে পাইলেন না বলিয়া হতাশ হইয়াই কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। এইরূপ ব্যক্তির গতি শাস্ত্রমত হইল না বলিয়া ইঁহার পথকে শুভপথ বলা যাইতে পারে না।

অতি প্রসারিত না হয় বা অতি সঙ্কীর্ণ না হয় এইরূপ শুভবাসনা ও শুভকর্ম্ম কি? আমরা তাহারই ক্রমালোচনা করিতেছি।

যাঁহারা ব্রাহ্মণ এবং রাজা আমরা প্রথমে তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছি। পশ্চিম বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও রাজা দুই চারি জন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ ও রাজার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই অতি সঙ্কীর্ণ কর্ম্ম লইয়া আছেন—কতকগুলি ব্রাহ্মণ রাজা আপনার উন্নতি ও সমাজের উন্নতি জন্য প্রাণপণ করিতেছেন।

আমরা যে শুভকর্ম্মের কথা আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহাতে যাহাতে সকলেই নিজের ও সমাজের উন্নতি সমকালে সাধন করিতে পারেন এইরূপ কর্ম্মের কথাই থাকিবে।

যিনি ব্রাহ্মণ তিনি স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উন্নতি সাধনেই যত্ন করিবেন। সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে বলিতেছেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দু জাতির রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ হইতে পারে না। সমস্ত হিন্দু জাতির শাস্ত্র, আচার ব্যবহার—এক কথায় হিন্দু জাতির লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা চলিতে পারে না। এজন্য ব্রাহ্মণরক্ষাই ব্রাহ্মণরাজার প্রধান কর্ত্তব্য।

যে ব্রাহ্মণরাজা ব্রাহ্মণরক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকেই প্রথমেই ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান না করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। আপনি ব্রাহ্মণের আচরণ করিয়া তিনি অন্যকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন ইহাই কার্য্য।

তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য আপন পরিবারমধ্যে ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান যাহাতে অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

এইরূপ ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহার আলোচনা করা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। কারণ পুত্রকন্যাকে ব্রাহ্মণভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে, সমাজে যে স্থায়ী উন্নতির বীজ বপন করা হয় এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

রাজা আপন পুত্রকে ব্রাহ্মণ করিবেন কিরূপে? পুত্রকে স্বধর্ম্মে থাকিতে হইবে অথচ রাজ্যরক্ষা ও লোকব্যবহারও করিতে হইবে—ইহা সম্পাদন করিতে হইলে কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন?

সেকালের মত গুরুগৃহ এখন নাই। কিন্তু গুরুগৃহের অনুকল্প নানাপ্রকার উঠিয়াছে দেখা যায়।

রাজপুত্রের শিক্ষার ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত হইবে তাঁহার শুধু বিদ্বান্ হইলে হইবে না। তাঁহাকে বিদ্বান্ হইতে হইবে এবং নিষ্ঠাবান্ হইতে হইবে। শিক্ষক যদি নিষ্ঠাবান্ না হয়েন তবে ছাত্র ব্রাহ্মণ থাকিতে পারিবে না।

উপস্থিত সময়ে যাঁহারা শুধু সংস্কৃত জানেন অথবা শুধু ইংরাজী জানেন তাঁহাদের দ্বারা একার্য্য হইতে পারে না। ইংরাজীর মধ্যেও দর্শনশাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান এই তিনই জানা আবশ্যক। আমরা বলিতেছি যে শিক্ষক নিষ্ঠাবান্ এবং যিনি দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান ও সংস্কৃত জানেন তিনিই রাজ-পুত্রের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত। ইহার একটিরও অভাব যদি হয়, তবে ছাত্রের সময়োপযোগী শিক্ষা হইবে না।

যদি একজনের এই সমস্ত বিদ্যা না থাকে, তবে রাজপুত্রের জন্য ঐ ঐ বিদ্যায় পারদর্শী ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক থাকা আবশ্যক। আমরা নিষ্ঠাবান্ স্বধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষককেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতেছি। কারণ ইহা না হইলে শিক্ষার মূলে এমন এক অভাব থাকিয়া যাইবে, যাহার জন্য কুমারকে জীবনে বহু মনঃপীড়া পাইতে হইবে; বহু কার্য্যে ঠকিতে হইবে, বহুলোকের পীড়ার কারণও তিনি হইবেন।

এইত হইল শিক্ষকের কথা। পরে কিরূপ স্থানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে তাহার কথাও আলোচনা করা আবশ্যক।

যে স্থানে গঙ্গা আছেন, যে স্থান তীর্থ বলিয়া পূজিত সেই স্থানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উপস্থিত সময়ে ৺কাশীই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান স্থান হওয়া উচিত।

স্বনামধন্যা বিদুষী অ্যানিবেসাণ্ট ইহা লক্ষ্য করিয়াই ৺কাশীধামে তাঁহার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি হিন্দুজাতির যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

রাজকুমারগণের শিক্ষা বিদ্যালয়েই হওয়া উচিত। যদি উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বালক চালিত হয়, তবে বিদ্যালয়ের দোষ বালককে স্পর্শ করিতে পারে না। পরন্তু বহু ছাত্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার যে বিশেষ গুণ তাহাও সহজেই লাভ হয়।

শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন শিক্ষার্থীর গৃহত্যাগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কাক চেষ্টা, বক ধ্যান, কুকুর নিদ্রা, স্বল্পাহারী এবং গৃহত্যাগী এই গুলি সকল বিদ্যার্থীরই আবশ্যক। পিতামাতার অসংযত শাসন ও অসংযত আদর যে বহুস্থানে পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত উৎপাদন করে ইহা আমরা অনেকেই জানি এবং অনেকেই এই জন্য ভুক্তভোগী। রাজারাণীর নিকটে থাকিলে রাজকুমারের বিদ্যাশিক্ষার যে প্রবল বিঘ্ন ঘটে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। সেকালে সমগ্র ভারতের অধীশ্বর যাঁহারা, তাঁহারাও সন্তানগণকে এইজন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করিতেন। এখন সেরূপ গুরুও নাই, সে গুরুগৃহও নাই; সেই জন্য ৺কাশীক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষকদ্বয় বা ত্রয়ের হস্তে বালককে সমর্পণ করিয়া যদি ধর্ম্ম, বিদ্যা ও আচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায়, তবে যে ব্রাহ্মণ-রাজকুমারের সমায়োপযোগী শিক্ষা হইতে পারে তাহা নিশ্চিত।

৺কাশীধামের বিদ্যালয়ে হিন্দি বা উর্দ্দু শিক্ষা আবশ্যক। ইহাতে রাজকুমারগণের উপকার ভিন্ন অপকার নাই। বঙ্গদেশের রাজকুমারগণের ভবিষ্যতে রাজপুত্ রাজাদিগের সহিত সংস্রব রাখিবার বিলক্ষণ সুবিধা এতদ্দ্বারা হইতে পারে। ইংরেজী ও হিন্দি এই দুই ভাষা জানা থাকিলে ভারতের সর্ব্বজাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত যে মিলিত হইতে পারা যায় ইহা বলাই বাহুল্য। ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ইত্যাদি সন্দর্শন দ্বারা আপন আপন দেশের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিবার বিলক্ষণ অবসর থাকে।

রাজকুমারগণের এইরূপ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও একটি আবশ্যকীয় কল্যাণকর শুভকার্য্যের উল্লেখ করিতে পারি। কোন ধনবান্ ব্রাহ্মণরাজা আপন কুমারের জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা যদি করেন তাঁহার দ্বারা অল্প ধনশালী

রাজকুমারের শিক্ষারও যথেষ্ট উপকার হইতে পারে—যদি নিজ নিজ আত্মাভিমানজনিত অনিষ্টকর সম্মান ইহার প্রতিবন্ধক না হয়।

রাজকুমারগণের শিক্ষার সম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইল তাহাতেই উপস্থিত সময়ের নানাপ্রকার অভাব দূর হইতে পারে ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায়।

এখন শিক্ষা দ্বারা সমাজের কল্যাণ কিরূপে সাধিত হয় তাহা আমরা দেখাইতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণ রাজার প্রধান স্বাভাবিক কার্য্য ব্রাহ্মণরক্ষা। ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যগুলি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করা উচিত এবং তাহারই অনুষ্ঠান যাহাতে ব্রাহ্মণেরা করিতে পারেন সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা উচিত।

ঋষিগণ এই প্রথা অবলম্বনে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য (১) শাস্ত্র আবশ্যক, (২) শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠান করান আবশ্যক। যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব জগতে জ্ঞানের অবতরণ যেরূপে হইয়াছিল তাহা দেখাইতে গিয়া এই দুই উপায় উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা এই বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যোগবাশিষ্ঠ মুমুক্ষ প্রকরণ ১০ম ও ১১শ অধ্যায় পাঠ করিলেই ইহা জানিতে পারিবেন।

আমাদের শাস্ত্র অনন্ত। এই সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণরক্ষার যাহা আবশ্যক তাহা মাত্র প্রথম প্রয়োজন। অন্যগুলির আবশ্যক পরে হইতে পারে অথবা সকলের জন্য সকলগুলির আবশ্যক নাও হইতে পারে!

ব্রাহ্মণরাজকুমারকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে রাখিতে হইলে কতকগুলি নিত্য অনুষ্ঠান আবশ্যক এবং কতকগুলি শাস্ত্র নিত্য পাঠ করা আবশ্যক।

একটি রাজকুমারের শিক্ষার জন্য ইহা যেমন আবশ্যক, সমাজের সমস্ত ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য ইহা সেইরূপই আবশ্যক। ব্রাহ্মণের নিত্য অনুষ্ঠেয়—ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাও ভিন্ন ভিন্ন বেদ অনুসারে বিভিন্ন। অথচ উপস্থিত সময়ে কি সামবেদী, কি ঋগ্বেদী, কি যজুর্ব্বেদী কোন সন্ধ্যারই নির্ভুল পুস্তক পাওয়া যায় না।

সাম, ঋগ্ যজুর্ব্বেদীয় একখানি সন্ধ্যার নির্ভুল পুস্তক প্রণয়ন হওয়া উচিত। মন্ত্রগুলির পাঠ শুদ্ধ থাকে এরূপ সন্ধ্যার একখানি পুস্তক সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ নিত্য স্বাধ্যায় জন্য কতকগুলি বিষয় লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

যদি এইরূপ একখানি পুস্তক রচিত হয় যাহাতে ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রগুলি পাঠ-শুদ্ধির সহিত লিখিত থাকে এবং নিত্য পাঠ ও নিত্য অর্থ চিন্তার জন্য বেদের কতকগুলি সূক্ত একত্রিত থাকে, তবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যে বিশেষ উপকার হয় তাহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়।

আমাদের বিশ্বাস সন্ধ্যার মন্ত্রগুলি এবং তাহাদের প্রাচীন ব্যাখ্যাগুলি নিত্য পাঠ করা সকল ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। সন্ধ্যার মধ্যে অঘমর্ষণ মন্ত্রের ব্যাখ্যা, সূর্য্যোপস্থানের ব্যাখ্যা এবং গায়ত্রীর ব্যাখ্যা নিত্য পাঠ করা আবশ্যক। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বেদের পুরুষসূক্ত এবং তাহার ব্যাখ্যাও নিত্য পাঠ করা উচিত। এতদ্ব্যতীত অন্ততঃ একখানি উপনিষদ্ ও তাহার ব্যাখ্যা নিত্য পাঠ করা উচিত। আমরা উপনিষদ্‌সমূহের মধ্যে মাণ্ডূক্য উপনিষদ্‌খানি নিত্যপাঠ্য বলিয়া মনে করি। মুক্তিকোপনিষদ্ অন্ততঃ মাণ্ডূক্য উপনিষদ্‌কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরও দেখা যায়, অধিকাংশ উপনিষদে মাণ্ডূক্য শ্রুতির সমস্ত মন্ত্রগুলিরই উল্লেখ আছে। মাণ্ডূক্য শ্রুতি আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু বিষয়-গৌরবে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। বিশেষতঃ গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে মাণ্ডূক্য শ্রুতির অর্থাবধারণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মাণ্ডূক্য শ্রুতি, পুরুষসূক্ত এবং সন্ধ্যার মন্ত্রব্যাখ্যা প্রথম প্রথম যদি এইগুলি স্বাধ্যায় জন্য রাখা যায় তবে ব্রাহ্মণধর্ম্ম কি প্রত্যহ তাহার আলোচনা হয়, এই আলোচনা দ্বারা সন্ধ্যানুষ্ঠানের এবং সন্ধ্যোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা নির্গুণ ও সগুণ ঈশ্বরচিন্তার যে সম্পূর্ণ সহায়তা হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে যদি তপস্যা ও স্বাধ্যায় প্রত্যহ অভ্যস্ত হইতে থাকে, যদি তপস্যা দ্বারা স্বাধ্যায় এবং স্বাধ্যায় দ্বারা তপস্যা এইরূপে পরস্পরকে সাহায্য করিতে থাকে, তবে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষার বীজ ইহাতে সুরক্ষিত হইবেই। কালে ইহাদের প্রতি যাঁহার যেরূপ অনুরাগ হইবে, তিনি সেইরূপ ব্রাহ্মণভাব লাভ করিয়া সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যে রক্ষা করিতে পারিবেন সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আপনি আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা না দিলে, কখনও লোককে ধার্ম্মিক করা যায় না; ইহা সাধুগণ বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন। আমি যাহা বলি তাহাই কর, যাহা করি তাহা করিওনা; এই শিক্ষা নিতান্ত কুশিক্ষা। জীবন্মুক্ত যিনি তিনিও লৌকিকাচার উল্লঙ্ঘন করিবেন না ইহাই শাস্ত্রশিক্ষা। তথাপি

লৌকিকাচারো মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ এ কথা অনেকেরই জানা আছে।

একটি ব্রাহ্মণ রাজকুমারকে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও রাজা করিবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার যদি অঙ্গভঙ্গ না হয় তবে তাহাতেও যে ব্রাহ্মণজাতি রক্ষার বীজ থাকে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

উপস্থিত সময়ে যে সমস্ত ব্রাহ্মণরাজা সমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিতেছেন—তাঁহারা যাহা করিতেছেন তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথাই বলিলাম না। আমরা বলিতেছি যাহা তাঁহারা করিতেছেন করুন, তাহার সঙ্গে= ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য উপায়ও করুন, ইহাই আমাদের বক্তব্য। অতি প্রসারিত ভাবে জাতীয় উন্নতি করিতে চেষ্টা হয় হউক; কিন্তু নিশ্চিত উন্নতির জন্য পূর্ব্বোক্ত কার্য্যও যদি হয়, তবে ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মণের বীজ রক্ষা নিশ্চয় হইবে ইহাই আমরা এখানে বলিলাম।

বিশ্বাসের ধর্ম্ম।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

১

প্রথম প্রবন্ধে বলা হইয়াছে সকল জীবের প্রাণেই ভালবাসা বলিয়া একটি জিনিষ আছে। মানুষ ভালবাসিতে চায়, প্রকৃত ভালবাসার জিনিষটি না পাইলেও যাহোক একটা কিছু ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। যার নিতান্ত কিছু না জুটে, সে একটা ময়না কিনিয়া বা শালিক ধরিয়া তাহাকেও ভালবাসে; এও না হয়, তবে একটা কুকুর বা বিড়ালকেও ভালবাসে। এই সমস্ত মানুষ যাহারা পশু পক্ষীর উপর এই দেবদুর্ল্লভ অনুরাগ ন্যস্ত করিয়া সুখ পাইতে চায়, তাহারা নীচ শ্রেণীর। ইহাদের উপরের মানুষ ভালবাসা জিনিষটি লইয়া কত মানুষকে বা মানুষীকে দিতে চায়—যাহাকে তাহাকে দিতে গিয়া কতই ঠকে, কতই প্রতারিত হয়, কখন কখন দাগীও হইয়া যায়। নানাস্থানে

নাস্তানাবুদ হইয়া, নশ্বর জগতের নশ্বর বস্তুতে বিরক্ত হইয়া শেষে আপনার ঘরে ফিরিয়া আইসে। বেদ বলেন সকলের ভালবাসার বস্তুটি আকাশ ছাইয়া আছেন, হৃদয় ভরিয়া আছেন—শুনে, শুনিয়া তাঁকে ভালবাসে। তাহাকে দেখিতে পায় না—শুধু নাম শুনিয়া তারে চোখে না দেখিয়াও, ভালবাসে। ভালবাসা বস্তুটি প্রাণে আছে। কি করিবে? নাম পাইয়া, গুণ শুনিয়া তারে ভালবাসে। ইহাই হইল বিশ্বাসে ভালবাসা।

লোকে বলে অন্ধ বিশ্বাস—বলে বিশ্বাস অন্ধ। বড় ভ্রান্তি মানুষের। বিশ্বাস কি অন্ধ হয়? অতখানি ভালবাসা যাহার মূলে, সে কি কখন অন্ধ হয়? ভালবাসা না থাকিলে বিশ্বাস কোথায়? যে ভালবাস দিয়া ভগবান্ মিলে, সেই ভালবাসার উপরে যে দাঁড়াইয়াছে সে কি কখন অন্ধ হয়? তা হয় না। তথাপি জ্ঞান ও বিশ্বাস এক জিনিষ নয়। বিশ্বাস জ্ঞানে পৌঁছায়। বিশ্বাসেরও প্রকাশ আছে, তবে জ্ঞানের প্রকাশ ও বিশ্বাসের প্রকাশ একটি বস্তুরই এপিঠ ওপিঠ। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বিশ্বাসের ধর্ম্মের মূল যে ভালবাসা তাহাই দেখাইয়াছি। এখানে আর একটু অগ্রসর হইব।

২

ধর্ম্মরাজ্যে যতদিন না স্থান পাইতেছ ততদিন প্রকৃত শান্তি পাইবে না। যেখানে প্রকৃত শান্তি নাই, সেখানে প্রকৃত সুখও নাই। "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্"। আবার সুখও একটুকুতে হয় না। অনন্ত না হইলে সুখ নাই। যাহা ভূমা, যাহা অনন্ত তাহাই সুখ! অল্পে সুখ নাই—শ্রুতি এই কথা বলেন। হায়! মানুষ কতবার অল্পের জন্য মরে? শাস্ত্র বলেন "যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয় এবতে" স্পর্শজনিত যে ভোগ সুখ তাহা দুঃখেরই নিদান। রূপ স্পর্শে মরে পতঙ্গ, রস স্পর্শে মরে মীন, গন্ধ স্পর্শে মরে ভৃঙ্গ, স্পর্শ স্পর্শে মরে মাতঙ্গ, আর শব্দ স্পর্শে মরে কুরঙ্গ। আর মানুষ মরে এই সকলগুলি বা অধিকাংশ এককালে স্পর্শে। বিষয়কে স্পর্শ না করিয়া যে সাধক ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে গুটাইতে পারিল—যে সাধক ইন্দ্রিয়ের রাজা যে মন তাহাকে সাধিয়া, ভজিয়া, কখন বা ধমকাইয়া যে সেই হৃদয়ের রাজা, সেই ঈপ্সিততম, সেই দয়িত, সেই দেবতা, সেই রমণীয় দর্শন, সেই আবিরাবি, সেই সর্ব্বজন বরণীয়, সেই ভ বময়কে দেখাইতে পারিল তার আর মরণ হয় না। মানুষ বলেন না ছুঁইলে মরিব—ছুঁইতে পাইলে বাঁচি—এই ছোঁয়াই মৃত্যু, না ছোঁয়ারূপ মৃত্যুটা জীবন—অন্ধ মানুষ ইহা

শুনিয়াও শুনে না। বিশ্বাসের ধর্ম্মে ভাবময়কে স্পর্শ করা যায়—তাহাতেই সমাধি আইসে। সমাধিকালে কোন কিছুর অনুভব থাকে না সত্য; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়, সেইরূপ সমাধিভঙ্গে সমাধিলব্ধ সুখের স্মৃতিতে মানুষকে বড়ই পবিত্র করে। মানুষকে বিষয় বৈরাগ্য আনিয়া দেয়—মানুষকে পাপ হইতে মুক্ত করে। বলিতেছিলাম বিশ্বাসে সাধনা কিরূপ হয় তাহা একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত। বুঝিলে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ লাভ করা যাইবে।

তুমি আছ এই টুকুইত বিশ্বাস করিয়া লইতে বলা হইতেছে। তুমি অধিষ্ঠান-চৈতন্য। তুমি অনুভব কর বলিয়া জগতের অস্তিত্ব। যেমন আমি যাহা অনুভব না করি, তাহার অস্তিত্ব আমার মধ্যে নাই; যতক্ষণ অনুভব না করি ততক্ষণের জন্য নাই; কিন্তু আমি অনুভব করি বা না করি, অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বতশৃঙ্গে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা বা অতল সমুদ্রতলে একটী শুক্তি এগুলির অস্তিত্ব—আমি অনুভব করি বা না করি এগুলির অস্তিত্ব আছে অনুমান করিয়া লই। কিন্তু কাহারও অনুভবে না থাকিলে যখন কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, তখন ইহাদের অনুভবকর্ত্তা একজন আছেন। ইনিই অধিষ্ঠান-চৈতন্য। এই অধিষ্ঠান-চৈতন্যের নিত্য অনুভবে এই বিশাল জগৎ সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া আছে। ইনিই সর্ব্বান্তর্য্যামী, ইনিই সগুণ ব্রহ্ম।

যখন বলা যায় আত্মা ত নিগুর্ণ, ব্রহ্ম ত নিগুর্ণ। তিনি ত আপনিই আপনি। আর কিছুই ত তাঁহাতে থাকিতে পারে না—সেই নিগুর্ণ ব্রহ্ম, সেই নিরুপাধি ব্রহ্ম, সেই অবিজ্ঞাতস্বরূপ ব্রহ্ম, সেই ইন্দ্রিয় মনের অগোচর ব্রহ্ম—তাঁহার অনুভবে কি জগৎ থাকিবে? না জগৎ নিগুর্ণ ব্রহ্মে নাই। যিনি অন্তর্য্যামী তিনি সগুণ ব্রহ্ম। নিগুর্ণ যিনি তিনিই মায়া অবলম্বনে সগুণ হয়েন। যাঁহারা বলেন আত্মা নিগুর্ণ হইতে পারেন না, তাঁহারা কতদূর ঠিক অনুমান করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের আর একবার আলোচনা করা উচিত। না করেন অন্য কাহারও ক্ষতি নাই। করিলে তাঁহার সম্যক্ লাভ হইতে পারে।

মহাভারত অনুগীতা হইতে আমরা আত্মা সম্বন্ধে নিগুর্ণত্ব ও সগুণত্বের উপদেশ উঠাইলাম।

"জীব নিগুর্ণ ও দেহ পরিশূন্য। কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ

উহাকে সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া গণনা করে। এক্ষণে যাহাতে ভ্রম দূর হয় ও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারা যায়, আমি সেই উপায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

বুদ্ধি প্রথম অরণিকাষ্ঠ এবং গুরু দ্বিতীয় অরণিকাষ্ঠ স্বরূপ। বেদান্ত শ্রবণ ও মনন দ্বারা ঐ উভয় কাষ্ঠ মথিত হইলে ঐ কাষ্টদ্বয় হইতে জ্ঞানাগ্নির উদ্ভব হয়। যোগীরা শ্রবণ মননাদি দ্বারা শরীরস্থিত আত্মাকে পৃথক্‌ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। শমদমাদির অভ্যাস নিবন্ধনই ঐ পরম পদার্থের (পরমাত্মার) সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।” ১২৪

সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে ভূত সমস্ত উৎপন্ন হয়। সত্য স্বভাবতঃ নির্গুণ। যখন উহা সগুণ হয় তখন উহাকে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরায়ুজাদি প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ১৩৪

সত্যস্বরূপ ঈশ্বর = পরমাত্মা।

কোন কোন মহাত্মা ব্রহ্মকে জগদাকারে পরিণত বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং কেহ কেহ বা তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহার অন্তকালে উচ্ছ্বাসমাত্র কালও পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে তাঁহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নিমেষ মাত্র জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে নিরুদ্ধ করিলে চিত্তপ্রসন্নতা দ্বারা মুক্তিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালে দশ বা দ্বাদশ বার প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণসমুদায় সংযত করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ব্রহ্মলাভ হয়।

অব্যক্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া উদ্বুদ্ধ হইলেই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

কোন কোন মহাত্মা সত্ত্বগুণ ব্যতীত আর কোন গুণেরই প্রশংসা করেন না। তাঁহারা বলেন সত্ত্বগুণ আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ সমুদায় আত্মার নিত্যসিদ্ধ। সুতরাং আত্মার সহিত সত্ত্বের একীভাব সম্পাদন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে।

এই মত নিতান্ত দূষণীয়; কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ সমুদায় যদি আত্মার নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আত্মার অনুচ্ছেদে উহাদিগের কি নিমিত্ত উচ্ছেদ

হইবে ? [আত্মা ত সর্ব্বজীবেই সর্ব্বক্ষণ আছেন, কিন্তু ঐ সমস্ত গুণ সর্ব্বজীবে থাকে না কেন ?]

সত্ব আত্মা হইতে পৃথক্ বটে ; কিন্তু আত্মার সহিত উহার সবিশেষ সংস্রব আছে বলিয়া, উহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন মশক ও উড়ুম্বরের, সলিল ও মৎস্যের এবং পদ্মপত্র ও জলবিন্দুর একত্ব ও পৃথকৃত্ব উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্বগুণেও আত্মার একত্ব ও পৃথকৃত্ব প্রতীত হয়"। ১৪৮

সত্ত্বগুণ ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ বিষয় ও পুরুষকে বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উড়ুম্বরের মধ্যে মশক যেমন নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ পুরুষ সত্ত্বগুণে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ অচেতন পদার্থ, উহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। পুরুষ যে ঐ গুণকে সর্ব্বদা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা ঐ গুণ কোন ক্রমেই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না ; কিন্তু পুরুষ ঐবিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া থাকেন।

পণ্ডিতগণ সত্ত্বগুণকে সুখ দুঃখাদি যুক্ত এবং পুরুষকে সুখ দুঃখাদি বিহীন ও নিগুর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

সত্ত্বগুণ কর্ম্মে সংযুক্ত থাকিলেই আত্মাকে প্রকাশ করে এবং কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইলেই বিনষ্ট হয়। যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেও পদার্থ সমুদায় বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হইলেও পুরুষের বিনাশ হয় না।

নিগুর্ণ আত্মা নাই যাঁহারা বলেন, তাঁহারা আত্মা বা ব্রহ্ম কি তাহা কতদূর বুঝিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্য দৃষ্টে আর একবার আলোচনা করুন ইহাই বক্তব্য।

যাহা উদ্ধৃত করা হইল তাহা ভিন্ন যুক্তিও আছে। মানুষ যদি নিজের স্বরূপ কি আলোচনা করে, তবে স্পষ্ট দেখিতে পায় যিনি থাকাতে মানুষ মানুষ, যিনি আছেন বলিয়া মানুষ বলিতে পারে, চলিতে পারে, খাইতে পারে, শুইতে পারে, দেখিতে পারে, শুনিতে পারে, ভাবিতে পারে, আলোচনা করিতে পারে—মানুষের মধ্যে সেই বস্তুটিই হইতেছে চৈতন্য। অন্য কোন জিনিষের সহিত চৈতন্য মিশিতে পারে না, মিলিতেও পারে না। এই চৈতন্য বস্তুটিই আপনি আপনি নিগুর্ণ ব্রহ্ম। এই চৈতন্যটি বাদে আর যাহা মানুষের মধ্যে আছে তাহা জড়। তবে যে মনকে চেতনের মত মনে হয় ইহার কারণ আর কিছুই

নহে; যে শক্তিকে মন বলে সেই শক্তিটি চৈতন্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া চৈতন্যের ছায়া মনের উপর পড়ে, পড়িয়া উহাকে চেতনের মত কার্য্য করায়। সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন জলের উপর বা কাচের উপর পড়িয়া উহাদিগকেও সূর্য্যের মত প্রখর করিয়া তুলে সেইরূপ।

তাই বলা হইতেছে "আপনিই আপনি" এইটি নির্গুণব্রহ্ম। ইনি মাত্র জ্ঞাতা—ইঁহাকে আর কেহই জানিতে পারে না। ইনি দ্রষ্টা, ইঁহাকে দেখিতে পারে এমন কেহই নাই। এজন্য ইঁহাকে বলা হয় অবিজ্ঞাতস্বরূপ।

এই "আপনিই আপনি" টি অথবা নির্গুণব্রহ্ম যেরূপে সগুণব্রহ্ম আগমন করেন তাহা এই।

নির্গুণ ব্রহ্মের এক অনির্ব্বচনীয়া শক্তি আছে। শক্তিটি কখন ব্রহ্মের সহিত মিলিয়া এক হইয়া থাকেন, কখন বা তাঁহাতে পৃথক্ হইয়া অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করেন। মণির যেমন ঝলক হওয়া স্বাভাবিক—ব্রহ্মে শক্তির ঝলকই সেইরূপ স্বাভাবিক। যখন ঝলক উঠে তখন ঐ শক্তিই ব্রহ্মকে "আপনিই আপনি" অবস্থা হইতে সাকার অবস্থায় আনয়ন করে। সাকার ব্রহ্মই সগুণব্রহ্ম। আর শক্তিটি মায়া। যখন শক্তি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া থাকে, যখন স্পন্দন উর্দ্ধমুখে কম্পিত হইয়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করে—তখন ইহা আপনি স্পন্দধর্ম্ম হারাইয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। শক্তি যখন শক্তিমানে মিশিয়া যায়, দাহিকাশক্তি যখন অগ্নিই হইয়া যায়, চন্দ্রিকা যখন চন্দ্রই হইয়া থাকে, তখন শক্তিকে আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। যদি বলা যায়, শক্তিমানেই শক্তি আছে—তখন জিজ্ঞাসা কর, যদি থাকে তবে ধরিয়া দাও যদি থাকে তাহার অনুভব নাই কেন? সুষুপ্তিতে যখন শক্তি লয় হইয়া থাকে, তখন তাহার অনুভব নাই কেন? যাহা কাহারও অনুভবে নাই তাহাকে নাই বলনা কেন? না তাও বলিতে পার না। যদি শক্তি শক্তিমানে না থাকে তবে শক্তির ব্যক্তাবস্থা যে জগৎ তাহা আইসে কোথা হইতে? যাহা নাই তাহা হইতে অন্য কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। এই কারণে বলা হয় শক্তিকে আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। শক্তিকে এইজন্য বলে মায়া। এই জন্য বলা হয় মায়া ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয়া শক্তি।

মায়াই ব্রহ্মের সান্নিধ্যে চেতন মত হইয়া তাহাতে ঈশ্বর ও জীব ভাব কল্পনা করে। বলা হইতেছে মায়াই ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম কল্পনা করেন। মায়াই সগুণব্রহ্ম বা বিশ্বরূপ কল্পনা করেন, মায়াই আবার বিশ্বরূপকে মায়া মানুষ-

রূপে কল্পনা করেন। মানুষে অবতার কল্পনা করে না। ক্লৃপ ধাতুর অর্থ সামর্থ। পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয়া শক্তির সামর্থই এই তিনি “আপনিই আপনি ভাবকে আকার দিতে পারেন। নিগুর্ণব্রহ্মকে সগুণ করিতে পারেন, নিরাকারকে আকার দিতে পারেন। শক্তি এইরূপে ব্রহ্মকে প্রকট করেন; স্বপ্রকাশকে বিশ্বরূপে সাজাইয়া প্রকাশ করেন। শক্তি জড় হইলেও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে প্রকৃতি সাজান, ব্রহ্মকে সাজান পুরুষ বা সগুণব্রহ্ম।

যাঁহারা সগুণব্রহ্মকেও নিরাকার বলেন, তাঁহাদের যুক্তিতে বহু দোষ আছে। যিনি আপনিই আপনি তিনি সত্ব. রজঃ, তম গুণান্বিতা মায়াকে আশ্রয় করিয়া আপনার অপরিচ্ছিন্ন রূপকে পরিচ্ছিন্ন মত দেখান। সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকি-য়াও ক্ষুদ্র মায়া দ্বারা জগৎতরঙ্গ তুলিয়া রূপবান্, গুণবান্. আকারবান মত হয়েন। ক্ষুদ্র মায়া বলা হইতেছে এই জন্য ব্রহ্মের তিন পাদ সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকেন, সর্ব্বদা পরমশান্ত চলনশূন্য তুরীয় অবস্থায় থাকেন। এক পাদের এক অতি ক্ষুদ্র দেশে মায়ার তরঙ্গ উঠে মাত্র। যেমন বিশাল সমুদ্রের এক অতি ক্ষুদ্র স্থানে ঝড় উঠিলে সমুদ্রের অন্য অন্য দেশের প্রশান্ত ভাবের কোন ক্ষতি হয় না, ইহাও সেইরূপ। মাতের হিতকারিণী ভগবতী শ্রুতি এই যে সীমা-শূন্য ব্রহ্মে ভাগ কল্পনা করেন ইহাও কেবল অজ্ঞানীকে বুঝাইবার জন্য।

আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বেদের কোন একটি কথা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না যতক্ষণ না সমস্ত তত্ত্বটি বুঝা হয়। এই জন্য শাস্ত্রের কোন্ একটি তত্ত্ব বুঝিতে গেলে সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বটি বুঝিতে হয়। একোভাব স্তত্ত্বতো যেন দৃষ্টঃ সর্ব্বেভাবাস্তত্ত্বত স্তেন দৃষ্টা ইতি। সেই জন্য প্রধান প্রধান শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়। আমরা বিশ্বাসের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধনার কথা বলিতেছিলাম।

তুমি আছ—অধিষ্ঠানচৈতন্য আছেন এইটি বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রমত কর্ত্তব্য কর—সর্ব্ব কার্য্যে তাঁহার দিকে চাও। সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার সহিত কথা কও। তাঁহাকেই বল, তোমার নাম শুনিয়া তোমাকে ভাল বাসিয়াছি। তোমার আজ্ঞা বলিয়া পালন করিতেছি কোন ফলাকাঙ্ক্ষা আমার নাই। সন্ধ্যা, পূজা, জপ যিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার ত উত্তমই হয় —না বুঝিলেও শুধু বিশ্বাসে তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছি, ভাবনা করিয়া করিয়া গেলে তিনি কৃপা করেন, তিনি বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া যাহাতে জ্ঞান জন্মে তাহাই করিয়া দিয়া থাকেন।

বিশ্বাসী ভক্ত সর্ব্বকার্য্যে তাঁহারই উপর নির্ভর করেন। বিশ্বাসী ভক্ত নিজে করিতেছি এই অভিমান রাখিতে পারেন না—নিজের ইচ্ছাও রাখেন না। কাজেই তিনি শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া অমানুষিক কার্য্যও করিতে পারেন। দয়াময় শ্রীভগবান্ আশ্রিতের জন্য সমস্তই করিয়া দিয়া থাকেন। সব জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। এই ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে সাধক যখন সর্ব্বদা তাঁহার কৃপা অনুভব করেন, তখন তাঁহার নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞানলাভ হয়; কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মত্যাগ হইয়া যায়; তখন শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা আত্মদর্শন বা আত্মভাবে স্থিতিলাভ হয়।

এই প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল তাহা সংক্ষেপতঃ এই :—

বিশ্বাসের ধর্ম্মের মূলে থাকে ভালবাসা।

ভালবাসা নিত্য বস্তু চায়। প্রথম প্রথম একটু কিছু সুন্দর লাগিলেই তাহাই বুঝি ভালবাসার বস্তু এই মনে হইয়া যায়। অনিত্যকে নিত্য ভাবিয়া আলিঙ্গন হইয়া গেলে তখন চমক্ ভাঙ্গে। তখন যাহা অনিষ্ট হইল তাহা চক্ষে পড়ে। সেই দোষদর্শনে বৈরাগ্যলাভ হয় এবং নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান হয়। প্রথমেই তাহা পাওয়া যায় না। সাধক নাম শুনিয়া ও গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাতে অনুরাগ স্থাপন করে। শেষে হ য়া যায় অনুরাগের বস্তু আপনিই আপনি।

অনুরাগ লইয়া যে সাধনা করা সেও কেবল তাহাকে নিত্য পাইবার জন্য, তাহাতে নিত্য স্থিতিলাভ জন্য। নিত্য স্থিতিলাভের বস্তুটি তাঁহার পরমপদ।

কোথায় এই পরম পদ? কিরূপে সেখানে যাওয়া যায়?

আমি ও আমার যেখানে উঠিতেছে তাহার নাম মোহস্থান। আমি ও আমার রূপ—গণ্ডী পার হইতে না পারিলে পরমপদে যাওয়া যায় না।

আমি ও আমার রূপ, গণ্ডী পার হইব কিরূপে? দুই প্রকারে পার হওয়া যায়।

(১) আমিকে প্রসারিত করিয়া সীমাশূন্য কর। সকলের মধ্যে তাহাকে দেখিয়া সকলই আমি হইয়া যাক্ খণ্ড খণ্ড আমি না থাকিয়া একটি মাত্র আমি হউক—তখন আমির নাশ হইল বা পূর্ণ আমি হইল।

আবার যখন সকল আর রহিল না—আমিই আমি বা আপনিই আপনি—আর কিছুই নাই একই এক রহিল—তখনও সকল গণ্ডী পার হওয়া গেল।

প্রথম উপায়টি সগুণ উপাসনা—দ্বিতীয়টি নির্গুণে স্থিতি। সগুণ উপাসনা দ্বারাই নির্গুণে স্থিতিলাভ হয়। এতদ্ভিন্ন চিরতরে নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লাভ হয় না।

শ্রীসীতা।

প্রাণেশ্বর! আমি কেমন করিয়া তোমায় পাই? আমি যে তোমার সঙ্গে ছিলাম। কত সুখে ছিলাম। নিরন্তর দেখিতাম। নিরন্তর সেবা করিতাম। সর্ব্বদা এক সঙ্গে ছিলাম। সেই নির্জ্জন কানন বাস, সেই এক সঙ্গে সমস্ত কর্ম্ম করা—কত সুখের সেই কানন বাস! সংসারের পরপারে তোমায় লইয়া সুখে ছিলাম। হায়! আমার কোন্ অপরাধে এই অন্ধকাররূপী দুর্বৃত্ত আমায় তোমার সঙ্গ ছাড়া করিল? এই সংসারসাগরের অন্ধকার রাজ্যে আনিয়া রাখিল? আমি কেমন করিয়া তোমার কাছে যাইব? কেমন করিয়া এই শতপ্রহরীবেষ্টিত সংসার-রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত হইব? কেমন করিয়াই বা মুক্ত হইয়াও এই অপার সাগর পার হইয়া তোমার নিকটে যাইব? প্রিয়তম! আমার আর কে আছে? কে তোমার সংবাদ আনিয়া দিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর্‌বে? কারেই বা আমি দূত করিয়া তোমার নিকট প্রেরণ করি? রঘুনাথ! বুঝি আমি তোমায় আর পাইলাম না। আমি বুঝি এই অভিমান রাক্ষসের হস্ত হইতে আর মুক্ত হইতে পারিলাম না। প্রিয়তম! আমি কত অপেক্ষা করিয়া থাকিব? কবে তুমি আসিবে? কবে তুমি আমাকে এই রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিবে?

স্বামিন্! আমি পারিলাম না। তুমি এস। আমি যে তোমারই। তোমার আদরের প্রণয়িণীকে তুমি আসিয়া উদ্ধার কর। গাব ইব গ্রামং—গো যেমন গ্রামকে প্রাপ্ত হয় তুমি সেইরূপে আমায় প্রাপ্ত হও। যুযুধি বিবাশ্বন্। যোদ্ধা যেমন অশ্বকে প্রাপ্ত হয়, তুমি সেইরূপ করিয়া আমায় প্রাপ্ত হও। বাশ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা। দুগ্ধবতী গাভী যেমন প্রসন্ন মনে হাম্বারব করিতে করিতে আপন বৎসের নিকটে আগমন করে, তেমনি করিয়া তুমি এস। পতিরিব জায়ামভিনোন্যেতুধর্ত্তাদিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ। হে বিশ্ববরণীয়! হে সর্ব্বলোক ধারয়িতা! পতি যেমন জায়ার নিকট গমন করে তুমি তেমনি করিয়া তোমার প্রিয়তমার নিকটে আগমন কর। কবে আসিবে প্রিয়তম? আমি

কবে আবার তেমনি করিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া তোমার গলদেশে দোলাইব? আমি কবে আবার তেমনি করিয়া তোমার জন্য পবিত্র কুসুমশয্যা রচনা করিব? আমি আবার কত দিনে তোমার জন্য পবিত্র আহার্য্য দ্রব্য সাজাইয়া রাখিব? আমি আবার কতদিনে রত্নাসনে তোমায় বসাইয়া, পবিত্রজলে তোমায় স্নান করাইয়া, দিব্য বস্ত্রে দিব্য অলঙ্কারে তোমায় সাজাইব; কবে মৃগমদামোদাঙ্কিত চন্দনে জাতী, চম্পক, বিল্বপত্ররচিত পুষ্প, ধূপ, দীপ দিয়া তোমার আরতি করিব? কবে আমি তোমার চরণসেবার অধিকার আবার পাইব? হায় নাথ! আমি কি আবার তোমায় পাইব? আমার কি এই দুঃখশর্ব্বরী অতিবাহিত হইবে? আবার কি আমার সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতি তোমার আরতি করিতে পারিবে? আবার কি তোমার ক্ষণিক অদর্শনে উন্মাদিনী হইয়া, তেমনি করিয়া ছুটিয়া তোমার কাছে যাইতে পারিব? প্রাণেশ্বর! কবে তুমি আসিবে? তোমা-শূন্য এই প্রাণধারণে আমার কোন্ প্রয়োজন? তোমা-শূন্য এই শ্বাস প্রশ্বাস—এ আমার বিষমূর্চ্ছনার মত জ্বালা দিতেছে। প্রাণেশ্বর! শূন্য প্রাণে আর কত দিন থাকিব? প্রাণেশ্বর! কবে তুমি প্রাণে আসিবে?

এই ক্লেশের সংসার পার হইবার জন্যই সর্ব্বদা হরি হরি করা। পরের কথা ছাড়িয়া, ভিতরে ছাড়িয়া, বাহিরে ছাড়িয়া হরি হরি কর।

হরি স্বপ্রকাশ। তুমি শুদ্ধ সত্ব না হইতে পারিলে সর্ব্বদা হরি হরি করিতে পারিবে না।

মায়ার গুণ তিনটি, সত্ব রজ ও তম। শুভ্রবর্ণ, রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। রজ ও তম থাকিতে কখন তুমি হরিতে একাগ্র হইতে পারিবে না। সত্বটিও প্রকাশ স্বরূপ আর শ্রীহরিও প্রকাশস্বরূপ। সত্বগুণটি যখন রজ ও তমকে পরাভূত করিয়া আপন স্বরূপ যে প্রকাশ—সেই প্রকাশরূপে ভাসে, তখন সত্বগুণের প্রকাশই সেই পরম প্রকাশস্বরূপ শ্রীভগবানে মিশিতে পারে। সমানে সমানে মিলন হয়। শুভ্র শুভ্রে মিশিতে পারে। রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ থাকিতে থাকিতে শুভ্রের সহিত মিলন হয় না। তাই রজ ও তমকে অভিভূত না করা পর্য্যন্ত শুদ্ধ সত্ব জাগে না। শুদ্ধ সত্ব না জাগিলে শ্রীভগবান্ লাভ করা যায় না।

রজ ও তমের অন্য নাম লয় ও বিক্ষেপ। লয় ও বিক্ষেপ কাটানই সাধনা।

বিশুদ্ধ সত্ব কিরূপে প্রকাশ হইবে? শ্রুতি বলেন, আহারশুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধি

সত্ত্বশুদ্ধাদ্ধ্রুবা স্মৃতিঃ। আহারশুদ্ধি কর, সাত্ত্বিক আহার কর, তবে শ্রীভগবান্‌কে লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে—সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিবে। ওই যে বল আজ কেন জাগেনা—কেন জাগেনা জ্ঞান—আহারশুদ্ধি নাই বলিয়া—যা'তা খাও বলিয়া। যদিও সৎসঙ্গে জাগে কিন্তু তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়—পানা পুখুরে ঢিল ফেলার মত। কবি কতক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া কবিতা লিখিল - যেমন লেখা শেষ হইল তেমনি যৈসা কে তৈসা। চিরকাল ভাল ভাল বিষয়ে কবিতা লিখিয়াও কবি ভাল হইতে পারিল না। কেন পারিল না? সাধনা নাই বলিয়া, নিয়মমত কার্য্য নাই বলিয়া, ব্যভিচার ছাড়িল না বলিয়া। এ সমস্ত আহারদোষে ঘটে। তাই শ্রুতি প্রথমেই আহারও শুদ্ধি করিতে বলেন।

শেষ সত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞানপ্রসাদে হয়। ইহাও শ্রুতিবাক্য।

জ্ঞানের প্রসাদ কি?

একমাত্র প্রাণের দেবতা তুমিই আছ। হৃদয়ের রাজা তুমি—যাহাকে লোকে আত্মা বলে—যিনি আত্মারাম। বিষ্ণুমায়া তোমাকে বহুরূপে দেখাইতেছে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া—সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চিন্তা যাহা মনে উঠে অথবা স্ত্রী-পুত্র কলত্রাদি বা বাহিরের দৃশ্য প্রপঞ্চাদি মনে উঠিলেই, তৎক্ষণাৎ ঐ ভাবনা সমস্তকে মন্ত্ররূপী, নামরূপী, প্রণবরূপী, ইষ্টমূর্ত্তিরূপী তোমাতে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।

যে ব্রহ্ম আমার হৃদয়ের রাজা, সেই ব্রহ্ম আবার এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত বস্তুরূপে, বিভিন্ন নামরূপে আপনাকে আপনি আবরণ করিয়া রহিয়াছেন। মায়া তাঁহাকে ঢাকিয়া আছে। তুমি বিশ্বাসে তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে থাক—তাঁহার শরণাপন্ন হও—সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ কর প্রাতে সূর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে স্মরণ কর, বায়ু স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে স্মরণ কর, শত্রুতে মিত্রেতে তাঁহাকে স্মরণ কর, সর্ব্বদা স্মরণ করিতে করিতে তুমি সর্ব্বদা তাঁহাকে লইয়া থাকিতে পারিবে। তখন জ্ঞানপ্রসাদ কি বুঝিবে।

এই জ্ঞানপ্রসাদ লাভ জন্যই সাধনা চাই।

শ্রীভগবৎ বলেন—

নাচরেদযস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞো হজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণাহ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥

যাহার ইন্দ্রিয় জয় নাই—তজ্জন্য যে ব্যক্তি অজ্ঞ, সে ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম্ম (সন্ধ্যাবন্দনাদি) করে না ; সে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না বলিয়া অধর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ রূপ মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়।

উপস্থিত সমাজে বৈদিক কর্ম্মযোগ ও তান্ত্রিক কর্ম্মযোগ এই দুইটি দৃষ্ট হয়।

সন্ধ্যা উপাসনা বৈদিক কর্ম্ম এবং মহাপুরুষের মূর্ত্তি অর্চ্চনা ইহা তান্ত্রিক সাধনা।

বৈদিক কর্ম্ম সমাপনান্তে শুদ্ধচিত্তে মূর্ত্তি-সম্মুখে উপবেশন করিয়া প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি দ্বারা দেহ সংশোধন করতঃ ন্যাসাদি দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে।

গন্ধ মাল্য দূর্ব্বা পুষ্প ধূপ দীপ ইত্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া স্তব স্তুতি করিবে।

পরে "আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্" আমিই হরি এইরূপ ধ্যান করিয়া শান্ত হইয়া যাইবে। ইহাই অহংগ্রহোপাসনা। প্রহ্লাদ হরি হইয়া হরি পূজিয়া হরিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীভাগবত বলেন, যে ব্যক্তি তান্ত্রিক কর্ম্মযোগানুসারে অগ্নি বা সূর্য্য বা জল বা অতিথি অথবা স্বীয় হৃদয়ে আত্মভাবে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন।

ভাবনা—বিন্দুমধ্যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরির নাম—তাঁহাকে প্রণাম, প্রদক্ষিণ, পূজা, স্তব, স্তুতি—তাঁহাকে সাজান, তাঁহাকে ভোজন করান ইত্যাদি দ্বারা ভিতরে এবং জীবকে হরিবোধে সেবা দ্বারা বাহিরে পূজা কর ; করিয়া শ্রীহরি যেমন শত্রু মিত্রকে সমান ভাবে ভাল বাসেন, শ্রীহরি যেমন ক্ষমা করেন সেইরূপ ভাবে ব্যবহারিক কার্য্য কর এবং একান্তে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাস কর—করিলে জ্ঞানপ্রসাদ লাভ করিয়া আত্মদর্শন করিতে পারিবে।

নিত্যধাম।

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্তত স্ততং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

ভয় কি! এ দুঃখ থাকিবে না। আশ্বস্ত হও। সহ্য করিলেই সহ্য করা যায়। সহ্য করিয়া যাও। এই দিন কতক, দুঃখ আর সহিতে পারিবে না? কোন-রূপে এই ক'টা দিন হরি হরি করিয়া কাটাইয়া দাও। দেখিও আবার যেন ভোগে মন দিও না।

শ্রীভগবান্ শোক দিয়াছেন? না কৃপা করিয়াছেন? এক দিন ত সবই যাইবে। তবে দু'দিন আগে বা দু'দিন পরে। সকলকেই এক অবস্থায় আসিতে হইবে। আবার ব'ল হরি হরি করিতে করিতে এই কটা দিন কাটাইয়া দাও। প্রতি দুঃখের সময়ে স্মরণ কর—এই ক'টা দিন কাটাইতে পারিলেই তুমি নিত্য সুখের ধামে নিত্য তাহার সহিত থাকিতে পাইবে।

সেখানে বড় আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন সেখানে আর কিছুই নাই। প্রাচীন বলিয়া, জরাজীর্ণ বলিয়া, কুৎসিত বলিয়া, ক্ষণস্থায়ী বলিয়া সেখানে কিছুই নাই। তাপ দিতে পারে, বা যাতনা দিতে পারে, বা ব্যথা দিতে পারে এমন সেখানে কিছুই নাই। সেখানে শত্রু নাই সবই আপনার, সেখানকার সবই স্বচ্ছ। প্রত্যেকের দেহ পর্য্যন্ত যেন স্বচ্ছ দর্পণ। সে দর্পণে সর্ব্বদা আত্ম-প্রতিকৃতি দেখা যায়। মনের ভিতর বাহির সেখানে নাই। যাহা মনে আসে তাহাই বাহিরে প্রকাশ হয়। এমন সুখের স্থান আর নাই। কল্পনাতেও হইতে পারে না। সেখানে আপনাকে সকলের মধ্যে দেখা যায়, আবার সকলকে আপনার মধ্যে দেখা যায়। সেখানে সকলেই সকলকে আপনার দেখে— সকলেই সকলকে ভালবাসে। সকলেই সকলকে সব দিতে চায়। দেওয়াই সেখানে সুখ। বড় সুখের স্থান সে। সেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, শোক তাপ নাই, জ্বালা যন্ত্রণা নাই। সেখানে বিচ্ছেদ নাই, সেখানে চিরমিলন। সেখানে চিরমিলনে ক্ষণকালের জন্যও বিরক্তি আইসে না। সেখানে সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তু নিত্য নূতন। বিচ্ছেদ আনিয়া মিলনকে মধুর করিতে হয় না—মিলন সর্ব্বদা মধুর সেখানে। সেখানে যত দেখি আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, যত শুনি আবার শুনিতে ইচ্ছা হয়, লাখ লাখ যুগ ধরিয়া দেখিলেও সেই নূতন। এমন সুখের নিত্যধাম সে। এই পৃথিবীরূপ

মরুভূমি পার হইলেই সেখানে যাওয়া যাইবে। নিশ্চয় যাইবে যদি, এই মরুভূমির ক্ষণিক মরীচিকায় ভ্রান্ত না হও।

কোন লোভের দিকে, কোন ভোগের দিকে, কোন প্রলোভনের দিকে, কোন সুন্দরের দিকে এখানে তাকাইওনা। সবই এখানে ক্ষণিক, সবই এখানে দোষযুক্ত, মনও এখানে মিথ্যা—সমস্তই ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মিথ্যা, এইটি নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বদা হরি হরি করিয়া দিন কাটাইয়া দাও। মন পাছে কোন কিছুতে আসক্ত হইয়া পড়ে, পাছে ভুলিয়া যায়—এই ভয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া মনকে এখানকার দোষ সর্ব্বদা দেখাও; বিষয়ের দোষ স্মরণ করাই উৎকৃষ্ট অভ্যাস। ভোগে রুচি না থাকিলেই সর্ব্বদা হরি হরি করিতে পারিবে। ভোগই হরিকে ভুলাইয়া দেয়। হরি হরি করিয়া ক'টা দিন কাটাইয়া দাও। দিন ত গেল, সেখানে শীঘ্র যাইতে পারিবে—সেখানে যাহা চাও স্থায়ীভাবে তাহা পাইবে। সেই মিলন-সুখের আশায় এই ক'টা দুঃখের দিন কাটাইয়া দাও না কেন? এই ত পথ। সর্ব্বদা হরি হরি কর। দেখিও বড় সাবধান থাকিও। এই মায়িক পুরীর কোন কিছুই যেন মিষ্ট লাগিয়া না যায়। এই দেহটাও যেন ক্ষণকালের জন্য মিষ্ট লাগিয়া না যায়। একবার মিষ্ট লাগিলে কিন্তু সে দেশে যাওয়া যাইবে না—আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া এইখানেই আসিতে হইবে। সাবধান! সাবধান! সর্ব্বদা ভয়ে হরি হরি কর। আশায় উৎসাহ রাখিয়া হরি হরি কর। শাস্ত্রবিশ্বাসে গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া হরি হরি কর, অনুরাগে হরি হরি করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইয়া যাইবে।

যদি ক্ষণিকের তরেও ভোগে আসক্ত হইয়া যাও, যদি দেহটাকে ভাল বাসিয়া ফেল, তবে অমঙ্গলবাহী কর্ম্মগতিতে ভ্রমণ করতঃ প্রলয় পর্য্যন্ত জনন মরণ প্রাপ্ত হইবে। যদিও আসক্ত হইয়াও থাক—কিন্তু যদি এখন শোক তাপ পাইয়া বুঝিয়া থাক আসক্তি করাটা ভাল নহে, তবে তোমার পূর্ব্ব-অপরাধ মার্জ্জনা হইয়াছে জানিও। শোককে ভগবৎ কৃপা মনে ভাবনা করিয়া, সর্ব্ব আশক্তি শূন্য হইয়া হরি হরি করিয়া যাও। আর ভুলিও না।

যাহারা হরি হরি করেনা তাহাদের ক্লেশ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত। একবার ভাব দেখি প্রলয়কালের ক্লেশ কিরূপ?

তখন শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হইবে। দু'দিন বৃষ্টি না হইলে সূর্য্য কিরূপ প্রখর তাপে ধরাকে উত্তপ্ত করেন—আর শতবর্ষ জল নাই? সূর্য্যের উত্তাপে সমস্ত

পুড়িতে থাকিবে—জীব কি আর তখন থাকিবে? আহা! এই সমস্ত জীব যখন অগ্নিতাপে অল্পে অল্পে পুড়িতে থাকিবে দগ্ধ হস্ত, দগ্ধ পদ, স্ফুটিত চক্ষু হইয়া যখন হাহাকার করিয়া ছুটিতে থাকিবে, যখন ছটফট্ করিয়া মরিবে তথাকার যাতনা একবার ভাব দেখি। শুধু পুস্তকে পড়িয়া কি হয়? পড়িলেত কতই, শুনিলেওত কত। বই লেখা? ইহাতেও বাহাদুরী নাই। বই কত লিখিলে ভাল কথা কত লিখিলে কিন্তু নিজে যে পামর সেই পামরই রহিয়া গেলে। বুঝিয়া দেখ ঠিক কি না। তাই বলি লেখা পড়ায় বেশী কিছুই নাই। তপস্যা কর, ভাবনা কর তবে ভুল হইবে না। প্রলয়ের ভাবনা আবার ভাব।

তার পর পাতালতল অবধি সমুদায় বিশ্ব যখন দগ্ধ হইয়া যাইবে, তখন সম্বর্ত্তক আদি মেঘসমূহ হস্তিশুণ্ডসদৃশ ধারা সহকারে শতবর্ষ বর্ষণ করিবে। একদিনের মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎবজ্রপাত কতক্ষণ সহ্য করিতে পার? আর শতবর্ষ? তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইবে, বিরাট্ পুরুষ বিরাটদেহ-ত্যাগ করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপী হইবেন। বায়ু পৃথিবীর তন্মাত্র গন্ধ হরণ করিলে ইহা জলে বিলীন হইবে। জল হৃতরস হইলে তেজ মাত্র থাকিবে। সেই তেজ হৃতরূপ হইয়া বায়ুতে লীন হইবে। বায়ু হৃতস্পর্শ হইয়া আকাশে লীন হইবে। আকাশ শব্দশূন্য হইয়া তামস অহংকারে বিলীন হইবে। তামস রাজসে, রাজস ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সহ সাত্ত্বিক অহঙ্কারে, অহংকার সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্বে লীন হইবে। মহত্তত্ত্ব মায়াতে, মায়া বা প্রকৃতি পুরুষে লীন হইবে; সমস্ত মায়িক ব্যাপার নিবৃত্ত হইবে।

যতদিন মায়া আছে, ততদিন আপনার মৃত্যুস্বরূপে নিত্য পীড়াদায়ক এই ক্লেশের সংসার থাকিবে।

আ।

কি করিতে ছুটিতেছ প্রথমে ভাবনা কর। করিবই—মৃত্যুকেও গ্রাহ্য করিব না · যত্ন করিলেই হইবে—অনেক বার যত্ন করিলেও যদি না হয় তবে আমার যত্নেরই কোথাও ত্রুটি আছে আরও যত্ন আবশ্যক ইহা দ্বিতীয়। যাহা যাহা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহার প্রত্যহ অনুষ্ঠান, ইহাই হইল তৃতীয়। সম্বিদ্‌স্পন্দ, মনঃস্পন্দ ও হৃদয় স্পন্দ প্রত্যহ কর। হইবেই।

এই তিনটি পুরুষার্থের স্বরূপ। ইহাদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়। চিত্তে যেরূপ বিষয়স্ফূর্ত্তি হইবে, চিত্তও সেইরূপে স্পন্দিত হইবে। চিত্তকে এরূপ ভাব দেওয়া চাই যাহাতে ইহার সাড়া বুঝিতে পারা যায়; স্পন্দন ধরা যায়। শরীর চেষ্টাও তখন তাহার মত হইবে; ফলও সেইরূপ হইবে।

নিজে যে উদ্দেশ্য স্থির করিলে, যদিও বৃদ্ধদেহে নিজে তাহা সাধনা করিতে না পার তবে বালকদিগকে বাল্যকাল হইতে যত্নপূর্ব্বক সেইরূপ শিক্ষা দাও, সেইরূপ অনুষ্ঠান করাও, সময়ে ফল দেখিতে পাইবে। দৈব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পৌরুষই প্রত্যক্ষ সুতরাং শ্রেষ্ঠ।

পুরুষকারদ্বারাই বৃহস্পতি দেবগুরু, পুরুষকার দ্বরা শুক্রাচার্য্য দৈত্যগুরু। হে সাধু! কত দীন দুঃখী পুরুষকার বলে ইন্দ্রতুল্য হইয়াছে, কত নীচ মানুষ নরোত্তম হইয়াছে। পৌরুষ প্রয়োগ না করিয়া কত ধনবান দরিদ্র হইতেছে আর পৌরুষ প্রয়োগ করিয়া কত দরিদ্রও উত্তম ধনবান হইতেছে।

জীবগণ পৌরুষ বলেই শত সহস্র বিপদ্, সহস্র সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া থাকে।

শাস্ত্র অনুশীলন, গুরূপদেশ, এবং স্বীয় পরিশ্রম, ইহা দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। দৈব দ্বারা কিছুই সিদ্ধ হয় না।

অশুভ পথে প্রধাবিত চিত্তকে শুভপথে লইয়া যাইতে হইবে, ইহাই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। বৎস! যাহা মঙ্গলজনক, যাহা সত্য, যাহাতে কোন পাপের আশঙ্কা নাই তাদৃশ কর্ম্মই যত্নপূর্ব্বক করিবে। ইহাই গুরূপদেশ।

যাহারা অল্প বুদ্ধি—দুঃখের প্রতীকার করিবার পুরুষার্থ নাই কেবল রোদনই সম্বল যাহাদের—তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য দৈব কথার ব্যবহার।

ভোজন কর তৃপ্তি পাইবে; অভোক্তার তৃপ্তি কি? সঙ্কট উদ্ধার চাও পৌরুষ ব্যবহার কর—যে নিশ্চেষ্ট তাহার কিছুই হয় না; সুখও নাই শান্তিও নাই। প্রকৃত পুরুষকার অবলম্বন কর—যাহা চাও পাইবে।

দৈব দেখা যায় না—ইহার নাম অদৃষ্ট। আর জ্ঞানীগণ বলেন পরমার্থ-সাধক-কার্য্যে যত্নপরতাই পৌরুষ। আর অনর্থ সাধক কার্য্যে যে যত্ন তাহাই উন্মত্ত চেষ্টা।

সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অবলম্বনে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কর—করিয়া ত্রিবিধ স্পন্দনে প্রাণপণ কর, স্বার্থ সাধন হইবে।

অজ্ঞান কৃত বৈষম্য দূর কর, অসীম আনন্দ পাইবে, তাহাই পরমার্থ। শাস্ত্র চর্চ্চা ও সাধুসেবা দ্বারা ইহা লাভ কর।

বুদ্ধি দ্বারা সৎশাস্ত্র আলোচনা কর ও সৎসঙ্গ কর—আবার সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র দ্বারা বুদ্ধি বৃদ্ধি কর। যথাকালে সরোবর ও পদ্ম যেমন বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ উভয়ের সাহায্যে উভয়েই বৃদ্ধি লাভ করিবে। বাল্যকাল হইতেই সৎশাস্ত্র ও সৎসঙ্গ অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও। বিষ্ণু পৌরুষদ্বারাই দৈত্য বিজয় করেন; জগৎ রচনা করেন, দৈব বলে নহে।

পুরুষকার ত্যাগ করিয়া কপালে যাহা আছে হইবে বা সময় হইলে হইবে বলিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাক, শুভ হইবে না। যাহাতে বৃক্ষ, সরীসৃপাদির দশা প্রাপ্ত না হও তাহার জন্য পুরুষার্থ কর।

তুমি যেমন অনুভব কর বৃক্ষও সেইরূপ অনুভব করে; সেইরূপ যাতনা বোধ করে; বৃক্ষ আহত হইলে তোমার মতনই সাড়া দেয়—ভাব দেখি কত যাতনা নিঃশব্দে ভোগ করিতেছে, পুরুষার্থ ত্যাগ করিয়া তুমি কি ঐরূপ হইতে চাও?

৮ম সর্গঃ।

দৈব নিরাকরণ।

বৈরাগ্য ২৫ সর্গে দৈব কি তাহা বলা হইয়াছে। "দীব্যতি ব্যবহরতি প্রাণিনাং কর্ম্মফল দানেন" ইতি দৈবম্। যিনি কর্ম্মফলদ্বারা প্রাণিগণকে

নানা অবস্থায় ব্যবহার করেন তিনিই দৈব।

কর্ম্ম করিলেই ফল পাওয়া যায়। যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই তবে দৈব। কর্ম্মফল নিষ্পাদনই তবে ইঁহার কার্য্য।

স্বকর্ম্মফলসম্প্রাপ্তাবিদমিত্থমিতীতি যাঃ।
গিরাস্তা দৈব নাম্নৈতাঃ প্রসিদ্ধিং সমুপাগতাঃ॥

ইদং কর্ম্ম ইত্থমনেন ক্রমেণানুষ্ঠিতমিতি এবং রূপ ফলসম্পন্নমিতি যা গিরো বাগ্ব্যবহারা স্তাঃ॥

আপন কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইলে "এই কর্ম্ম এই ক্রম অনুসারে করিলে এই ফল হয়" এইরূপ যে উক্তি তাহাই দৈব।

দৈবাৎ কিছুই হয় না। পূর্ব্বে যাহা করা থাকে তাহারই ফল অনেক পরে উদয় হয়। এখন যাহার ফল ভোগ করিতেছি—পূর্ব্বকৃত যে কর্ম্মের ফল ইহা, তাহা যখন দেখিতেও পাই না, মনেও করিতে পারি না—শুধু বলা হয় এই যে অকালে পুত্র বিয়োগ হইল অথবা এই যে দারুণ রোগ আসিল—এই জীবনে এমন কিছুই ত করি নাই যদ্দ্বারা আমার এই রূপ হইতে পারে—যাহা দেখিতে পাই না বলিয়া অদৃষ্ট, যাহা স্মৃতিতেও থাকে না বলিয়া নিষ্কারণ মত বোধ হয়, মূর্খ জনে তাহাকেই দৈব বলে। দৈবের কিন্তু কোন আকৃতি ও নাই, কোন কর্ম্মও নাই, কোন স্পন্দও নাই, কোন পরাক্রমও নাই। ইহা মিথ্যা জ্ঞানের ন্যায় রূঢ়। পূর্ব্বকৃত পৌরুষই তবে দৈব—দৈব বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই। চেষ্টাই জীবের ফলদাতা; দৈব কিছুই করে না।

কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে কিন্তু হস্তপদ সঞ্চালন ভিন্ন কার্য্য সমাধা হয় না। লেখনী বিদ্যমান কিন্তু হস্তের ব্যাপার ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না। চেষ্টা ব্যতীত দৈবের উপায় নির্ভর করিলে তবে কিরূপে কার্য্য হইতে পারে? ঐ যে মূঢ় লোকে বলে ভাগ্যে থাকে হইবে—এই উক্তি নিতান্ত তুচ্ছ। কারণ চেষ্টাশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবে না; মূঢ়জনের জানা উচিত ভাগ্য কিছুই করিয়া দেয় না। বিনা চেষ্টায় কিছুই হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত তবে যে ব্যক্তি নিতান্ত অলস দৈবই তাহার স্নান দান মন্ত্রোচ্চারণ ইত্যাদি কার্য্য করিয়া দিত। দৈব দ্বারাই যখন সমস্ত হইবে তখন আর শাস্ত্রোপদেশের আবশ্যকতা কি?

বলিতে পার ভক্তজন ত ভগবানকেই ডাকেন—জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টাও

করেন না—তবে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ কে করিয়া দেয়? আপনা হইতে কত লোক আসিয়া যে তাঁহাকে কত কি দিয়া যায়? যদি মূল অনুসন্ধান কর তবে দেখিবে ভক্তের পূর্ব্বকৃত পুরুষকারই ফলপ্রাপ্তির কারণ। ভক্তজন যে অনন্ত সাধারণ একটু স্থিরত্ব লাভ করেন, ভক্তজনের বাক্য যে সত্য হইতে দেখা যায়, ভক্তজনের প্রদত্ত ঔষধ যে বিশেষ উপকারী—এই গুলিই তাঁহার প্রতি লোক আকৃষ্ট করিবার কারণ। ইহারাও পুরুষকারের ফল। আবার জন্মান্তরের সাধনা ও সংস্কারও ইহারই সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। এই সমস্ত কারণে মনে হয় আপনা হইতে লোকে সাহায্য করিল। আপনা হইতে কাহারও প্রতি কিছুই হয় না। পূর্ব্বে ভক্তজনের গুণ কোন না কোন প্রকারে প্রচারিত হইয়াছিল; তাহারই ফলে অথবা তাঁহার আধুনিক কর্ম্মের যশঃ হেতু মনুষ্য তাঁহাকে সাহায্য করে। তবেই দেখা গেল চেষ্টাই কর্ম্মফল প্রদান করে। দৈব কিছুই দেয় না—দৈব বলিয়াও কিছুই নাই। দৈবই ভগবান এ ভ্রমও কাহারও কাহারও থাকে। সেইজন্য দৈব নাই বলিলে কেহ কেহ বলে—যে দৈব মানে না সে ভগবান মানে না। বিষম ভ্রম ইহা। পৌরুষং নৃষু। শ্রীভগবান দৈব নহেন তিনিই জীবের মধ্যে পৌরুষরূপেই থাকেন। মন বুদ্ধি চিত্ত এসকল অদৃশ্য হইলেও যেমন অনুভূতির গোচর দৈব সেরূপ অনুভূতির গোচর কোন পদার্থ নহে। পুরুষকারই কর্ত্তা। দৈবই নাই—তাহার আবার কর্ত্তৃত্ব কি থাকিবে?

দৈবে যদি থাকে যে, একটা লোক জলে ডুবিয়া মরিবে, আচ্ছা সেই লোকটাকে জোর করিয়া আগুণের মধ্যে ফেলিয়া চাপিয়া রাখ দেখি লোকটা মরে কি না? তবেই দেখা গেল পুরুষকার দ্বারা লোকটা মরিল আর দৈবটা মুখের কথা মাত্র হইয়া গেল।

"এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে" দৈবজ্ঞ ইহা বলিয়া দিলেন, আচ্ছা সেই ব্যক্তিকে অধ্যয়ন করিতে দিও না—দেখদেখি সে পণ্ডিত হয় কি না? কখনই হইতে পারিবে না।

দৈব যাহা করিবেন তাহার জন্য আবার চেষ্টা করা কেন? দৈবই যদি মানুষের নিয়োগ কর্ত্তা হয়েন তবে "দৈবই সমুদায় করিবে এই ভাবিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত থাকুক—নিরন্তর শয়ন করিয়া থাকুক—দৈব আসিয়া তাহার সকল কর্ম্ম করিয়া

যদি বল দৈবই তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেন না তাহাকে কর্ম্ম করাইয়া লন,—না, দৈব ত কর্ম্ম করান না—কর্ম্ম করান কর্ম্ম নির্ব্বাহের উপযোগিনী বুদ্ধি। যদি দৈবকে এই কর্ম্মনির্ব্বাহের উপযোগিনী বুদ্ধি হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া বল, তবে সে দৈব কোথায়? কর্ম্মনির্ব্বাহোপযোগিনী বুদ্ধিকে ত কেহই দৈব বলে না।

মনে কর দুইজন মানুষের কর্ম্মনির্ব্বাহোপযোগিনী বুদ্ধি একরূপ। দুই জনই পরিশ্রম করিতেছে। একজন কৃতকার্য্য হইল, অন্য ব্যক্তি পরিশ্রমের কোন ফল পাইল না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও পাইল না। ইহার কারণ কি? লোকে উত্তর দেয় দৈব। অল্প পরিশ্রমে ধনবান্ যে হইল দৈবই তাহার কারণ—তাহার ভাগ্যে বা অদৃষ্টে ছিল তাই সামান্য চেষ্টাতে তাহার হইল আর বহু চেষ্টাতেও অপর লোকটির হইল না। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হউক। দুই জন দরিদ্র এক জন বড়লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সমান চেষ্টা করিল। প্রথম ব্যক্তি যখন গেল তখন বড় লোকটির মন ভাল ছিল না বলিয়া হইল না, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটি যখন গেল তখন বড়লোকটির মনের অবস্থা ভাল ছিল বলিয়া হইয়া গেল। এক্ষেত্রে লোকে বলে লোকটার ভাগ্যে ছিল, লোকটার প্রতি দৈব প্রসন্ন তাই হইল। এই সমস্ত সন্দেহ দূর করিতে হইলে একটু সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইবে। আপাত দৃষ্টিতে দুই জনের বুদ্ধি সমান হইলেও যে কৌশল করিয়া বলা রূপ পুরুষার্থ করিতে পারিল তাহার হইল, যে গুছাইয়া বলা রূপ পুরুষার্থ করিতে পারিল না তাহার হইল না। আরও কারণ আছে। একজনের পূর্ব্বকৃত শুভ কর্ম্মের ফলদানের সময় আসিয়াছে বলিয়া অল্প পরিশ্রমেই ফললাভ হয়, অন্যের পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত ফলদান করিতেছে বলিয়া নানা চেষ্টা দ্বারাও ফললাভ হইতেছে না। পূর্ব্বকৃত পুরুষকার কল্পনা করাই এসব স্থলে যুক্তিযুক্ত—দৈব কল্পনা বৃথা।

মূঢ় ব্যক্তিরাই দৈব কল্পনা করে। যাহারা দৈবপরায়ণ তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। "মূঢ়ৈঃ প্রকল্পিতং দৈবং তৎপরাস্তে ক্ষয়ং গতাঃ"।

প্রাজ্ঞজন পুরুষকার দ্বারাই মহত্বলাভ করেন। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ত ফলদান করিবেই, কিন্তু উপস্থিত পুরুষার্থ দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংস্কারকে পরাস্ত কর—পুনঃ পুনঃ এই যুদ্ধ কর। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংস্কার যতদিন প্রবল থাকে ততদিন তোমার উপস্থিত চেষ্টা সফল হয় না—তুমি ঐ চেষ্টা আরও বর্দ্ধিত কর; নিশ্চয়ই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে।

বিশ্বামিত্র ঋষি দৈবকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পুরুষকার বলেই

ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। হে রাম! আমি একমাত্র পুরুষকার বলেই বহু সময় ব্যাপিয়া আকাশ গমন করিতে শিখিয়াছি। দৈত্যগণ পুরুষকার বলেই দেবতা সকলকে উৎসাধিত করিতে পারিয়াছিলেন, আবার দেবতাগণ পৌরুষ বলেই অসুরদিগের নিকট হইতে এই বিশাল জগৎ আহরণ করিয়া লয়েন। উত্তম পৌরুষ অবলম্বন কর। পূর্ব্বতন কুকার্য্য যেমন সৎকর্ম্ম দ্বারা বিমল হইয়া শুভে পরিণত হয়; পূর্ব্বদিনের দুষ্ক্রিয়া বিদ্যমান দিবসের শাস্ত্রীয় সৎকার্য্য দ্বারা যেমন ঢাকা পড়িয়া যায়—সেইরূপ প্রাক্তন সমস্ত কর্ম্মও ঐহিক পুরুষকার দ্বারা অভিভূত হইবেই হইবে। ইহা নিশ্চয় করিয়া তুমি প্রবল যত্ন সহকারে সৎকার্য্যে রত হও।

প্রতিদিন নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রথমেই আপনার হিত চিন্তা কর। ভক্তিভাবে শ্রীপুরুষার্থরূপী ভগবানের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া তোমার গন্তব্য স্থানটি কোথায় স্মরণ কর, কি কি উপায়ে তথায় স্থিতিলাভ করিতে পারিবে সেই উপায় গুলি মনে মনে আবৃত্ত করিতে করিতে স্মরণ করিয়া লও, উদ্দেশ্য ও উপায় চিন্তা করিয়া কর্ম্ম করিতে থাক। সম্বিৎস্পন্দ, মনঃস্পন্দ ও ইন্দ্রিয়স্পন্দ ইহাই পুরুষকারের মূর্ত্তি। "দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষ মাত্মশক্ত্যা" দৈবকে নিধন করিয়া আত্মশক্তি দ্বারা পুরুষকার প্রয়োগ কর—ব্যাখ্যা করিওনা যে চেষ্টা করিলাম হইল না তবে আমার দোষ কি—এই ভুল ব্যাখ্যা ছাড়িয়া ব্যাখ্যা কর—যত্ন করিতেছি তথাপি হইতেছে না—নিশ্চয়ই আমার যত্ন বিষয়ে কোথাও দোষ-আছে—এই ভাবিয়া আবার যত্ন কর, আবার চেষ্টা কর, যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ পুরুষকার কর নিশ্চয়ই হইবে।

৯ম সর্গঃ।

কর্ম্মবিচার।

রাম—দৈব যদি নিরর্থকই হয় তবে লোকে দৈব দৈব করে কেন? লোকে যাহাকে দৈব বলে তাহা কি?

বশিষ্ঠ—পণ্ডিতগণ জানেন দৈব এক প্রকার কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মূর্খ লোকে যে দৈব দৈব করে সেটা একটি আশ্বাস বাক্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

আমার বরাত মন্দ; কি করিব; অদৃষ্টের উপরে হাত নাই—দুঃসময় উপস্থিত হইলে মূর্খ জনে এই সমস্ত বাক্যে আপনাকে আপনি আশ্বাস প্রদান করে। অন্যকে ধনবান হইতে দেখিলেও বলে কপালে ছিল হইয়া গেল, তদ্ভিন্ন লোকটার শক্তি কি আমাদের অপেক্ষা বেশী তুমি মনে কর তাহা কখনই নহে। এইরূপে স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগকেই লোকে দৈব নাম দিয়া আশ্বস্ত হয় মাত্র।

রাম—ভগবান্—আপনি বলিতেছেন দৈব নাই। যাহা দৈব বলিয়া লোকে বলে তাহা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম। প্রাক্তন কর্ম্মই দৈব। একবার বলিতেছেন নাই আবার বলিতেছেন প্রাক্তন কর্ম্ম; প্রাক্তন কর্ম্মকে একটা মিথ্যা নাম দিয়া দৈব, অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য এ সমস্ত কেন বলা হইতেছে?

বশিষ্ঠ—যাহা কিছু মানুষের ঘটে তাহা আকাশ হইতে পড়ে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলেই মানুষের সৎসঙ্গ বা কুসঙ্গ লাভ হয়, সুস্থ শরীর বা অসুস্থ শরীর লাভ হয়; সৎস্থান বা অসৎস্থানে বাস হয়; ধনবান্ বা নির্দ্ধনের গৃহে জন্ম হয়; সৎবুদ্ধি বা অসৎবুদ্ধি হয়। মানুষ উপস্থিত কর্ম্ম দ্বারা কোন্ ফল উৎপন্ন হয় তাহা ঐ সময়ের জন্য মনে করিয়া রাখিতে পারে। আর প্রায়শঃ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম স্মরণ রাখিতে পারেনা। বিশেষ কোন্ কর্ম্মের কোন্ ফল তাহাও নির্ণয় করিতে পারে না। কাজেই ফলভোগের সময়ে—কবে তাহা দ্বারা এমন কর্ম্ম করা হইয়াছিল যাহার ফল এই জন্মাবধি কুষ্ঠব্যাধি বা জঘন্য শরীর বা দারিদ্র্য বা কলুষিত বৃত্তি—ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বলে কপালে লেখা আছে ডাক্তারি করিতে হইবে তাই করিতেছি বা কপালে আছে এইরূপে কুস্থানে থাকিয়াও ইহাদের স্নেহে জড়িত হইয়া থাকিতে হইবে তাই আছি। বাস্তবিক এইরূপ চিন্তা করা মূর্খতা মাত্র। যেরূপ অবস্থায় তুমি পড়না কেন—যদি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক থাকে, আর উপস্থিত অবস্থা তাহার প্রতিকূলও হয় তথাপি উপস্থিত পুরুষকার দ্বারা স্নেহাদি তুচ্ছ করিয়া "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং"—নিবৃত্ত মন দ্বারা প্রবৃত্ত মনকে উদ্ধার করিতে হইবে। যতক্ষণ ইহা করিতে তোমার যত্ন না হইতেছে ততক্ষণ তোমার উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ় যত্ন বা পুরুষকার নাই বলিতে হইবে।

আমি কর্ম্মবিচার করিয়া এইগুলি দেখাইতেছি। মানুষের মনের মধ্যে

যখন যেরূপ বাসনা উঠে, তখনই বাসনানুরূপ কর্ম্ম হয়। বাসনা বা মনোভাব একরূপ, কর্ম্ম করে অন্য রূপ তাহা হয় না। ভিতরের বাসনাই বাহিরে কর্ম্মরূপে পরিণত হয়।

"গ্রামগোগ্রামমাপ্নোতি পত্তনার্থী চ পত্তনম্" যে গ্রাম গমনে ইচ্ছুক সে গ্রামে যায়, যে নগর গমনে ইচ্ছুক সে নগরে যায়।

যাহার যেরূপ বাসনা হয় তাহার সেইরূপ চেষ্টাও হয়, সে সেইরূপ ফল লাভও করে। মনে কর অনেক দিন ধরিয়া কেহ অশুভ বাসনা করিয়াছিল—অশুভ বাসনা মত তাহার অশুভ চেষ্টাও হইয়াছিল, আবার অশুভ বাসনা ও অশুভ চেষ্টা জন্য তদনুরূপ কর্ম্ম ও তদনুরূপ ফল ভোগও তাহাকে করিতে হইবে। সকল কর্ম্মই কিছু সঙ্গে সঙ্গেই ফলদান করে না। কোন কর্ম্ম সঙ্গে সঙ্গেই ফলদান করে—যেমন অগ্নিতে হস্ত দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফলপ্রাপ্তি হয়। আবার অনেক কর্ম্ম আছে যাহা দিনান্তে কোনটা বা মাসান্তে, কোনটা বা বৎসারান্তে, কোনটা বা জন্মান্তরে ফল-প্রদান করে। এইরূপ বহু অশুভ কর্ম্ম যখন করা হইয়া গিয়াছে—এবং তাহার ফলে নানা অশুভ অবস্থা যখন ভোগ হইতেছে তখন সে ব্যক্তি যদি শুভবাসনা করিতে আরম্ভ করে, তবে সে শুভবাসনা তৎক্ষণাৎ ফলদান করিতে পারে না। ধৈর্য্য ধরিয়া শত অসুবিধা ভোগের মধ্যেও তাহাকে শুভ বাসনা প্রত্যহ করিয়া যাইতে হইবে। কাজেই পূর্ব্বকৃত বাসনার সহিত তাহার অদ্যতন বাসনার বিবাদ হইবেই। বিবাদে জয়লাভ সেই করিতে পারে যে পূর্ব্ববাসনার ফল-ভোগ সহ্য করিয়া উপস্থিত শুভবাসনাকেই প্রবল করিতে পারে। সকলেই যত্ন করিলে ইহা পারে। তীব্র শুভবাসনা করিতে পারিলেই নিশ্চয়ই শুভ ফল সে পাইবে। এ জন্মে যদি নাও পায় বুঝিতে হইবে তাহার পূর্ব্বজন্মের অশুভ কর্ম্ম অত্যন্ত বলবান্—তথাপি উপস্থিত শুভবাসনা ত্যাগ না করিয়া সে ব্যক্তি প্রবল চেষ্টা করুক—সমস্ত অসুবিধা সহ্য করিয়া সমস্ত দুঃখ সহ্য করিয়া শুভবাসনা দৃঢ় করিয়া যাউক, সে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত পাপ, সমস্ত দুষ্কৃতি খণ্ডন করিয়া পরমপদ লাভ করিতে পারিবে।

তবেই দেখিতেছ বাসনাই শুভাশুভ অবস্থা বা শুভাশুভ কর্ম্মের মূল এখন দেখ বাসনা কি? কেনই বা বাসনা উঠে আর কেনই বা বিনা বাসনায় কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না?

Registered No C 583.

৬ষ্ঠ বর্ষ।] ভাদ্র, আশ্বিন ১৩১৮ সাল। [৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীমনীলাল রায়চৌধুরী।

কলিকাতা, ১০ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট
উৎসব কার্য্যালয় হইতে—শ্রীযুক্ত মনীলাল রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

ভাদ্র, আশ্বিন।

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৬ষ্ঠ বর্ষ] ১৩১৮ সাল, ভাদ্র ও আশ্বিন। [৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গণপতি।

সিন্দূর বরণ, সুন্দর তনু,
সিদ্ধিদাতা গণপতি—
রূপে নব ভানু।
করিকর শিরে শোভা
মুক্তার মালা।
হিমালয়ে থেকে থেকে
চমকে চপলা।
বিঘ্নহর, বুদ্ধদেব,
গঙ্গাধর সুত।
জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্ব পূজ্য—
শৈলজা-প্রসূত।
নগপতি তনয়াজ,
দেব গণপতি।
তব পূজা অগ্রে বিধি—
লহ মম প্রীতি।

মহাকাব্য-কবি ব্যাস
মহাভারতের।
তুমি তার জন্মদাতা
স্মৃতি আমাদের।
শ্রী ....

কোন্ মানুষ কি রকম।

কোনও মানুষ দেবতা, কোনও মানুষ মানুষ, আর কোনও মানুষ পশু।

যে সমস্ত মানুষ নিদ্রা, আলস্য, অনিচ্ছা লইয়া থাকিতে ভাল বাসে, তাহারা দেহত্যাগের পরে নরকে গমন করে এবং শেষে পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

যাহারা এটা করা চাই, ওটা করা চাই; এই সব না করিলে হইবে না এইরূপ তৃষ্ণা লইয়া থাকে, তাহারা মৃত্যুর পরে আবার পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ মিশ্রিত মানুষ জন্মই পায়; কিন্তু যে সব মানুষ শাস্ত্রীয় জ্ঞান কর্ম্মে নিরত, তাহারা মানুষ হইয়াও দেবতা। ইঁহারা সত্ত্বগুণের মানুষ। ইঁহারা মৃত্যুর পরে ক্রমে ক্রমে গন্ধর্ব্বলোক, পিতৃলোক, দেবলোক হইতে সত্যলোক পর্যান্ত আনন্দ-লাভ করিতে করিতে গমন করেন।

সত্ত্বগুণ যাঁহাতে প্রবল তিনি ঊর্দ্ধলোকে, রজোগুণে মধ্য-মানুষলোকে, তমোগুণে অধলোকে-পশ্বাদিতে গমন হয়।

যে মানুষের জ্ঞান প্রবল, সর্ব্বদা আত্মজ্ঞান লাভে চেষ্টা, যে সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে নারায়ণ দর্শন করিয়া নারায়ণের সেবার জন্য কর্ম্ম করে, যাঁহারা সর্ব্বনরনারী এমন কি স্থাবরাদিকেও ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা করিয়া শরীর দিয়া সেবা করে, বাক্য দিয়া তৃপ্ত করে সেই সব মানুষ সাত্ত্বিক। ইহারা ভিতরে সর্ব্বদাই আপন ঈপ্সিততমের সহিত কথা কহেন। ভিতরে সুমিষ্ট কথা কহিতে পারেন বলিয়া, বাহিরে অন্য লোকের মধ্যেও তিনি আছেন জানিয়া সেখানেও তাঁহার সহিত কথা কহেন। তিনি যাহা দেখেন তাহাতেই যেন ভিতরের কোন কিছু দেখিয়া, তাহাকেই বাহিরে অন্য লোকের মধ্যেও দেখেন; কাজেই সে দেখাও যেন বড় মধুর।

যে মানুষের দেহে সত্ত্বগুণ কার্য্য করে সে মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া যেন ভিতরের সেই রমণীয় দর্শন বাহিরে আইসেন; কাজেই তিনি যাহা দেখেন, যাহা শোনেন, যাহা করেন, যাহা বলেন—তাহাই আনন্দময়। তিনি যেন সর্ব্বদা কোন জ্ঞানময়, আনন্দময় নিত্য সত্ত্ব পবিত্র আত্মবস্তুর উপলব্ধি করেন।

যখন রজোগুণ দেহে বর্দ্ধিত হয়, তখন বহু ধনাগম হইলেও ইচ্ছা হয় আরও আসুক; যাহার যে সখের বস্তু দেখা যায়, তখন সেইরূপ সখের বস্তু পাইবার ইচ্ছা হয়; সর্ব্বদাই একটা ফিকির থাকে কিরূপে অর্থ বাড়িবে, সখের দ্রব্য মিলিবে। এইরূপ মানুষ বহুবিত্তসাধ্য বহুআয়াসকর গৃহ উদ্যানাদি কর্ম্ম আরম্ভ করে।

এই রজোগুণের মানুষ অমুক কার্য্যের পর অমুক কার্য্য করিতে হইবে—ইহাতে ব্যাকুল হয়। পরের ধন, পরের জনী আত্মসাৎ করিতে সর্ব্বদা বাসনা থাকে।

আর তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে যাহা হয় তাহাতে (১) লোকে নানাবিধ উপদেশ শুনিয়াও জ্ঞানের উদয় হয় না বলিয়া দুঃখী।

(২) সমস্ত কর্ম্ম জানিয়াও কর্ম্মে অনিচ্ছা, উদ্যমহীনতা।

(৩) কর্ম্ম জানিয়াও যথাসময়ে স্মরণ হয় না, অনুষ্ঠান হয় না।

(৪) নিদ্রা তন্দ্রা ইত্যাদি সর্ব্বদাই যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব থাকে।

আপনি-আপনি একান্তে।

যদি বুঝিয়া থাক আপনি আপনি সকল করায় সুখ—কথা কওয়ায় সুখ, কথা শোনায় সুখ, দেখায় সুখ, দেখানায় সুখ, সাজায় সুখ সাজানায় সুখ,. পূজা করায় সুখ, পূজা নেওয়ায় সুখ, পূজা অন্তে সেবা করায় সুখ, সেবা নেওয়ায় সুখ, যদি বুঝিয়া থাক মানস পূজার পর আপনাকে আপনি বুঝায় সুখ, আপনার সহিত আপনি বিচার করায় সুখ, যদি ঠিক বুঝিয়া থাক আপনাকে আপনি প্রশ্ন করায় বড় সুখ—জিজ্ঞাসা করা হাঁগা আমি কে, তুমিই বা কে এই লইয়া হাসাহাসিতে বড়ই সুখ—যদি বুঝিয়া থাক আপনি আপনি স্তব করায় বড় সুখ, বিচার বান্ হওয়ায় বড় সুখ—যদি এই সব বুঝিয়া থাক, তবে আর তুমি ব্যভিচার

করিতে পার না—আর তুমি লোকসঙ্গ করিতে পার না—তবে তুমি সর্ব্বদা বলিবে "অব সব বিষ সম লাগই"।

এ অবস্থায় তুমি নির্জ্জনে থাকিতে চাহিবে—নির্জ্জনে আসিয়া আপনার সহিত আপনি কথা কহিয়া যেন জুড়াইবে। আপনার আদর আপনি পাইয়া শীতল অন্তঃকরণে এমন একটা আহ্লাদ ভোগ করিবে যাহার আর তুলনা নাই। পাখী বন্দুকের আওয়াজে ভীত হইয়া যখন প্রাণভয়ে উড়িতে থাকে—যখন এলোমেলো ভাবে উঠিয়া পড়িয়া তাহার পাখার পালক যেন এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো হইয়া যায়, তার পরে সে যেমন খুব বড় নদীর মধ্যবর্ত্তী কোন নির্জ্জন চরে গিয়া আপনি আপনি বসিয়া আরাম পায়,আর আপনার পালকগুলি ঠোঁট দিয়া গুছাইয়া লইতে থাকে—তুমিও সেইরূপ লোকসঙ্গে নানা কথা শুনিয়া, নানা কথা কহিয়া যখন দেখ মনের পালক, মনের কথা কওয়া, এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো হইয়া গিয়াছে, তখন নির্জ্জনে আপনি আপনি বসিয়া, আপনার সঙ্গে আপনি কথা কহিয়া তবে সুস্থ হও। শ্রুতি এই আপনি আপনি বসিয়া কথা কওয়া, আপনি আপনি সাজা সাজান, আপনি আপনি বিচারবান্ হওয়াকেই বলেন আত্মরতি, আত্মক্রীড় হওয়া। ইহা অপেক্ষা সুখ আর কোথাও নাই।

প্রকৃত সুখ বলে তাকে যেখানে বাহিরের কোন কিছুই নিজের সুখের জন্য আবশ্যক হয় না। আপনার ভিতরে আপনার মোহনরূপ,আপনার ভিতরে আপনার মাধুর্য্য, আপনার ভিতরে আপনার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দেখিয়া আরও দেখিতে ইচ্ছা করে—আপনাতে আপনি থাকিয়া থাকিয়া আরও থাকিতে ইচ্ছা করে—আপনাকে আপনি দেখিয়া দেখিয়া জগতের সব জিনিষকে আপনি ভাবে দেখা হইয়া যায়। যেখানে গাছ দেখিয়া কথা হয়, আকাশ দেখিয়া কথা হয়, সূর্য্য দেখিয়া কথা হয়, বায়ুস্পর্শে আদর পাওয়া যায়, পাখীর ডাকে আপনার কি যেন অব্যক্ত কথা শোনা হয়—যেখানে জগৎ-ভ্রমণটাতে রমণসুখ অনুভব হয়, আত্মরমণ হয়—প্রভাত রমণীয়, দিন রমণীয়, রাত্রি রমণীয়; মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সব আপনি আপনি—বলনা এ অপেক্ষা অধিক সুখ কি কখন ধারণা করিয়াছ? এস এস, লোকসঙ্গ ত্যাগ করিয়া একটু আপনি আপনি থাকি, আপনি আপনি কথা কই, আপনি আপনি মানস পূজা করি, আপনি আপনি গল্প করি, আপনি আপনি হাঁসি কাঁদি, আপনি আপনি বিচার করি। এতদিন ত

লোকসঙ্গের সুখ ভোগ করিলে—এখন একবার আপনি আপনি সুখ ভোগ কর। দিন কতক অভ্যাস কর না, কতকি দেখিবে।

দেখিবে—থাকি থাকি নির্জ্জনে যাইয়া আপনি আপনি কথা কহিতে ইচ্ছা করে; আপনি আপনি কথা না কহিলে প্রাণ যেন অস্থির হয়; আপনি আপনি ফুলের মালা গাঁথিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; আপনি আপনি আপনাকে আপনি স্তব শোনাই শুনি; বিচার শোনাই শুনি; আপনি আপনি ফষ্টিনষ্টি করি—কি যেন কি দেখিয়াছি, কি যেন কি চিনিয়াছি, কি যেন মনের মানুষ পাইয়াছি—দেখিয়াও আশ মেটে না, কথা কহিয়াও সাধ ফুরায় না; যেন এই মানুষের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে ইচ্ছা করে; যেন ইহার কাছে গেলে সব ফুটিয়া উঠে; হরিনাম আপনি ফুটে। আবার সকলেরই এই আপনি আপনি আপনি আছে, তবে মানুষের দুঃখ কি? তবে মানুষ শোক করে কেন? এই কথা কওয়া, এই মানস পূজা করা, এই স্তব স্তুতি করা, এই প্রণাম প্রদক্ষিণ করা, এই সেবা করা, এই সেবা নেওয়া, এই আপনি আপনি স্ত্রী পুরুষ সাজা, সত্য সত্য অনুরাগ অনুরাগিণীর সুখ ভোগ করা—এত সকলেরই আয়ত্ত। এখানে পতিপুত্রহীনা নাই, পতিপুত্রহীন নাই, সধবা বিধবা নাই, ধনী দরিদ্র নাই এযে সবাই পারে, কেন সবাই করে না?

কেন সবাই করে না? একটু কথা আছে।

যাহারা বাহিরে আপনার জন পাইয়াছে মনে করে, তাহারা আপনা আপনি কথা কওয়ায়, আপনা আপনি আলিঙ্গনে কি সুখ পাইবে? আমি বলি এইটিই মানুষের ভুল। বাহিরে পাওয়াটা পাওয়াই নয়। যতই কেন হৃদয়ে টানিয়া লও কিন্তু তবু যেন ঠিক হয় না। যেন কিসের একটা অন্তরায় থাকিয়া যায়। গলার হার খুলিলে হইবে কি? এত সবাই খুলে। তবু কি মিলন হয়? শ্রীভগবানই শ্রীসীতার শোকে বলিয়াছিলেন—

হারে নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্ম্মধ্যে সরিৎ সাগর ভূধরা॥

ছিয়ায় রাখিয়াও বিশ্লেষ থাকে—সরিৎ, সাগর, ভূধর ব্যবধান থাকে। তাই প্রিয় বস্তু যাঁহারা পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন তাঁহারাও ঠিক পান না—যতক্ষণ না প্রিয়জনকে আপনি আপনি করিতে পারেন।

নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।

আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি॥ ইত্যাদি শ্রুতি।

তার পরে ঠিক ঠিক প্রিয় বস্তু পাইয়াছেন, সত্য সত্য মনের মানুষ পাইয়াছেন বা মনের মানুষী পাইয়াছেন এমন ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী কয়জন? তাই বলি যাঁহারা পান নাই তাঁহারা আপনি আপনি পান এই ভাল।

এই আপনি আপনি সব সময়ে পাওয়া যায়। কেবল ব্যভিচার করিলে পাওয়া যায় না। তাহার কাছে গিয়া অপরের কথা ভাবিলে সে চলিয়া যায়। "পড়্‌তা লোকের সাড়া পেলে রাম থাকে না"। তাই ব্যভিচারশূন্য হইয়া আর কিছু না ভাবিয়া আপনি আপনি পাও।

এও মানুষ পায় না। সব সময়ই পাইতে পারে তবু পায় না। বুঝিয়া উঠিতে পারে না—আপনি আপনি পাওয়াটা 'ক।

আমি বলি বুঝিলেই বুঝা যায়। তবে কিছু দিন অভ্যাস করিতে হয়। বিনা সাধনায় কোন সিদ্ধিই হইতে পারে না।

তুমি বল, হে ভগবান্! "আমার হৃদয়ে এস"। এই বলিলেই উপাসনা হয় না। ভগবান্ বলেন আগে হৃদয়টাকে পুষ্পসজ্জা কর—হৃদয়ে আর আঁইস ছড়াইয়া রাখিও না। আমিষগন্ধশূন্য হৃদয় করিয়া তাহাকে সুগন্ধি পুষ্প-গন্ধে আমোদিত কর, আমি তোমার হৃদয়ে আসিব।

বেদ সবাই পড়ে। গায়ত্রী মন্ত্র চণ্ডাল, বাগ্দি সবাইকে শিখাইতে চাও। এটা কর গায়ের জোরে। এতে হয় না কিছু। গায়ত্রী বেদমাতা। বেদ পড়িতে হইলে হৃদয়কে পবিত্র করিতে হয়। তার জন্য সংযম শিক্ষা আগে চাই। তাই ঋগ্বেদ শান্তি-পাঠ মন্ত্রে পাই—বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতং আবিরাবির্ম এধি। হে আবিরাবি! হে স্বপ্রকাশ! তুমি এস আমি তোমার জন্য হৃদয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন তোমার পবিত্র বাক্য যাহা শুনিয়াছে, বাক্যে তাহাই উচ্চারিত হইতেছে। কথায় একরূপ বলিতেছি আর মনে অন্যরূপ ভাবিতেছি—এই নব্য সভ্যতারূপ কপটতা আমার হৃদয়ে নাই। আরও আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। তোমার মধুময়, আনন্দময় বাক্য শুনিয়া, শ্রুতির রসময় বাক্য শুনিয়া মন তাহাকেই বড় আদর করিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমি মনে মুখে এক সমান হইয়াছি, মনে মুখে পবিত্র হইয়াছি। তুমি এস। এ প্রার্থনা তিনি শুনেন। নতুবা শুধু প্রার্থনা।

তাই বলি ব্যভিচার ছাড়ার অভ্যাস একটু কর। কেমন করিয়া করিবে?

কথা ত কতই কও। কেও কাছে থাকিলে ত বৈখরীতে নতুবা অন্য রকমে। যাহা হউক একাই থাক বা লোকসঙ্গে থাক সর্ব্বদাই কথা কহিতেছ। এই কথাটা আপনার সঙ্গে কও। প্রথম যদি আপনাকে ধরিতে না পার, তবে বিশ্বাস কর যার নাম সবাই করে থাকে, সবাই ভগবান্ বলে, যে দয়াময়, যে কাঙ্গালের হরি, যে পতিতের পাবন,—সেই প্রেমময়, সেই দয়াময়, সেই দীন দয়াল, সেই প্রণত পাল সর্ব্বত্র আছেন; বাহিরে আছেন, ভিতরে আছেন। তোমার ভিতরেও আছেন। আগে এইটি বিশ্বাস করিয়া লও। শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুবাক্যে ইহাই দৃঢ় কর। করিয়া নির্জ্জনে থাকিতে চেষ্টা কর। লোকসঙ্গে আছ, থাক, ফাঁকি দিয়া নির্জ্জনে চল। গিয়া স্থির হইয়া ব'স। বসিয়া লক্ষ্য কর মন কি কথা কয়। তখন তাঁহার কাছে মনের দৌরাত্ম্যের কথা বলিতে থাক। দয়াময়! আমি পতিত সত্য! কিন্তু এখন আমি বুঝিয়াছি আমি পতিত। তাই তোমার কাছে আসিয়াছি। আমিত কিছুই দমন করিতে পারি না। তুমি কৃপা কর। তুমি আমার দিকে একবার তাকাও। তুমি আমার মন ঠিক কর। কিছুদিন এই ভাবে মনের উপর লক্ষ্য কর, আর মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ তাঁহার কাছে জানাও, তিনি সত্য সত্যই দীনবন্ধু। তিনি আপনি বলেন—দুঃখী দুঃখ দিয়া আমার পূজা করুক, রোগী যাতনা দিয়া আমার পূজা করুক—সে পূজাও আমি গ্রহণ করি। পূজার সময়ে ব্যভিচারীর হৃদয়ে ফুল, চন্দন, প্রণাম, প্রদক্ষিণ ত আসে না—আসে দুঃখের কথা, আসে টাকাকড়ির কথা, আসে কুটনো বাটনার কথা। পামর জন ঐ দিয়াই আমার পূজা করুক। আমি তাহাদের দুঃখ খণ্ডাইয়া পবিত্র করিয়া লইব। তাই বল বিশ্বাস কর। এই আপনি আপনিকে সকল সময়ে পাওয়া যায়—শুধু তুমি তাহার কাছে গেলেই সে আছে। এটা অশাস্ত্রীয়ও নহে—শাস্ত্রে বলেন, "আত্মাত্বং গিরিজা মতিঃ॥ ইত্যাদি।

তবে কেন বৃথা দুঃখ করিবে বল। আপনি আপনি সবারই আছে। সব

সময়েই আছে। শুধু তার কাছে যাও, দেখিবে সে কত মধুর। আবার বলি তাকে লইয়া জগৎভ্রমণ—জগৎ ভ্রমণটাই আত্মরমণ! হে আপনি আপনি তুমিই সকলকে আপনি আপনির পূজা করাইয়া দাও। ইতি।

শ্রী আমি।

ভ্রম কি—যায় কিসে?

আত্মা চলনরহিত, পরম শান্ত। প্রকৃতিই চলেন, কর্ম্ম করেন। প্রকৃতির কর্ম্ম আত্মাতে আরোপ হয়, আবার আত্মার চেতন ভাব প্রকৃতিতে আরোপ হয়। এই আরোপ ছাড়াইলে মুক্তি।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক। তীরতরু চলে। নৌকারোহী চলিতেছে। নৌকারোহী দেখিতেছে সে নিজে স্থির আছে, আর তীরতরু ছুটিতেছে।

দু'খানি রেলগাড়ী পাশাপাশি হইল। একখানি চলিতেছে একখানি স্থির আছে। যেখানিতে আরোহী সেখানি চলিতেছে অন্য খানি দাঁড়াইয়া আছে। আরোহী দেখিতেছে তাহার গাড়ী স্থির। স্থির গাড়ী চলিতেছে। গাড়ী পাশাপাশি অবস্থা ত্যাগ করিলে জানা যায় কোন্‌টি দাঁড়াইয়া আছে, কোন্‌টি চলিতেছে। কেন এমন ভ্রম হয়? যে গাড়ীতে আরোহী, আরোহীর চিত্ত তাহাই দেখিতেছিল; চিত্ত যাহা দেখে তাহার আকারে আকারিত হয়। দ্রষ্টা পুরুষ চিত্তকেই দেখেন। যখন একখানি গাড়ী ছিল, তখন আরোহীর চিত্ত গতিশীল গাড়ীর আকারে আকারিত বলিয়া দ্রষ্টা পুরুষ চিত্তকে গতিশীল দেখিতে-ছিলেন। যখন দুইখানি গাড়ী হইল তখন স্থির গাড়ীর উপরে গতিশীল চিত্ত পড়িল, কাজেই আবার ঐ স্থির আকারে আকারিত হইল। হইয়া যখন নিজের গতিশীল গাড়ী দেখিল তখন তাহাকে দেখিল স্থির, আর যাহা স্থির তাহাকে দেখিল গতিশীল। চিত্তের জন্যই এই ভ্রম।

চিত্তই দৃশ্য বস্তু। কিন্তু চিত্ত চৈতন্য দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয় আকারে পরিণত হয়। দ্রষ্টা পুরুষ কে ? না চৈতন্য দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত চিত্তই। চিত্তই তবে দ্রষ্টা, চিত্তই দৃশ্য। এইটি জাগরণ অবস্থা।

যখন বাহিরের দৃশ্য থাকে না কিন্তু চৈতন্য উজ্জ্বলীকৃত হইয়া চিত্ত দ্রষ্টা হয় ও সংস্কার উপস্থিত যে দৃশ্য তাহাও হয় (অর্থাৎ সঙ্কল্প বিকল্পরূপ দৃশ্যও হয়), তখন স্বপ্নাবস্থা।

একখানি বস্ত্রে অনেক চিত্র আছে। আর একখানি বস্ত্র তাহার পাশাপাশি অতি নিকটে রাখা গেল। নূতন বস্ত্রখানি এক সঙ্গে চিত্রিত বস্ত্রের ও চিত্র-সমূহের আকারে আকারিত হইল। দৃশ্যবস্তু চিত্তে চিত্রের ন্যায় অঙ্কিত। এই গুলি সংস্কাররূপে থাকে। চিত্ত চৈতন্যের নিকটে থাকিয়া চৈতন্যের আকার ও দৃশ্যবস্তুর আকারে আকারিত হয়। বস্ত্র যেমন চিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, চৈতন্যও সেইরূপ চিত্ত হইতে পৃথক্ এবং তাহার সাক্ষী।

যখন জাগরণ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থার যাবতীয় সংস্কারের সহিত চিত্ত আপনার মূল কারণ অবিদ্যায় লীন হয় এবং সেই অবিদ্যা সংস্কার-মাত্রায় শেষ হইয়া নির্ব্বিকল্প অনুভবরূপ হইয়া চৈতন্যের আশ্রয়ে বিশ্রাম করে তখন সুষুপ্তি।

এই সুষুপ্তি অবস্থাকেও যিনি অনুভব করেন সেই তুরীয়ই তুমি।

পথিক।

কাতর চক্ষে কতই অপ্রস্তুত হইল। সে ত জানে না তুমি কি করিতেছ। ভালবাসিয়া, বিশ্বাস করে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে আসিল আজ কি একাদশী ? তুমি কতই তিরস্কার করিয়া উঠিলে।

উভয়েই পথিক। তুমি প্রভুদেহে, সে ভৃত্যদেহে। পথিক কিন্তু দুজনেই। সে অজ্ঞান, তুমি জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞান। সে জানেনা যে তোমার সহিত সে এক যাত্রার পথিক। তুমি জানিতেছ তুমি পথিক। কিন্তু তুমি ঠিক হইতে পারিলে কৈ ? এখন হইতে কি আত্মস্মৃতি স্মরণে রাখিতে পারিবে ? আপনাকে

বিস্মৃত হইয়া কাহারও উপর কর্ত্তৃত্ব আর করিবে না? বহুদেহ ধারণ করিয়া বহু পথিক এই জীবনযাত্রায় ছুটিয়াছে। কেহ স্ত্রী দেহ, কেহ বালক দেহ, কেহ বৃদ্ধ দেহ, কেহ পশু দেহ, কেহ পক্ষীদেহ—এই অনন্ত দেহে অনন্ত পথিক। মূলে যিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, সকল পথিকের জন্য প্রার্থনা কর। তিনি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

মরণ ত আছেই।

দেহ ত থাকিবেই না। পথিক! তবে কষ্টকে এত ভয় কর কেন? ভয় করিয়া কাজ হারাও কেন? কাজ হারাইয়া কত বার কত দেহে ঘুরিতেছ। পার না যে সেত কাজ হারাইয়াছ বলিয়া। পথিক! তোমার মৃত্যু নাই। দেহ ছাড়াছাড়ি আছে। সর্ব্বদার কাজ ত জানিয়াছ। তাহাই সর্ব্বদা কর। কোন সময় আলস্য করিও না। কখন্ দেহ ছাড়িতে হইবে তাহা ত জান না। সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক। ভুলিও না।

ঐ দেখ ঐ হরিণ-শিশু! উহাকে কত যত্ন করিয়া খাওয়াইল। রোজ কত আদর করিয়া খাওয়ায়। কত সেবা করে। বল দেখি তবু উহার কত অশান্তি। বলনা এমন করিয়া দড়ী টানিতেছে কেন? উহাও যে পথিক। কাজ হারাইয়াছিল। তাই পথ হারাইয়া ঐ দেহে ঢুকিয়াছে। একবার দেখ না। কত কাতর ভাবে ও চাহিতেছে। কত যেন বলে। কাহারও কথা কেহ বোঝে না। মরণ ত আছেই। ক্লেশের ভয়ে কাজ হারাইও না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। কর।

খেয়া।

দিনশেষে, কোন্ দেশে
এনেছ মোরে ?
কর পার, কর্ণধার,
করুণা ক'রে !

সম্বল যে নাহি কিছু,
তাই মোর মাথা নীচু।
—ওই হায়, বেলা যায়,
রেখোনা ধ'রে !

জীবনের কোনকালে,
সঞ্চয় ছিল না ভালে ;
—তাই মাঝি, ভাসি আজি,
নয়ন-লোরে !

দয়া কর, দয়াময়,
হবে তব হবে জয় ;
—এই বেলা, আন ভেলা,
করুণা ক'রে !

কর্ণধার, নমস্কার,
চরণ 'পরে !

শ্রী—

তুলসী দেওয়া।

তুলসীচন্দন চর্চ্চিত করিয়া ঠাকুরকে দিতে আমার সময় লাগে। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছেন ভ্রূমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে জ্যোতির প্রণব। সেই প্রণব মধ্যে বীজ। সেই বীজই শ্রীগুরু। বীজ মধ্যে সুন্দর জ্যোতির

মূর্ত্তি। আমি সেই চরণে তুলসী দিতেছি। কাজেই প্রথমে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া তাঁহার মধ্যস্থলে আসিলাম। তাহার পর প্রণব মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কি জ্যোতির স্থান তাহা! কি সীমাশূন্য স্থান! মনে মনে এই গুলি লেখা হইয়া যায়। প্রণব মধ্যে বহ্নিবীজ। সেই বীজের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সমস্ত পাপবহ্নি শুদ্ধ হইয়া দূর হইয়া গিয়াছে সেই বীজের বৃক্ষ তুমি। তোমার চরণে তুলসী দিতেছি।

ঊর্দ্ধস্রোত—ত্বয়া হৃষীকেশ।

যখন ভাবনাটি ঊর্দ্ধস্রোতে যায় তখন ধর্ম্ম, যখন অধঃস্রোতে বহে তখন অধর্ম্ম।

ভ্রূমধ্যে বা সহস্রারের দিকে যখন প্রাণের স্পন্দন নীত হয় বা মনের ভাবনা প্রেরিত হয় তখন হয় ধর্ম্ম। প্রণব উচ্চারণে প্রাণ ঊর্দ্ধে উঠে—উহার অর্থাবধারণে জ্ঞানমার্গে মন সহস্রার তলেই থাকিতে চায়। যোগ-মার্গে প্রাণ ত্রিকোণমণ্ডল পার হইয়া উপরে উঠে। ভক্তিমার্গে মন পরম-রমণীয় উপাস্যের চরণে প্রণাম করে, তুলসী দেয়, প্রদক্ষিণ করে; পরে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া থাকে শেষে জ্ঞানমার্গে বিচারে সেইখানে স্থিতিলাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করে আমি কে? সংসার কি? তুমি কি? সুন্দর মীমাংসা পায়। যে আমি সেই তুমি। তুমি আপনাকে এত ছোট ভাবনা কর কেন? রাজা হইয়া আপনাকে চামার ধারণা কর কেন? তুমি যে মূলে রাজাই। তুমি যে আমিই। তুমি কষ্ট পাও আপনাকে আমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া। এখন হইতে আমার এক অন্তরঙ্গা সখী তোমাকে দিলাম। সে তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিবে—তুমি রাজা, তুমি সত্যই বড়, তুমি ছোট ভাবনা করিলেও আমিই তোমার সত্তা। আমার সখী তোমার স্ত্রী। তোমার মাতলামি ছাড়াইবার জন্য সতী-স্ত্রী সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। তোমার সমস্ত ভাবনাগুলিকে মস্তকের দিকে ফিরাইবে। তবেই প্রকৃত ধর্ম্ম হইবে। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন—আগে বেশ করিয়া বুঝ। বুঝিবে হৃদিস্থিত বা সহস্রার স্থিত হৃষীকেশকে চিন্তা করিলেই, সমস্ত স্পন্দন ঊর্দ্ধে ছুটিতে

থাকে। যতক্ষণ ইহা না হয়—প্রাণ, মন ও বুদ্ধির স্পন্দন যতক্ষণ উপরে না উঠে, ততক্ষণ ছন্দমত স্পন্দন হয় না। ছন্দমত স্পন্দনেই ধর্ম্ম। নতুবা সমস্তই অধর্ম্ম। হৃষীকেশের চিন্তাতে যখন অহংস্পন্দন হৃষীকেশের দিকে হয়—তখন হয় কি? না অহং তাঁর দিকে স্পন্দিত হইতে হইতে নিকটে গিয়া, তাঁহার সহিত মিলাইয়া যায় বলিয়া দ্বৈত আর থাকে না। অহং না থাকিলেই দ্বৈত নাই। মণির ঝলক উঠুক বা না উঠুক মণি একই আছে; কাজেই পাপপুণ্যবোধের কর্ত্তা অহং না থাকায়—ধর্ম্ম কিসে হয় জানি, অধর্ম্ম কিসে হয় তাহাও জানি। ধর্ম্মেও প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্মেও নিবৃত্তি নাই; কেননা আমি হৃষীকেশের কাছে বলিয়া অহং আর নাই। যাহা হয় হউক, আমি অহং উর্দ্ধস্রোতে বরণীয় ভর্গের সহিত উর্দ্ধনৃত্যে হৃষীকেশে মিশিয়া গিয়াছি।

তুমিই আছ।

আর কিছুই নাই। শুধু তুমি। ভাষা পর্য্যন্ত নাই। শুধু ভাব। ভাষা যেটাকে বলি তাহাই তোমার আত্মমায়া, তাহাই স্পন্দন, তাহাই শক্তি। ভাষাটা যখন ভাবে জড়িত থাকে, তখন আছে বা নাই কিছুই বলা যায় না। যদি বল আছে তবে বলি ধরে দাও; তা পার না, কেনন। ভাষার কোন অনুভব পর্য্যন্ত নাই। যাহার অনুভব নাই তাহা একবারেই নাই বল না কেন? না তাহাও বলা যায় না। কারণ যাহা নাই তাহা হইতে অন্য কিছু জন্মিতে পারে না। ভাষা যদি নাই, তবে তাহা হইতে এত আসিবে কিরূপে? কাজেই ভাষাকে আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না।

তুমি আছ। আর কিছু আছে বা নাই কিছুই বলা যায় না।

তুমি চিরদিনই এক। কি এক আত্মমায়া আপনার উপরে ভাসাইলে তোমার উপরে যেন সুষুপ্তি ভাগিল। কিন্তু সত্য সত্যই সুষুপ্তি আছেও বলা গেল না, নাইও বলা গেল না। যদি বল আছে, বলিব, মিথ্যাটা আছে কিরূপে? যদি বল নাই, তবে বলি সুষুপ্তির কথা বলা যায় কিরূপে? দেখা যায় কিরূপে?

আবার সুষুপ্তিটা স্বপ্নবৎ হইল। আছ তুমিই—সুষুপ্তিও নাই, স্বপ্নও নাই। অথবা আছে বা নাই উভয়ই বলা যায় না। তবুও যে বলা হয় যেন আছে, এটা একটা অজ্ঞানে বলা হয়। এই অজ্ঞানটা কোথায়? এই অজ্ঞানটা কার? তোমাতে ত অজ্ঞান নাই। কোনকালেই ছিল না। যখন স্বভাবতঃ মায়া—মণির ঝলকের মত ভাসিল, তখনও অনুভব করিবার কেহ নাই। অহং তখনও ভাসে নাই বলিয়া কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, খবর নাই। পরে শক্তি স্পন্দিত হইতে হইতে যখন অহং ভাসিল, তখনই অজ্ঞান একটা জাগিল। সেই অজ্ঞানে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত সত্য মত বোধ হইয়া গেল। যাহা আছে বা নাই কিছু বলা যাইতেছিল না, তাহাই আছে মত অজ্ঞানে বোধ হইয়া গেল। জ্ঞানে তুমিই আছ আর কিছুই নাই; অজ্ঞানে তোমার উপরে যেটা ভাসিল সেইটা দেখা গেল এবং সেইটা তোমাকে ঢাকিয়া ফেলিল। প্রথমে আবরণ করিল পরে অন্যরূপ দেখাইল। এটাই মায়ার কার্য্য। জগৎটাও আছে বা নাই কিছু বলা যায় না। তুমিই আছ।

তুমিই আছ। আমি নাই। আমিটা বোধ হয় অজ্ঞানে। আমিটা তোমার উপরে ইন্দ্রজাল। তোমার উপরে মায়া। এ মায়া স্বভাবতঃ ভাসে। তুমি কিন্তু ইহাকে দেখ না। তোমাতে অহং নাই। কিন্তু তুমি যখন অহংকে আয়ত্তাধীন কর, তখন তুমি সগুণ ব্রহ্ম। এই সগুণ ব্রহ্ম সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। এই সগুণ তুমি—তুমি উপাসনার বস্তু। কে উপাসনা করে? তুমি আপন স্বরূপে থাকিয়াও যে একটা ভুল আমি প্রস্তুত কর সেইটা খণ্ড ভাব। সেই খণ্ডটা অখণ্ডকে উপাসনা করে।

তুমিই কেমন একটা মায়াতে আমি হও—তুমিই আকাশে সূর্য্য মত, চন্দ্র মত, সমুদ্র মত, আকাশ মত, মন মত, বুদ্ধি মত। এস এস তুমি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে প্রণব, প্রণব মধ্যে বীজ, বীজের মধ্যে নাম। আমি সেই নাম জপি, আর সর্ব্বত্র তুমি এই ভাবনা করি।

শ্রীচৈতন্য।

১

গলিত কাঞ্চন জিনি, ঢল ঢল তনুখানি,
এই সেই শচীর নন্দন,
সদাই ভাবেতে ভোরা, উন্মত্ত নব গোরা,
আত্মহারা যেন অনুক্ষণ !

২

এ কচি বয়সে মরি, ছেড়ে গেছে ঘর বাড়ী,
সাজিয়াছে চির-উদাসীন,
কমণ্ডলু করে হায় ! হেরে বুক ফেটে যায়,
পরিধানে ডোর ও কৌপীন !

৩

নগ্নপদ, মোড়া মাথা, মরমে কি যেন ব্যথা,
ব্যাকুলতা প্রাণে যেন সদা,
আঁখি হ'তে অনিবার, দর দর বহে ধার,
যেন সার করিয়াছে কাঁদা !

৪

কেঁদে ফেরে বনে বন, শ্রীক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন,
অন্বেষণ করে যেন কার,
অন্য বোল্ মুখে নাই, হরিবোল সর্ব্বদাই,
হরি বলি ছাড়য়ে হুঙ্কার !

৫

অধীর হিয়ায় প্রভু, যদিও ভ্রমে গো তবু,
ধৈর্য্যশীল তরুর সমান,
অঙ্গেতে প্রেমের স্ফূর্ত্তি, দীনতার প্রতিমূর্ত্তি,
নাহি ওগো মান অভিমান !

৬

এমন দয়াল ভাই, দেখিয়াছ কে কোথায়,
বাছা নাই চণ্ডাল ব্রাহ্মণ,
উচ্চ নীচে ভেদ নাই. সম্মুখে যাহারে পাই,
তারি সনে করে আলিঙ্গন !

৭

তারেই আদরে বলে, বল হরি বাহু তুলে,
হরি ব'লে নাচ কুতূহলে,
হরি-নাম শুধু সার, হরি-নাম বিনে আর,
অন্য গতি নাহি কলিকালে।

৮

করে গৌর ! হরিধ্বনি, ডুবু ডুবু এ ধরণী,
হরি-নাম সুধাসিন্ধু জলে.
সে নাম শুনিয়া মরি, দূরে থাক্ নর নারী,
পশু পাখী হরি হরি বলে !

৯

প্রেমে ভাষা গদ গদ, টল মল দু'টী পদ,
প্রেম-নৃত্য করে গৌররায়,
প্রেমে প্রেম, প্রেমাধার, বিলায় ঐ ভারে ভার,
গৌণ আর করিস্ নে রে আয় !

শ্রী............

কাছাড়ে ভূবন তীর্থ।

কাছাড় জেলার প্রধান নগর সিলচর হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে সোনাইমুখ নামে গণ্ডগ্রাম। এই গণ্ডগ্রাম হইতে ১৪ মাইল দূরে ভুবন পাহাড় অবস্থিত। সমতল হরিৎ শ্যামল শস্যক্ষেত্র পরিশোভিত ভূখণ্ডের পূর্ব্ব প্রান্তে বৃহৎ কৃষ্ণকায়

প্রাচীরের ন্যায় এই ভুবন পাহাড় দণ্ডায়মান—সমতল ক্ষেত্র হইতে হঠাৎ একেবারে খাড়া প্রায় ৩১৪০ ফুট উঠিয়াছে। এই পাহাড়ের শিখরদেশে ভুবনেশ্বর বা "ভুবন বাবার" স্থান। দুর্গম পথ, এজন্য সর্ব্বদা লোকসমাগম হয় না। সম্বৎসরে একবার মাত্র এই দেবালয়ে যাইবার জন্য মহতী জনতা হয় সে শিবরাত্রি উপলক্ষে।

ফাল্গুন মাসে শীতের প্রখরতা কিঞ্চিৎ মন্দীভূত, অথচ শীত যাহা আছে তাহাও কম নহে; বসন্তাগমে তরুপল্লব সবে মুকুলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ক্ষেত্রে শস্যাদি অধিকাংশই কাটা হইয়া গিয়াছে—অথচ মাঠের অর্দ্ধনগ্ন শোভাও প্রাণ-স্পর্শী, এ হেন সময়ে নানা দেশ বিদেশ হইতে এই তীর্থে লোকসমাগম হয়, যে সমস্ত লোক যায় তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীর এবং সর্ব্বদেশীয় লোক দৃষ্ট হয়; ১০।১৫ হাজার লোক সমবেত হয়। দোকান পাট, খাদ্যাদি লইয়া ছয় মাইল চড়াই ভাঙ্গিয়া পর্ব্বতের উপর জঙ্গল পরিষ্কৃত করিয়া একটি মেলা বসে। মেলা এক সপ্তাহ থাকে। অন্ধ আতুর খঞ্জ, স্ত্রীলোক বালক শিশু, বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবা যুবতী—সকল প্রকার লোক বাবা ভুবনকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইবার মানসে এ স্থানে আগমন করে। ত্রিতাপতাপিত জীব তৃপ্তির আশায় তাঁহার শীতল চরণে মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতে বা অহৈতুকী ভক্তি হেতু সমাগত হয়—যে জ্বালা মস্তকে লইয়া লোকে যায় কয়জন তাহা নিবৃত্ত করিয়া আইসে?

ভুবন পথে গোযান বা পদব্রজে ভিন্ন যাইবার অন্য ব্যবস্থা নাই। তাহাও কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত। যতই পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় ততই মনুষ্য-আবাসশূন্য হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ জঙ্গল মধ্যে যাইতে হয়—এজন্য প্রায়ই লোকে দলবদ্ধ হইয়া যায়। এত লোক সমাগম হয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন মহামারী বা দৈব দুর্ঘটনা ভুবন বাবার কৃপায় কদাচ শুনা যায় না। পাহাড়ের চড়াই ছয় মাইল—রাস্তা নাই, কেবল মাত্র লতা, আগাছা, পাথর, বৃক্ষমূল প্রভৃতি ধরিয়া অগ্রবর্ত্তী লোকের পদানুসরণ করিয়া—ভুবন বাবার নামে পশ্বাদিসংকুল বিজন অরণ্য মুখরিত করিয়া জনশ্রেণী উঠিতে থাকে। পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই—সঙ্গে সঙ্গে নিম্নস্থ অনেক লোক পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই খঞ্জ, অন্ধও যায়—দুর্ঘটনা কখন হয় না। সকলেই সকলকে সাহায্য করে, সকলেই সকলের সেবা করিতে ব্যস্ত। প্রথম দিবস শিলচর হইতে সোনাইমুখের বাজারে আসিয়া বিশ্রাম করে, পরদিন প্রাতে যাত্রা

করে। কোথাও বন্ধুর, কোথাও সমতল, কোথাও শ্যামল ক্ষেত্র কোথাও প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়ে; পরে জঙ্গল মধ্যেই পাহাড়ের মূলদেশে এক চটী আছে তথায় পৌঁছায়—আসিতে প্রায় বেলা অবসান হয়। পরদিন প্রত্যুষে "জয় ভুবন বাবা কি জয়" শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ত্রয়োদশীর দিনে পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করে। বাবার মন্দিরের নিকট একটী জলাশয় আছে, কিন্তু শীতকালে তাহা শুখাইয়া যায়; এজন্য ভারে ভারে জল গবর্ণমেণ্ট লোকদ্বারা এবং শ্রীমন্দিরের দেবসেবকগণ আনাইয়া রাখেন। আহারাদিও প্রায় সকলে সঙ্গে করিয়া লয়েন। যদি কাহারও সঙ্গে কিছু না থাকে—আহার্য্য বা শীতবস্ত্র অপ্রতুল হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিবামাত্র পাওয়া যায়; কারণ সকলেই চায় দিতে,লইতে ব্যগ্র নহে; তবে অনাথ দরিদ্র ত সর্ব্বত্রই আছে। বাবার স্থান-মাহাত্ম্যে সকলেরই হৃদয় উদার—যেন সকলেই আপনার জন—আত্মপর ভেদ নাই—উচ্চ জাতি নীচ জাতির সহিত সৌহার্দ্দ্য করিতেছে। পুণ্যক্ষেত্রে দানই বিধি, সুতরাং সাধ্যানুসারে সকলেই মুক্তহস্ত। আবার ছয় মাইল উর্দ্ধে উঠিতে শারীরিক কষ্টও যথেষ্ট; কিন্তু কৈ কেহ ত তাহা প্রকাশ করে না। স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা, বালক বালিকা পর্য্যন্ত কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিতেছে। এ দৃশ্য দেখিবার, না দেখিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না। যতই উর্দ্ধে উঠা যায়, যতই শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই ঘন ঘন "ভুবন বাবা কি জয়" "মহাদেব, হর" ইত্যাদি ধ্বনি উঠিতে থাকে, ততই লোকের আগ্রহ বাড়ে; সঙ্গে সঙ্গে সব কষ্ট ভুল হইয়া যায়—আর এক কথা, যে দিকে তাকাও তোমার অপেক্ষা দুর্ব্বল বা বয়োবৃদ্ধ বা বালক বা স্ত্রীলোক বা আতুর দেখিবে উঠিতেছে—"বাবা ভুবনজি কি জয়" শব্দ উচ্চারণে প্রাণের উৎসাহ দ্বিগুণিত করিয়া উঠিতেছে; তাহাদের সহিত নিজের অবস্থা তুলনা করিয়াও কষ্ট অগ্রাহ্য হয়। আর সর্ব্বপ্রধান কথা এই যে, যাঁহার শ্রীচরণদর্শন মানসে যাইতেছি, যাঁহার চরণাশয়ে লুব্ধ হইয়া এই বিশাল লোক-সমুদ্র এক প্রাণে চলিয়াছে—তাঁহার জন্য এ হতভাগ্য-জীবনে এতটুকু কষ্টও যে করিতে পারিতেছি ইহার জন্য কৃতার্থ বোধ হয়। এই কষ্টটুকুর মধ্যেও সুখ আছে. নতুবা বোধ হয় তীর্থদর্শনের অর্দ্ধেক গরিমা নষ্ট হইয়া যাইত। আজকাল রেল, ষ্টীমার রাস্তা ঘাট সুগম করিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে যখন এ সমস্ত ছিল না—তখন তীর্থযাত্রায় যে বিপদ, যে কষ্ট, যে অধ্যবসায় আবশ্যক হইত, এখন তাহার কিছুই হয় না,—হয় না বলিয়াই তীর্থদর্শনের সে

ভক্তি, সে আগ্রহ নাই, তীর্থমহিমা অনেকের মনে কমিয়া গিয়াছে। কষ্ট বিনা সুখ নাই—কৃষ্ণও নাই। পূর্ব্বে তীর্থযাত্রীদের পথে বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে ছিল। বিপদে মধুসূদনের স্মরণ যেমন হয়, এমন আর হয়ত কিছুতে হয় না। ভাগবতে দেখা যায়, একদা শ্রীভগবান্ পাণ্ডবদের সহিত কিয়দ্দিন বাস করিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সকলে বিদায় দিবার জন্য সমাগত; পাণ্ডবমাতা কুন্তীদেবীও আসিলেন। যথাযোগ্য সম্ভাষণে সকলে বিদায় দিলে পৃথা শ্রীমাধবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে পাণ্ডবসখা! তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে হইবে এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছি। তুমি যাইবে যাও, কিন্তু আমরা যেন তোমায় ভুলিয়া এক দণ্ডও না থাকি তাহার ব্যবস্থা কর। ব্যবস্থা আর কি করিবে--যাহাতে সর্ব্বদাই আমরা বিপদে নিমজ্জিত থাকি তাহাই কর। আমি সম্পদ চাই না, সম্পদে তোমাকে বড় ভুলাইয়া দেয়—অনুক্ষণ বিপদে থাকিলেই তোমায় স্মরণ করিতে হইবে। অতএব হে জগদেকবন্ধো! তুমি এইরূপ ব্যবস্থাই করিও, যেন বিপদে পড়িয়া সর্ব্বদাই তোমাকে স্মরণে রাখিতে পারি—আমি সম্পদ চাই না।" পাণ্ডবমাতার উপযুক্ত কথা বটে! সাধে কি ভগবান্ পাণ্ডবের সখা!

যাহা হউক প্রায় বেলা-শেষে উপরে উঠা যায়। উঠিবার কালে বড় আর অন্য দিকে নজর থাকে না। এখন কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে—পূর্ব্বে যতদূর দৃষ্টি চলে স্তরে স্তরে পর্ব্বতমালা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যেন কাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে—যেন একটীর পর একটী করিয়া সোপানশ্রেণীর মত কে সাজাইয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতশ্রেণীর অপর পারে মণিপুর ও বর্ম্মা দেশ। এই স্থানের উত্তরেও এই দৃশ্য। উত্তর কাছাড় পর্ব্বতমালা দূরে কাল মেঘের ন্যায় স্তরে স্তরে সজ্জিতভাবে দণ্ডায়মান। দক্ষিণে—দক্ষিণ লুসাই পাহাড় শ্রেণী, এক কথায় বাক্য সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া এই বিশ্বনিয়ন্তার অদ্ভুত সৃষ্টিবৈচিত্র দেখিলে নিজের অসীম ক্ষুদ্রত্ব স্পষ্ট অনুভূত হয়। মন যাহার যেমনই হউক না কেন, এই দৃশ্য তাহাকে স্তম্ভিত করিবেই। এই মহান্ মেঘস্পর্শী পর্ব্বতমালা-সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এই বিশাল নভোমণ্ডলের তলে দাঁড়াইয়া ক্ষণেকের জন্য যেন নিজের অস্তিত্ব ভুল হয়। এত ক্ষুদ্র আমি—আমার আবার গর্ব্ব, দম্ভ, রাগ, পরশ্রী-কাতরতা, ক্রোধ, আরও কত কি? কি ভ্রম! এত আস্ফালন কিসের? হায়

হায়! কবে নিজের ক্ষুদ্রত্ব অনুভূত হইবে? যাহাই হউক স্থানটী এত মনোরম যে, মনে হয় যেন যাঁহার রাজ্যে আসিয়াছি তিনি বাছিয়াই এই বাসস্থান মনোনীত করিয়াছেন। সত্যই দেবতার স্থানের যোগ্য। যেন হরপার্ব্বতীর বিহার ভূমি কৈলাস পর্ব্বত।

উঠিবার স্থানে স্থানে পথ এত দুর্গম ও সংকীর্ণ যে, এক জন করিয়া যাইতে হয়, এমন ভীতিবিধায়ক যে মাতা আত্মরক্ষার জন্য সন্তানকে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু এরূপ পথও আতুর, খঞ্জ লোকে নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করে। আমরা পুলিসের রিপোর্ট দেখিয়াছি এবং স্থানীয় লোকের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছি—এস্থানে দুর্ঘটনা কখন শুনা যায় না—ইহা কি সেই কৃপাময়ের জাগ্রত কৃপা নহে?

বাবার রাজ্যে পৌঁছিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য ক্রমশঃ মন হইতে অপসারিত হইতে আরম্ভ হইলে আর এক অদ্ভুত দৃশ্য নয়নগোচর হয়। যে দিকে তাকাও, ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে। বৃদ্ধ, যুবা, বালক বালিকা, স্ত্রীলোক শিশু, সকলে রজে গড়াগড়ি দিতেছে—রজ অঙ্গে, মস্তকে মাখিতেছে; আর বলিতেছে "বাবার নিকটে যাইব, কিন্তু কিরূপে এ মলিন, অপবিত্র দেহ মন লইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইব? ইহা সহস্র ভক্তের পদরজ—ইহার অপেক্ষা পবিত্র কারী আর কি আছে? বাবা ভূবন! তুমি আমাদের দেহ মন পবিত্র করিয়া লও—আমরা তোমার চরণরেণু কামনায় আসিয়াছি; কিন্তু যোগ্যতা আমাদের কিছুই নাই। এই তোমার ভক্তদের পদরজ, আমরা ইহাতে পড়াগড়ি দিয়া নিজেদের পবিত্র করিতেছি এবং ধন্য হইতেছি। তুমি আমাদের পবিত্র কর, তুমি প্রসন্ন হও।" ইত্যাকার বাক্যে সকলে গড়াগড়ি দিতেছে, পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে, নীচ উচ্চ ভেদ তিরোহিত হইয়াছে, সকলে সমান হইয়াছে। কেহ বা কিছু রজ উত্তরীয়ে বাঁধিয়া লইতেছে—বলিতেছে "এ দ্রব্য আর কোথায় পাইবি।" কেহ অপরকে আহ্বান করিয়া ধূলায় গড়াইতেছে—সর্ব্বোপরি এক মহা আনন্দপ্রবাহ যেন সকলকে ঘেরিয়া রহিয়াছে।

এ দৃশ্যও সম্যক্ বর্ণনা করা যায় না। উপবাস-ক্লেশ, পর্য্যটনজনিত ক্লেশ, শীতের কষ্ট (কারণ পাহাড়ের উপর বিষম শীত) সব ভুল হইয়া যায়। একমাত্র মনে হয় এ কোন্ রাজ্যে আসিয়াছি—এই কি সেই আনন্দময়ের আনন্দধাম, বুঝি বা এ পৃথিবী ছাড়া কোন দেশ, পৃথিবীর পাপচিন্তা এখানে আসে না; এখানে মন স্বতঃই যেন কাহার চরণে প্রণত হইতে চায়। হায়! যদি এই ভাব

চিরস্থায়ী হইত, তবেই না জীবন সার্থক। যতই চারি দিক্ দেখা যায়, মন আর্দ্র হইতে থাকে। মনে মনে দেবাদিদেবের নিকট কামনা উৎসর্গীকৃত হয়—"হে দেবাদিদেব! হে জগদ্‌গুরো! আর কে রাখিবে—তুমিই মাত্র গতি; আমার আর কেহ নাই, আর কাহারও কোন সাধ্য নাই; যাহাতে তোমার রাতুল চরণের ধূলিকণার ভিখারী হইয়া, তোমার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া জীবন কাটাইতে পারি এরূপ তুমি করাইয়া দাও। যেন তোমায় ভুলিয়া আমার কোন কাজ না হয়। আমি নিতান্ত অকিঞ্চন, আমার কোন যোগ্যতা নাই, ভক্তি, স্তুতি, জ্ঞান গম্য কিছুই জানি না, বুঝি না; অকপটে বলিতেছি ঠাকুর আমার মন্দ হইবার সাধ নাই, প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি আমার প্রকৃত নিজ জন আর কেহ নাই। যাহাদের আপন মনে করি তাহারা আপনার আপন; কিন্তু বুঝি, জানি, তবুও তোমায় ভুলিয়া তাহাদেরই চাই; তাহাদেরই তুষ্টিসাধনে জীবনপাত করিতেছি. হে অনাথশরণ! হে পতিতপাবন! হে দুরিতক্ষয়-কারিন্! মাত্র তোমার কৃপা ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই—"ন গতির্বিদ্যতে নাথ! ত্বমেব শরণং প্রভো!" তুমি প্রসন্ন হও।" জানি না এ প্রার্থনা তাঁহার চরণে পৌঁছায় কি না! তবে বিশ্বাস যে, তিনি দীনতারণ, তিনি অবশ্যই শ্রবণ করেন; নচেৎ তাঁহার নামের সার্থকতা থাকে না।

পরদিন প্রত্যূষে (চতুর্দ্দশীর দিন) সকলে দেবতাস্থানে গমন করিতে থাকে। দেবদর্শন দুর্ল্লভ, জনতা দুর্ভেদ্য; যাহার অদৃষ্টে যতটুকু আছে সে ততটুকু দর্শন করে, যাহার মনে যে ভাব থাকে সে সেই ভাবে দর্শন করে। মন্দিরাভ্যন্তরে কোথাও বা কেহ যুক্তকরে, সজল নয়নে, আশুতোষের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মনোভাব জ্ঞাপন করিতেছে, কেহ করযোড়ে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কেহ মাথায় হাত বুলাইতেছে, কেহ অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তালে তালে নৃত্য গীত করিতেছে, কেহ বীণা বাদন করিতেছে, কেহ একতারা লইয়া—

"রামচন্দ্র বিনা দুখ কোন্ হরে
রাধা কৃষ্ণ বিনা দুখ কোন্ হরে ॥"

এই বলিয়া ভজন গাহিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে চন্দনচর্চ্চিত, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিয়া দেবসেবক উপস্থিত। বিল্বপত্র, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ উপকরণ সজ্জিত; পঞ্চবিধ ভক্ষ্য, পানীয়, ফল, শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি যথাস্থানে স্থাপিত। পূজক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছেন—

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং।
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিং॥

বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং।
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥

মৌলৌচন্দ্রদলং গলে চ গরলং জূটে চ গঙ্গাজলং।
ব্যালং বক্ষসি চানলঞ্চ নয়নে শূলং কপালং করে॥

বামাঙ্গে দধতং নমামি সততঃ প্রালেয় শৈলাত্মজানং।
ভক্তক্লেশহরং হরং স্মরহরং কর্পূরগৌরম পরম্॥

ঊর্দ্ধমুখে গললগ্নীকৃতবাসে আবার গাইতেছেন—

চন্দ্রোদ্ভাসিত-শেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে.
সর্পৈর্ভূষিত-কণ্ঠ-কর্ণ-বিবরে নেত্রোত্থ বৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্কৃত সুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমখিলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ॥

কিং বাহনেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিংবা পুত্র-কলত্র-মিত্র-পশুভির্দেহেন গেহেন কিং
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজং মনো দূরতঃ
সাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতিবল্লভম্॥

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালোজগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়-তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনাং॥

চারিজন দণ্ডী মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিয়া করিয়া আবৃত্তি করিতেছে।

* * *

বাচামগোচরমনেক গুণ স্বরূপং
বাগীশ বিষ্ণু সুর সেবিত পাদপীঠম্।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥

*　*　*

তেজোময়ং সগুণ নির্গুণ মদ্বিতীয়-
মানন্দ-কন্দ-মপরাজিতমপ্রমেয়ং ।
নাগাত্মকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥

*　*　*

আশাং বিহায় পরিহৃত্য চ পরস্য নিন্দাং
পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য্য মনঃ সমাধৌ ।
আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥

রাগাদি দোষ রহিতং স্বজনানুরাগং
বৈরাগ্যশান্তি নিলয়ং গিরিজা সহায়ং ।
মাধুর্য্য-ধৈর্য্য-সুভগং গরলাভিরামং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥

সকলে সমস্বরে গাহিতে লাগিল—

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে ।
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে ॥

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য ।
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধ মৌলে ।
মহেশান্ শূলিন্ জটাজূটধারিন্ ॥

ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥

প্রাতঃকালে এই প্রকারে দেবাদিদেবের পূজা চলিল। মধ্যাহ্নেও অনেকে পূজাদি করেন। রাত্রের ব্যবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। অধিকাংশ লোকই বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিয়া নিজের "ডেরায়" পূজাদি করিবার ব্যবস্থা করেন।

কাছাড় জেলা কিছুকাল পূর্ব্বে মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখনও এই স্থানে অনেক মণিপুরীর বাস। মণিপুরীরা সব শ্রীগৌরাঙ্গসেবক—কৃষ্ণ-ভক্ত। কপালে চন্দনরেখা, গলে তুলসীমালা, গাত্রে শ্রীরাধা নামাঙ্কিত। ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গীত লীলাদিও খুব প্রচলন। রাসলীলা অভি-নয় প্রায় প্রতি পল্লীতে হয়—পল্লিবাসিনী গৃহস্থ রমণীরাই এই উৎসবে যোগদান করে। ইহারা হিন্দু দেবদেবী মানে। কথিত আছে এবং ইহারা নিজেরাও বলে যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। কাছাড়বাসীরাও সেইরূপ ভীম ও হিড়িম্বা রাক্ষসী হইতে সমুৎ-পন্ন; এবং মহাভারতে যে নাগরাজাদির কথা শুনা যায়,—নাগা, কুকি, লুসাই, গারো খসিয়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য অনার্য্য জাতীরা তাহাদেরই বংশ-ধর। এই মণিপুরীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশভূষাদি করে, উপবীত ধারণ করে এবং ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় দান করে। নামের পদবী "সিংহ" থাকায় ইহারা বীরপুরুষ বলিয়া আত্মশ্লাঘা করে। কাণে ফুল দুল স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য অনেক প্রকার জানে এবং সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে। যদিও ইহারা শ্রীকৃষ্ণোপাসক, কিন্তু ইহারা অনেক সময় শক্তিপূজায়ও যোগদান করে। কিন্তু প্রাণিহত্যার অত্যন্ত বিরোধী; শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজায় আসিবে, দেখিবে, প্রসাদ লইবে; কিন্তু বলি দিবার সময় অদৃশ্য হইবে আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশস্থলেই ইহারা শক্তি-পূজাতেও যে নৃত্যগীতাদি করে তাহা শ্যাম বিষয়ক। শ্যামা বিষয়ক গীতাদি অপেক্ষাকৃত অনেক বিরল। যে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গীতাদি করে তাহা অধিকাংশই হয় মূল জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দ হইতে, নচেৎ তাহাদের কোন জাতীয় কবির গীতগোবিন্দ অনুবাদ হইতে। অর্দ্ধ বাঙ্গালা. অর্দ্ধ মণিপুরী মিশ্রিত শ্রীমতীর বিরহ-সঙ্গীতও কদাচ শুনা যায়—বোধ হয় বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের ব্রজবুলিরও কিঞ্চিৎ চলন আছে।

এই ভুবন বাবার উৎসবেও অনেক মণিপুরী সমবেত হয়, কিন্তু সকলেই দেব-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যায় না; অনেকে দোকান পাট বসাইতে যায়, কারণ এই পাহাড়ে ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত মেলা থাকে।

চতুর্দ্দশীর দিবস মধ্যাহ্নে দেবমন্দির প্রাঙ্গণে দলে দলে মণিপুরী আগ-মন করে। ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। মণিপুরী স্ত্রীলোক

বিবাহিতা কি অবিবাহিতা তাহা তাহার পরিচ্ছদ এবং কেশকর্ত্তন ও রচনা-প্রণালীতে জানা যায়। শুনা যায় ইহাদের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহের অধিক প্রচলন। অবিবাহিতা বালিকাদের "লাইসাবি" কহে। ক্ষত্রিয়দের পূর্ব্বতন প্রথানুসারে এক পুরুষ দুই বা ততোধিক কন্যার পাণিগ্রহণ করে।

দেবমূর্ত্তির সম্মুখে ১০।১২ বা ততোধিক স্ত্রীলোক মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হয়। ইহাদের মধ্যে দেখিতে যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ সে এক দিকে তাহার অপেক্ষা বড় তাহার পার্শ্বে এইরূপ ভাবে মণ্ডলটি সাজান হয়। প্রত্যেক দলের এক-জন নেত্রী থাকে এবং দুইজন পুরুষ খোল বাজাইবার জন্য থাকে। নেত্রী গীতের ধুয়া ধরাইয়া দেয়, বাদ্যকর অসীম দাপটের সহিত খোল বাজাইতে থাকে ;—তালে তালে ঈষৎ অঙ্গসঞ্চালন করিয়া এবং করতালি দিয়া সকলে নৃত্য করিতে থাকে। সুচারু অঙ্গভঙ্গি ও গ্রীবাভঙ্গির সহিত করতালি-সঙ্গে গীত হইতে থাকে।

* * *

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেবর নিমগ্না।
কেশব! ধৃত শূকররূপ! জয় জগদীশ হরে!

* * *

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং,
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং॥
কেশব! ধৃত হলধররূপ! জয় জগদীশ হরে!

* * *

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব! ধৃত কল্কিশরীর! জয় জগদীশ হরে!
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং,
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং।
কেশব! ধৃত দশবিধরূপ! জয় জগদীশ হরে!

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আসিয়া নৃত্যগীত করিয়া দেবতাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়। ভূবন বাবার স্থানে এই তৃতীয় আশ্চর্য্য।—শিবসকাশে

কৃষ্ণগীতি ও তাণ্ডব নৃত্য স্থলে শান্ত নৃত্য। বুঝি বা তাহারা জানে যেই শিব, সেই কৃষ্ণ। যাহাতে মাধব সন্তুষ্ট, আশুতোষ তাহাতে রুষ্ট কখনই হইতে পারেন না।

সন্ধ্যাকালের আর এক শোভা। দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, দিবাকরের কিরণমালায় উদ্ভাসিত পর্ব্বতমালা যে কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে তাহা বুঝান অসম্ভব। বুঝি বা সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেবাদিদেব ভক্তগণের মনে বিস্ময়জড়িত ভক্তি জন্মাইবার জন্যই দেখাইয়া থাকেন। বিভূতি যাঁহার অঙ্গভূষণ তাঁহার কাছে ভক্তপদরজেলুণ্ঠিত ধূলিধূসরিত কায়ই বুঝি ভাল লাগে; যিনি দিগম্বর তিনি বুঝি প্রাকৃতিক লগ্নসৌন্দর্য্যই দেখাইতে ভাল বাসেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে অসংখ্য দীপমালায় ভগবানের মন্দির অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। দলে দলে লোক আরতি দেখিবার জন্য আগমন করে। সে দৃশ্যও শুনিয়াছি ৺কাশীধামে শ্রীবিশ্বেশ্বরের আরতির ন্যায় নয়নমনোমুগ্ধকর। আরতি সমাপ্তে যে যাহার "ডেরায়" বা মন্দিরে যাহার যেখানে অভিরুচি পূজাদি সমাপন করে।

পরদিবস বিশ্রাম করিয়া সেই বিশাল জনশ্রেণী, পাহাড় হইতে অবতরণ আরম্ভ করে। কত লোক কত প্রকার ভাব লইয়া যায়—সকলেই ফিরিয়া আইসে—কিছু লইয়া আইসে কি?—আমরা জানি না। আমরা কিছুই বুঝিতেও পারি না—জানি না, বুঝি না, তবুও যতটুকু কাতরতা আসে সেই ভাবে বলি—

হে নীলকণ্ঠ! বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র
লোকেশ শেষ বলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিত বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক গুণাভিবেশ।
হে বিশ্ববন্ধো! করুণাময় দীনবন্ধো!
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

প্রভো কৃপা হইবে কি? সংসারই দুঃখ—সংসারে একমাত্র সার তুমি—ইহা কি বুঝাইয়া দিবে? তুমিই জান।

শ্রী.........

কি শিখিলাম ?

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এ প্রদেশে সাধারণের ভিতর সম্ভবতঃ বৈষ্ণবী গুঁতার ঠেলায় ওঁ ও আত্মা বা হিন্দুস্থানী জিহ্বোষ্ঠসুলভ আত্মা কথার এতদূর প্রচলন-প্রাধান্য বা প্রাদুর্ভাব ছিল না।

ছাত্রজীবনে s o u l soul মানে আত্মা শিক্ষা করা গিয়াছিল এবং শিক্ষকজীবনে soul মানে তথৈবচ শিক্ষা দেওয়া গিয়াছিল এই পর্য্যন্ত।

কতিপয় মিসনারিদিগের মুখনিঃসৃত পথে ঘাটে আত্মার সদ্ব্যবহারে আনিবা ও আত্মার পরিত্রাণ ইত্যাদি ধ্বনি কখন কখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত। তাহার পর ব্রাহ্মসমাজের উঠ্‌তি মুখে ওঁ, ব্রহ্ম এবং ইহার সহিত হোমিওপ্যাথিক ডোসের আত্মার মূর্চ্ছনা শুনা যাইত এবং তাহার পর থিয়সফিষ্টদিগের কল্যাণের আত্মা। শুধু ইহা নহে, ইহার পূর্ব্বে মহাযোগ করিয়া কথকটা অর্থগম্য একটা কথা এখন শুনা যায়। এখন গীতার দিনে বা দুর্দ্দিনে ইংরাজীশিক্ষার বিস্তারের সহিত ব্রহ্ম আত্মা পরমাত্মা জীবাত্মা প্রকৃতি পুরুষ, দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি এবং ইহার আনুষঙ্গিক কর্ম্ম ভক্তি, জ্ঞান, মুক্তি, অদৃষ্ট, পুরুষকার এইরূপ নানাবিধ কথার জল্পনা কল্পনা সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে বাহির হইতেছে এবং আবালবৃদ্ধবনিতা শূদ্র ভদ্র সকলের মুখেই ঐ সব বুলি শুনা যাইতেছে; এবং সেকেলে দয়াময়, বিপদভঞ্জন, পতিত পাবন, ভক্তবৎসল প্রভৃতি যাত্রাদোলো বিশেষণের পরিবর্ত্তে নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিজবোধস্বরূপ অব্যয়, অচ্যুত, এই ঢংএর বিশেষণ দ্বারা পূর্ব্বলিখিত বস্তুকে বিশেষিত করা হইয়া থাকে।

আমি আত্মা সম্বন্ধে উৎসবের গীতার আত্মা ও ইহার আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে যাহা ভাসা ভাসা ধারণা করিতে পারিয়াছি তাহার পরীক্ষা দিতে চাহি। পাশ ফেল যাহা হয় করিবেন।

উৎসবে গীতার ব্যাখ্যায় যে আত্মা শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা খাঁটী নির্জ্জলা অদ্বৈতবাদী আত্মা। এই আত্মা এজমালীর সম্পত্তি নহে, ভাগাভাগীর অংশা-অংশীর ভিতর নাই। ইহাই বেদান্তের ব্রহ্ম, সোঽহংএর অহং, ইংরাজীর self or ego এবং চলিত ভাষার জীবাত্মা বা জীব। ইহা এক, ইহাই সৎ, ইহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

জীব-কথা ব্যবহার করায় অনেকেই বোধ হয় চ'মকে উঠে বলিবেন কি—এই অন্নগত প্রাণ সঙ্কীর্ণ কর্ম্মপাশবদ্ধ জরামরণশীল "আমি" এই জগতের কর্ত্তৃত্ব, বিধাতৃত্ব, নিয়ন্তৃত্ব ভার গ্রহণে স্পর্দ্ধা করি ?

ইহার উত্তরে উৎসব বলেন, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা—এই যে লম্বা চৌড় বিশেষণ দিয়া জগৎকে খাড়া করা হইয়াছে এবং যে জগৎ উৎসবের চক্ষে দুঃখ-স্বপ্ন-ভ্রমপরম্পরাকল্পিত জন্ম-জরা-মরণ-হর্ষামর্ষ-শোকাদি অনর্থ-সঙ্কট-সহস্র-সঙ্কুল—ইহার অস্তিত্বই চৈতন্যের অনুভূতি সাপেক্ষ। আর একটু উচ্চ করিয়া বলিলে এই দাঁড়ায় যে, এই প্রতীয়মান জড় জগতের পারমার্থিক বা স্বাভাবিক অস্তিত্ব আদৌ নাই। ইহা কেবল অনুভূতি বা প্রত্যয়সমষ্টি, চেতন বা আত্মার সমীপেই স্ফুরিত হয়। তাহার পর যেন ভদ্রতার খাতিরে যে "আমি"কে সসীম, সঙ্কীর্ণ প্রভৃত ক্ষুদ্র অর্থবোধক বিশেষণ দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছে, ইহা অবিদ্যা, ভ্রান্তি ও অজ্ঞানপ্রসূত। কে বলিল আমি সসীম, সঙ্কীর্ণ? বোধোদয়ে পড়া গিয়াছিল পদার্থ তিন প্রকার—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ; পাশ্চাত্য ও আমাদের দর্শন শাস্ত্রে ইহাকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। কর্ত্তা জ্ঞাতা, ভোক্তা বা বিষয়ী (subject); এবং কর্ম্ম জ্ঞেয়, ভোগ্য বা বিষয় (object) আমি ছাড়া অন্য যাহা কিছু গাছ, পালা, চন্দ্র, সূর্য্য, ঘর, দোর, তুমি, তিনি পর্য্যন্ত এমন কি আমার ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এক কথায় যাহা আমার প্রত্যক্ষ বা অনুমান-গোচর—আমার উপলব্ধির গণ্ডীর ভিতর তাহা বিষয়, তাহাই অচেতন। যদি ইহার ভিতর কাহাকেও চেতন অচেতন কল্পিত করা হয়, সে কল্পনা আমার; তাহার কৈফিয়তের দায়ী আমি। সে চেতন অচেতনের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই।

আর আমি? "আমি" দ্রষ্টা, 'আমি" স্বাধীন, "আমি" সর্ব্বজ্ঞ, "আমিই" বিষয় উদ্গিরণ (সৃষ্টি) করি; বিশ্বমাত্মা বিনির্গতং আমি নিত্য শুদ্ধ বিমুক্তৈকমখণ্ডা-নন্দমদ্বয়ম্।

তবে চিৎ জড়ের সম্বন্ধ কি, স্থূল দৃষ্টিতে বোধ হয় জীব ক্ষুদ্র, জগৎ বৃহৎ; জীব অধীন, জগৎ স্বাধীন। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি বিষয় বাহিরের জিনিষ, আমাদের ভিতরে গিয়া ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্পর্ক পাতায়।

ইহাদিগের সহিত, আমার বহুদিনের আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে, ইহার নাম সংসার। এই সংসারে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারই কর্ম্মের উদ্দেশ্য।

যাহা আমার অনুকূল বেদনীয় তাহা সুখ এবং যাহা প্রতিকুল বেদনীয়—যাহা বাধা লক্ষণ তাহা দুঃখ। এই সুখান্বেষণ ও দুঃখবর্জ্জন ন্মজন্মান্তরব্যাপী—যতদিন এক সময়ে এই লেনা দেনা ব্যাপার চলে ততদিন এক জীবন। "বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপনের নাম জীবন" যেই কারবার বন্ধ হয়, সেই সময়কে মৃত্যুকাল বলিয়া থাকি। মৃত্যুর পরও সম্ভবতঃ এই লেনা দেনা ব্যাপার বন্ধ হয় না। অন্য স্থানে অন্য শরীরে এই বিষয়ের সহিত কারবার চলিতে থাকে। ইহার লাভ লোকসান রূপ সুখদুঃখের জের জন্মান্তরের খাতায় টানিয়া কৈঃ কাটিতে হয়, তাহা না হইলে এজন্মের সুখদুঃখের কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না ; স্থূল দৃষ্টিতে যাহাই হউক প্রকৃত পক্ষে ইহা নহে। জীবের স্বভাব ও জগতের স্বরূপ উহার উল্ট। এই যে জগৎ ইহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই. ইহা বিষয়ীর কল্পনা স্বপ্নবৎ অলীক।

বেশ তাহাই যেন হইল, কিন্তু রাত্রে অন্ধকার ঘর হইতে বাহির হইবার সময় দরজা খুজিয়া না পাইয়া দেওয়ালে যখন মাথা ঠুকিয়া যায়. তখন মনে হয় কি বাবা তবে নাকি তুমি নাই। আবার আফিস যাইবার সময় গড়ের মাঠের ধারে চোঁয়ান রৌদ্রে মাথার চাঁদি ফাটিয়া যখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ায়, রাস্তার ধূলায় চোকের দফা রফা করে. তারপর আফিসে গিয়া দুই গ্লাস বরফ জল খাইয়া, শ্রীপাদপদ্মের ধূলা ঝাড়িয়া চেয়ার টানিয়া, লম্বাগোছের একটা আছাড়িয়া শ্রীদুর্গা ফাঁদা যায়, তখন আবার মনে হয় কি বাবা তবে নাকি তোমরা নাই।

ইহার উত্তরে সোহহং বলেন হাঁ৷ ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই বটে, তবে ইহা ব্যাবহারিক সত্য ; একটা আটপৌরেগোছের সত্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। যখন হাতে হাতুড়ে টের পাওয়া গেল তখন অবশ্য ইহা মানিতেই হইবে। কাহার সাধ্য ইহাকে মিথ্যা বলে। এই ব্যাবহারিক সত্য স্বীকার করিয়াই ত সংসারযাত্রা চলিতেছে ; এবং যতদিন জগৎকে এইরূপ সত্য বলিয়া বোধ হইবে, ততদিন ইহার একজন স্রষ্টা, নির্ম্মাতাও খাড়া করিতে হইবে। শুধু তাহা নহে, আবার যখন দেখা যায় এই জড়জগৎ নির্ম্মাণ ও চালাইবার একটি ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা আছে—সামান্য ধূলিকণা হইতে বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণী, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট হইতে ধরাকে সরা দেখা মনুষ্য পর্য্যন্ত একটা ধরাবাধা আইনের ভিতর কোন উদ্দেশ্য মূলে চালতেছে তখন এই স্রষ্টাতে

সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমানত্ব প্রভৃতি বিশেষণ আরোপ না করিলে খাটে না।

এই সর্ব্বশক্তিমানকে বা আত্মাকে বা আমাতে ঈশ্বর নাম দেওয়া যায়।

ইনিই সগুণ সোপাধিক মায়াধীশ ঈশ্বর।

তবে জগতের সত্য যখন ব্যাবহারিক সত্য, তখন আত্মারও এই ঈশ্বরত্ব ব্যাবহারিক ভাবে সত্য—লোক লোকতঃ ঘরকন্না করিবার জন্য স্বীকার করিতেই হইবে, না করিলে উপায় নাই।

জগৎকে সত্য ধরিয়া—জগৎ-কর্ত্তৃত্বরূপ উপাধি যাহা আত্মাতে অধ্যাস করিয়া সৃষ্টিপ্রণালীর ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাই মায়া।

তাহা হইলে জানা গেল বিষয়ের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে। বিষয়ীর ব্যাবহারিক ও পরমার্থিক আটপৌরে ও পোষাকী দুই রকম অস্তিত্ব আছে। ব্যাবহারিক দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে বিষয়ীকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কাজেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান না বলিলে চলে না; কিন্তু পরমার্থতঃ ইনি কোন বিশেষণের ধার ধারেন না—উপাধিরহিত ও নিষ্ক্রিয়। আর আমি যে আমাকে প্রকৃতির অধীন সঙ্কীর্ণ সুখদুঃখভোগী জরামরণশীল জীব মনে করি, ইহা অধ্যাস মাত্র; বরং আমিই জগৎকে গড়েপিটে এইরূপ ভাবে চালাই, তাই জগৎ এইরূপ দেখায় ও চলে বলিলেও বলা যায়; কিন্তু বাস্তবিক আমি কিছুই করি না; কাটামুণ্ডু কথা কয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহা বোধ মাত্র। আমি নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ।

ভাল তবে একটা কথা উঠিতে পারে—যখন আত্মা বা জীবাত্মা বা জীব দ্বারা সকল কাজই চ'লে গেল, তখন পরমাত্মাকে খাড়া করিয়া তাহার সহিত জীবের অভেদ সম্বন্ধ পাতাইবার প্রয়োজন? প্রয়োজন জ্ঞানীর পক্ষে কিছু নয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে আছে। পূর্ব্বে যাবতীয় পদার্থকে বিষয়ী জ্ঞাতা বা ভোক্তা, আর বিষয় জ্ঞেয় ভোগ্য এই দুই ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে; অর্থাৎ আমি আর আমার অনুভূতির বিষয় যাহা তাহা।

যে দেখে সে বিষয়ী, যাহাকে দেখা যায় সে বিষয়। এখন কথা হইতেছে; আমি যেমন তোমায় জানি, হরিকে জানি—তেমনি আমি আমায়ও জানি। আমি আমায় জানিনে এ কথা বলিতে পারি না। আমি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই। আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। যাত্রারদলের ছেলে হনুমান সেজে যখন

মা জানকীর সহিত কথা কয়—হনুমান কর্ত্তা, মা জানকী কর্ম্ম। আবার যাত্রার দলের ছেলে যখন জানে যে নিজেই হনুমান সেজেচে, বস্তুতঃ সে যাত্রারদলের ছেলে বই আর কেউ নয়—এখানে যাত্রারদলের ছেলে কর্ত্তা, হনুমান কর্ম্ম; কিন্তু একাধারে সে যাত্রারদলের ছেলে ও হনুমান—বিষয়ী ও বিষয় উভয়ই।

"আমি জানিতেছি" এটাও জানিতেছি, জানিতেছিকে জানিতেছি,—এক প্রকার চোরের উপর বাটপাড়ি।

এই বিষয়ী-কর্ত্তা-ভোক্তা-আমির নাম পরমাত্মা; আর বিষয়কর্ম্মভোগ্য আমির নাম জীবাত্মা। এই বিকারশীল, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, হাঁসি কান্না রাগ দ্বেষ মাখান আমি বিষয় আমি। ইহার নাম জীবাত্মা। জড়জগতের ঘাত, প্রতিঘাত এই বিকারের কারণ; এই জন্য জীব বাহ্যজগতের হাতে নিজেকে ক্রীড়ার পুত্তলি মনে করে ও আপনাকে কখন সুখী, কখন দুঃখী, কখন সবল, কখন দুর্ব্বল, কখন বালক, কখন বৃদ্ধ মনে করে। কিন্তু জ্ঞাতা আমি এই বিকারগ্রস্ত হন না। যে আমি এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বিষয় আমির পশ্চাতে থাকিয়া স্থিরভাবে অনিমেষে এই সকল পরিবর্ত্তন দর্শন করিতেছেন—অনন্তকাল হইতে ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, আলো, অন্ধকার, উদাসীন, এই মরা, বাঁচা, হওয়া, নেওয়া, যাওয়া, খাওয়ার এক মাত্র দ্রষ্টা ও সাক্ষীর স্বরূপ সেই দেশ কাল বস্তু অপরিরিচ্ছন্ন নিত্যমুক্ত স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আমিই বিষয়ী আমি; আমি পরমাত্মা; আমি ব্রহ্ম আমি।

ফলে যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি। যে আমি বিষয় আমি, সেই আমিই বিষয়ী আমি। দ্রষ্টা আমি, দৃশ্য আমি, জ্ঞাতা আমি, আর জ্ঞেয় আমি, ব্রহ্ম আমি, জীব আমি এক; ষোল আনা এক। এর ভিতর মারামারি করিবার কিছুই নাই। আমি আমাকেই দেখি, অন্য কাহাকেও নহে; আমি যখন সুখী হই, আমি আমাকে সুখী মনে করি; পাড়ার লোককে নহে।

উৎসব বলেন এ সব মায়ার ছলনা। যদি বল আত্মা আপনি আপনাকে দেখেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে আত্মা আপনি আপনা হইতে পৃথক্ বস্তু হয়েন। দুই না থাকিলে দর্শন হয় না। কিন্তু আত্মা এক। কাজেই আত্মার এই বহুত্ব মায়া। তবেই হইল জীবাত্মা বা জীব বা আমি ও পরমাত্মা এক।

এই বিষয়ী আমি অর্থাৎ ব্রহ্ম যন্ন বেদা বিজানন্তি * * তে নির্ব্বিকার,

নিত্য প্রভৃতি বিশেষণ দেওয়া হইল। প্রকৃতপক্ষে বুঝাইবার কোন ভাষা নাই। যাহা জ্ঞানগম্য তাহাই বিষয়শ্রেণীভুক্ত,—তাহারি বিশেষণ চলে; কাজেই ইহাকে বুঝাইতে হইলে ইনি ইহা নন, উহা নন—নেতি নেতি বলিয়া নিরস্ত হইতে হয়। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম অস্থূলমসূক্ষ্মং অহ্রস্বং ইত্যাদি। বেশী পেড়াপীড়ি করিতে গেলেই তাঁহাকে বিষয়-অন্তর্ভূত করা হয়। এখন দাঁড়াইল এই—

জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব আমা ছাড়া নাই। যাহার মূলে জানা বলিয়া বস্তুটি নাই, যে বস্তুকে জানিবার কেহই নাই—তাহার অস্তিত্ব নাই।

ইহার ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে মাত্র। লৌকিক দৃষ্টিতে জগৎ বাস্তবিক কিন্তু ইহা ইন্দ্রজাল কল্পনামাত্র। স্বপ্নে "পরি" দেখা মাত্র।

কিন্তু এই কল্পনার ব্যবস্থা-শৃঙ্খলা আছে। সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলা দেখিয়া, প্রতীয়মান জগৎ কল্পনা করিতে চেতনা সৃষ্টিকর্ত্তার আবশ্যক। তবে জীব হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা না করিয়া এক মাত্র চেতন পদার্থ যাহা আমার পরিচিত, যাঁহাকে আমি জানি—তাঁহাকেই এ জগৎ-কর্তৃত্ব-ভার দিলে কার আট্কায় না।

"জগৎকে সত্য ধরিয়া জগৎকর্তৃত্বরূপ উপাধি যাহা আত্মার অধ্যাস করিয়া সৃষ্টিপ্রণালী ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাই মায়া। এই মায়া আত্মায় আরোপ করিয়া ঈশ্বর নামকরণ হয়। এই ক্ষুদ্র জীবে জগৎ-কর্তৃত্ব হাঁসির কথা নহে। আমি আমাকে ক্ষুদ্র ও জগতের অধীন মনে করি বটে, কিন্তু ইহা অজ্ঞানের চাল। জগৎ যখন কল্পনা, তখন ঐ ক্ষুদ্রত্ব জগৎ অধীনত্ব, দেশ কাল পরিচ্ছিন্নত্ব ও কল্পনা মাত্র। কেন এই কল্পনা? ইহার উত্তর আমার স্বভাব মণির ঝলক।

যতক্ষণ এই ভুল থাকে, ততক্ষণ আমি বদ্ধ। ভুল গেলেই মুক্ত। ভক্তি, মুক্তির royal road হইতে পারে। কিন্তু এ মুক্তির পন্থা জ্ঞান। এ ব্যাধির ইহাই এক মাত্র ঔষধ। এই জ্ঞানের জন্য মরণকাল পর্য্যন্ত টাঁকিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। জীবন থাকিতেই মুক্ত হওয়া যায়। জীবন্মুক্তিই গীতার লক্ষ। উৎসবও তাহাই বলেন। জীবন্মুক্তি বস্তুটি কি? সুখ দুঃখ না থাকা, আর অন্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না—না আর কিছু? সুখদুঃখ থাকিবে না তো যাবে কোথায়? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভয় সবই থাকিবে, কারণ উহারা প্রারব্ধ বা সঞ্চিত কর্ম্মের ফল। উহা ভুগিতেই হইবে। তবে ইহাদের ধরা

বাঁধার ভিতর থাকিতে হইবে না। জীবন-মুক্তের সুখ দুঃখ ভোগ থাকিবে, তবে সে সুখ দুঃখ ব্যবহারিক সত্য মাত্র ; কেবল স্বপ্নদর্শন সুখ দুঃখের মত বলিয়া বোধ হইবে। আর দেহ যখন তাঁহার নিকট কল্পনা - তখন জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ, নরকও কল্পনা। তবে ব্যবহারিক জীবনে তিনি কর্ম্ম করিতে বাধ্য—খেতেও হবে প'রতেও হবে ইত্যাদি। জীবনমুক্তের কাছে ইহলোক, পরলোক যখন অর্থ-শূন্য, তখন তিনি কামনাশূন্য। তাঁহার কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম—ইহা তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না ; স্বর্ণশৃঙ্খলেও নহে, লৌহশৃঙ্খলেও নহে। উৎসব বলেন, জীবনমুক্তের কোন কর্ম্মনিষ্ঠা নাই। তিনি সর্ব্ববিষয়ে বিরক্ত। একমাত্র অনুরক্তি তাঁহার ব্রহ্মে। তাঁহার চক্ষে প্রিয় বা অপ্রিয় সমাগমে হর্ষোদ্বেগ হয় না, তবে তাঁহার চক্ষে পরিদৃশ্যমান জগৎ থাকে কিন্তু দৃশ্যজ্ঞানে তাঁহার মোহ হয় না।

যাই হোগ এই একটা বাঁচোয়া যে, নির্ব্বাণমুক্তিওয়ালাদিগের যে আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা বা পারলৌকিক স্বার্থপরতা (otherwordliness) অভিযোগ করা হয়, জীবনমুক্তগণ তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন।

কেবল জ্ঞানই এই মুক্তির উপায়—অন্য উপায় নাই। নির্ম্মল শুভ্র শরদিন্দু-মরীচিবৎ জ্ঞান। আর ঐ জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য নিত্য অনিত্য বস্তু বিচার, ঐহিক পারত্রিক ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, শমদমাদি সাধনা, বেদবাক্য, গুরু-উপদেশ ; আর আত্মা সম্বন্ধে

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। ইহাই ব্যবস্থা।

শ্রী.........

ছাড়িও না।

সংসারে দুঃখ আছে, দুঃখ অতিক্রমও করা যায়।

এতদিন চেষ্টা করিয়াছ বিশেষ কিছুই হয় নাই। তাহাতে কি ? আবার চেষ্টা কর। যতদিন না হয় ততদিন চেষ্টা কর। ছাড়িও না। ক্লেশ হয়—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ হইতেছে, এই ভাবিয়া চিত্তকে প্রসন্ন রাখিয়া, কর্ম্ম করিয়া যাও। কর্ম্ম ভাল হইল বা মন্দ হইল এই ফলাফলে ইহাকে অপ্রসন্ন

করিও না। মুক্তপুরুষকেও মন কর্ম্মফল ভোগায়। যাহার জন্য চেষ্টা করিবে তাহা আবার বলি শ্রবণ কর।

(১) প্রথম কার্য্য—মনকে উপদেশ দাও ;

(২) যতক্ষণ না নিজের অবস্থাটা বোধগম্য হয় ততক্ষণ উপদেশ কর। যতদিন না নিজের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট বুঝিতেছ ততদিন ইহাকে নিত্য উপদেশ কর।

প্রতিদিন প্রতিক্ষণ উপদেশ কর। সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া দাও—কোন্ অবস্থায় পড়িয়াছ, আর কোন্ অবস্থায় যাইতে হইবে উদ্দেশ্য সর্ব্বদা স্মরণ করিলে তবে উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্যম জাগিবে।

মনকে যেমন ক্ষণস্থায়ী অসার বিষয়ে বিরাগী না করাইয়া তপস্যা করাইলে, মন ঠিক একমন হইয়া কার্য্য করিতে পারে না ; জোর করিয়া কার্য্য করাইলে, ইহা অভ্যাস মতে করে সত্য, কিন্তু মন মাতে না ; সেইরূপ কর্ম্ম করিবার অবস্থায় আনিয়া কর্ম্মটি সম্মুখে ধরিলে এ নিশ্চয়ই উদ্যমের সহিত কর্ম্ম করিবে।

(৩) কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা চাই—কর্ম্ম করিতেছি তুমি প্রসন্ন হইবে বলিয়া। কর্ম্মে সুখ হইল বা দুঃখ হইল তাহা দেখিব না, কোন দিন ভাল হইলে উৎফুল্ল হইব না, আবার কোন দিন মনের মতন না হইলে বিষণ্ণ হইব না। ভাল হউক বা মন্দ হউক সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া তুমি প্রসন্ন হও—এই ভাবিয়া ভাবিয়া কর্ম্ম করাও। যতদিন না মন অন্য সকল বিষয়ে বিরাগী হইয়া কেবল উদ্দেশ্য সম্পাদনে অনুরাগী হয়, ততদিন সর্ব্বক্ষণ উপদেশ করিতে থাক। একক্ষণের জন্য যেন ইহা আলস্য বা অনিচ্ছা করিতে না পারে। পুত্র, কন্যা, স্বামী বা স্ত্রী অথবা কোন লোকের মৃত্যু যদি দেখিয়া থাক তবে সেই নিরাশ্রয়ের অবস্থায় মনে মনে আপনাকে আনিয়া নাম কর, নামে রস পাইবে।

এতদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছ হয় নাই—তথাপি ছাড়িও না। আবার আজ হইতে, এই মুহূর্ত্ত হইতে নূতন করিয়া আরম্ভ কর। মনে কর নূতন জীবন হইল।

এই নূতন জন্মে কাহারও সহিত ত পরিচয় নাই। নূতন বালক জন্মিল, তাহার সহিত কাহার পরিচয় আছে ? সেইরূপ ভাবে সকলের সহিত যেন অপরিচিত - এই মনে করিয়া খাতির রাখিতে দুর্ব্বলতা না দেখাইয়া, নূতন জীবন লইয়া নূতন ভাবে গড়।

মনের প্রতি উপদেশ দাও। দিয়া ইহাকে বৈরাগ্য দ্বারা সজীব কর; করিয়া নিত্য কর্ম্ম—তুমি প্রসন্ন হও স্মরণ করাইতে করাইতে করাও। ইহাতে উদ্যম শিথিল হইবে না। তখন একান্তে ইহা শান্তভাবে বসিয়া বিচার করিতে পারিবে।

বিচার কর আপনিই আপনি—ইহাতে স্থিতিই দুঃখনিবৃত্তি। শক্তিগুলি যতক্ষণ বাহিরের অসার বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত হয়, ততক্ষণ আপনি ভাব ধরা চায় না। এজন্য বাহিরে প্রবাহিত শক্তিগুলিকে ভিতরে কোন এক কেন্দ্রমুখে লইয়া চল। সর্ব্বশক্তি যাহা হইতে বাহিরে ছুটে, সেই চিত্তকে ভিতরের কোন অবলম্বনে বন্ধন কর। অন্যদিকে ছুটিয়া গেলে আবার ফিরাইয়া বন্ধন কর। ইহাই ধারণা। বহু দিন ধরিয়া বন্ধন করিতে করিতে যখন আপনা হইতে ইহা ধ্যেয়বিষয়ে থাকিবে, তখন হইবে ধ্যান। ধ্যান পাব হইলে হইবে সমাধি। যখন সমাধি হইতে থাকিবে, তখন ব্যুত্থান অবস্থায় বিচার কর—চেতন—অন্য সমস্ত হইতে পৃথক্। আত্মাই কেবল চেতন, অনাত্মা যাহা তাহা জড়। এই চেতন কাহারও সহিত মিশিতে পারে না, কাহারও সহিত মিশ খায় না। ইহার নিজের দুঃখ কিছুই নাই। স্বচ্ছ লোক ভাল লোক বলিয়া অন্যের দুঃখটা ইহাতে আরোপ হইয়া যায়, ইহাতে প্রতিফলিত হয়। স্ফটিক মণি, নিকটবর্ত্তী জবার লাল রং আপনাতে পড়া নিষেধ করিতে পারে না; কিন্তু আত্মা তাহা পরিবেন না কেন?

বিশেষ যদিই কোন কিছু চিত্তে উদয় হয়, তাহাতে চেতন পুরুষ আপনার আপনিই আপনি স্বভাব হারাইয়া দুঃখী হইয়া যাইবেন কিরূপে?

উপদেশ কর, বৈরাগ্য আন, নিত্যকর্ম্ম কর—বিচার কর বুঝিতে পারিবে তুমি যাহা হইয়া আছ তুমি তাহা নও। তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়া শোকতাপে মগ্ন হইয়াছ।

তুমি জীব! কিন্তু তোমার স্বরূপটি আপনিই-আপনি। এইটি বুঝিতে প্রাণপণ কর, বুঝিয়া স্মরণ কর; করিয়া অন্য সমস্ত ব্যবহারিক কার্য্য প্রবাহপতিত ভাবে কর।

তুমি প্রসন্ন হও—এই মনে রাখিয়া সকল কর্ম্ম কর, তাহাতে কর্ম্মেও ঔদাসীন্য আসিবে না; তুমি হতাশও হইবে না; উদ্যমবিহীনও হইবে না! অন্য পক্ষে তুমি বুঝিবে তুমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—তুমি আপনিই আপনি। তোমার

মৃত্যুও নাই, জরাও নাই, আধিব্যাধিও নাই, দেহ মরিলেও তোমার কোন ক্ষতি নাই; আহার কমাইলেও তোমার কোন ক্ষতি নাই, নিদ্রা কমাইলেও নাই। যে আপনিই আপনি ইহা ভাবিতে পারে, তাহার কোন ভোগে রুচি থাকে না। ভোগে রুচিশূন্য হইয়া, আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের সেবা জন্য সংসার কর, তোমার মত কর্ত্তব্য আর কেহ করিতে পারিবে না জানিও।

নতুবা কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার সংগ্রহ করিয়া কি করিবে বল? না হয় তুমি স্বাধীন চিন্তা করিতে পারিলে, বিধবাবিবাহ দেওয়া ভাল, স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া ভাল, সমুদ্রযাত্রা ভাল, কোন কিছুতেই দোষ নাই। শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে মানুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ হয়, হৃদয়ের প্রসারতা চাই—তজ্জন্য শাস্ত্রের দোহাই একবারে ত্যাগ করা চাই, প্রতিমাপূজা বন্ধ করা চাই, জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়া চাই। বুঝিলাম তুমি সব করিলে—করিয়া কি ফল ফলিবে একবার স্থিরচিত্তে ভাব দেখি। আমিও তোমার আপনার, অত কর্কশভাবে উপদেশ না দিয়া একটু ভাল করিয়া উপদেশ দাওনা। তার পরে তুমি যে আধুনিক আলোকে আলোকিত হইয়াছ—তুমি ত তোমার বর্ব্বর ভাই ভগ্নীকে উন্নত করিবে বলিয়াই দৃঢ়ভাবে কটিবন্ধন করিয়াছ? তবে ভালবাসিয়া উপদেশ দাও না কেন? তোমার উপদেশে এত ঘৃণা থাকে কেন? তুমি ত জগতের পুরাতন সবই ত্যাগ করিলে, নূতন ভিন্ন তোমার প্রিয় কিছুই নাই,—লইয়া আছও ত অনেক দিন, কতটুকু শান্তি পাইলে বল? জাতি-ভেদ ছাড়িয়া, প্রতিমা ছাড়িয়া, শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া ছাড়িয়া, যজ্ঞোপবীত ছাড়িয়া, বিধবাবিবাহ দিয়া বা করিয়া কতটুকু শান্তি পাইয়াছ বল? পরকে ঘৃণা যতদিন করিতেছ, ততদিন একটা অহঙ্কার তুমি রাখ; অহঙ্কার রাখিলেই তুমি পরিচ্ছিন্ন হইয়াছ, সকলকে ভালবাসিতে পার নাই,—শান্তি কিসে পাইবে? সংসারেই বা তোমার কোন্ শান্তি আছে? পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন, দেশের লোক সকলকে বর্ব্বর ভাবিয়া ত সব ছাড়িলে—কিন্তু যে সংসারে তুমি থাক, সেখানে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার তোমার কেমন আপনার হইয়াছে তাহা দেখ? যাক্—এ সব বৃথা। যাহা করিতেছ তাহা আবার আলোচনা কর; করিয়া একবার আপনাতে আপনি থাকিয়া, ভালবাসিয়া লোকের উপকার কর।

সমকালে দুইটী কর্ম্ম করিতে হইবে। একটী বাদ দিয়া যদি একটী কর, তুমি কাহারও কিছু করিতে পারিবে না।

নিজের নিঃশ্রেয়স্ লাভের জন্য আত্মকর্ম্ম করাই প্রধান। সেই জন্য জগতের অভ্যুদয় যাহাতে হয় তাহাও করা চাই। শ্রীভগবান্ যে নিয়মে জগৎচক্র পরিচালন করিতেছেন, সেই নিয়ম ধরিয়া লোকহিতকর কার্য্য কর; সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মাকে আপনিই আপনি ভাবে স্থিত করিবার কার্য্য কর। আত্মকর্ম্ম বাদ দিয়া জগতের হিত করিতে যাও, তুমি ভিত্তিশূন্য প্রাসাদ গাঁথিবে মাত্র। জগতের হিতকর কার্য্য ছাড়িয়া আত্মকর্ম্ম করিতে যাও তুমি আত্মকর্ম্ম করিতেই পারিবে না; বহুপ্রকারে সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে।

আত্মকর্ম্ম ও জীবহিতকর কর্ম্ম—তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া কর, ছাড়িও না।

ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম—রাজধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয়। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয় পরিচালিত হইতেন। পদ্মপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণেও দেখা যায়:—

(১) রাজা-দান করিবেন কিন্তু যাচ্ঞা করিবেন না। "দদ্যাদ্রাজান যাচেত।" অধ্যয়ন করিবেন কিন্তু অধ্যাপনা করিবেন না। "যজেত ন চ যাজয়েৎ।" যজ্ঞানুষ্ঠান (রাজসূয় অশ্বমেধাদি) করিবেন কিন্তু যাজন করিবেন না। "নাধ্যাপয়ে দধীয়িত।"

(২) সর্ব্বদা দস্যুবধে উদ্যুক্ত থাকিবেন। নিত্যোদ্যুক্তোদস্যুবধে।

(৩) সমরে বিক্রম দেখাইবেন।

যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞপরায়ণ, বেদজ্ঞ, যুদ্ধজয়ী, তিনি সর্ব্বলোক-বিজেতা। যে ক্ষত্রিয় অক্ষত শরীরে সংগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহার ইহকাল পরকাল নাই। দস্যুদমন অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ কার্য্য নাই। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ এই তিনটি রাজাদিগের মঙ্গল কার্য্য।

(৫) প্রজাপালন রাজার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

(ক) নৃপতি প্রজাগণকে স্বস্ব ধর্ম্মে স্থাপন করিবেন।

(খ) প্রজাদিগকে সতত ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত রাখিবেন।

(৬) নৃপতি বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক রাজনীতিসমূহ শিক্ষা করিয়া বিবাহাদি করিবেন।

(৭) নৃপতি বিজয়লাভ করিয়া প্রজাপালক পুত্রকে—অভাবে অন্য প্রশস্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে অভিষেক করিবেন।

(৮) দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া চরমে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা পর্য্যটনাদি দ্বারা জীবনপাত করিবেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির ইহাই রাজধর্ম্ম।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত ও মন্ত্র।

সন্ন্যাসী কত প্রকার?

(১) কুচীচরঃ, (২) বহূদকঃ, (৩) হংস, (৪) পরমহংসঃ।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কি?

শ্রীভগবানে সমস্ত কর্ম্মার্পণ। সর্ব্বন্যাসে হরৌভূপ ধর্ম্ম সন্ন্যাসিনাং ধ্রুবম্।

সন্ন্যাসীর ব্যবহার কি?

সন্নাসী রক্তাম্বর পরিধান ও দণ্ডধারণ করিয়া মৃণ্ময় কমণ্ডলু হস্তে গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিবেন। কখনও এক স্থানে অবস্থান করিবেন না।

ভ্রমণ সময়ের কর্ম্ম কি?

সর্ব্বভূতে সমদর্শন ও নারায়ণ স্মরণ।

সন্ন্যাসীর নিষিদ্ধ কি?

(১) সন্ন্যাসী সহসা কাহাকেও বিদ্যা বা মন্ত্র প্রদান করিবেন না।

(২) কোন স্থানে বাসের নিমিত্ত আশ্রম-নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইবেন না।

(৩) কোন বস্তু লাভের কামনা করিবেন না; কোন সঙ্গ, কোন মমতা রাখিবেন না। কোন গৃহস্থের নিকট বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা করিবেন না।

(৪) স্বাদু ভক্ষ্য ভোজন করিবেন না।

(৫) দৈবক্রমেও স্ত্রীমুখ দর্শন করিবেন না।

রক্তৈকবাসা দণ্ডীচ বিভর্ত্তি মৃৎকমণ্ডলুম্।
সর্ব্বত্র সমদর্শীচ স্মরেন্নারায়ণং সদা॥
করোতি ভ্রমণং নিত্যং গেহে গেহে ন তিষ্ঠতি।
বিদ্যামন্ত্রঞ্চ কস্মৈচিৎ ন দদাতি চ দৈবতম॥

করোতি নাশ্রমং ভিক্ষুঃ করোতি নাণ্যবাসনাম্।
করোতি নাণ্যসঙ্গঞ্চ নির্ম্মোহঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ॥

ন স্বাদু ভুঙ্‌ক্তে দৈবাচ্চ স্ত্রীমুখং নহি পশ্যতি।
ন বাঞ্ছিতং ভক্ষ্যবস্তু যাচতে গৃহিণং ব্রতী॥
ইতি সন্নাসিনাং ধর্ম্মমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥

সন্ন্যাসীর বিহিত কি?

(১) সন্ন্যাসী এক সময়েই ভিক্ষা করিবেন। বারংবার ভিক্ষাতে লিপ্ত হইলে ভোগাসক্ত হইতে পারেন।

(২) সপ্তগৃহে ভিক্ষা করিবেন। তাহাতেও প্রাণধারণের উপযোগী দ্রব্য লাভ না হয়, তবে আর দুই গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

(৩) জলের দ্বারা উত্তমরূপে পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে ভক্ষণ করিবেন। নিত্য পৃথক্ পাত্রে ভোজন ও ভোজনান্তে পরিত্যাগ। কল্যকার জন্য পাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না।

(৪) গৃহীর দ্বারে আসিয়া একবার মাত্র "ভিক্ষা" এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন। গো-দোহন পরিমিতকাল নীরবে অপেক্ষা করিবেন।

(৫) ভোজনকালে বাক্‌যত ও শুচি হইবেন। হস্তপদ প্রক্ষালনের পর যথাবিধি আচমন করিবেন। আদিত্যদেবকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়া পূর্ব্বমুখে বসিয়া পঞ্চপ্রাণাহুতি দিবেন। অনন্তর অষ্টগ্রাস ভোজন করিবেন। পরে আচমনান্তে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন।

(৬) প্রাতে, সন্ধ্যায়, মধ্যরাত্রে ও শেষরাত্রে বিশেষরূপে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবেন।

সন্ন্যাসীর পাত্র কিরূপ হইবে?

অলাবুপাত্র, কাষ্ঠপাত্র, মৃৎপাত্র এবং বেণুবংশপাত্র ইহাই যতিপাত্র।

সন্ন্যাসীর ব্রত ও নিয়মের ব্যভিচার হইলে প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হইবে?

(১) রিপুর উত্তেজনায় স্ত্রীগমন করিলে প্রাণায়ামযুক্ত সান্তপর্ণনামা প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

(২) শাস্ত্র বলেন, পরিহাসস্থলে মিথ্যাবাক্য দোষাবহ নহে। কিন্তু সন্ন্যাসী পরিহাসসূচক মিথ্যাপ্রসঙ্গও করিবেন না। মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিলে তাহার

প্রায়শ্চিত্ত একরাত্র উপবাস ও ১০০ শত প্রাণায়াম। অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াও মিথ্যা বলিবেন না। মিথ্যার তুল্য অধর্ম্ম নাই।

(৩) হিংসা ও তৃষ্ণা আত্মজ্ঞান বিনাশক। ইহাকে আশ্রয় করিলে দুষ্টাত্মা সন্ন্যাসী ব্রতচ্যুত হয়। ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে এই। সেই সন্ন্যাসী যদি অনুতপ্ত হয়, তবে সে এক বৎসর সাধ্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। দৈববশতঃ হিংসা করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত অথবা চান্দ্রায়ণ করিবে।

(৪) স্ত্রীলোক দর্শনে মন চঞ্চল হইলে ১৬টী প্রাণায়াম করিবে।

(৫) দিবানিদ্রা করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ও শত প্রাণায়াম করিবে।

(৬) মধু, মাংস, নব শ্রাদ্ধান্ন এবং প্রত্যক্ষ লবণ ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করা বিধায়।

সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় জন্য সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কি?

ধ্যান-রত থাকা।

সন্ন্যাসীগণের গুরুপরম্পরার কি উল্লেখ আছে?

সত্যযুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ইহারাই সন্ন্যাসীর আচার্য্য।

ত্রেতায় বশিষ্ঠ, শক্ত্রি, পরাশর।

দ্বাপরে ব্যাসদেব ও শুকদেব।

কলিতে গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ ও শঙ্করাচার্য্য।

সন্ন্যাসীর দীক্ষামন্ত্র কি?

তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞঃ হংস সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো স্বভাবেন সুখং চর॥

মহানির্ব্বাণ ৮ম উল্লাস।

শ্রীদুর্গাপূজা ও প্রতিমাপূজা।

১

শ্রীদুর্গাপূজা।

বিশ্বাস মহামূল্য রত্ন। বহু পুণ্যে মানুষ বিশ্বাসী হইতে পারে। যাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না তাহারা যে মূঢ় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ইহাও সত্য—বিশ্বাস যদি এক অবস্থায় থাকিয়া যায়, তবে তাহার আশে পাশে কুসংস্কার যুটিয়া যায়। কুসংস্কার দূর করিলে, বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়। হইয়া ভবিষ্যতে ভক্তিতে পরিণত হয়। ভক্তি হইতে জ্ঞান আইসে। জ্ঞানেই মুক্তি। মুক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ।

বিশ্বাসই মুক্তির বীজ। বীজের মধ্যে যেরূপ বৃক্ষ থাকে, বিশ্বাসের মধ্যেও সেইরূপ ভক্তি ও জ্ঞান-বনস্পতি থাকে। বিশ্বাসের বস্তুটিতে যুক্তি থাকিবেই। যে বিশ্বাস যুক্তিশূন্য তাহাই কুসংস্কার।

তুমি মূর্ত্তি অসম্ভব মনে কর। যাহারা সম্ভব মনে করে, তাহারা যুক্তি দেখিয়াই সম্ভব মনে করে। ব্রহ্মের মূর্ত্তি নাই—ইহার সম্বন্ধে তুমি যে যুক্তি প্রদর্শন করে সেই যুক্তি যদি বিশ্বাসী খণ্ডন করিতে না পারেন, তবে তাঁহার বিশ্বাসে প্রকৃত ফল হয় না।

সন্দেহ রাখিয়াও যখন বিশ্বাস মত কার্য্য করা যায়, অথবা সন্দেহ অগ্রাহ্য করিয়া যখন বিশ্বাসে কার্য্য করা যায়,—তখন যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান বলে। কিন্তু সংশয় ও বিপর্য্যয় রহিত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান।

মনে করা হউক গুরুকে ঈশ্বর বোধ করিতে হইবে। তোমার মনে হইতেছে ইনিও ত মানুষ—ইঁহার রাগ দ্বেষ আছে—তোমার এই যে সন্দেহ, তাহার নাম সংশয়।—তবে মানুষ কখন ঈশ্বর নহে তোমার এই যে বোধ, তাহাই বিপর্য্যয়। সংশয় ও বিপর্য্যয় যদি বিচার দ্বারা দূর করিতে পার, তবেই তুমি ঠিক ঠিক ধারণা করিতে পারিবে ইনিই ঈশ্বর। কিন্তু যদি ইহা নাও পার—শুধু সংশয় ও বিপর্য্যয়গুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাও, তাহাহইলেও ক্রমে জ্ঞানের স্ফুরণ হইবে।

ব্রহ্মের মূর্ত্তি আছে কিরূপে? অমূর্ত্তের মূর্ত্তি, অরূপের রূপ এতৎসম্বন্ধে যে সমস্ত

যুক্তি আছে তাহা জানিতে চেষ্টা কর,—দেখিবে যাঁহারা ব্রহ্মের মূর্ত্তি হইতে পারে না বলেন, তাঁহারা অজ্ঞানেরই প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। আমরা পরপ্রবন্ধে যুক্তির কতক কতক অবতারণা করিব। এ প্রবন্ধে এইমাত্র বলি যে, শ্রুতি স্মৃতি মূর্ত্তি-পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ব্যাস, শঙ্কর সকলেই মূর্ত্তি মানিয়াছেন, পূজাও করিয়াছেন। শাস্ত্রের কথা অমান্য করিতে যদি তুমি বল, তবে তোমার মত লোকের কথা মানিয়া মানুষ কতদিন চলিতে পারিবে ? যদি তুমি মানুষকে ঋষিদিগের কথা ভ্রমপূর্ণ ইহা দেখাইতে চাও, তবে তুমি, যে ঋষি-গণের চরণছায়াও কখন স্পর্শ করিতেও পার না, কখন পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না—তোমার কথা যে নির্ভুল তাহা কোন্ বাতুলে বিশ্বাস করিবে বল ?

কাহারও সমালোচনা করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও যাহারা আমার পিতা মাতা অথবা তদপেক্ষা প্রিয়তম যে ইষ্টদেবতা তাহার নিন্দা করে, তাহাদের প্রতি-বাদ করা নিতান্ত স্বাভাবিক। লোকসঙ্গে থাকিলেই এইরূপ হয়। শাস্ত্রও বলেন জ্ঞানের প্রচার যেরূপ আবশ্যক, অজ্ঞানের মূলোৎপাটন ও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। শক্তিই ব্রহ্মের উপাধি। শক্তি-দর্পণে তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন। কোন মানুষ ব্রহ্মের মূর্ত্তি কল্পনা করে না। কৃপ ধাতুর অর্থ সামর্থ্য। ব্রহ্মে মূর্ত্তি ধরিবার সামর্থ্য আছে। এই যে সৃষ্টি ইহাও তাঁহার মূর্ত্তি। সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রকাশ হইবেন কাহার কাছে ? সৃষ্টিটা অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তাবস্থা। আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রতিমা সম্বন্ধে কতক কতক আলোচনা করিব। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি—নামরূপ যাহা তাহা ব্রহ্ম সমুদ্রের উপরে শক্তিরূপ তরঙ্গ মাত্র। দৃশ্যমান যাহা, ইন্দ্রিয়-গোচর যাহা—তাহা শক্তিই।

শ্রীদুর্গা শক্তিরই নাম। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ বলিয়া ইনিই ব্রহ্ম। ইনি চিন্ময়ী, ইনিই ব্রহ্মরূপিণী, ইনিই ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ ভাবে উপাসনা করাতেও যে ফল, শ্রীদুর্গাকে উপাসনা করিলেও সেই ফল। শ্রীদুর্গা কেন—সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যাহা হইতে জড়ভাব মুছিয়া ফেলিতে পারিবে তাহাই ব্রহ্ম। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই ব্রহ্মের উপরে মায়ার ইন্দ্রজাল।

শক্তি সম্বন্ধে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। শক্তির এক অংশ সৃষ্টি বিস্তার করে। শক্তির অপর অংশ সর্ব্বদাই ব্রহ্মপথগামিনী। নদী যেখান হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন ইহা সর্ব্বদাই যেমন সাগরাভিমুখে প্রবাহিত

হয়,—শক্তিও সেইরূপ যেস্থানেই কেননা ভাসেন, সেই স্থান হইতেই ইঁহার এক প্রবাহ, ব্রহ্মের সহিত মিশিতে ছুটিয়া যান। শক্তির এই ঊর্দ্ধপ্রবাহকে বলে বরণীয় ভর্গ। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাকেই গায়ত্রী নাম দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় এই বরণীয় ভর্গেরই উপসনা করেন।

ভর্গ বলে তাহাকে, যিনি অবিদ্যা, অজ্ঞান ইত্যাদি ধ্বংস করেন। ভর্গ অর্থ তেজ। কাহার তেজ ইনি? সেই ক্রীড়াশীল সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তার ভর্গ ইনি। ইনিই সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মই, সেই নির্গুণ, অবিজ্ঞাত স্বরূপ, অবাঙ্মনসগোচর, আপনিই আপনি রূপ পরমব্রহ্মের বরণীয় ভর্গ। ব্রহ্ম আপন স্বরূপে আপনিই আপনি। মায়া বা শক্তিটি সেই চিন্মণির ঝলক। ঝলকমণ্ডিত ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম। ঝলকশূন্য মণিটি পরমব্রহ্ম।

শ্রীদুর্গা কে? না ইনিই সেই সবিতা দেবতার, সেই ঝলকমণ্ডিত চিন্মণির বরণীয় ভর্গ। সমস্ত দেবতাই বরণীয় ভর্গ। সমস্ত মূর্ত্তিই সেই বরণীয় ভর্গের। প্রণবই ইঁহার আদি মূর্ত্তি। প্রণবই আপন ব্যাহৃতিতে সপ্তলোক ছাইয়া আছেন। ইনিই সেই দেবতার, সেই—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"র, সেই নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ সগুণ ব্রহ্মের, বরণীয় ভর্গ; সেই ঝলক জড়িত চিন্মণি। অধিক কি বলা যাইবে—ইনিই পিতা, ইনিই মাতা, ইনিই একমাত্র সুহৃৎ। শক্তি-আচ্ছাদিত পরব্রহ্মই শ্রীচণ্ডীতে দেবী; শক্তি-আচ্ছাদিত পরব্রহ্মই শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ। শুধু ব্রহ্মের পূজা হয় না। শক্তি যুক্ত ব্রহ্মই পূজার বস্তু। শুধু ব্রহ্মে স্থিতি হয়—শক্তিমাখা ব্রহ্মের পূজা হয়। এই দুর্গাপূজা তাহাই।

আয়াহি বরদে দেবি! বলিয়া ইঁহাকেই ডাকা হয়। ব্রহ্মের যে ত্রিপাদে সৃষ্টি-তরঙ্গ উঠে না, যে ত্রিপাদ পরমশান্ত-চলন রহিত—ব্রহ্মের সেই পরম পদেই শক্তি মিশিয়া থাকেন। সেখানে ইঁহার পূজা হয় না। তাই সেই পরমপদ ছাড়িয়া, ইঁহাকে ইন্দ্রিয়গোচর হইবার জন্য ডাকা হয়। মা তুমি এস, তাই বলা হয়। হায়! মানুষের অবিশ্বাস। যিনি আছেন বলিয়া জীব জীবিত, তাঁহাকেও মানুষ জড় ভাবিয়া উপাসনা করিতে চায় না।

একবারে বুঝিতে পার আর না পার প্রথমে বিশ্বাস কর,—ইনিই সচ্চিদানন্দ-রূপিণী, ইনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী। ইনিই আকাশ ছাইয়া আছেন; ইনিই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে আছেন। ইনি নিরাকারা হইয়াও সাকারা; সাকারা হইয়াও নিরাকারা

এই ত পূজা আসিতেছে। তিন দিন ধরিয়া বিশিষ্টভাবে ইঁহার পূজা হয় সত্য, কিন্তু মায়ের পূজা প্রত্যহ হয়। তিন বেলায় হয়। সর্ব্বক্ষণে হয়। যে, পূজার রস পাইয়াছে,—সে কি পূজা না করিয়া একক্ষণও থাকিতে পারে? অনুরাগ যাহার জন্মিয়াছে সে কতক্ষণ আপন ঈপ্সিততম, আপন দয়িত, আপন রমণীয় দর্শন, এক কথায় আপনার প্রাণের প্রাণকে ছাড়িয়া জীবনধারণ করিতে পারে? মীন কতক্ষণ জড় ছাড়িয়া জীবনধারণ করিতে পারে? ইনি শ্বাস প্রশ্বাস রূপে জগৎজীবধারিণী। শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িয়া কতক্ষণ থাকিতে পার? তাই বলি এই তিন দিন ভাল করিয়া পূজা কর, পূজার ব্যাপার লক্ষ্য কর,—করিয়া সম্বৎসর ধরিয়া অন্তরে মানসে মায়ের পূজা কর। কত দিনত পূজা দেখিয়াছ? অন্তরে মানসে কতদিন পূজা করিলে বল? মায়ের আরতি ত দেখ—কয় দিন মানস পূজায় আরতি করিলে বল? বাহিরের পূজায় অনেক আয়োজন চাই। মানস-পূজার কোন আড়ম্বর নাই। শুধু বৈরাগ্যযুক্ত মনকে হুকুম কর,—সেই পূজার আয়োজন করিয়া দিবে। বলিদানে হিংসা আছে। ঠিক জ্ঞান না হইলে, ঠিক ভক্তি না জন্মিলে, পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে বলিদান হয় না; কিন্তু মানসপূজায় হিংসা নাই; মানসপূজায় বলিদান দিও। কামই তোমার অজা; ক্রোধই তোমার মহিষ; লোভই তোমার মেষ। কাম, ক্রোধ, লোভই নরকের তিনটি দ্বার। কামকে ছাগল ভাবনা করিয়া বলি দাও; লোভকে মেষ ভাবনা করিয়া মায়ের নিকট বলি দাও; আর ক্রোধকে মহিষ ভাবনা করিয়া বলি দাও। বড় সুখ পাইবে। তার পর প্রাণ? অপান, সমান, উদান, ব্যানরূপী পঞ্চবায়ুর পঞ্চপ্রদীপ লইয়া মায়ের আরতি কর। আরতিকালে মায়ের মূর্ত্তি বড় স্পষ্ট দেখিবে—ইহাতে বড়ই আনন্দে ভাসিবে। ধারণাভ্যাস ইহা। ইহা দ্বারা ক্রমমুক্তি হয় কিন্তু সদ্যোমুক্তি হইবে যদি মাকে স্পর্শ করিয়া শান্ত হইয়া যাইতে পার,—যদি মায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মায়ের সঙ্গে সেই পরমপদে স্থিতিলাভ করিতে পার। নিত্য পূজা কর, নিত্য প্রার্থনা কর, নিত্য কথা কও। এ পূজা হয় একান্তে। বাহিরের পূজাও কর, আবার একান্তে মানস পূজা কর। কিসের দুঃখ ভাই!

২

প্রতিমাপূজা।

মুখের উপাধি দর্পণ। দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িয়া মুখকে ইন্দ্রিয়গোচর করে। নতুবা আপনার মুখ আপনি দেখা যায় না।

আকাশের কোন আকার নাই, কোন মূর্ত্তিও নাই। আকাশ সূক্ষ্ম, আকাশ ব্যাপক।

আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম যিনি, শূন্য অপেক্ষাও ব্যাপক যিনি,—তাঁহার আকার কিরূপে থাকিবে? তাঁহার প্রতিমা কিরূপে হইবে?

ব্রহ্ম, শূন্যকেও ওতপ্রোত ভাবে ধরিয়া আছেন। ব্রহ্ম, আকাশ অপেক্ষাও ব্যাপক। এই ব্রহ্মের আকার কি হইতে পারে?

পারে না। আকার হইতে পারে না, কিন্তু কি হইতে পারে? যাহা অতি সূক্ষ্ম, যাহা মনেরও অগোচর, যাহা অব্যক্ত, যাহা অচিন্ত্য, বল দেখি তাহার গুণ হইতে পারে কি?

দয়া একটি গুণ। প্রেম একটি গুণ। গুণবান্ নাই গুণ আছে, প্রেমময় কেহ নাই, প্রেম আছে;—ইহা কি ধারণা করিতে পার?

আকারবান্ বস্তু ভিন্ন গুণ কি কোথাও থাকিতে দেখিয়াছ? বস্তু হইতে গুণকে কখন পৃথক্ থাকিতে কি দেখিয়াছ?

দীর্ঘ একটি গুণ। দীর্ঘ বস্তু না ভাবিয়া দীর্ঘগুণটকে কি ভাবনা করিতে পার? দয়া একটী গুণ—দয়াবান্ মনুষ্য না ভাবিয়া কখন কি দয়াটীকে ধারণা করিতে পার?

পার না। তবে ব্রহ্মে যেমন আকার দিতে পার না, সেইরূপ গুণ দিতেও পার না। আকার দিলে যেমন তিনি ক্ষুদ্র হইয়া যান, গুণ দিলেও তিনি সেইরূপ ক্ষুদ্র হইয়া যান।

তুমি বলিবে অনন্ত দয়া—আমিও বলিব অনন্ত চক্ষু। কিন্তু তোমার অনন্ত দয়াও যেমন সীমাবদ্ধ, আবার অনন্ত চক্ষুও সেইরূপ সীমাবদ্ধ। ফলে তুমি যে অনন্ত কথা ব্যবহার করিতেছ—সে অনন্তসম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? তুমি বল আকাশ অনন্ত। তুমি এই অনন্ত দেখ কিরূপে? বা ভাবনা কর কিরূপে?

আকাশকে কত বড় দেখ—না যতটুকু চক্ষে আঁটে—তার বেশী পার না। আকাশকে ভাব কত বড়—না যতটুকু মনে আঁটে—তার বেশী নয়। মন

সীমাশূন্যকে কি চিন্তা করিতে পারে? যাহা সীমাশূন্য তাহারকি চিন্তাহয়? চিন্তা করা অর্থ সীমাবদ্ধ করা। তবে বল ব্রহ্মচিন্তা কিরূপ? ব্রহ্মভাবনা কিরূপ?

ইন্দ্রিয় যেমন আকার দেখে, মন সেইরূপ সূক্ষ্মগুণ দেখে। মন ও ইন্দ্রিয় উভয়েই ব্রহ্মে পৌঁছিল না। "মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে"। রাজা রামমোহনের গীত।

গুণকে ধরা যায় কি দিয়া?

মন ত তাঁহাকে পায় না—কিন্তু গুণ যদি তাঁহার থাকে, তবে ত মন তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে।

তবে গুণ দিলেও তিনি ব্রহ্ম আর থাকিলেন না।

ব্রহ্ম তবে যেমন আকারশূন্য, সেইরূপ গুণশূন্য। ব্রহ্ম নিরাকার, ব্রহ্ম নির্গুণ।

আকার নাই, গুণও নাই—তবে তাঁহাতে কি আছে? কি আছে বলা যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। শ্রুতি বলেন,—"যন্ন বেদা বিজানন্তি, মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি"। বেদ তাঁহাকে জানেন না, মন চিন্তা করিতে পারে না, বাক্য সেখানে পৌঁছে না।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে যদি কিছুই বলা না যায় তবে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলা হয় কেন? সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বান্তর্যামী,—ইহা কেন বলা হয়?

যখন সর্ব্ব থাকে তখন তিনি সমস্ত, তাঁহাতেও সমস্ত।

ভাল করিয়া বুঝা গেল না।

শ্রবণ কর। "ব্রহ্মে শক্তি আছে" ইহাও বলা যায় না। শক্তি নিজেই যখন কার্য্যরূপে পরিণত না হয়েন, তখন তিনি অব্যক্ত। অব্যক্ত হইয়া তিনি ব্রহ্মের সমান অবস্থায় প্রায় থাকেন। শক্তি অব্যক্ত হইলেও, শক্তি জড়। শক্তিকে একজন না চালাইলে শক্তি চলিতে পারে না।

ফলে ব্রহ্মে শক্তি আছে ইহা বলা যায় না। যদি থাকে বল,—তবে তাহার অনুভব নাই কেন? সুষুপ্তিতে কি থাকে কেহ কি বলিতে পার? তাহা পার না। কারণ সুষুপ্তিতে কোন অনুভব থাকে না।

ব্রহ্মে শক্তি তবে নাই। না—তাও বলিতে পার না। কারণ শক্তি যদি না থাকে, তবে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" শ্রুতি এ কথা বলেন কেন?

তবে কি হইল? শক্তি আছে ইহাও বলা যায় না, আবার শক্তি নাই ইহাও বলা যায় না—ইহা কিরূপ হইল?

হাঁ—এই জন্য শাস্ত্র, শক্তিকে বলেন মায়া। মায়া সৎ ও নহেন, অসৎও নহেন; সদসৎও নহেন, অনির্ব্বচনীয়। তথাপি যখন মিথ্যা মায়া মূর্খলোককে নিরন্তর দুঃখ দেন, তখন বলা হয় ইহা ত্রিগুণাত্মিকা। ইহা অভাব পদার্থ নহে ভাবরূপী। ইহা যৎকিঞ্চিৎ।

মায়া ও অজ্ঞান এক। তাই বলা হয়,—অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি।

তাই মায়া সম্বন্ধে বলা যায়;—

ন সতী সা না সতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ
এতৎ বিলক্ষণা কাচিদ্বস্তু ভূতানি সর্ব্বদা॥
পাবকস্যোষ্ণতেবেয়ং উষ্টাংশোরিব দীধিতিঃ
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা॥

শক্তিকে মায়া, মিথ্যা, অজ্ঞান, নাই ইত্যাদি বলিতে অনেকেই আপত্তি করেন। তা বলিয়া কি করা যাইবে? শক্তি যিনি তিনি মূলে অব্যক্ত। আরও মূলে ইনি স্পন্দন, চলন, সঙ্কল্প, -এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। যখন ইনি ব্রহ্মকে স্পর্শ করেন, তখন আর স্পন্দন থাকে না; সঙ্কল্পও থাকে না; —ব্রহ্ম তখন আপনিই আপনি ভাবে অবস্থিতি করেন। এই ক্ষেত্রে বলা হয় শক্তি শক্তিমানে অভেদ—অভেদ হইয়া ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করেন। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ হইলেও শক্তিমান্ শক্তি ভিন্ন থাকে না। সমুদ্র না থাকিলে তরঙ্গ উঠে না—স্থিতি না থাকিলে গতি হইতে পারে না। সেই জন্য বলা হয়, শক্তিই কিছু শক্তিমান্ নহেন। শুধু শক্তি আকাশে ঝুলে না।

ব্রহ্ম আপনিই আপনি থাকিলেও মণির ঝলক যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ তাঁহা হইতে স্পন্দনাত্মিকা মিথ্যা মায়ার আবির্ভাবও স্বাভাবিক। তিনিই আছেন, অন্য কিছুই নাই; তথাপি যেন কিছু উঠে। তাই বলা হয়, স্বয়মস্তুইবোল্লসন্। স্বয়ং আছেন, আমি অন্য মত—এই তাঁহার উল্লাস। এ সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলিতে পারেন। সব কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আবশ্যক হইলে বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মকে সৎ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। তাহাও যখন তিনি মায়া-উপাধি ধারণ করেন তখন। যখন তিনি অব্যক্ত শক্তি হইতে এই ব্যক্ত-জগতে ভাসেন তখন। সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রকাশ হন কাহার নিকটে?

দর্পণ না থাকিলে মুখ দেখা যাইবে কিরূপে? উপাধি দ্বারাই স্বপ্রকাশের দ্বিতীয় প্রকাশ হয়, তদ্ভিন্ন তিনি "অবিজ্ঞাতস্বরূপ"—"মনোগিরাং বিদূরায়"।

তথাপি দর্পণে যে মুখ দেখা যায় তাহা ঠিক মুখ নহে, মুখের প্রতিবিম্ব মাত্র। মায়ার সাহায্যে যে ব্রহ্ম প্রকাশ হন তাহা ও তাঁহার প্রতিবিম্ব, ঠিক স্বরূপ দেখা যায় না।

ব্রহ্মকে দর্শন করা যায় না। ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা যায়। সুষুপ্তিকে দর্শন করা যায় না, সুষুপ্তিতে স্থিতিলাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন, আত্মজ্ঞান, আত্মদর্শন—এই গুলি স্থিতি-অর্থেই প্রয়োগ হয়। আত্মাই একমাত্র দ্রষ্টা। দ্রষ্টাকে আবার দেখিবে কে? এই জন্য আত্মভাবে স্থিতিই আত্মদর্শন। তবে যে অন্যবিধ দর্শনের কথা বলা যায়, তাহা আমরা যেমন বলি অনন্ত আকাশ দেখিতেছি—সেইরূপ। অনন্ত আকাশ দেখি না,—দেখি যতটুকু চক্ষে আঁটে; কিন্তু কল্পনাতে বলি যেন কি একটা অনন্ত এই ক্ষুদ্র দৃষ্টিগোচর বস্তুকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই "আছে" বা "সৎ" ইহার অনুভবের আভাস। তার পরে ব্রহ্মের চিৎ ও আনন্দ বিশেষণ—ইহাও যখন তিনি মায়া-অবলম্বনে গুণবান্ মত হয়েন তখন। ইহাও সগুণ ব্রহ্মের। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম অতি নিকট বলিয়া, শ্রুতি সর্ব্বত্র দুইই একসঙ্গে বলিয়াছেন। তবেই হইল ব্রহ্ম আপনস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও, উপাধি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনাকে পরিচ্ছিন্ন মত দেখান। কাজেই বলা হয় তাঁহার প্রতিমা। ন তস্য প্রতিমা অস্তি—যাহা বলা হয়, তাহা মায়ার মিথ্যাত্ব লক্ষ্য করিয়া। অন্য কিছুই যেখানে নাই, সেখানে আবার প্রতিমা থাকিবে কিরূপে? কিন্তু ভ্রমজ্ঞানে যখন মায়িক উপাধি জাগ্রত হয়, তখন তাঁহার প্রতিমা আছে।

ফলে প্রতিমা ভিন্ন অন্য কোন রূপে ব্রহ্মকে চিন্তা করা যায় না। অপরিচ্ছন্ন যিনি তিনি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও পরিচ্ছিন্ন মত প্রকাশ হয়েন। ধ্যানযোগে আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ হয় ইহাকেই ব্রাহ্মীস্থিতি বলা যায়। ব্রহ্মোপাসনা অর্থে ব্রহ্মে স্থিতি। তদ্ভিন্ন যাহা কিছু সমস্তই উপাধির সাহায্যে পূজা। প্রতিমাপূজা ভুল নহে। সভ্যজগৎ ইহাকে ভুল বলিলেও সভ্যজগতেরই ভুল। প্রতিমাপূজা সত্য।

বিনা জ্ঞানে এই বিষয়টির ধারণা হইবে না। মনোযোগ কর। যে কারণেই হউক পূর্ব্বদেহে অত্যন্ত মনোবেগের সহিত যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম করা হইয়াছে সেই সমস্তের দুর্লক্ষ্য সংস্কারই এতদ্দেহে বাসনা। ইহাই দৈব। উপস্থিত যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে তাহাই উক্ত প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আবার উপস্থিত কর্ম্মগুলি আর কিছুই নহে কেবল পরিপুষ্ট বাসনা। কর্ম্ম যখন শেষ হইয়া গেল তখন রাখিয়া গেল তাহাদের দুর্লক্ষ্য সংস্কার। এই দুর্লক্ষ্য সংস্কারও বাসনা। তবেই হইল কর্ম্মগুলি বাসনাতেই পরিণত হয়। বাসনা কিন্তু মনেই থাকে। বাসনা মন হইতে অভিন্ন। "বাসনা চ স্বকারণান্মনসো নান্যা। বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ম্" ইতি শ্রুত্যুক্ত ন্যায়াৎ।

যদিও বাক্য ও শরীর দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয়, কিন্তু কর্ম্মাবসানে তাহাদের সংস্কার মাত্র থাকে। সংস্কারগুলিও মনোবাসনা মাত্র।

মনোবাসনা আর মন অভিন্ন হইলেও মনের সত্তাটিই পুরুষ বা আত্মা।

বাসনা মনসো নান্যা মনোহি পুরুষঃ স্মৃতঃ। মনশ্চ পুরুষঃ পূর্ণাত্মৈব ন ততো ব্যতিরিচ্যতে। "তন্মনোকুরুত আত্মন্বী স্যাম্" ইতীত্যাদি শ্রুতের্ম্মনসঃ পুরুষ-বিবর্ত্তত্বাদিতি ভাবঃ। মনই পুরুষরূপে বা আত্মারূপে বিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ মন আপন স্বরূপে গমন করিলেই পুরুষ।

এখন দেখ লোক যাহাকে দৈব বলে তাহা কর্ম্ম। সংস্কারভাবপ্রাপ্ত কর্ম্মের আধার মন। মনের আধার পুরুষ। তবে কর্ম্মগুলিই উপচিত বা পরিপুষ্ট বাসনা। বাসনাই মন। মনই পুরুষ। সুতরাং পুরুষ ও পুরুষকার (কর্ম্ম) এই দুই ব্যতীত অন্য দৈব নাই।

যদ্দৈবং তানি কর্ম্মাণি কর্ম্ম সাধো মনো হি তৎ
মনোহি পুরুষস্তস্মাদ্দৈবং নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥

আবার বলি শুন। মনের আধারকেই যখন পুরুষ প্রমাণ করা হইল তখন আরও একটু চিন্তা করিয়া দেখ। পুরুষস্তু চ পরমার্থতো নির্ব্বিকার-চিন্মাত্ররূপত্বাৎ মনসোঽসত্ত্বে কর্ম্মাসত্ত্বাৎ তদাত্মকদৈবাসত্ত্বং ফলিতমিত্যাহ যদ্দৈবমিতি॥ পরমার্থভাবে দেখিলে পুরুষ নির্ব্বিকার চিন্মাত্ররূপ। কাজেই মনটা তাঁহাতে মায়া মাত্র, মন মিথ্যা। মন মিথ্যা বলিয়া কর্ম্মও মিথ্যা। কর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া কর্ম্মাত্মক যে দৈব তাহাও মিথ্যা প্রমাণ হইল। জীব বাসনাবিশিষ্ট মনের দ্বারা, যে যে বিষয়ে বাসনা জন্মে সেই সেই বিষয়ে মন প্রধাবিত হয়—পরে

তৎপ্রাপ্তি জন্য যত্ন করে, অঙ্গ পরিচালনা করে—পরে সেই সেই ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব জীব কর্ম্ম দ্বারাই ফল পায়—ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে দৈবের কর্ত্তৃত্ব নাই। মনের মধ্যে বাসনা উঠে কেন—এই কঠিন তত্ত্ব পরে বুঝাইব।

সাধুগণ এই দুর্নিরূপ্য মনকেই চিত্ত, বাসনা, কর্ম্ম, দৈব এই সব নাম দিয়াছেন।

হে রাঘব—দৃঢ় অশুভ ভাবনা করিয়াই মানুষ ক্লেশে পতিত হইয়াছে। জানিয়া রাখ যে, পুরুষ আবার শুভ দৃঢ় ভাবনার প্রেরণায় প্রযত্ন সহকারে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন সেইরূপই ফল পাইয়া থাকেন। পুরুষকারই কর্ত্তা। অন্য কিছুরই কর্ত্তৃত্ব নাই।

রাম—প্রাক্তনং বাসনাজালং নিয়োজয়তি মাং যথা।
মুনে তথৈব তিষ্ঠামি কৃপণঃ কি করোম্যহম্॥

হে মুনে! পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনাজাল আমাকে যেরূপে নিয়োজিত করিতেছে আমি সেইরূপেই রহিয়াছি। আমি কৃপণ। কৃপণোদীনঃ পরবশ ইতি যাবৎ। আমি দীন আমি পরবশ; কি করিব বলুন।

বশিষ্ঠ—না না তুমি কৃপণ নও, তুমি পরবশও নও। যেমন প্রাক্তন বাসনা তোমার আছে সেইরূপ অদ্যতন বাসনাও তোমার আছে। যতই দুরাচার হউক না কেন, পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপী হউক না কেন এমন মানুষ কোথায় যাহার ভাল হইতে ইচ্ছা নাই? তবেইত হইল অদ্যতন শুভবাসনাও সকলের আছে। প্রাক্তন অশুভ বাসনা যদি তোমাকে মহাসঙ্কটে নিপাতিত করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে বলপূর্ব্বক জয় কর। যখনই দেখিবে বাসনা সরিৎ (নদী) অশুভ পথে যাইবার উপক্রম করিয়াছে; অনিচ্ছা, আলস্য, বিষাদ, অবসাদ তুলিতেছে তখনই তাহাকে পুরুষকার দ্বারা বলপূর্ব্বক শুভপথে ফিরাইয়া আনিবে। অশুভপথ হইতে ফিরাইলেই সে শুভপথে প্রবাহিত হইবে।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি শ্রবণ কর।

ভাল হইবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। ভাল হইবার উপায় জানে না বলিয়া মানুষ ভাল হয় না। মনে কর যাহার ভাল হইবার ইচ্ছা হইয়াছে সে শাস্ত্র ও গুরু সাহায্যে শুভকার্য্য করিবার উপায় জানিয়াছে। মনে কর স্বাধ্যায় ও যোগাভ্যাস এই দুইটি উপায় গুরু বলিয়া দিলেন। যোগভাষ্যে ভগবান্ ব্যাস বলিতেছেন—

"স্বাধ্যায়াৎ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায় যোগ সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ বা গীতা বা অন্য সৎশাস্ত্র পাঠ, প্রধানতঃ প্রণবের উচ্চারণ—ইহা দ্বারা যোগের অনুষ্ঠান ও যোগের অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় বেদার্থের বা গীতার্থের বা অন্য সৎশাস্ত্রের মনন করিবে। এইরূপে স্বাধ্যায় ও যোগ সম্পত্তি দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান হইবে। শ্রীগুরু যোগের ক্রিয়া দিলেন এবং গীতা পাঠ ও গীতার্থ মনন করিতে বলিলেন। তুমি যোগের কার্য্য কতক্ষণ করিলে কিন্তু তোমার প্রাক্তন বাসনা জাগিল—জাগিয়া তোমার মনকে নানা চিন্তায় ব্যাকুল করিল; কখন বা শরীরকে তমোভাবে আচ্ছন্ন করিল। এ অবস্থায় তুমি কি করিবে? না যোগ ছাড়িয়া স্বাধ্যায় করিবে। বেশ করিয়া বুঝিয়া বুঝিয়া এবং তাহা লিখিয়া লিখিয়া গীতার কোন অংশ পাঠ করিবে—বা যোগবাশিষ্ঠ লিখিয়া পড়িবে। তাহাতে তোমার জড়তা, অনিচ্ছা বা অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর হইল। তখন তুমি আবার যোগাভ্যাসে রত হইলে। প্রথমে দর্শনের কার্য্য করিয়া, পরে নাভি করিয়া পরে প্রাণায়াম কুম্ভকাদি করিলে।

এ অবস্থাতেও সতর্ক হইবার প্রয়োজন আছে। বলপূর্ব্বক চিত্তকে শুভ পথে লইতে হইবে সত্য—আলস্য, অনিচ্ছা ইত্যাদি তমোভাব বা অশুভ বাসনা জাগিলেই বলপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবে; করিয়া চিত্তকে শুভ পথে লইয়া যাইবে। কিন্তু একদিনেই পারিতেছ বলিয়া অধিক করিবে না। হঠ করিয়া চিত্তকে রোধ করিতে চেষ্টা করিবে না।

সমতা সান্ত্বনেনাশু ন দ্রাগিতি শনৈঃ শনৈঃ।
পৌরেষেণৈব যত্নেন পালয়েচ্চিত্তবালকম্॥

চিত্তটি বালক। যে দিকে ফিরাইবে সেই দিকে ফিরিবে। সহজে না ফেরে ত বলপূর্ব্বক ফিরাইবে। কিন্তু ইহাকে সহসা অধিকক্ষণের জন্য রোধ করিয়া রাখিবে না। ক্রমে ক্রমে, অল্প অল্প করিয়া প্রত্যহ ইহাকে যোগ অভ্যাস ও স্বাধ্যায় করাইবে। যোগে ক্লান্ত হইলে স্বাধ্যায় এবং স্বাধ্যায় ক্লান্ত হইলে যোগ—এইরূপ প্রতিদিন করিয়া করিয়া যোগের সময় ও স্বাধ্যায়ের সময় বাড়াইবে। একবারে অধিক সময় একদিন করিলে কিন্তু পরদিন আর কিছুতেই পারিবে না। হঠ করিয়া চিত্তকে রুখিয়া দেখ—চিত্ত এরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া

যায় যেন তুমি একবারে বলহীন হইয়া যাও। মনে কর যখন রাস্তায় তুমি ভ্রমণে বাহির হও, তখন চারিদিকে দেখা তোমার অভ্যাস। তুমি শুনিলে বিষয়ের সহিত চিত্তের যোগ হইতে দেওয়াই পাপ। তুমি কিছুই দেখিবে না—দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া হাঁটিতেছ। একদিনে হঠাৎ এইরূপ করিতেছ বলিয়া চিত্ত এরূপ দুর্ব্বল হইয়া যাইবে যেন তোমার শরীর সেই ক্ষণেই শিথিল হইয়া গেল—মন যেন আর কিছুই করিতে পারিতেছে না; ঘন ঘন হাই উঠিতেছে, মাথা যেন কিরূপ হইয়া গেল—হঠাৎ চিত্তকে রোধ করিতে গেলে এইরূপ বিপদ আছে। শেষে কঠিন রোগও হইতে পারে।

সেই জন্য প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া অধিকবার যোগ ও স্বাধ্যায় করিবে। ইহাকেই বলে চিত্তকে সমভাবে রাখা ও নির্দ্দোষভাবে রাখা। যতটুকু কাজ করিলে অধিক ক্লেশ না হয় ততটুকু করিবে। অধিক ক্লেশ যখন বোধ হইতেছে দেখিবে তখন যোগ ছাড়িয়া স্বাধ্যায় বা স্বাধ্যায় ছাড়িয়া যোগ করিবে। ইহাই হইল পালয়েচ্চিত্ত বালকম্। ন তু দ্রাগেব হঠান্নিরুধ্যাৎ উদ্বেগাৎ সমাধান ভ্রংশো মাভূদিতি। হঠপূর্ব্বক নিরোধ করিলে উদ্বেগ জন্মিয়া তোমার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিবে।

হে রাম! ঐহিক শুভবাসনা অভ্যাসের ফল সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারে!

বিষাদ কি? লোকে বিষাদ করে কেন? বিষাদ ছাড়িয়া অভ্যাসে মন দাও—পূর্ব্বকার দুর্ব্বাসনারূপ আলস্য, অনিচ্ছা দূর করিতে পারিবে। উত্তমরূপে অভ্যাস করিলেই তন্ময়ীভাব আসিবে। ইহা দ্বারাই ইন্দ্রিয় জয় হইবে।

যতদিন না আত্মজ্ঞান লাভ হয় ততদিন গুরুশুশ্রূষা, সাধুসঙ্গ, সৎশাস্ত্র অভ্যাস কর এবং গুরুদত্ত যোগাভ্যাস কর।

যখন চিত্তে আর রাগদ্বেষ আসে না, আত্মবস্তু জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে—আর তোমার মনোজ্বর নাই, কোন উদ্বেগ নাই—তখন ক্রিয়া করা রূপ শুভ-বাসনা ত্যাগ করিয়া পরমপদে শান্তভাবে অবস্থান করিতে পারিবে।

প্রথমে শুভবাসনা অবলম্বন করিয়া জ্ঞানপথ জয় কর, পরে শুভবাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান কর।

১০ম সর্গঃ।

জ্ঞানাবতরণ।

বশিষ্ঠদেব—আত্মতত্ত্ব প্রকাশ স্বরূপ। সচ্চিদানন্দ রূপে তাহা সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত। সেই সত্তা সমস্ত পদার্থেরই কোলে কোলে সমভাবে ভাসিতেছে।

সেই সত্তা এখনও আছে। আবার ভবিষ্যতে যে ভাবে তিনি ভাসিবেন তাহাই নিয়তি। যাহা ভবিতব্য তাহাই নিয়তি। সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত ব্রহ্মসত্তাই তবে নিয়তি।

"আছে" এই ভাবটি সত্তা। গতকালের এই সত্তার কথা বলিতে হইলে বলা হয় "ছিল" আর ভবিষ্যতে "হইবে"। ভবিষ্যৎ সত্তাটি নিয়তি বা ভবিতব্য। যাহাকে বর্ত্তমানে "আছে" বলা হইতেছে তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বকালবর্ত্তী যে সত্তা তাহাই তাহার কারণ এবং বর্ত্তমান সত্তাটি কার্য্য।

ফলে কার্য্য ও কারণ যাহা বলিতেছ তাহা কি দেখ দেখি?

একটি সত্তা--যে ভাবে বর্ত্তমানে প্রকাশ হইতেছে তাহাকে বলিতেছি কার্য্য। আবার যখন জিজ্ঞাসা করি এই ভাবে প্রকাশ হইল কিরূপে, তখন ইহার পূর্ব্বের অবস্থাটি কি তাহা দেখিতে হয় সেইটিকে কারণ বলে।

সত্তার উপরে যাহা ভাসিল তৎসম্বন্ধেই কার্য্য কারণ বলা হয়—সত্তা যেটি সেটি একই। সেই জন্য বলা হইতেছে কারণের কারণত্ব যেটি সেটি সত্তা বা নিয়তি; কার্য্যেরও কার্য্যত্ব যেটি সেটিও নিয়তি।

তোমার শ্রেয়ঃসাধন হইবে কিসে—না স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তাটি ধরিতে পারিলে। ইহার জন্য পুরুষকার কর।

সত্তাকে ব্যক্ত যে করিতেছে সেই প্রকৃতি। সত্তা সত্তাই আছে, তাহা সর্ব্বদাই অব্যক্ত। তথাপি সত্তাটি আর এক রকমে ব্যক্ত হইতেছে। সেইটি প্রকৃতি। প্রকৃতির অন্য নাম চিত্ত। চিত্ত ভিতরের নাম। প্রকৃতি সাধারণতঃ বাহিরের নাম। এই প্রকৃতি সদাই চঞ্চলা। তুমি ইহাকে প্রথমে স্থির কর।

শ্রীরাম—কিরূপে চিত্ত স্থির করিব?

বশিষ্ঠদেব—প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্ত কর? কিরূপে?

কতবারই দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, ঘ্রাণ লইয়াছ, রস গ্রহণ করিয়াছ, স্পর্শ

করিয়াছ, কথা কহিয়াছ, এদিক্ ওদিক্ বেড়াইয়াছ, নাড়িয়াছ, ঘাঁটিয়াছ ইত্যাদি করিয়াছ। চক্ষু কর্ণ বাক্য পদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় কতদিন ব্যবহার করিয়াছ—কিন্তু কি ফল লাভ করিলে বল? রূপ দেখিয়া আর কি হইবে, গল্প শুনিয়া আর কি হইবে, দেশ ভ্রমিয়া আর কি হইবে, কথা কহিয়া আর কি করিবে—সমস্তই অস্থায়ী, সমস্তই দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়; ভোগ ত অনেক করিয়াছ, ভোগে ত স্থায়ী সুখ মিলিল না—আব কি ভোগ করিবে বল? এই ভাবে বৈরাগ্য আশ্রয় কর। ইন্দ্রিয় যখন আর কাজ করিতে চায় না, তখন ইন্দ্রিয়ের রাজা যে মন সেও চুপ করিবে। মন আর চিত্ত একই বস্তু।

মন যখন বিষয় ভাবনা ছাড়িল তখন মনকে মোক্ষোপায়ময়ী-বেদ-সার-সংহিতা শ্রবণ করাও।

এই বেদ তোমাকে আত্মার কথাই শ্রবণ করাইবে।

চিত্তকে বা মনকে এক স্থানে অগ্রে ধারণা কর। যে স্থানে আত্মদেবের স্থান, মনে কর হৃদয়কমল মধ্যে, সেই খানে ইহাকে ধারণা কর। অন্য কোথাও যাইতে দিওনা। নাভিচক্রে, নাসিকাগ্রে, হৃদ্‌পদ্মে বা হৃদয়কমলমধ্যবর্ত্তী ভগবৎ মূর্ত্তিতে চিত্তকে বন্ধন কর। চিত্তকে বাঁধিয়া রাখাই ধারণা। ধারণা কিরূপে পারিবে?

প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে। এষা বৈ ধারণাজ্ঞেয়া যচ্চিত্ত' তত্র ধার্য্যতে।

ধারণাটা যে সুখকর তাহা কিন্তু ভাবিও না। প্রথম প্রথম পূর্ব্বাভ্যাস বদলাইয়া চিত্তকে এক স্থানে ধরিতে হইবে, ইহাতে ক্লেশ আছেই। কিন্তু যোগের বহিরঙ্গ সাধনগুলির সহিত ক্রমে ক্রমে আরাম বোধ হইবে। প্রাণায়াম প্রত্যাহার ত করিবেই। সকল সময়ে ত পারিবে না। সেই জন্য ব্যবহারিক জগতেও পরের সুখে মিত্রতা কর, দুঃখে করুণা কর, পুণ্যে মুদিতা কর, পাপে উপেক্ষা অভ্যাস কর। প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা অভ্যাস কর। এতদ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল কর। মৈত্র্যাদি ভাবনা দ্বারা যে চিত্তকে রাগ-দ্বেষ হইতে মুক্ত করা রূপ সাধনা, তাহা এ ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ সাধনা। তাহার সহিত আরও বহিরঙ্গ সাধনা প্রাণায়াম প্রত্যাহার। এই সমস্ত বহিরঙ্গ সাধনা দ্বারা ধারণা করিবার শক্তি জন্মিবে। গাঢ় ধারণাই ধ্যান, আর গাঢ় ধ্যানই সমাধি। গাঢ় ধারণা হইলে চিত্ত আপনা হইতেই ধ্যেয় বিষয় লইয়াই থাকিবে। ধ্যেয়

বিষয় লইয়া থাকিতে থাকিতেই আপনা হইতে ইহা তন্ময় হইয়া সমাধি প্রাপ্ত হইবে। এই সমাধিও ভঙ্গ হয়। যখন সমাধি ভঙ্গ হইবে তখন চিত্তকে বেদসার-সংহিতা এই যোগবাশিষ্ঠ শ্রবণ করাও।

ইহা শ্রবণ করিলে সুখদুঃখে তুমি অভিভূত হইবে না। তুমি পরলোকে পরমানন্দে থাকিবে। পুনর্জ্জন্ম আর হইবে না। কারণ সংসারবাসনা, ভোগ-বাসনা এ সব কিছুই থাকিবে না।

এই সংহিতা বেদের সার। বেদে কি আছে?

বেদে কাণ্ডত্রয়ং প্রোক্তং কর্ম্মোপাসনবোধনম্।
সাধনং কাণ্ড যুগোক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীরিতম্।

কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড—বেদে এই ত্রিকাণ্ড আছে। কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ড হইতেছে সাধনা বা উপায়, আর জ্ঞানকাণ্ড হইতেছে সাধ্য বা উদ্দেশ্য। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর - করিয়া জ্ঞানানুষ্ঠানে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা মুক্তিলাভ কর।

কোন্ ব্যক্তি ইহা পারিবে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তর এই :—

ত্রিবিধো বিদ্যাধিকারী; উত্তমো মধ্যমোঽধমশ্চ। সর্ব্বাস্মাৎ সংসারাদ্বিরক্ত একাগ্রচিত্তঃ সদ্যো মুক্তিকাম উত্তমঃ। তং প্রতি আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ইত্যাদিনা ব্রহ্মবিদ্যোক্তা।

হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তিদ্বারা ক্রমমুক্তিকামো মধ্যমঃ। তৎপ্রতি উক্থমুক্থ-মিত্যাদিনা প্রাণবিদ্যোপাস্তিরুক্তা। যস্তু দ্বিবিধাং মুক্তিমকাময়মানঃ প্রজাপশ্বাদি মাত্র কামোঽধমঃ। তং প্রতি সংহিতোপাসনং তৃতীয়ারণ্যকেঽভিধীয়তে॥

উত্তম, মধ্যম ও অধম—বিদ্যার এই ত্রিবিধ অধিকারী। সমস্ত বস্তুতে বিরক্ত, সংসারে বিরক্ত হইয়া, আত্মাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া যিনি সদ্যই মুক্তি চান তিনি উত্তম। তাঁর প্রতি আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ আত্মাই আছেন, তিনি আপনিই আপনি আর কিছুই নাই ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ।

সগুণব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভকে লাভ করিয়া যিনি ক্রমমুক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি মধ্যম। তাঁর প্রতি উক্থমুক্থ মিত্যাদি প্রাণবিদ্যার উপাসনা উপদেশ।

সদ্যোমুক্তি বা ক্রমমুক্তি—ইহার কোনটিই যিনি চান না—কিরূপে ধন ধান্য পুত্র কন্যা পশু চিত্ত হইবে ইহা যিনি চান, তিনি অধম। তাঁর প্রতি সংহিতাদির উপাসনা বলা হইয়াছে।

রাম তোমার বৈরাগ্য প্রবল সেই জন্য তুমি সদ্যোমুক্তি চাও। তুমি আত্মা অনাত্মার বিচার কর ; করিয়া অনাত্মা যাহা তাহা ত্যাগ কর ; করিয়া আত্মার অনুসন্ধান কর। চিত্তকে অদ্বয় ব্রহ্মরত কর। তোমার জন্য মোক্ষ কথা।

পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে মোক্ষ কথা বলিয়াছিলেন তাহাই বলি, মনোযোগ কর।

রাম—ব্রহ্মা পূর্ব্বে কি জন্য তত্ত্বজ্ঞান কথা কহিয়াছিলেন—আপনিই বা তাহা শুনিলেন কিরূপে ?

বশিষ্ঠদেব—শ্রবণ কর।

এই যে জগৎ দেখিতেছ—ইহার মূলে সর্ব্বগামী সর্ব্বান্তর্য্যামি অবিনশ্বর চিদাকাশরূপী এক অদ্বয় আত্মা আছেন। সগুণ ও নির্গুণ দুই পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি।

আত্মা প্রদীপের ন্যায় জীবে জীবে বিরাজ করিতেছেন। সেই সর্ব্বত্র, স্থাবরে জঙ্গমে সমভাবে বিকারশূন্য আত্মা একরস হইয়া অবস্থিত।

চিৎস্বরূপ নির্গুণ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু প্রথমে উদিত হন। ইনিই সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাট্ চৈতন্য। সাগর হইতে যে তরঙ্গ উঠে এই পুরুষের উত্থানও সেইরূপ।

এই বিরাট্ পুরুষের হৃদ্‌পদ্ম হইতে [কোথাও বলে নাভিপদ্ম হইতে] সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়। বেদ বেদাঙ্গবিৎ ব্রহ্মা, মন যেমন কল্পনা সৃজন করে সেইরূপে এই সমুদায় ভূত সৃজন করেন। তাঁহার সৃষ্টির এক পার্শ্বে এই জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের এক কোণে এই ভারতবর্ষ।

আধি ব্যাধি জরা ব্যস্ত জীব সৃজন করিয়া—তাহাদিগকে নানা উৎপাতে কাতর দেখিয়া, তিনি ভাবনা করিলেন ইহাদের দুঃখ মোচনের উপায় কি ?

দুঃখ মোচনের জন্য তপস্যা, ধর্ম্ম (যজ্ঞ বা যাগ) দান, সত্য, তীর্থ এই গুলি প্রথমে সৃজন করেন। ইহাতে দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবে না জানিয়া স্থির করিলেন—আত্মতত্ত্ব জানা ব্যতীত নির্ব্বাণনামধেয় পরম সুখ আর কিছুতেই লাভ হইবে না।

আত্মজ্ঞানই সংসার-তপ্ত জীবের উদ্ধারের উপায়। তপস্যা, দান, তীর্থ কিছুই আত্মজ্ঞানের তুল্য নহে।

আত্মজ্ঞানের প্রচার জন্য ব্রহ্মা আমাকে (বশিষ্ঠ দেবকে) সৃজন করিলেন। আমিও পিতার মত অক্ষসূত্র কমণ্ডলু ধারণ করিয়া পিতাকে অভিবাদন

করিলাম। পিতা তখন আমাকে তাঁহার সত্যাখ্য আসনপদ্মের উত্তর পাপড়ীতে বসাইলেন। শুভ্র মেঘে যেমন চন্দ্র উপবেশন করেন, আমিও সেইরূপ উপবেশন করিলাম।

রাজহংস যেমন সারসের কথা কয়, মৃগচর্ম্মপরিধায়ী আমার সহিত পিতার তখন সেইরূপ কথা হইতে লাগিল। পিতা আমাকে বলিলেন, বশিষ্ঠ! তুমি ক্ষণ-কালের জন্য অজ্ঞান হইয়া যাও।

পিতার অভিশাপে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া দিন দিন দুঃখী ও কৃশ হইতে লাগিলাম। সর্ব্বদাই ভাবিতাম এই সংসারযাতনা কোথা হইতে আমাকে আক্রমণ করিল? পিতা আমাকে দুঃখী দেখিয়া বলিলেন, পুত্র! তুমি আমাকে দুঃখশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা কর।

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতঃ! জীবের দুঃখ কিরূপে আসিল, কিরূপেই বা তাহার শান্তি হইবে—আপনি শীঘ্র বলুন।

পিতা বলিলেন, আত্মজ্ঞান প্রচারের জন্য তোমাকে শাপ প্রদান দ্বারা অজ্ঞান-গ্রস্ত করিয়া জিজ্ঞাসু করিয়াছি।

জিজ্ঞাসু না হইলে জ্ঞানসার উপদেশ শুনিবার অধিকারী কেহই হয় না, সেই জন্য এই রূপ করিয়াছিলাম।

পিতা আমাকে আত্মজ্ঞান দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যাহারা সংসার-বিরক্ত বিচারপরায়ণ তুমি তাহাদিগকে পরামাত্মতত্ত্ব জ্ঞান প্রদান কর।

হে রাম! আমি সর্ব্বদা জ্ঞান দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। সংসারে যত কাল উপদেশযোগ্য লোক থাকিবে তত কাল আমাকে এখানে থাকিতে হইবে।

আমার নিজের কর্ত্তব্য কিছুই নাই। যেমন সুষুপ্তিতে বুদ্ধি বিষয়াভিমান-শূন্য হয়, আমিও সেইরূপ অভিমান শূন্য হইয়া উপস্থিত কার্য্যে স্পন্দিত হই মাত্র। অজ্ঞ লোকে আমাকে কর্ম্ম করিতে দেখিলেও আমি কিছুই করি না। ঈশ্বরাজ্ঞা পালন জন্য কর্ত্তব্য বোধে অনাসক্ত হইয়া আমি কর্ম্ম করি। ফলে আমি কিছুই করি না। আমি নিষ্কাম।

এই ভাবে জগতে জ্ঞানের ও নিষ্কাম কর্ম্মের অবতারণা হইয়াছে।

---

১১ সর্গঃ।

বক্তা ও প্রশ্নকর্ত্তা।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মার চেষ্টা, আমার জন্ম ও পৃথিবীতে জ্ঞানের অবতরণ—এই সমস্ত বলা হইল। সুকৃতি না থাকিলে জ্ঞান শ্রবণে ইচ্ছা হয় না। তোমার এই ইচ্ছা মহা সুকৃতির ফল।

রাম—জ্ঞানাবতরণে ব্রহ্মার বুদ্ধি কেন হইয়াছিল, আবার বলুন।

বশিষ্ঠ—সমুদ্রে স্বভাবতঃ যেমন তরঙ্গ উঠে, সেইরূপ পরমব্রহ্ম-স্বভাববশতঃ মৎপিতা ব্রহ্মা ক্রিয়াশক্তিময় হইয়া উৎপন্ন হন। ব্রহ্মাই ঈশ্বর। জগৎ সৃষ্টির পরে তিনি দেখিলেন, আত্মজ্ঞানাভাবে জীবসমূহ জন্ম, জরা, মরণ ও নরকগতি প্রভৃতিতে নিতান্ত আতুর হইয়াছে।

ব্রহ্মা তখন প্রাণিগণের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালের সুগতি দুর্গতি পর্য্যালোচনা করিলেন। দেখিলেন সত্যাদি যুগ হইতেছে, জীবের স্বর্গ ও অপবর্গ (মুক্তি) লাভ করিবার জন্য সাধনা করিবার যোগ্য কাল। ঐ কাল ক্ষয় হইলে জীবের মোহ বৃদ্ধি হইবে। তজ্জন্য নরকলাভ অনিবার্য্য। এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি কারুণ্যপরবশ হইলেন।

তখন তিনি অজ্ঞান নিবারণ জন্য আমাকে সৃজন করিলেন, বার বার উপদেশ দিলেন এবং পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন।

সনৎকুমার নারদাদিও এইরূপে পৃথিবীতে প্রেরিত হইলেন। মহর্ষিগণ জীবের মোহনাশ জন্য পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিশুদ্ধ ক্রিয়া কলাপ, পুণ্য ও জ্ঞান উপদেশ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ তখন প্রচার জন্য পৃথক্ পৃথক্ দেশ বিভাগ করিয়া সেই সেই দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজা স্থাপন করিলেন। লোককে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান অনুষ্ঠান করাইবার জন্য রাজার আবশ্যক। জীবের ধর্ম্মার্থ কামের অনুষ্ঠান করাইবার জন্য যেমন রাজার সৃষ্টি হইল সেইরূপ স্মৃতিশাস্ত্র, যজ্ঞশাস্ত্রাদিও (শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের শাস্ত্র) প্রচারিত হইল।

এইরূপে রাজা, ধর্ম্মসংহিতা, স্মৃতিশাস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের শাস্ত্র প্রচারিত হইল।

তবেই দেখ শুধু জ্ঞানপ্রচারে ফল নাই। অনুষ্ঠান করাইবার লোক থাকা আবশ্যক। আবার নিয়মলঙ্ঘনকারীর শাসন জন্য রাজা থাকাও আবশ্যক।

লোকে যে বলিয়া থাকে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম নহে, একথা সত্য নহে। কিরূপে প্রচার করিতে হয় তাহা তাঁহারা জানিয়াই, জ্ঞানপ্রচারের জন্য রাজা, সমাজ, শাস্ত্র সমস্তই প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু কালচক্রের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। কালে আবার বিশুদ্ধ ক্রিয়া কলাপ লোপ পাইতে লাগিল। লোক সকল ভোগাভিলাষ ও ভোগ প্রাপ্তি জন্য ধনাদি উপার্জ্জনে তৎপর হইল। ধনের জন্য রাজগণের মধ্যে বিবাদ, শত্রুতা চলিতে লাগিল। অত্যাচারীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। বহু লোক দণ্ডার্হ হইয়া উঠিল। বিনা যুদ্ধে রাজগণ পৃথিবী শাসন করিতে পারিলেন না। প্রজাগণ দৈন্যদশাগ্রস্ত হইল ও অধিকতর দুঃখী হইল।

আমি ও অন্যান্য মহর্ষিগণও সংসার-দুঃখ দূর করিবার জন্য এবং জ্ঞান, নিয়ম প্রচারার্থ বহু জ্ঞানশাস্ত্র প্রকটন করিলাম। এই কারণে অধ্যাত্মবিদ্যা রাজাদিগের নিমিত্ত বর্ণিত হইয়াছিল; তাই ইহার নাম রাজবিদ্যা। এই বিদ্যা দ্বারা রাজগণ দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইতেন। সে সমস্ত রাজাও এখন নাই। হে রাম! এক্ষণে রঘুকুলে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ।

রাম! তোমার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে। অহেতুক বৈরাগ্য তোমাতে দেখা দিয়াছে।

কারণ বশতঃ যে বৈরাগ্য লোকের জন্মে, তাহা রাজস বৈরাগ্য; কিন্তু আত্মা ও অনাত্মার বিচারজনিত যে বৈরাগ্য, যে বৈরাগ্য বিবেকজনিত তাহাই সাত্ত্বিক বৈরাগ্য। বীভৎস বস্তু দেখিলে সকলেরই বৈরাগ্য জন্মে। কিন্তু ঐরূপ কোন নিমিত্ত না থাকিলেও যে বৈরাগ্য আত্মানাত্ম বিচার দ্বারা জন্মে, তাহাই উত্তম বৈরাগ্য। যিনি আত্মবিবেক দ্বারা বিচার করিয়া সমুদায় প্রপঞ্চকে ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যাবোধে পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ।

মরণ, ব্যাধি, বিপদ, দৈন্য, জরা নিপুণ হইয়া বিচার করিলে তবে না সংসার বৈরাগ্য জন্মে? তুমি মহাপুরুষ। তোমার মন উত্তম ফালকৃষ্ট কোমল ক্ষেত্রের ন্যায় বীজধারণের যোগ্য।

বৈরাগ্য এই জন্য আবশ্যক যে, ইহা দ্বারাই অসৎ সংসার ত্যাগ হয়; তখন বুদ্ধি দ্বারা পরমব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা যায়। দেহাভিমান ত্যাগ না করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। ইহা না হইলেও সংসারসমুদ্র পার হওয়া যায় না।

তুমি বিচার-অভ্যাস তৎপরা, বিবেক-বৈরাগ্য নির্ম্মলা বুদ্ধি দ্বারা সংসার-সমুদ্রতারক জ্ঞানযোগ শ্রবণ কর।

জ্ঞানযোগ ভিন্ন কোন দুঃখই দূর হয় না। জ্ঞানযোগ না থাকিলে শীত-বাত আতপও কোন সাধু সহ্য করিতে সমর্থ হন না। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন সহ্য করিবার শক্তি জন্মে না।

তুমি যেমন জ্ঞানলাভের উপযুক্ত পাত্র, আমিও সেইরূপ জ্ঞানপ্রচার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত।

রাম—কিরূপ পুরুষকে জ্ঞান কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত? জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কিরূপ হওয়া উচিত?

বশিষ্ঠ—যে ব্যক্তি অতত্ত্বজ্ঞ ও বিফলভাষী—তাহাকে যে কিছু জিজ্ঞাসা করে সে ব্যক্তি নিতান্ত মূঢ়। আবার তত্ত্বজ্ঞানী গুরু যাহা বলেন তাহা যে না শুনে, সেও নিতান্ত অধম।

যে ব্যক্তি গুরুর অজ্ঞতা ও তত্ত্বজ্ঞতা পরীক্ষা করিয়া প্রশ্ন করে, সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ ও উত্তম। আর যে মূর্খ বক্তার স্বভাবাদি পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা করে, সে মূর্খ যার পর নাই অধম। যে গুরু সহসা অপাত্রে বক্তব্য বলেন, সে গুরু সাধুসমাজে মূর্খ বলিয়া পরিচিত হন।

রাম! তুমিও যেমন শিষ্য আমিও সেইরূপ গুরু। তুমি মহান্ হইয়াছ, বিরক্ত হইয়াছ, সংসারের গতি বুঝিয়াছ, জীবের গতি বুঝিয়াছ—তোমাকে উপদেশ করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়।

রাম! আমি যাহা বলিব যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিও। যদি না পার, বৃথা প্রশ্ন করিও না।

মন এই সংসারে চপল মর্কট। মনকে শোধন কর, স্থির কর, করিয়া আত্মতত্ত্ব শ্রবণ কর। অসতের সংসর্গ করিও না। সৎসঙ্গ কর।

শম, নিত্যানিত্য বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ—ইহারা মোক্ষ রাজবাটীর দ্বারপাল। একটিকেও বশ করিতে প্রাণপণ কর। করিয়া অন্য তিন জনকে বশ করিতে চেষ্টা কর। রাম! তুমি বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা মনকে বশ কর।

অগ্রে সৎশাস্ত্রের আলোচনা, সাধুসঙ্গ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞা বৃদ্ধি কর। অধ্যাত্মশাস্ত্রই মূর্খতা বিনাশের একমাত্র উপায়।

বিচারকেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মার দূত বলিয়া জানিও।

এ।

Registered No. C. 583.

ষষ্ঠ বর্ষ ।] কার্ত্তিক ১৩১৮ সাল । [৭ম সংখ্যা ।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা ।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী ।

কলিকাতা, ১০ নং শম্ভু চন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট
উৎসব কার্য্যালয় হইতে—শ্রীযুত ননীলাল রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ।

সূচীপত্র।

কার্ত্তিক।

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৬ষ্ঠ বর্ষ] ১৩১৮ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা।

স্থান-মাহাত্ম্য।

হিমালয়ে যোগমগ্ন মহা-যোগেশ্বর।
শির বেড়ি ফণীমালা গরজে গভীর॥
হেনকালে উপনীত খগপতি সেথা।
সসম্ভ্রমে লুটাইল চরণে তাঁহার॥
উত্তোলিয়া শত ফণা শত বিষধর।
দংশিবারে চাহে তাহে এমনি বর্ব্বর॥
সবিস্ময়ে খগপতি করিলা উত্তর।
"নেমে এসো বুঝা যাক্ বীরত্ব সবার॥
ভক্ষ্য, ভক্ষকের কাছে এত অহংকার।
সে কেবল স্থান-গুণে মাহাত্ম্য প্রচার"॥

শ্রী......

প্রাণাঞ্জলি।

প্রভু! বড়ই দরিদ্র আমি।

ওহে জগন্নাথ! কাঙ্গালের নাথ—লোকমুখে শুনি তুমি।
যদি দয়া করি, এস দীন-হরি, এ ভগ্ন হৃদয় মাঝে;
(দেখি) এ ভাঙ্গা পরাণে, রাঙ্গা চরণ, কেমন মধুর সাজে॥
(আমি) কি নিয়া আনিব, সুশীতল বারি, ধোয়াতে শ্রীপদ দুটি।
ব'লেছি আমার কিছু নাই আর, আমি যে দরিদ্র অতি॥
কংস রৌপ্য আদি, মৃণ্ময় পাত্রাদি কিছুত নাহিক ঘরে।
নাহি তৃণ শেষ, এ ভগ্ন কুটীরে—বিষয়-মার্ত্তণ্ড-করে—
দহে মন প্রাণ, নাহি অন্য স্থান, জুড়াইতে মহীতলে;
মাথা রেখে তাই, ঘুমাইতে চাই, শীতল চরণ-তলে।
ফেলিয়া দিওনা, লাগিবে বেদনা, সে ব্যথা তুমি যে পাবে;
কাঙ্গালের সাধ, না পূরালে বল, অনাথ কোথায় যাবে॥
তাই বলি এস, হৃদয়ের রাজা, বস হে হৃদয় মাঝে।
(আমি) দু'হাত পাতিয়া, যাচিয়া লইব, যা কিছু তোমার আছে॥
(বলি) দাও দাও দাও, পূজিব আমার, আরাধ্য-রতনে আজ।
(তুমি) প্রসন্ন বদনে, নীরবে হাসিবে; দেখিয়া আমার কাজ॥
নাহি অন্য ধন, পূজোপকরণ, আয়োজন বিসর্জ্জন।
সঞ্চয় সঙ্গতি, হলনাত আর, তুমি মাত্র নারায়ণ—
দরিদ্রের ধন, তুমি যে আমার, চিন্ময় পরশ মণি;
(আমি) সোয়াথ না পাই, রাখিয়া কোথাও, সতত ভয় যে গণি॥
নাড়িতে চাড়িতে, ভয় হয় চিতে, (তাই) নীরবে তাকায়ে রই।
তোমার নয়নে, পড়িলে নয়ন, কেমন-ধারা যে হই॥
বলি এস এস এস, যেয়োনাক তুমি, আমারে ফেলিয়া আর।
এভব সাগরে, তুমি যে আমার, মুক্তিদাতা কর্ণধার॥
(আমি) নয়ন ভরিয়া, এনেচি সলিল, এস এস বঁধু এস।
শ্রীপদ ধোয়াব, কিছু না চাহিব, বস বস সখা বস॥

জগৎ আরাধ্য, তুমি হৃষীকেশ, সবার অন্তর ধন।
তন্ত্রমন্ত্রসারে, বিবিধোপহারে, ভক্তে পূজে সর্ব্বক্ষণ॥
নাহিক আমার, এসব সম্বল, সতত ব্যাকুল প্রাণ।
অমূল্য রতন, দুইটি আঁখর, তোমায় করিব দান॥
করি জোড় হাত, শুন রমানাথ, শ্রীগুরুগোবিন্দ বলি।
ধর ধর ধর, দীনের সর্ব্বস্ব, সুধাময় প্রাণাঞ্জলি॥ শ্রীমতী.........

একটি নিবেদন।

প্রবল রোগ সকল শরীরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক এক বার দেখা দিয়া যাইতেছে; অসম্বন্ধ প্রলাপ সকল বহু সময়েই চিত্তভূমিতে তাণ্ডব করিতেছে, মৃত্যু বিকটভাবে বন্ধুবান্ধবাদি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এখন আর অন্য উপায় কি আছে? তোমার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর কিসে সুস্থ হওয়া যাইতে পারে?

এখনও ত কোন সাধনায় সিদ্ধি দিতে তুমি আসিলে না—কিসে নিশ্চিন্ত হইব? তোমার আজ্ঞাপালন ইহাই ব্রত; তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ এই ত আমার একমাত্র অভিলাষ; তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার, প্রদক্ষিণ, পূজা, আরতি এইত আমার ধারণাভ্যাসের সামগ্রী, কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হইলাম কৈ?

বলিত—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

হে বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা—তুমি যে বলিয়াছ তোমাকে জানা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কৈ তোমাকে জানিলাম?

সত্যই ঠাকুর

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎপ্রজাপতিঃ।

---

* লেখক বা লেখিকার অনুমতি না লইয়াই কখন কখন দুই এক স্থানে পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা হয়। সকল সময়ে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে না পারিলেও সম্পাদকের ঐরূপ করা উচিত। ত্রুটী পদে পদে। ক্ষমা ভিন্ন অন্য প্রতিকার কি? উঃ সঃ।

সত্যই প্রভো

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।

বাহিরে সর্ব্বত্র তুমি সত্য, আর অন্তরে –

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

ঠাকুর সবই সত্য, সবই বিশ্বাস করি—এক বিশ্বাস করিনা নিজের মনকে। শরীর একটু দুর্ব্বল হইলে এ তোমায় স্মরণ করিতে ত চায় না? একদিন নিদ্রার একটু বেনিয়ম হইলে যেন কত কাতর হইয়া পড়ে, আর কিছুই যেন পারে না; একদিন আহার না করিলে ভান করে যেন কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল—ভান করিয়া বলে যেন আর ইহার কোন সামর্থ্য নাই, নাম উচ্চারণ করিতেও ইহার ক্লেশ, স্মরণ করায় ত ইহার মনোযোগ চাই—এই সুস্থ অবস্থায় যখন মনের হাল এই, তখন সে অবস্থায় এই প্রতারক, এই কপট কি আমায় নিশ্চিন্ত করিতে পারিবে? হরি! হরি! এখন একটু অসুখেও যে কিছুই করিতে চায়না আর তখন? যখন শত বৃশ্চিক দংশন করিবে? যখন সকল প্রকার অসুখ আসিয়া একবারে আক্রমণ করিবে? উদর সর্ব্বদা স্ফীত থাকিবে, টিপিলেই কল্লোলধ্বনি শোনা যাইবে, হৃদয় কফজড়িত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে ফেলিতেও কষ্ট বোধ করিবে—ক্রমে শ্বাস টানিতে যেন সূচিকা বিদ্ধ হইতেছে মনে হইবে? তার উপর ঢক্কা বাদন; শেষে মস্তক—মস্তক যেন আর ঠিক থাকিবে না, রাত্রিতে নিদ্রা না থাকায় সর্ব্বদা ইহার ভিতরে যেন কিসের হুটপাট আরম্ভ হইবে? আর মন—মন তখন এই অসম্বন্ধ প্রলাপের হাট বসাইয়া দিবে। হায়! যখন এই কাল আসিবে প্রভু! তখন কি হইবে? এই সাধন ভজন তখন ত আর করা যাইবে না; এই স্মরণ প্রার্থনা তখন ত আর হইবে না? তখন কি গতি হইবে?

প্রভু! সেই জন্য এই নিবেদন। নিবেদন দিন থাকিতে করিয়া রাখি।

যতদিন সামর্থ্য থাকিবে, যতদিন সবলে থাকিব ততদিন ত ধারণাভ্যাসী ও বিচারবান্ হইতে প্রাণপণ করিবই; সাধনা ও স্বাধ্যায় ত করিবই; তিন বেলায় তোমার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিবই। নিত্যকর্ম্মাদি শেষ করিয়া, পূজা আরতি সারিয়া, তুমি যে বিশ্বরূপ তাহা বুঝিবার জন্য জড় হইতে চেতন যে পৃথক্ তাহার বিচার করিবই—করিয়া জড় ভাবকে মিথ্যা জানিয়া

তোমার চেতন ভাবটি—তোমার আপনি আপনি ভাবটি—সুষুপ্তি হইতে জাগরণ ব্যাপারে স্মরণ রাখিয়া ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিতে চেষ্টা করিবই। কিন্তু প্রভু! যখন আমার আর কোন সামর্থ্য থাকিবে না, তখন তুমি এই অধমের গতি করিও। তুমি বলিয়াছ, তোমার ভক্তকে তুমি উদ্ধার করিবে; কিন্তু শোকবহ্নিতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইলেও, এই পবিত্র শোক সর্ব্বদা আমায় বৈরাগ্য অবস্থায় রাখে না। যদি রাখিত, তবে কি ক্ষণকালের জন্যও হাহা, হুহু, হিহি করিতে পরিতাম? যদি হৃদয়-শ্মশানে প্রিয় বস্তুদিগের চিতা-অঙ্গারের ও চিতাভস্মের স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত, যদি হৃদয়-শ্মশানে ঐ শ্মশানবহ্নির ভীষণ শিখা সর্ব্বদা জ্বলিত, তবে কি ক্ষণতরেও আর ব্যভিচার হইত? আজও ত ইহা হয় না, আজও ত ব্যভিচার হয়, আজ ও ত সকলের মধ্যেই তুমি আছ এ কথা স্মরণে সকলের কাছে আমি বিনীত হইতে পারি না—হায় প্রভু! এই অবিনয় ত আমার অপনীত হইল না; হে দেব! মন ত আমার সর্ব্বদা কাতর হইয়া তোমার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে পারিল না; হায় নাথ! বিষয়-মৃগতৃষ্ণা এখনও ত একবারে শান্ত হইল না; এখনও ত তোমার মায়িক প্রতারণা দেখিতে—মোহকারী ইন্দ্রজাল দেখিতে লালসা দূর হইল না! কৈ তবে তোমাতে আমার মন সর্ব্বদা রহিল? কৈ তবে আমি তোমার ভক্ত হইতে পারিলাম? তাই বলি ভক্ত হইতেও ত পারিলাম না—এ অধম জনার কি কিছু গতি আছে?

তাই নিবেদন করিয়া রাখি—

তুমি আমায় কৃপা কর; যাতনা না দিলে যদি আমার কর্ম্মক্ষয় অসম্ভব হয়, তবে সহ্য করিবার শক্তি দিয়া যাতনা দাও—দিয়া আমার বৈরাগ্য প্রবল করিয়া দাও। মনকে বৈরাগী করিয়া কৌপীন পরাইয়া—নিত্যকর্ম্ম—ধারণাভ্যাস ও বিচারবান্ করাইয়া লও। আহা! যদি এই জীবনেই তুমি একবার আসিয়া আমার বিচার সম্পন্ন করিয়া দিতে—যদি শ্রুতি, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, গীতা ইঁহারা একবার কৃপা করিতেন, যদি ইঁহাদের কৃপায় আমি আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারিতাম, তবে আমার কি হইত—আমি কল্পনাতে তাহা চিন্তা করিয়াও কেমন হইয়া যাই। যদি চিরতরে আপনি আপনিতে না রাখিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তবে না হয় বিশ্বরূপ তুমি—তুমি সর্ব্ব-বস্তুতে, সর্ব্বব্যাপারে, প্রতি শ্বাসে আমার স্মরণে থাক—আমার বিশ্বাসে থাক;

যদি ইহাও না হয়, তবে যে অবলম্বনে আমায় অনুগ্রহ করিয়াছ—সেই অবলম্বন সহায়ে বিশ্বরূপে ভাস; যদি ইহাও সকল সময়ে না দিতে চাও, তবে শুধু তোমার ভক্তিজনক কর্ম্মে মাত্র নিযুক্ত রাখ; যদি তাহাও না হয়, যদি এখনও আমার কর্ম্ম আছে এই ভ্রম রাখ, তবে আমার সর্ব্বকর্ম্ম তোমাতে অর্পিত হউক। তুমি প্রসন্ন হও—ইহার স্মরণে আমার শ্বাসটি পর্য্যন্ত পড়ুক।

সর্ব্বেশ্বর তুমি! আমি তোমার নিকট কি প্রলাপ বকিলাম। অন্তর্যামী তুমি! যাহা নিবেদন করিলে হয় তাহাও যেন জানি না; যাহাতে হয় তুমিই করিয়া দাও, তুমিই করাইয়া দাও, আমার আর কেহ নাই, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

আকুল প্রতীক্ষা।

জীবনপারে মরণতীরে দাঁড়ায়ে আছি একা;
কি জানি যদি বঁধুর সনে বারেক হয় দেখা।
চরণতলে হৃদয় ঘিরে আকুল সিন্ধু গরজি ফিরে;
আঁধার ঘন চকিতে চিরে বিজলি কর লেখা;
সজল ঘন আঁখির পরে টানিয়া যবনিকা;
বাড়ায়ে তোলে তিমিররাশি ঝলকি অগ্নিশিখা।
ঝাপটি আসিছে ঝঞ্ঝাবায়, দলিত তরু চরণ-ঘায়
তরাসে বক্ষ কাঁপিয়া যায় বিজনপথে একা;
কখন্ জানি পথের ধারে দাঁড়াবে আসি সখা;
গভীর মন্দ্রে বাজেগো আজি প্রলয়'ঘনঘটা।
মৃত্যু আজিকে অতিথি ঘরে, করিছে নৃত্য পুলক ভরে,
আকুল আঁখি ঝুরিয়া মরে কাহারো নাহি দেখা;
বিজন পথে সাথী যে শুধু ক্ষুদ্র আশার রেখা;
কি জানি যদি মৃত্যু লাঞ্ছিতে বাঞ্ছিত দেয় দেখা॥

শ্রীমতী........

জপে রস না পাওয়া।

পরকে উপদেশ দিতে বেশ পার। ভাবের কবিতাও লিখিতে পার, বই লিখিয়া সমাজকে উন্নত করিবার জন্য কত কি করিতে পার, বার্ষিক অধিবেশনে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পার, বাছা বাছা শ্রুতিবাক্য লইয়া কত রঙ্গে ভঙ্গে তোমার সঙ্গে যাহাদিগের না মিলে তাহাদিগকে ঠারে ঠোরে বোকা বানাইতে পার; কিন্তু হে পরোপদেশি—তোমার আপনার উপদেশ কতটকু হইল? হে জগৎ-রক্ষাব্রতধারিণি! তোমার নিজের রক্ষা কতটুকু হইল? হে সংসার-হিতার্থ গৃহস্থধর্ম্মরক্ষাকারিণি! বল! বল! তোমার অসম্বন্ধ প্রলাপ কতটুকু রোধ করিতে পারিলে? জপকালে কি বুঝিতে পার অসম্বন্ধ প্রলাপের প্রসার কতদূর? তোমায় কোথায় ফেলিয়া দিয়া মন অসম্বন্ধ প্রলাপ করিতে করিতে ছুটাছুটি করে, নিতাই করে—এর প্রতিকার কি করিলে বল?

হতাশ হইলে ত কোন ফল নাই। ঠিক শাস্ত্র মত চলনা তাই ফল হয় না। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিসমাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ এই কথাটি ভগবানের। যদি নিজের ইচ্ছামত অন্য কিছু না মানিয়া, শুচি অশুচি বিচার না করিয়া, বিছানায় বসিয়া, বা চর্ম্মপাদুকা অঙ্গে ধরিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলে সিদ্ধি হইবে ভাব, তবে তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত। তুমি যে ভ্রান্ত তাহার অন্য প্রমাণের আবশ্যক কি? তোমার নিজের দিকেই চাওনা কেন? বয়সও ত হইল। যাহোক তাহোক চেষ্টাও ত করিতেছ, কিন্তু সেই খাড়া বড়ি থোড়; আর থোড় বড়ি খাড়া। রোজ মন খারাপ হওয়া, আর সেই মনকে ভাল করিবার জন্য একটা ডাকা। আর কোন দিন মনে একটু রস পাওয়া, কোন দিন বিষাদমুখে কিছুই হইল না বলিয়া হতাশ হইয়া উঠিয়া আসা। এই কি তোমার ধর্ম্মের উন্নতি গা? তোমার কোন উন্নতিই হয় নাই। তোমার কোন দিন ভাল হওয়াটাও মনের প্রতারণা মাত্র। ভাল করিয়া দেখ, ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে।

কেন হয় না জান? তুমি কখন বৈরাগ্য অভ্যাস কর নাই, কখন বিষাদ-যোগী হইতে সাধনা কর নাই। তোমার বিষাদ আসে সত্য, কিন্তু একটু স্বাদ পাইলেই তুমি বেহুঁস হইয়া যাও। একটু সুখ পাইলেই তুমি ভগবান্ ভুলিয়া যাও। সংসারের একটু হাসি-মুখ দেখিলে তুমি বেশ থাক। ইহাকে বিষাদযোগ বলে না

আজ যাহাকে হাসিতে দেখিতেছ, সে যে পরমুহূর্ত্তেই কাঁদিবে—ইহা কি হাসির সময়েই ভাবিতে পার? আজ যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, কাল তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে—ইহা কি আলিঙ্গনকালেই তোমার মনে পড়ে? আজ সূতিকাগৃহের আলোকে যাহার মুখ দেখিয়া সুখে বুক ভরিয়া যায়, কাল শ্মশান-বহ্নির ভীষণ আলোকে তাহার মুখ দেখিতে হইবে—ইহা কি একবার ভাবিতে পার?

সুখ ভোগ করিবে কি? তোমাদের শিওরে কে খাড়া রহিয়াছে তাহা কি দেখ? "তেরে শিরপর যম খাড়া হ্যায়" সাধুরা এই বলিয়া লোককে কাতর করেন,—করিয়া বলেন, ভগবান্‌কে ডাক। কাতর না হইয়া, মনকে কাতর না করিয়া, তুমি উপাসনা কি করিবে বল? বালক ভয়ানক অস্থির হইয়া রহিয়াছে—আপন ব্যভিচারে উন্মত্ত হইয়া যে রহিয়াছে—বল তাহাকে জপ করিতে বলিলে সে জপ কেমন হইবে? তুমি বলিবে চিত্তবালক! হরি হরি কর। বালক দেখিবে খাসা মোহন বাগান। তুমি বলিবে নিত্যক্রিয়া কর—চিত্ত-বালক দেখিবে লিপ্‌টনের চা—কখন দেখিবে সুন্দর মুখ—কখন ভাবিবে এই এই উপায়ে সংসার গুছাইতে পারা যাইবে। হরি! হরি! এই জপে বা এই সাধনায় কি কখন রস পাওয়া যায়! যতক্ষণ মঞ্চে বসিয়া বক্তৃতা কর, ততক্ষণ তুমি স্থির—লোককে শুনাইতেছ বলিয়া; রঙ্গমঞ্চ হইতে নামিলেই সেই মাছির ভেন্‌ভেনানি।

এসব সাধনা নয়। সাধনা যাহাকে করাইবে সে হইল মন। মনকে আগে বৈরাগী কর। মনকে আগে কৌপীন পরাও। মনকে দুঃখী করাও। মনকে বিষাদযোগী আগে করাও, তবে এই মন জপে রস পাইবে; এই নিত্যক্রিয়া ঠিক মত করিতে পারিবে।

কিরূপে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হয়; কিরূপে বিষাদযোগী হইতে হয়—এই ত তোমাদের জিজ্ঞাসা?

এস এস আর হাহা, হুহু, হিহিতে মন দিও না। শাস্ত্রমত একবার আপনাকে আপনি দেখ। তুমি স্বরূপে কি তাহা ত প্রথমেই বুঝিবে না। তুমি কি হইয়া আছ তাহাই একবার দেখ।

কাহাকেও মৃত্যুশয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে কি দেখিয়াছ? দেখিয়াছ বৈ কি? মা গিয়াছেন, পিতা গিয়াছেন, পুত্র গিয়াছে, কন্যা গিয়াছে, স্ত্রী গিয়াছে, জামাতা গিয়াছে, স্বামী গিয়াছে—শোক কে না পাইয়াছে?

এক এক করিয়া ধর দেখি! যখন স্বামী গেল, তখন মনে করিয়াছিলে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিবে? এখন সে শোক কোথায়? যে শোক বড় পবিত্র—যে শোক এক ক্ষণকালে তোমার মনকে জগতের সমস্তই যে নশ্বর বোধ করাইয়া দিয়া, ঐ দুরন্ত মনকে বৈরাগী করিয়াছিল—সে শোক কি রাখিতে পারিলে? যদি রাখিতে পারিতে, তবে কি আবার হাহা, হুহু, হিহিতে যোগ দিতে পারিতে? তবে কি আবার দেহের বিলাসিতা, দেহকে ফিটফাট রাখা—এ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারিতে? তবে কি ভুলেও রঙ্গরসে যোগ দিতে পারিতে? তাহা পারিতে না। আর শোক ভুলিয়া আবার মনকে ব্যভিচারী করিয়া ফেলিয়াছ? না হয় একটু কবিতা লিখিলে,—তাহাতে বিশেষ কি হইতেছে বল? না হয় দুটো কথা বলিয়া লোককে একটু মাতাইতে পারিলে,—তাহাতেই বা কোন্ লাভ হইল বল?

না না এসব কিছুই নয়। উপায় কর।

ঐ শুন! কে গাহিয়া গেল।

শ্মশান ভাল বাসিস ব'লে শ্মশান ক'রেচি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি বলে নিরবধি।

এ গানের বাঁধা একটু ঘুরাইয়া দাও। আপনি ইচ্ছা করিয়া হৃদয় শ্মশান কর নাই। সেই হৃদয় শ্মশান করিয়াছে—শ্মশান করিয়া আপনি সে শ্মশানে নাচিবে বলিয়া।

ভাল করিয়া একবার বোঝ দেখি, হৃদয় শ্মশান করা কি? তুমি বল কিছুই ত ভাল লাগে না। ভাল লাগে না সত্য, কিন্তু যদি কোনরূপে ভাল লাগাইয়া দেওয়া যায়, তখন তাই লইয়া ব্যভিচার কি কর না? না না ইহাকে শোক বলে না। স্বামী, পুত্র, কন্যার শোক ইহা নহে? যতক্ষণ না তারে পাই, যতক্ষণ না তাহার বিশ্বরূপে সকলকে দেখি, ততক্ষণ কিছুতেই সুখ হইবে না।

স্বামীর মৃত্যু ত দেখিয়াছ, পুত্র কন্যা পিতা মাতা স্ত্রী—নিজের না হইলেও অন্যের ত হইতে দেখিয়াছ। যেমন করিয়া মরিতে দেখিয়াছ—মরিবার সময় যেরূপ নিরাশ্রয় হইতে দেখিয়াছ—সেইটি মনে মনে নিত্য আলোচনা কর। হৃদয়ের মধ্যে বহু প্রিয়জনের শ্মশান শয্যা পুরিয়া রাখ। হৃদয় মধ্যে আর কোথাও কিছু দেখিও না—সংসার ইন্দ্রজালের কোন কিছুর আশা আর আসিতে দিও না—শুধু দেখ, কোথাও পুত্রের চিতায় শ্মশানবহ্নি ভীষণভাবে স্নেহের পুত্তলিকে

দগ্ধ করিতেছে, কোথাও দেখ স্বামীর মৃতদেহের ভস্মাবশেষ, আর দগ্ধ অঙ্গার পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, কোথাও দেখ স্ত্রীর চিতায় শেষ জলকলস ভাঙ্গা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও দেখ তাহাদের শয্যা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের শেষ বাঁশের দোলার বংশখণ্ড এখানে সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে; আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা কর, আহা! মরিবার সময় সে যে কত কাতর চক্ষে চাহিয়া গেল; কত যাতনায় অস্থির হইয়া, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া সাহায্য চাহিয়াছিল—কেহই যে কিছু করিতে পারিল না। রাখ রাখ হৃদয়! এই মৃত্যু দৃশ্য পুরিয়া রাখ—আর কোন দিকে মন যাইতে পারিবে না। মন তখন বিষাদযোগী হইয়া, নিতান্ত ভীত হইয়া কাতরভাবে সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়কে চাহিবে। মন তখন কাতর হইয়া নিরন্তর নাম করিতে পারিবে—করিতে করিতে প্রার্থনা করিতে পারিবে—প্রভু! রক্ষা কর—হে অগতির গতি—গতি বিধান কর। তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। তোমার নাম ভিন্ন জীবের জুড়াইবার আর কিছুই নাই। দীনবন্ধু! তুমিই আশ্রয়। এইরূপে মনকে কৌপীন পরাইয়া নিরন্তর নাম কর। নামের অবলম্বনে নামীর কৃপা বুঝিবে।

অনুরাগ ও অনুরাগিণী।

তুমি ভিন্ন আমার কে আছে?
তুমি ভিন্ন আমারই বা কে আছে?

আমরা অনুরাগ ও অনুরাগিণী। আমরা নানা দেহ ধারণ করিয়া খেলা করিতেছি, কিন্তু আমাদের এ খেলা ত অবিচ্ছেদে হয় না। এ খেলা ত ভঙ্গ হয়। দিন পুনঃ পুনঃ জন্মে বটে, রাত্রিও পুনঃ পুনঃ আইসে সত্য—কিন্তু একটানা দিন ত নাই, একটানা রাত্রিও নাই। তবে ইহারা নিত্য নহে। প্রবাহক্রমে নিত্য বটে। দেখ আমরা প্রবাহক্রমে নিত্য হইতে ত চাই না। পুনঃ পুনঃ দেহধারণ করিব—ইহা কি চাই? পুনঃ পুনঃ মিলিব, আবার পুনঃ পুনঃ বিচ্ছিন্ন হইব, আবার পুনঃ পুনঃ মিলিব—ইহা ত বড় কষ্ট? ইহাতে যে বিচ্ছেদ আছে।

এ বিচ্ছেদও আমার ভাল লাগে না। মিলনে সব ভুলিয়া যাই। শুধু দেখি, শুধু শুনি—কত কথাই হইয়া যায় ; কিন্তু বিচ্ছেদ হইলেই মনে হয়, হায়! আমার কোন কথাই যে বলা হইল না। হায়! কোন সাধই যে মিটিল না। আহা! যদি নির্জ্জনে একবার পাই, যদি মনের মতন একবার পাই—যেখানে কেহ নাই, যেখানে কোন ভয় নাই যেখানে ভয়েরও কোন আশঙ্কা নাই—যদি তেমন করিয়া একবার পাই, যদি মনের সব কথাগুলি একবার বলিতে পাই—আমার নিষ্ঠুরতার জন্য ক্ষমা চাই। তুমি যে কত কাতর হইয়া ডাক—আমি যাইতে পারি না বলিয়া ক্ষমা চাই। আমি যে কিছুই পারিনা বলিয়া ক্ষমা চাই। একান্ত না হইলে আমার কিছুই হইবে না—এই কথা জানাই। একান্তে যাইবারও আমার শক্তি নাই—এই কথা জানাই। আর বলি—তুমি না করিয়া দিলে আমি কিছুই পারি না। তুমি আমাকে করিতে বলিলে ত হইবে না। আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।

অনুরাগ বলে এই, অনুরাগিণীও বলে এই—

ইহা ত অশান্তি। কে এই অনুরাগ ও অনুরাগিণী? ইহারা থাকে কোথায়? ইহারা নিত্য মিলিত থাকিতে পারেনা কেন?

অনুরাগিণী শক্তি, অনুরাগ শক্তিমান্। শক্তি না হইলে শক্তিমানের হয় না। শক্তি না হইলে শক্তিমান্ প্রকাশ হইবেন কাহার নিকটে? শক্তিশূন্য শক্তিমান্ সুষুপ্তি অবস্থার মত। কিছুরই অনুভব নাই। আপনিই আপনি। চলন নাই, স্পন্দন নাই, কি আছে তাহারও অনুভব করিবার কেহ নাই, কি নাই তাহারও বলিবার কেহ নাই। ঠিক নির্গুণ ব্রহ্মের মত। যেমন সৃষ্টি না হইলে সৃষ্টিমানের প্রকাশ হয় না, যেমন রাধা না হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হয় না, যেমন সীতা না হইলে শ্রীরামের অনুভব হয় না, শক্তি না হইলে শিবের প্রকাশ নাই, সেইরূপ শক্তি না থাকিলে শক্তিমানেরও প্রকাশের স্থান নাই। সেইরূপ শক্তিরূপা অনুরাগিণী না থাকিলেও, শক্তিমান্‌রূপ অনুরাগও প্রকাশ হইবার কিছুই পান না।

আবার শক্তিমান্ না থাকিলেও শক্তির অস্তিত্ব থাকে না। যেমন সমুদ্র-বক্ষ না থাকিলে তরঙ্গের খেলা হয় না, যেমন আকাশ না থাকিলে মেঘের বিচিত্র রঙ্গ হয় না, যেমন চন্দ্র না থাকিলে চন্দ্রিকার বিস্তার হয় না, যেমন সূর্য্য না থাকিলে দীধিতির স্ফুরণ হয় না, যেমন বায়ু না থাকিলে স্পন্দন ছুটে না, অগ্নি না থাকিলে উত্তাপ শূন্যে শূন্যে ঝুলে না—সেইরূপ শক্তিমান্ না থাকিলে শক্তিও থাকে না।

যেমন শিব না থাকিলে শিবরাণীর প্রকাশ নাই, রাম না হইলে রামরাণী নাই, কৃষ্ণ না থাকিলে রাধারাণী নাই,—সেইরূপ অনুরাগ না থাকিলে অনুরাগিণী নাই।

কিন্তু শক্তিমান্ কি কোন কালে থাকেন না এমন হয়? শক্তিও কোন কালে থাকেন না এমন হয়?

শক্তিমান্ যখন আপনিই আপনি, তখন তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছুরই অনুভব নাই। আছে বা নাই বলিবার যো নাই। আবার শক্তি যখন শক্তিমানে মিশিয়া থাকেন, তখন শক্তি আছেন বা নাই কিছুই বলা যায় না।

অনুরাগ যখন আপনি আপনি তখন ইহা কি, কিছুই জানিবার উপায় নাই। আবার অনুরাগিণী যখন নাচিয়া নাচিয়া অনুরাগ-বক্ষে মিশিয়া যান, তখন অনুরাগিণী কি কিছুই বলিবার উপায় নাই।

তবে কি হইল? হইল যাহা তাহা এই—অনুরাগিণী অনুরাগে মিশিয়া থাকিলেও নিরন্তর এক হইয়া থাকে না। ঝলক, মণিতে মিশিয়া থাকিলেও নিত্যকাল মিশিয়া থাকিতে পারে না। মণি চিরদিন আছেন। ঝলক স্বভাবতঃ তাঁহা হইতে উঠিতেছে। উঠিয়া মণির সহিত জড়িত হইয়া দুই সাজিয়া কত রঙ্গ করিতেছে। আপনাকেও প্রকাশ করিতেছে, আবার মণিরও নামরূপ দিয়া দুই হইতেছে। হইয়া খেলা করিতেছে। এ খেলা প্রবাহক্রমে নিত্য। একটানা খেলা হয় না।

ইহারা কে? উত্তর—শক্তি শক্তিমানের মত; ব্রহ্মমায়ার মত। প্রথম অব্যক্ত অবস্থায় আসিয়া ক্রমে ব্যক্তাবস্থায় প্রকৃতি পুরুষ। ক্রমে ইহাদের খেলায় বিচিত্র সৃষ্টি।

অনুরাগিণী—আমরা যাহা তাহা বুঝিলাম। কিন্তু মূলে যাহাই হইনা কেন, এখন এমন হইয়াছি কেন?

অনুরাগ—কি হইয়াছে?

অনুরাগিণী—মনের মতন করিয়া পাইতেছি না। একান্তে মিলিতে পারিতেছি না। মিশা ত দূরের কথা।

অনুরাগ—তুমিই আমার শক্তি। আমার অণুতে পরমাণুতে তুমি জড়িত হইয়া আছ। আমি নিত্য ইহা অনুভব করি। সকলেই আপন আপন শক্তিকে এইরূপে অনুভব করিতে পারে। তুমি বহু হইয়া আছ, নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া

আছ, নানাস্থানে ছুটিতেছ। বহু হইয়া বহুভাগে বিভক্ত হইয়া সংসার করিতেছ। কাজেই আমিও যেন তোমার বহুরূপে মিশিয়া বহুরূপ হইয়া গিয়াছি। বহুর এক হইবার কৌশল ভুলিয়া গিয়াছি। এস এক হই। তবেই মিলিবার, মিশিবার কৌশল জানিবে। জানিয়া কখন মিশিয়া, কখন মিলিয়া বহু খেলা খেলিব; তাহাতে কোন ভয় থাকিবে না। খেলা তখন আয়ত্ত হইয়া যাইবে। যখন ইচ্ছা খেলিব। যখন ইচ্ছা ভাঙ্গিব। এখনকার মত খেলা ভাঙ্গিয়া মিলিতে না পারিয়া আর কষ্ট পাইতে হইবে না।

বল কি করিতে হইবে?

তপস্যা করিতে হইবে।

তপস্যা ত করি। সব দিন সমান হয় না। কখন রস পাই, কখন পাই না। কখন আজ্ঞাপালন করিতে দৌড়িয়া যাই—রস পাই বা না পাই আজ্ঞাই আমার জীবন এই বলিয়া তপস্যা করি। কখন শতবার বলি তোমার আজ্ঞা, তথাপি তপস্যা করিতে পারি না। কখন বৈরাগ্য আনি, আনিয়া কাতর হইয়া তপস্যা করি। কখন বৈরাগ্যের কথা আলোচনা করি, হৃদয়কে শ্মশান করি, মাতার চিতা, পিতার চিতা, ভ্রাতার চিতা, ভগ্নীর চিতা, পুত্রের চিতা, কন্যার চিতা—সমস্ত প্রিয় ব্যক্তির চিতা হৃদয়-শ্মশানে জ্বালিয়া দি; মৃত্যুকালে তাঁহারা যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন, যেরূপ নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন—মৃত্যুকালে আমাকেও সেইরূপ হইতে হইবে ভাবনা করিয়া, মনকে কাতর করিবার চেষ্টা করি; কিন্তু মন যথার্থ কাতর হয় না। কাজেই তপস্যা করিলেও ঠিক স্থানে পৌঁছিতে পারি না। এইরূপ অবস্থায় এই বলিয়া প্রবোধ দি যে, প্রারব্ধ ক্ষয় হইতেছে—বিষের স্ফোটক অস্ত্র হইতেছে—আজ কিছুই হইল না। যাহউক তাহউক করিয়া মনকে শান্ত করি। কিন্তু তপস্যা করিলে যেমন অবস্থাটি হয়, তেমন তেমন অবস্থাটি ত লাভ করিতে পারি না। বল একভাবে তপস্যা কিরূপে হইবে?

অনুরাগ—জাতীয় স্বভাব একটু ছাড়না। ব্যভিচার—

অনুরাগিণী—আর ত কাহারও ব্যভিচার নাই?

অনুরাগ—বিবাদ করিলে কি ফল হইবে? যাহার ব্যভিচার হইবে তাহারই হইবে না।

অনুরাগিণী—ব্যভিচার তুমি না ছাড়াইলে আপনি ত ছাড়িতে পারি না।

অনুরাগ—তাই বলিলেই ত হয়। শুন আমি উপায় বলিয়া দি।

অনুরাগিণী—বল ?

অনুরাগ—দেখ মনকে সবদিন এক রকম উপায়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা সকলের সাধ্য নহে। আজ্ঞাপালন, বৈরাগ্য-চিন্তা এসমস্ত উপায় বটে; কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপায় অনুরাগ। বল সংসারে এমন কে আছে যে, অনুরাগকে না জানিয়াছে। কোন না কোন বিষয়ে লোকে অনুরাগকে জানিয়াছে।

সর্ব্বদা যাহা লইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, অথবা যেরূপ মিলন বা মিশ্রণের আশা সর্ব্বদা প্রাণ চায়—অর্থাৎ যেরূপ হইলে প্রাণ আনন্দ পায়, সেইটি অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে হয়। কখন কখন স্থূল বিষয়কে মনে মনে ভাবনা করিয়া তপস্যা করিতে হয়। তখন স্থূলের দোষ কাটিয়া যায়—গিয়া কামও নিতান্ত নির্ম্মল হইয়া প্রেমরূপ ধারণ করে। স্থূলে ভোগ কিছুই থাকে না—সূক্ষ্ম ভাবনা দ্বারা হৃদয়, উৎসাহের সহিত কুম্ভকাদি কঠিন তপস্যা সহজে করিতে পারে। প্রাণায়াম অভ্যাস যাঁহারা কিছুদিন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, প্রাণায়াম সর্ব্ববিধ মনের ব্যাপারকে নির্ম্মল করিয়া অতি সুখময় স্থানে চিত্তকে পৌছিয়া দিতে পারে। মলিন ইন্দ্রিয়-সাহায্যেও এই ভাবে তপস্যা হয়। ইহা অপেক্ষা এ বিষয় খুলিতে গেলে ঢাক বাজান হইয়া যায়। যাহার যাহাতে অনুরাগ—তাহার সূক্ষ্ম ভাবনা দ্বারা মনকে সজাগ করিয়া তপস্যা বেশ হয়।

অনুরাগিণী—বুঝিয়াছি তুমি কি বলিতেছ। তুমি বা আমি দেহাভিমানী বা দেহাভিমানিনী বলিয়া অসম্পূর্ণ। তুমি বলিতেছ ভাবনায় উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া সাধনা করিতে। অতি সুন্দর কথা বটে। তুমি আমি মিলিয়া এক হইয়া যদি আপনাদের স্বরূপ যে উত্তম পুরুষ তাঁহাকে ডাকি, তবে সত্বর হয়, রসের সহিত হয়।

অনুরাগ—ঠিক বুঝিয়াছ। কিন্তু বুঝিয়াই নিশ্চিন্ত হইও না। তপস্যা করাই চাই। নতুবা কিছুতেই ভক্তি বা জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। কর।

এখন আর এক প্রকারে ভাঙ্গিয়া বলি শোন।

মন স্ত্রী আর জীব স্বামী। মন ও জীব যতক্ষণ না এক হইবে, ততক্ষণ ঠিক হইবে না। জীব এখন মনের সঙ্গে এক হইয়া আছে। কিন্তু মনকে জীবের সঙ্গে এক হইতে হইবে। তবেই হইবে নিবৃত্তি-পথে গতি। নিবৃত্তি-পথে গতি ভিন্ন সাধনা নাই। আপনি আপনি অবস্থায় থাকাই সাধনার শেষ। ইহা না পারিলে নানাবিধ উপায়ে ইহা লাভ করিতে হইবে। যেমন বাসনাত্যাগই মুক্তি বা কর্ম্মত্যাগই

মুক্তি, কিন্তু একবারে যাহারা ইহা পারে না—তাহাদিগকে শুভ বাসনা বা শুভ কর্ম্ম করিতে বলা যায়। শুভ কর্ম্ম দ্বারা বা শুভ বাসনা দ্বারাও কর্ম্ম বা বাসনা একবারে ত্যাগ হয় সেইরূপ।

শ্রী আমি......

সেই কি তুমি ?

এসেছিলে তুমি, নাথ, আমার সকাশে ?
সে কি তুমি ? দয়া তব হয়েছিল দাসে ?
দিগন্ত বিস্তীর্ণ চারু প্রান্তর মাঝারে—
ছিনু স্তব্ধ ; ধরাস্পর্শী-আকাশ উপরে ;
বিস্ময় ঘনত্ব লভি' পশিল হৃদয়ে,
ক্ষণতরে আত্মহারা, যেন শান্তি পেয়ে।
সেই শান্তি—সে বিস্ময়—সৌন্দর্য্য-বিকাশ,-
দয়াময় ! সে কি তব করুণা প্রকাশ ?

(২)

রম্য সভাগৃহে সেই বন্ধুদের সহ,
প্রীতি-রসে ছিল মগ্ন মন প্রাণ দেহ ;
সুদৃশ্য-সুশ্রাব্য-গ্রাহ্য সে ভাব সম্ভার
তব দয়াগুণে, নাথ ! হয়েছে সঞ্চার ?
সে কি তুমি ? দয়াময় ! তোমার ঐশ্বর্য্য—
বিষাদ-সংসারে আসে ক্ষণিক সৌন্দর্য্য ?

(৩)

চন্দ্রার্কের দ্যুতি কান্তি, কুসুম-সৌরভ—
বিতরিছে জনে জনে তোমার গৌরব ?
সে কি তুমি অন্তরালে থাকিয়া সবার,
সুখস্পর্শে মলিনতা নাশিছ আমার ?

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় নিস্তব্ধ নির্জ্জনে,
যেন তুমি মোর তরে আছ কোন স্থানে
সংসার-বিষাদরাশি দূরে সরে যায়,
কল্পনায় মজে মন ; সে তব কৃপায় ?

(৪)

এত দয়া ! তবে কেন কার্পণ্য এমন !!
যেন দেখি,—না দেখিতে কর পলায়ন!!!
জগতে মাখিয়ে দেও তোমার সৌন্দর্য্য,
মুছে নিয়ে যাও পুনঃ, এ বড় আশ্চর্য্য।
প্রীতি-রস তুমি নাথ, প্রিয়বস্তু মাঝে ;
ধরিতে বাড়াই হাত, যাও কোন্ দেশে ?
সংসারের তুচ্ছ বস্তু পড়ে থাকে তথা,
মজে মন সংসারেতে ; তুমি যাও কোথা ?
হে ঠাকুর ! চতুরালী বুঝিতে কি পারি ?
এত দয়া, তবু মোরে করিলে সংসারি !
ভুলায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম, মজাইলে মোরে ;
প্রাণারাম, এস মোর হৃদয়-মাঝারে।

শ্রী.........

তুমি।

আছ তুমি শুনি বটে জানিনা তোমায়,
সর্ব্বজীবে কহে তুমি নিয়ন্তা ধরায় ;
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ হেথা কেহ নাহি আর,
পরম দয়াল তুমি বিশ্বের আধার।
নাসা, চক্ষু, জিহ্বা, ত্বক্, কর্ণ, বুদ্ধি, মন,
সকলের অগোচর তুমি নিরঞ্জন ;

জানিনা কেমন তুমি জড় কি চেতন,
অথবা কোথায় তব পাব দরশন ?
নানা ভাবে নানা লোকে বর্ণয়ে তোমায়,
কেহ বা সাকার বলে কেহ নিরাকার,
কেহ বলে তুমি প্রভু ব্যাপ্ত চরাচর,
সর্ব্বজীব হৃদে তুমি আছ নিরন্তর।

জীবহৃদে যদি প্রভু বসতি তোমার
কেন তবে বল তোমা দেখা নাহি যায় ?
আপ্তবাক্য শুনে মানি আছ তুমি বটে,
নিয়ত বিরাজ তুমি কর ঘটে ঘটে।

ধরিব তোমায় প্রভো জানি না কেমনে,
বাসনা ধরিতে কিন্তু হয় মনে মনে ;
ব্যাকুল অন্তর হয়ে যেই দিকে ধাই,
তোমার সাড়াটি যেন কিছু কিছু পাই ;
প্রকৃতির যেই ধারে নয়ন ফিরাই,
তোমার বিহার চিহ্ন দেখিবারে পাই।

সুনীল অম্বর ঊর্দ্ধে দিগন্ত ব্যাপিয়া,
অনন্তের কোলে সদা রয়েছে মিশিয়া।
কোলে করি নীলাকাশে জননীর মত,
বিবিধ বরণে তুমি করেছ রঞ্জিত।

গগনের শোভা হেরি হয়ে আত্মহারা
তোমারে ধরিতে যেন রবি শশী তারা—
নিয়ত বিমান-পথে করি পর্য্যটন
অপার মহিমা তব করিছে কীর্ত্তন।

নিম্নদেশে ভূমিতলে সুনীল সাগর
অনন্তের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া আবার,
উন্মাদের মত যেন তরঙ্গ তুলিয়া
আহ্লাদে চলেছে কিবা নাচিয়া নাচিয়া।

অন্তরালে তুমি আছ তাইতে সাগর
উন্মাদ হইয়া আজি নাচে নিরন্তর।
তালে তালে নাচাইয়া জলধির অঙ্গ,
জীববক্ষে তুলিতেছে ভাবের তরঙ্গ।
নবীন পল্লব-সাজে সাজি বনস্থলী
বিচিত্র কুসুম-কুলে দেয় পুষ্পাঞ্জলি।
তব অঙ্গে স্বীয় অঙ্গ মিশাবার আশে
সমীরণ শন্‌শনে ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে।
ফুলকুল মৃদুমন্দ দুলিয়া দুলিয়া
যতনে সমীর শিরে দিতেছে তুলিয়া।
সুগন্ধ পসরা যেন অতীব যতনে,
তব প্রীতি হেতু প্রভু জ্ঞান হয় মনে।
এ সব দেখিয়া মনে উপলব্ধি হয়
তুমি যেন মাখামাখী প্রকৃতি ভিতর।
চরাচরে যাহা কিছু দেখিবারে পাই
সকলের সার তুমি তোমা ভিন্ন নাই।
রূপবানে রূপ তুমি, গুণ গুণবানে
জড়দ্রব্যে জাড্য তুমি চেতনা চেতনে।
প্রাণীর পরাণ তুমি, ধৃতি ভূমিতলে,
অনলের তেজ তুমি, স্নিগ্ধতা সলিলে;
পবনের বেগ তুমি, শোভা নভঃস্থলে,
প্রকৃতি-সুন্দরী তব কোলে আছে ব'লে।
তুমি আছ প্রভু হেন অনুভূতি হয়
আপ্তবাক্যে ছিলে শুধু আছিল প্রত্যয়।
অনুমানে এবে তুমি এসেছ নামিয়া
করিবেনা দাসে তৃপ্ত, প্রত্যক্ষ হইয়া ?
নির্ম্মল পবিত্র তুমি বুঝেছি এবার
নির্ম্মল না হ'লে তব দেখা পাওয়া ভার।
নির্ম্মল হ'য়েছে যাঁর হৃদয়-মুকুর
নিয়ত প্রতিফলিত তাহাতে ঠাকুর।

কায়াসনে ছায়া যথা জীবেতে তেমতি
নিয়ত আনন্দময় করিছ বসতি।
আলোকে কায়ার ছায়া শুধু দেখা যায়
আঁধারে কে কোথা কবে দেখেছে ছায়ায় ?

অবিদ্যা-আঁধারে পড়ি আছি নিরন্তর
কেমনে দেখিব বল ওরূপ সুন্দর ?
জ্ঞানালোকে আলোকিত যাহার অন্তর
প্রত্যক্ষ তাহার তুমি আছ নিরন্তর।

তিমিরে থাকনা তুমি জগতের আলো
কেন নাহি জীবহৃদে জ্ঞানালোক জ্বাল !
রাজার রাজা যে তুমি রাজরাজেশ্বর
তোমার দর্শনে বিঘ্ন আছে যে বিস্তর।

অনেক চেষ্টায় হয় রাজদরশন,
বিনা যত্নে কেহ রাজা দেখেনি কখন।
রাজবাটী-প্রবেশের কামনা যাহার
অনেকের মনস্তুষ্টি কৈতে হয় তার।
সুসজ্জায় আপনার দেহ সাজাইয়া
উপযোগী রাজনীতি অভ্যস্ত করিয়া,
উচ্চ কোন কর্ম্মচারী নিকট হইতে
প্রবেশের অনুমতি হয় যে লইতে।

এতেক যতন করি তবে ভাগ্যবলে
রাজার সহিত তার দরশন মিলে।
তুমি যে রাজার রাজা রাজরাজেশ্বর,
তোমারে দেখিতে প্রভু বাসনা যাহার—
তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছয়ে বিস্তর ;
নির্ম্মল করিতে হ'বে আপন অন্তর।
শম দম সাধনাদি অভ্যাস করিয়া
শাস্ত্রের নিয়ম যত যতনে পালিয়া,

মহাজন প্রদর্শিত পথ ধরি তবে—
প্রাসাদ-ভিতরে তারে প্রবেশিতে হ'বে।
অবিদ্যার আভরণ করি পরিহার
জ্ঞানালোকে দীপ্ত করি বুদ্ধি আপনার,
আসিতে হইবে তবে তব দরশনে—
তবে তো প্রত্যক্ষ তুমি হইবে সেজনে।
দীন আমি দাস তব অতি হীনমতি
কেমনে করিব বল এতেক সঙ্গতি ?
কৃপা করি দীনে যদি দেখ একবার
দেখিবে এতেক শক্তি নাহিক আমার।
তুমি যে সর্ব্বত্র আছ, নিত্য বিদ্যমান
জেনেও জানিনা আমি মোহেতে মগন।
'তুমি' ছেড়ে 'আমি' করে করিয়াছি কাল
তাই তো অভাগা ভালে ঘটিল জঞ্জাল।
এক 'আমি' রাখিয়াছি লুকায়ে তোমায়
'আমি' না মরিলে ভাল হ'বে না আমায়।
তুমি না মারিলে কভু 'আমি' কি মরিবে ?
রক্তবীজ 'আমি' এই শত 'আমি' হ'বে !
এস ত্বরা অসি হাতে লোলজিহ্বা করি
অট্ট অট্ট হাস হেসে সাজি দিগম্বরী।
তাণ্ডবে নাচতো তুমি নৃমুণ্ডমালিনী,
শ্মশান করহ হৃদি, শ্মশানবাসিনি !
কাট মুণ্ড অসিধারে 'আমি' যাক মারা,
রসনায় পান কর রুধিরের ধারা।
তোমার মায়ার 'আমি' তোমাতে মিশাক্
আমার হৃদয়জ্বালা সব ঘুচে যাক্।
তবে তো প্রত্যক্ষ হ'বে যে আমি সে তুমি,
তুমি খুঁজিবারে আর চাহিব না আমি।

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়।

আত্মদর্শনেচ্ছুর কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক।

জ্ঞান লাভে এই জীবনেই মুক্তি হয়—মৃত্যুকালে প্রাণের উৎক্রামণ পর্য্যন্ত হয় না—হয় ত এই লোভে অনেকেই জ্ঞানপথ ভালবাসেন। প্রতিদিনের কর্ম্মে যাঁহাদের ভক্তি ও জ্ঞানের সমকালে সাধনা থাকে—অথচ যাঁহাদের জ্ঞান ও ভক্তিতে সমান অনুরাগ—তাঁহারা জ্ঞানপথের সাধক না ভক্তিপথের সাধক ইহা নিশ্চয় করিতে পারেন না।

সাধক নিজের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণগুলির আবির্ভাব অথবা তৎপ্রাপ্তি জন্য যথার্থ ইচ্ছা যখন দেখিবেন, তখন তিনি আপনাকে জ্ঞানমার্গের উপযুক্ত মনে করিবেন। অবশ্য ভক্তিমার্গের সাধকেরও এই সমস্ত গুণের মধ্যে অনেকগুলি গুণ থাকিবেই।

(১) জ্ঞানমার্গে সাধককে প্রথমেই মানত্যাগ করিতে হইবে। নিজের মান প্রার্থনা না করিয়া, এমন কি নিজে অপমানিত হইয়াও অন্যকে মান প্রদান তাঁহারা করিবেন। মানত্যাগের উপায়—অর্থাৎ কেহ আমাকে মান্য করুক এই-রূপ অভিলাষ পর্য্যন্ত না থাকে, ইহার জন্য সাধক আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্তই নশ্বর বিচার করিবেন; আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্তই জ্ঞান প্রদানে অসমর্থ ধারণা করিবেন; অনাত্মা যাহা, তাহাতে আস্থা করিবার কিছুই নাই ভাবনা করিয়া—ব্যবহারিক জগতের জন্য কোনরূপে বাহিরে কর্ম্ম করিবেন মাত্র। লোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন ভাবিয়া সকলকে মান্য দিবেন, কিন্তু অন্তরে মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া—সর্ব্বত্রই সেই অধিষ্ঠানচৈতন্যকে দেখিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপ অনুষ্ঠান অভ্যাস করিলে মানলাভের রুচি থাকিবে না। যাহার যতখানি অজ্ঞান তাহার ততখানি মানে রুচি। মান এইজন্য জ্ঞানীর প্রথম ত্যাজ্য। "আমার কিন্তু এই গুণ আছে, একদিন আমারও ছিল ইত্যাদি আত্মশ্লাঘাও জ্ঞানী করিবে না।

(২, ১১) জ্ঞানপথের পথিক সর্ব্ব বিষয়ে দম্ভ ত্যাগ করিবেন। আমি বড়ই ভাল, আমি উৎকৃষ্ট এইরূপ সর্ব্বত্যাগ করিবেন। আমিও এইরূপ শক্তি ধরি ইত্যাদিই দম্ভ। আমি এত খাটিয়াছি, আমি তত পড়িয়াছি, দেখিয়াছি;

আমি ইহা পারি, উহা পারি ইত্যাদি গর্ব্ব। যশোলাভ জন্য ধর্ম্মকরাই দম্ভ।

জ্ঞানপথিক গর্ব্ব ও দম্ভ ত্যাগ জন্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন—হায়! কতদিন তপস্যা করিলাম, স্বাধ্যায় করিলাম—আমার অভিনয় দূর হইল কৈ? মন দমন করা হইল কৈ? বিষয় মৃগতৃষ্ণার শান্তি হইল কৈ? ভোগেচ্ছা দূর হইল কৈ? সহিষ্ণু হইতে শিখিলাম কৈ? নিজে অভিলষিত স্থানে কৈ যাইতে পারিলাম? ইহা পুনঃ পুনঃ ভাবনা করিলে—দম্ভ আর হইবে কোথায়?

(৪) তৃতীয় গুণ, পরপীড়ন ত্যাগ। ইহাই অহিংসা বর্জ্জন। সর্ব্বত্রই তুমি তোমার প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিতেছ আমি কে? আমি হিংসাই বা করিব কাহার? ইত্যাদি নিরন্তর স্মরণে হিংসা থাকিবে না।

(৫) জ্ঞানপথিকের আর এক গুণ থাকিবে ক্ষান্তি পরপীড়ন সহ্য করা। পীড়ন যাহা হইতেছে, তাহা তুমিই করাইতেছ—আমাকে ভাল বাসিয়া আমার কর্ম্মক্ষয় করিয়া, আমাকে মুক্তি সুখ দিবার জন্য—এইটি স্মরণ রাখিলে পরপীড়ন সহ্য করা যায়।

(৬) চতুর্থ গুণ থাকিবে সরলতা। জ্ঞানপথিক কুটিল হইতে পারেন না। যাঁহার লক্ষ্য জ্ঞানে তাঁহার অন্য কোন স্বার্থ থাকিবে না। তিনি কুটিল হইবেন কোন্ স্বার্থলাভ জন্য? তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া মুখে মুখরোচক চারু-বাক্য বলিবেন কোন্ স্বার্থ রক্ষা জন্য? যিনি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানচৈতন্যকে দেখিতে ইচ্ছা করেন—যিনি সর্ব্বজীব মধ্যে একজনের সত্তা অনুসন্ধান করেন তিনি মনের ভাব গোপন করিবেন কাহার নিকট? যে সব জানে তাহার কাছে কুটিলতা থাকিবে কিরূপে?

(৭) জ্ঞানপথিক আত্মজ্ঞ গুরুর উপাসনা করিবেন। তদভাবে সৎ শাস্ত্র সৎসঙ্গ, মন্ত্র, ইষ্ট দেবতা সমস্তই গুরু। গুরুর সত্তা এক স্থানেও সর্ব্ব স্থানে রহিয়াছে। কাজেই গুরুর নিকটে যখন, তখন ত উপাসনা চলিবেই—অন্যস্থানে অপর লোকেও গুরু ভাবনা করিয়া উপাসনা করিতে হইবে।

(৮) জ্ঞানপথিক ভিতরে বাহিরে শুচি অভ্যাস করিবেন। স্নানাদি দ্বারা বাহিরে শুচি থাকিবেন। আবার মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা অভ্যাস করিয়া—

প্রকৃত সুখীর সহিত মিত্রতা ; দুঃখীর প্রতি করুণা ; পুণ্যের প্রতি হর্ষভাব এবং পাপে উপেক্ষা—ইহা তাঁহার ভাবনার বিষয় হইবে। জ্ঞানপথিক মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা দ্বারা চিত্তকে প্রসন্ন রাখিয়া প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের অন্তরতম প্রদেশের মলা যে রাগ ও দ্বেষ তাহা ত্যাগ করিবেন। অনুতাপ জাগাইয়া পরে প্রাণায়াম ও ধ্যান দ্বার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভিতরে পবিত্র হইবেন।

(৯) জ্ঞানপথিক কখন স্থিরভাব ত্যাগ করিবেন না। শত বাধা পাইলেও নিজের পথ ত্যাগ করিবেন না। কোন বিষয়ে চিত্তকে বিচলিত হইতে দিলেই আত্মভাবে থাকা হইল না।

(১০) জ্ঞানপথিক আত্মনিগ্রহ করিবেন। মন বাক্য ও কায় দণ্ডই আত্ম-নিগ্রহ। মন—আত্মদেব ছাড়িয়া বিষয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলে অথবা তদ ভাবে অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক। বৃথা অপ্রয়োজনীয় বাক্য উচ্চারণ করা অথবা লোককে ব্যথা দেওয়ার জন্য কর্কশ বাক্য ব্যবহার করা—এই উভয়ই ত্যাগ করিবেন। শীতল বাক্য ভিন্ন কাহাকেও কর্কশ বা শ্লেষ বাক্য বলিবেন না। যদি উপদেশ দিতে হয় তবে ভালবাসিয়া উপদেশ দিবেন। দম্ভ সহকারে পরের দোষ উল্লেখ করিবেন না। বরং মৌনী থাকিলেন তথাপি দ্বেষ সূচক বাক্য ব্যবহার করিবেন না।

(১১) জ্ঞানপথিক বিষয়বিরাগী হইবেন। ভোগই অজ্ঞান জানিয়া ভোগে রুচি ত্যাগ করিবেন। বিষয়ই সমস্ত দুঃখের মূল জানিয়া বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবেন। মনে মনে আপনাকে অনাসক্ত রাখিয়া যথাপ্রাপ্ত বিষয়েও অচঞ্চল থাকিতে অভ্যাস করিবেন।

১২। জনম মরণ সর্ব্বদা আলোচনা করা জ্ঞানপথিকের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। জরা মরণ দোষ সংসারকে সর্ব্বদা আক্রমণ করিয়া আছে, ইহা চিন্তা করিলে আর বৃথা বিষয় লইয়া থাকা যাইবে না। যাহাতে জরা মরণ অতিক্রম করা যায় সেই উপায় লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে হইবে হইবে। আত্মার জরা, মরণ, আদি ব্যাধি নাই—এই বিচার করিয়া বৈরাগ্য অভ্যাস চাই।

(১৩, ১৪) জ্ঞানপথিক "ইহা আমার" "এই আমি" এই আমি ও আমারে আসক্তি ত্যাগ করিবেন। যতদূর পারেন বাক্যেও "আমি" "আমার" ত্যাগ করিবেন।

(১৫) জ্ঞানপথিক ইষ্ট অনিষ্ট, হর্ষ বিষাদ ইত্যাদিতেও এককে লক্ষ্য করিয়া অবিচলিত থাকিবেন। পূর্ব্বকর্ম্ম জন্য ইষ্টানিষ্ট হর্ষ বিষাদ আইসে মনে রাখিয়া চঞ্চলতা ত্যাগ করিবেন।

(১৬) জ্ঞানপথিক অনন্য যোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি লইয়া থাকিবেন। যিনি নির্গুণ ঈশ্বর—তিনিই মায়া আশ্রয়ে সগুণ বিশ্বরূপ ও মায়ামানুষ হইয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ—ইহাদের সর্ব্ব ও অল্প উপাধি ত্যাগ করিয়া দেখিলেই সর্ব্বত্র সেই এক ভিন্ন অন্য কেহ নাই। তিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তিনিই গতি, ইহা স্থির জানিয়া তাঁহাকে ডাকা, তাঁহাকে মানসে ও বাহিরে ভজন করাই অব্যভিচারিণী ভক্তির কার্য্য।

(১৭) জ্ঞানপথিকের রুচি হইবে নির্জ্জন বাসে।

(১৮) জ্ঞানপথিক প্রাকৃত জনের সঙ্গ ত্যাগ করেন।

(১৯) সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানের চেষ্টা এবং বেদান্তার্থ অবলোকন ইহাই তাঁহার শেষ কার্য্য।

---

১২ সর্গঃ।

তত্ত্বমাহাত্ম্য বর্ণন।

শ্রীভগবান্ বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে তখন প্রোৎসাহিত করিলেন এবং বলিলেন, রাম ঃ--

বিদ্যতে ত্বয়ি সর্ব্বৈব প্রচ্ছকস্য গুণাবলী।
বক্তুর্গুণানী চ ময়ি রত্নশ্রীর্জ্জলধৌ যথা॥

সমুদ্রে যেমন রত্নসম্পৎ অথবা রত্নসহিত লক্ষ্মী থাকেন, সেইরূপ তোমাতে এবং আমাতে প্রশ্নকর্ত্তা ও বক্তার সমস্ত গুণই আছে। হে পুত্র! তুমিই তত্ত্ব-কথা শ্রবণের যোগ্যপাত্র।

রাম—আমাকে পুত্র সম্বোধন করিলেন?

বশিষ্ঠ—"শিষ্যাংশ্চ পুত্রবৎ পশ্যেৎ" ইতি ন্যায়াৎ। শিষ্যকে পুত্রের মত দেখা হইয়া যায়, তাই সুত! সম্বোধন করিলাম।

রাম—তত্ত্বকথা শ্রবণযোগ্য গুণ কি?

বশিষ্ঠ—বিবেক ও বৈরাগ্য না জন্মিলে তত্ত্ব কথা শ্রবণে অধিকার জন্মে না। আত্মা ও অনাত্মার বিচারকে বলে বিবেক। ইহামুত্রফলভোগ বিরাগকে বলে বৈরাগ্য। আত্মানাত্ম বস্তুবিবেক ও ইহামুত্রফলভোগ বিরাগই মুমুক্ষুর প্রথম সাধনা। কিরূপ প্রশ্ন করিতে হয় তাহা তুমি জান এবং সূত্র কথা, সংক্ষিপ্ত কথা বলিলেও তুমি বুঝিতে পার। এখন তুমি রজস্তমোবর্জ্জিত শুদ্ধ সাত্ত্বিকী বুদ্ধিকে পরমাত্মায় স্থাপিত কর।

রাম—রজস্তমোভ্যাং রহিতং শুদ্ধ সত্ত্বানুপাতিনীম্-মতি কিরূপ?

বশিষ্ঠ – রজ দ্বারা মতির বা বুদ্ধির চাপল্য হয়, আর তম দ্বারা আবরণ হয়। এই দুই গুণ রহিত হইলে শুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হয়. শুদ্ধ সত্ত্বের স্বাভাবিকী গতি পরমাত্মার দিকে; শুদ্ধ সত্ত্বগুণও প্রকাশস্বরূপ বলিয়া ইহা স্বপ্রকাশের পানেই ধাবিত হয়। বিবেক বৈরাগ্য তোমার জন্মিয়াছে, অন্যের ঐ গুণ যাগাতে দৃঢ় হয় তজ্জন্য আমি আবার উহা বলিব। এই অধ্যায়ে সংসারগতি কিরূপ অনর্থকর তাহাও দেখান হইবে এবং জ্ঞান ভিন্ন যে সংসারের অনর্থ গতি নিবারণ করা যাইবে না তাহাও দেখাইব। রাম! চন্দ্রের কিরণ লাগিলে চন্দ্রকান্ত মণি যেমন আর্দ্র হয়, তোমার চিত্তও বিবেকবৈরাগ্যযোগে সেইরূপ আর্দ্র হইয়াছে।

তুমি অশেষ গুণ লাভ করিয়াছ। তুমি তত্ত্বজ্ঞান ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছ। চন্দ্রমা ব্যতীত কুমুদিনী বিকশিতা হয় না—

অতঃ শৃণু কথাং বক্ষ্যে ত্বমেবাস্যা হি ভাজনম্।
নহি চন্দ্রং বিনা শুদ্ধা সবিকাশা কুমুদ্বতী॥

রাম—কত দিন ধরিয়া তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতে হইবে ?

বশিষ্ঠ—যতদিন না পরমপদ দৃষ্ট হয় ততদিন পর্য্যন্ত।

রাম—পরমপদকে ত ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছেন ? পরমপদ দৃষ্টে কি লাভ হয় ?

বশিষ্ঠ—এই যে বাহিরের যাহা কিছু ইন্দ্রজাল, যাহা কিছু আড়ম্বর, এই যে সমারম্ভ-প্রমাণযুক্ত উপদেশ—এই সমস্তই পরমপদ দৃষ্টে শান্ত হইয়া যায়। যদি জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে চিত্তবিশ্রান্তিজনিত পরমসুখ লাভ না হইত, তবে কোন্ বিবেকী পুরুষ এই চিন্তামূঢ়তা সহ্য করিত? চিন্তাই ত দুঃখ। দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া সকলেই তোমার মত দেহত্যাগে উদ্যম করিত। তত্ত্বকথা শ্রবণে শুধু যে বাহিরের ইন্দ্রজালরূপ দৃশ্যদর্শন বিনষ্ট হয় তাহাই নহে; কিন্তু প্রলয়কালে দ্বাদশ সূর্য্য উদয়ে যেমন কুলশৈলগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আপনিই আপনি রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটিলে সমস্ত মননব্যাপারও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই দুঃসহ সংসার-বিষ-বিসূচিকা, "জীব ও ব্রহ্ম এক" এই বোধরূপ বিষশোষক গারুড়মন্ত্ররূপী যোগ দ্বারা শান্ত হয়।

রাম—এই যোগ লাভ হইবে কিরূপে ?

বশিষ্ঠ—পরমার্থজ্ঞানমন্ত্রই যোগ। এই যোগ সজ্জনের সহিত শাস্ত্রবিচারেই নিশ্চয় লাভ হয়।

স চ যোগঃ সজ্জনেন সহ শাস্ত্র বিচারণাৎ।
পরমার্থজ্ঞানমন্ত্রো নূনং লভ্যত এব চ॥

মনুষ্যজন্ম শুধু জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য। বিচারবান্ হও, এই জন্মেই সকল দুঃখ পরিক্ষয় হইবে। বিচারদৃষ্টিকে অবহেলা করিও না।

রাম—সংসার-বিষ-বিসূচিকাজনিত দুঃসহ জ্বর কবে ছাড়িয়া যাইবে ? কিরূপে জীব শীতল-অন্তঃকরণ হইবে ?

বশিষ্ঠ—অগ্রে সর্পের পুরাতন কঞ্চুক (জীর্ণত্বক্) ত্যাগের মত সমস্ত আধিপঞ্জর ত্যাগ করিতে হইবে। দেহের প্রতি যে অহংবোধ ও মমবোধ—দৃশ্যদর্শনে বা মনের উল্লাসে যে আমি সুখী ইত্যাদি বোধ হয় তাহাই আধিপঞ্জর।

অহংঅভিমান ত্যাগ করিতে পারিলে বিগতজ্বর হইবে। তখন ইন্দ্রজালের মত সমস্ত জগৎকে দেখিয়া শীতল অন্তঃকরণে সুখলাভ করিবে। শুধু জগৎ-বিস্মৃতি নহে; জগৎ ইন্দ্রজাল, জগৎ মিথ্যা এইরূপ বোধই সম্যক্‌দর্শন। ঐন্দ্র-জালিকের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই, এই মিথ্যা ইন্দ্রজাল সান্ধ্যগগনে বিচিত্র মেঘমালার ক্রীড়ামত দেখিতে দেখিতে মিটিয়া যাইবে; শুধু নীল আকাশে চিত্ত একাগ্র হওয়ায় আর ইন্দ্রজাল চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। অধিষ্ঠানচৈতন্যে চিত্ত ক্ষয় হওয়ায়, সর্ব্বত্র সাক্ষীস্বরূপ সেই অধিষ্ঠানচৈতন্য মাত্র আপনিই আপনি স্বরূপে স্থিতিলাভ করিবেন। প্রথমে দৃশ্যপ্রপঞ্চকে, সমস্ত মানস ব্যাপারকে সাক্ষীচৈতন্যরূপে অবলোকন করাই সম্যগ্‌দর্শন। সম্যগ্‌দর্শনে পরমশান্ত পরম-পদে স্থিতি। তাই বলিতেছি সম্যগ্‌দর্শনই সম্যগ্‌দুঃখ নাশ। অসম্যগ্‌দর্শনই পরম দুঃখ,—দুঃসহ সংসারবিষ-বিসূচিকার জ্বালা।

রাম—আমি সংসার দেখিয়া পামর সংসারী প্রাণিপুঞ্জের সংসার-বিষ-বিসূচিকায় জর্জ্জরিত হইয়াছি। সংসারের জ্বালা কি জানিয়াছি, তথাপি আপনি সংসাররোগ পুনরায় বর্ণনা করুন।

বশিষ্ঠ—বিষমোহ্নতিতরাং সংসাররোগোভোগীব দশতি, অসিরিব ছিনত্তি, কুন্ত ইব বেধয়তি, রজ্জুরিবাবেষ্টয়তি, পাবক ইব দহতি, রাত্রিরিবান্ধয়তি,অশঙ্কিত-পরিপতিত পুরুষান্ পাষাণ ইব বিবশী করোতি, হরতি প্রজ্ঞাং, নাশয়তি স্থিতিং, পাতয়তি মোহান্ধকূপে, তৃষ্ণা জর্জ্জরী করোতি, ন তদস্তি কিঞ্চিদ্দুঃখং সংসারী যন্ন প্রাপ্নোতি॥

এই সংসার এক ভয়ঙ্কর রোগ। এই অবিরত বিষম সংসার-রোগ, সংসারী পামর জনগণকে কখন বিষধর সর্পের মত দংশন করে, কখন ক্ষুরধার অস্ত্রের মত ছেদন করে, কখন কুন্তাস্ত্রের (বড়শা) মত বিদ্ধ করে, কখন রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করে, কখন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত দগ্ধ করে, কখন অন্ধকার রজনীর ন্যায় চক্ষুহীন করে, কখন বা মোহাচ্ছন্ন, বিষয়পতিত, অনাশঙ্কিত অনর্থশঙ্কাবিশিষ্ট পুরুষের প্রতি মস্তকপতিত পাষাণের ন্যায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত করায়।

এই দীর্ঘ সংসাররোগ, প্রজ্ঞা (বিবেকদৃষ্টি) হরণ করে, মর্য্যাদা নাশ করে, মোহান্ধকূপে নিপাতিত করে, ভোগাভিলাষ তৃষায় জর্জ্জরিত করে। এমন কোন দুঃখ নাই যাহা সংসারী পামর জনগণকে ভোগ করিতে না হয়।

রাম—হে ভগবন্! বলুন এই ভীষণ সংসার-মহারণ্যে মোমুহ্যমান্ বিবেকান্ধ জীবের গতি কি?

বশিষ্ঠ—দুরন্তেয়ং কিল বিষয়বিসূচিকা। যদি ন চিকিৎস্যতে তন্নিতরাং নরকনগরনিকরফলানুবন্ধিনী তত্তৎ করোতি।

এই দুরন্ত বিষয়বিসূচিকার যদি চিকিৎসা না করা হয়, তবে নরনারীকে অবশ্যই নরকদুর্দ্দশাসহস্র ভোগ করিতে হইবে।

রাম—নরকদুর্দ্দশাসহস্র কোথায়?

বশিষ্ঠ—এই শরীর নরক নগর; এই শরীর মলমূত্রাদিপূর্ণ নরক নগর। স্বস্বজনপোষ্যবর্গাদি সমূহের দেহে যে অনুরাগ—সেই নরকানুরাগে মনুষ্য যখন বদ্ধ হয়, বল তখন বিষয়লক্ষণাবিসূচিকা মানুষকে নরকদুর্দ্দশাসহস্রে পাতিত করিবে কি না?

রাম—হে প্রভু! নরকদুর্দ্দশাসহস্র কিরূপ?

বশিষ্ঠ -যত্র শিলাশিতাসিপাতঃ পাত উপলতাড়নমগ্নিদাহোহিমাবসেকোঙ্গাবকর্ত্তনং চন্দনচর্চ্চাতরুবনানি ঘুণবৃত্তান্তঃ পরিবেষোঙ্গ পরিমার্জ্জনমনবরতানলবিচলিতসমরানারাচনিপাতো নিদাঘবিনোদনং ধারাগৃহসীকরবর্ষণং শিরচ্ছেদঃ সুখনিদ্রামুকীকরণমানন মুদ্রা বান্ধর্য্যং মহানুপচয়ঃ॥

এই জীবনে দেহাসক্তিতে ত অশেষ দুঃখ। কিন্তু নরকভোগ এ দেহে হয় না। মৃত্যুর পর যমালয়ে গিয়া সূক্ষ্মদেহে অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। নরকযাতনা অতি ভীষণ।

সেখানে ক্ষুধা পাইলে পাষাণ ভক্ষণ করায়, অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে, পর্ব্বতাগ্র হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, পাষাণ আঘাত করে, অগ্নিতে দগ্ধ করে, বরফে ডুবাইয়া রাখে, কুঠার ও কর্ত্তরি (করাত) দ্বারা দেহ কর্ত্তন করে. চন্দনঘর্ষণের ন্যায় শিলাফলকে ঘর্ষণ করে, ছুরী খাঁড়া প্রভৃতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র-পত্রবিশিষ্ট বনে দৌড় করায়, ঘুণে কাঠ ঝাঁঝরা করার মত সর্ব্বাঙ্গ কীট কর্ত্তৃক ভক্ষণ করায়, বস্ত্রনিপীড়নবৎ কাষ্ঠযন্ত্রে প্রপীড়ন করে, তপ্তকণ্টক শৃঙ্খলে অঙ্গবেষ্টন করায়, কণ্টকমার্জ্জনী দ্বারা অঙ্গ পরিমার্জ্জন করিতে করিতে দেহকে ত্বক্‌শূন্য করে, অনবরত অনলবিচালনকারী, অগ্নিজ্বালা নিঃসরণকারী যুদ্ধনিক্ষিপ্ত বাণধারার মত নারাচ বর্ষণ করে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ছায়া-পানীয়শূন্যদেশে সময় অতিবাহিত করিতে দেয়, প্রচণ্ড শীতে ধারাগৃহে সীকর

বর্ষণ করায়, পুনঃ পুনঃ শিরচ্ছেদ করে, সুখে নিদ্রা যাইতে দেয় না, মুখ নাক চাপিয়া রাখিয়া নিশ্বাস পড়িতে দেয় না, নিম্নোন্নতভাবে অঙ্গ সকলকে মুচড়াইয়া অঙ্গের ব্যবহার-ক্ষমতা নষ্ট করে—এই সমস্ত দুর্দ্দশা ভোগ করায়। হায়! রাঘব! এবম্বিধ নিদারুণ ক্লেশ চেষ্টা সহস্রে সংসার অতি ভীষণ। ভবরোগ চিকিৎসাতে অবহেলা করিও না। আমি যেরূপ বিচারপ্রণালী বলিতেছি ও বলিব সেই উপায় দ্বারা পরমাত্মপরায়ণ হও ও তত্ত্ব অনুশীলন কর।

রাম—সংসার নিতান্ত ক্লেশের স্থান। তথাপি মহামুনি, মহর্ষি, বিপ্র, রাজা, ইঁহারাও জ্ঞানকবচাবগুণ্ঠিত শরীর হইয়াও সংসারক্লেশ স্বীকার করেন কেন?

মুনয়ো ধ্যানপরাঃ; ঋষয়ো মন্ত্রজপপরাঃ, বিপ্রা কর্ম্মপরাঃ। রাজানো জনকাদয়ঃ। এই ধ্যানপরায়ণ, জপপরায়ণ, কর্ম্মপরায়ণ ও জ্ঞানী রাজগণ, ইঁহারা অদুঃখার্হ হইয়াও সংসারের পীড়া সহ্য করেন কেন?

বশিষ্ঠ—ইঁহারা লোকদৃষ্টিতে সংসারী ইঁহাদের সংসার-ক্লেশ নাই।

ইঁহারা অহংঅভিমান শূন্য, ইঁহারা অসঙ্গ। যথাপ্রাপ্ত আহারবিহারেও জ্ঞানী পুরুষ প্রারব্ধক্ষয় মাত্র করেন। ইঁহারা উদাসীন গতব্যথঃ, ইঁহারা সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। যেমন হরিহর প্রভৃতি দেবতাগণ এই সংসারে কৌতুকহীন ও বিক্ষেপহীন, সেইরূপ মহাত্মাগণও হৃষ্টচিত্ত, সতত আনন্দে মগ্ন। ইঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত।

রাম—দুঃখময় সংসার ভ্রমণ কি সুখের হইতে পারে?

বশিষ্ঠ—পারে। শ্রবণ কর।

পরিক্ষীণে মোহে বিগলতি ঘনে জ্ঞান জলদে
পরিজ্ঞাতে তত্ত্বে সমধিগত আত্মন্যতিততে।
বিচার্য্যার্য্যৈ সার্দ্ধং চলিত বপুষোৈব সদৃশতো
ধিয়া দৃষ্টে তত্ত্বে রমণমটনং জাগতমিদম্॥

শরীরটা অনাত্মা। এই অনাত্মাটা তাদাত্ম্যধ্যাস প্রসক্ত হইয়া আত্মসদৃশ হইয়া গিয়াছে। গুরু প্রভৃতি আর্য্যগণের সহিত আত্মা কি, অনাত্মা কি শাস্ত্রবিচার দ্বারা যখন পদার্থ পরিশোধন হয় এবং স্থূল শরীরাদিতে আত্মভাবটি নিরস্ত হয়, যখন শরীরাদি হইতে ইহার জড়ভাবটা, অনাত্মভাবটা নিরস্ত করা যায়—এইরূপ অধিকারী প্রথম গুরু ও বেদান্ত বাক্য

দ্বারা তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবেন; দ্বিতীয়তঃ, মনন দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন আত্মাতে অসম্ভাবনা নিরাস করিবেন। এইরূপ অসম্ভাবনা নিরাস হইলে, ধ্যান দ্বারা বিপরীত ভাবনাও নিরস্ত করিতে হইবে। বুদ্ধি এইরূপে নির্ম্মল হইলে ব্রহ্ম-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইবে। তখন মোহ পরিক্ষীণ হইবে এবং মোহকার্য্য যে নিবিড় ভ্রান্তিজ্ঞানমেঘ তাহাও বিগলিত হইবে। এই অবস্থায় জাগত-মটনং ভ্রমণং রমণং ক্রীড়নমেব ন পীড়নমিত্যর্থঃ—এই অবস্থায় জগৎভ্রমণটা ক্রীড়া মাত্র, ইহা পীড়ন নহে।

চিত্ত যখন প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ চৈতন্যমাত্র স্বভাব পরমাত্মবস্তু যখন প্রসন্ন হন, তখন উৎকৃষ্ট শান্তভাব চিত্তে আবির্ভূত হয়। সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি তখন শান্তিরস আস্বাদন করে। তখন সমস্ত অন্তঃকরণ-ব্যাপার ব্রহ্মরস আস্বাদনে বৈষম্যশূন্য স্বভাব প্রাপ্ত হয়—অতএব এইরূপ নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বদৃষ্টি হইলে রমণমটনং জাগতমিদম্। জগৎই তখন সাক্ষী চৈতন্যভাবে অবস্থিত হয়েন। জগৎ—জগৎরূপে দৃষ্ট হয় না, আত্মারূপে প্রতীয়মান হয়।

আরও দেখ "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু"। ছিন্নতরু বা স্থাণুর মত অচেতন এই দেহ রথস্বরূপ। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াভিমুখী যে গতি তাহাই অশ্বদিগের গতি-চাতুরী। এই রথ প্রাণবায়ু দ্বারা চালিত হইতেছে। মন ইহার লাগাম। আত্মা সারথি। পরমাত্মা রথী। এই আরোহণের ফল আনন্দ। এই রথকে আনন্দধামের দিকে চালাও, পরমানন্দ লাভ হইবে; নচেৎ দুর্গতি।

এই দেহরথের আরোহী জীবাত্মা ক্ষুদ্র হইলেও সমাধি সময়ে মহান্। তত্ত্বদর্শনের পরে নিষ্পাপ বুদ্ধি দ্বারা এই রথে জগৎভ্রমণ বড়ই সুখের।

রাম—শুধু জ্ঞানীর জগৎভ্রমণই কি রমণ সুখ? আত্মরমণানন্দ? আর কেহ কি সংসারে সে সুখ পায় না?

বশিষ্ঠ—জ্ঞানীর প্রথম অবস্থা ভক্তের অবস্থা। ভক্তেরও সংসারভ্রমণ সুখের। আপন হৃদয়ে রমণীয় দর্শনকে প্রথমে বিশ্বাসে দেখিয়া পরে মানসে তাঁহার পূজা করিতে করিতে এক অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ হয়। তখন বাহিরের সকল বস্তুতেও সেই রমণীয় দর্শন, সেই ঈপ্সিততম, সেই দয়িত, সেই হৃদয়ের রাজা আছেন বলিয়া বোধ হইতে থাকে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে ভিতরে সেই, আবার চক্ষু চাহিলে বাহিরেও সেই—কোথাও আর তাঁহার অদর্শন হয় না। পর্ব্বত

দেখিয়া, সমুদ্র দেখিয়া, আকাশ দেখিয়া মনে হয় সেই কি করিতেছে; বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী সকলে সেই, নরনারী, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ লতা সর্ব্বত্র সেই আছে মনে হইয়া যায়। হৃদয়ে তাহার সেবা করিয়া, অন্তরে তাহার সহিত কথা কহিয়া, বাহিরে সেই সেবার দেবতাকেও নানারূপে ভজন করিতে সাধ হয়। বৃক্ষ দেখিয়া, আকাশ দেখিয়া, তারা দেখিয়া, বিচিত্র পশু পক্ষী দেখিয়া, নানা রঙ্গের নানা ভঙ্গের নর নারী দেখিয়া একবারও ভুল হয় না সেই আছে। নির্জ্জনে আসিয়া সকলের সঙ্গে অথবা সর্ব্বমূর্ত্তিতে বিরাজিত সেই প্রাণের দেবতার সঙ্গে কত কথা কহিতে ইচ্ছা হয়। বল দেখি, যদি সেই সুন্দর পুরুষোত্তমের অভাব কোথাও না হয়, তখন জগৎভ্রমণ সুখের কি না?

ভক্তও জগৎভ্রমণে সুখ পান, জ্ঞানীর ত কথাই নাই।

---

১৩ সর্গঃ।

শম নিরূপণ।

জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া মহাত্মারা এই সংসারে পরম সুখে বিচরণ করেন, পূর্ব্বাধ্যায়ে ইহা বলা হইয়াছে। ইঁহারা জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত মহাত্মা শোক করেন না, কোন কিছু বাঞ্ছা করেন না, শুভাশুভ কিছুই প্রার্থনা করেন না। হেয় উপাদেয় বর্জ্জন করিয়া ইঁহারা আত্মনিষ্ঠ হন। ইঁহারা আপন ইচ্ছায় কিছুই করেন না। ইঁহাদের কার্য্য কখন অবুদ্ধি পূর্ব্বক, কখন পরেচ্ছা প্রেরিত। ইঁহারা সর্ব্ববিধ চেষ্টা বর্জ্জিত—সদাই সুখী।

বিষয়াভিলাষশূন্য অখিল কৌতুক-পরিত্যাগী মনের সুখ কে পরিমাণ করিতে পারে? এই আত্মদর্শী মহাত্মা কোন ইন্দ্রজালও দেখেন না, কোন বাসনারও অনুসরণ করেন না। সর্ব্বদাই পরমাত্মরূপে বিরাজ করেন।

জীবন্মুক্ত অবস্থা আত্মদর্শন দ্বারা লাভ হয়। বিচারবান্ হও। যত দিন না পাও ততদিন আত্মার অন্বেষণ কর; উপাসনা কর, নিষ্কামী হইয়া তুমি প্রসন্ন হও এই বলিতে বলিতে সকল কর্ম্ম কর যতদিন কর্ম্ম থাকে। প্রথমেই "আমি তোমার" বলিয়া শরণাগন্ন হও। পরে তুমি "প্রসন্ন হও" বলিয়া নিত্য কর্ম্মাদি কর। পরে একান্তে সুখে উপবিষ্ট হইয়া বহিপ্রবৃত্ত শক্তিগুলিকে আত্মদেবের নিকট রুদ্ধ কর। পরে বিচার কর চেতন জড় হইতে পৃথক্। প্রকৃতি হইতে

আত্মা পৃথক্, বিচার দ্বারা ইহা অনুভব কর। যদি ইহা না পার তবে ভক্তি যোগে কল্পতরু মূলে শ্রীমণ্ডপে উপাসনা কর, প্রণাম কর, প্রদক্ষিণ কর, জপাদি কর, মানস পূজা কর। করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শান্ত হইয়া আত্মদেবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ধ্যান কর। ধ্যানের পরে জিজ্ঞাসা কর প্রকৃতি পুরুষ স্বতন্ত্র কিরূপে ?

ইহার পরে শাস্ত্রানুশীলন অভ্যাস কর। ইহাতেই আত্মদর্শন হইবে।

এই যোগবাশিষ্ঠ শাস্ত্র দ্বারা মানুষের মূর্খতা দোষ নষ্ট হয়। আত্মদেবই পরম সুহৃৎ ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের এই সুখকর শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করা উচিত।

বরং শরাবহস্তস্য চাণ্ডালাগারবীথিষু।
ভিক্ষার্থঘটনং রাম ন মৌর্খ্যহতজীবিতম্ ॥
বরং ঘোরান্ধকূপেষু কোটরেষ্বেব ভূরুহাম্।
অন্ধকীটত্বমেকান্তে ন মৌর্খ্যমতিদুঃখদম্ ॥

বরং শরাবহস্তে চণ্ডাল দ্বারে ভিক্ষা করা শ্রেয় তথাপি মূর্খতা-দূষিত জীবন ভাল নহে। বরং ভীষণ অন্ধকূপে অথবা মহীরুহ কোটরে ভেক কীটাদি হইয়া থাকা ভাল তথাপি মৌর্খ্যাপহত জীবন সুখের নহে।

যতদিন মূর্খ থাকিবে ততদিন তৃষ্ণা মানসপদ্মকে সঙ্কুচিত করিবে। আত্ম স্বরূপ জান, জানিয়া হরিহরাদির মত জীবন্মুক্ত হইয়া সুখে বিচরণ কর।

সংসার—বিরক্ত হও, বিবেকী হও, তবে মোক্ষের ভাজন হইবে। আত্মকে দেহ মন প্রভৃতি হইতে পৃথক্, জানাই বিবেকের কার্য্য। শ্রবণ মনন ধ্যানই বিচার। বিবেক ও বিচারের পার্থক্য কেহ কেহ করেন। এই বিবেক আশ্রয়ে বৈরাগ্য অভ্যাস কর—ভীম ভবার্ণব পার হইতে পারিবে। যে পদ পাইলে পুনরাবৃত্তি নাই কোন শোক আর থাকে না সেই ব্রহ্মপদ বিচার দ্বারাই লাভ হয়। যদি বল ব্রহ্ম নাই—তাহা হইলেও বিচার করিতে দোষ কি ? যদি থাকেন তবে বিচার দ্বারাই সেই পদে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে। মোক্ষের উপায় বিচারণে ইচ্ছা জন্মিলেই অদূরে মোক্ষসাম্রাজ্য জানিও।

এই ভুবনত্রয়ে কেবলীভাব—আপনি আপনি ব্যতীত সুস্থ্য থাকিবার স্থান আর নাই। জপ হোম দানাদিতে সেই পদ লাভ হয় না—লাভ হয় কেবল মনোজয়ে, লাভ হয় কেবল বিচারে।

Registered No. C. 583.

ষষ্ঠ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সাল। [৮ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কলিকাতা, ১০ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৬২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট্
উৎসব কার্য্যালয় হইতে—শ্রীযুক্ত ননীলাল রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র।

অগ্রহায়ণ।

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৬ষ্ঠ বর্ষ] ১৩১৮ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

আরাধ্য দেব।

জানি আমি তোমা ছাড়া চলিবার শক্তি নাই,
তবুও গুমরে ভরা মন মোর সর্ব্বদাই।
চলিতে অশক্তপদ মোহ-অমা চারি ধার,
তোমার চরণ তবু করিতে পারি না সার।
অশেষ যে তব গুণ শাস্ত্রেতে শুনিতে পাই,
মোহাচ্ছন্ন হৃদি মন বুঝিবার সাধ্য নাই।
পাপী তাপী যেই জন তব কৃপা তরুছায়,
লভে শান্তি, ভক্তি, মুক্তি, তোমার করুণা বায়।
একমাত্র আশা তাই হৃদয়ে করি পোষণ,
হে দীন করুণাসিন্ধু জগজ্জন মনোমোহন।
পাপে মতি নাহি ধায় হৃদে বল পাই হেন,
অধমতারণ নামে কলঙ্ক না হয় যেন॥

শ্রী

মনকে সুস্থ কর।

মনকে যদি অনুতপ্ত করিতে না পার তবে তুমি কখন ভাল লোক নও জানিও। ইচ্ছা হয় ভগবান্‌কে ডাকি, কিন্তু অনুতাপহীন মন্দ লোক বলিয়া তোমায় ডাকা হয় না ; অনুতাপহীন দুরাত্মা বলিয়া পাপের স্মরণেও হৃদয় ব্যাকুল হয় না।

শত বিষয়ে অনুতাপ হওয়া উচিত। লোকের সহিত ব্যবহারে কত অবিনয়ের কার্য্য হয়—অনুতাপ নাই, নিতান্ত পবিত্র কর্ম্মও যথাসময়ে করিতে পারি নাই ; যথাসময়ে কর্ম্ম হয় না বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও মন মাতিয়া উঠে না। অনুতাপ নাই অথচ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—এটা ফাঁকি। অখাদ্য খাইলে পাপ নাই যাহার ধারণা, অপিচ অখাদ্য না খাইলে হইতেই পারে না যে জানিয়াছে, অখাদ্য না খাইলে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না যে বুঝিয়াছে—; সেরূপ ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, তুমি অখাদ্য খাইয়াছ সে জন্য তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; তবে তুমি সমাজে চলিবে। এরূপ ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করে, সে যে তোমাকে বা সমাজকে বুঝাইয়া দেয় যে তোমরা মহা নির্ব্বোধ। তুমি বা তোমার সমাজ যাহাকে দোষ বল বা বলে,তাহা দোষ নয় ; অথচ আমাকে আমার সুবিধার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। উভয় পক্ষই এ ক্ষেত্রে অপরাধী। অনুতাপবিহীন বলিয়া এ প্রায়শ্চিত্ত যেমন কোনই কাজের নহে, সেইরূপ তোমার প্রতিদিন সময়লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্তও অনুতাপবিহীন বলিয়া কোন কাজের নহে ; ইহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

এত দোষ করিয়াও অনুতাপ হয় না কেন ? পশু অনুতাপ করে না, ইহারা বিচার করিয়া কার্য্যও করিতে পারে না ; যা পায় তাহাই খায়, কোন ইন্দ্রিয় নিজে দমন করিতে পারে না ; এজন্য ইহাদের অনুতাপ নাই।

মানুষ বিচার করিতে পারে, ভাল কি, মন্দ কি জানিয়া মন্দ ত্যাগ করিয়া ভাল হইতে পারে ; আর এ সব যে করে না, সে মানুষ থাকে না পশু হইয়া যায় ; তাই অনুতাপ হয় না।

অনুতাপহীনতা তবে পশুত্বের লক্ষণ।

অনুতাপ নাই—এমন লোকই আজকাল অনেক। ইহারা কি পশু হইয়া গিয়াছে তাই এত দুঃখী ? এ বিষয়ে সন্দেহ কিছুই নাই।

উপায় কি কিছু আছে ?

সৎসঙ্গ কর—মনকে দণ্ড দাও। মনের কর্ণমর্দ্দন কর। প্রতি দোষ বা প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলাতে কর্ণমর্দ্দন করাও—তখন অনুতপ্ত হইবে।

সৎসঙ্গে মন পবিত্র কথা শুনিবে। পবিত্র কথা শুনিয়া, পবিত্র কার্য্য করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু পূর্ব্বকার কু-অভ্যাস জন্য নানা প্রকারে কর্ত্তব্যের অবহেলা হইবে। নানা প্রকার দোষ ঘটিয়া যাইবে। যত যত বার দোষ হইবে, তত তত বার কর্ণমর্দ্দন করাইয়া দাও। বেশ জ্বালা হয় এমন ভাবে মর্দ্দন কর। ভেড়াও কর্ণমর্দ্দনে তাতিয়া উঠে।

এই ভাবে মনকে গরম করিয়া, পরে জপ অভ্যাস করাও। তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া জপ করাও এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য সমস্তই যে অনাত্মা তাহাও শুনাও। অনুতপ্ত মন, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সুস্থ হইবে।

প্রকৃত কথা।

এমন একটা কিছু মানুষ চায় যাহার ভিতরে মানুষ সকল প্রকার দুঃখও দেখিতে পায়, আবার সকল প্রকার দুঃখের নিবৃত্তিও দেখিতে পায়। দুঃখ কতই দেখিতেছে, কতই আসিতেছে, কতই যাইতেছে—এ দুঃখ কি কারণে হইতেছে, কোথা হইতে আসিতেছে, কোন্ প্রকারে হইতেছে মানুষ ইহা বুঝিতে চায়। আবার কি প্রকারে এ দুঃখের অবসান হয় ইহাও মানুষ বুঝিতে চায়।

এই কিছুটা কি ? একবারে প্রকাশ করিব না। কারণ ভয় রাখি। তুমি সব করিতে পার। এত দিন ত করিতেছ। আবার যে করিবে না তার প্রমাণ কি ?

তুমিই সব করিতেছ। এক সঙ্গে দুই মূর্ত্তি ধরিয়া সব ভাঙ্গিতেছ সব গড়িতেছ ; আবার ভাঙ্গিতেছ, আবার গড়িতেছ।

তুমি সর্ব্বদা জাগ্রতে আছ—আবার এমন তোমার মহিমা—খুব আছ—সে অবস্থাতেই আবার নাই। আছ আছ—তৎক্ষণাৎ নাই—এমনটি আর কেহ নাই। খুব ক্লেশ দিতেছ, আবার তৎক্ষণাৎ হাঁসাইতেছ।

তোমার দয়ামায়াও যেমন, আবার নিষ্ঠুরতাও তদপেক্ষা কম নহে। নিষ্ঠুরতা দেখানই যেন তোমার অভ্যাস। আরও অভ্যাস খুব কাঁদাইয়া দেখান যে, কান্নাটা কিছুই নহে।

কোন্ দুই বস্তুতে তুমি গড়া—বলা কঠিন। বলিতে গেলে যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে আবার কোন্ বিপদে ফেলিবে সে ভয় বিলক্ষণ রাখি। তাই ইঙ্গিতে, আভাসে তুমি কে জানাইতে চাই।

কে তুমি? যেমন আমি কে এই তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা বলেন, যাহা সকলে বুঝিতে পারে এই ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমি=জীব+মন+শরীর; সেইরূপ তুমি কে বলিতে গেলে বলিতে হয়, তুমি যেন মন-মাখান চেতন। মন যেমন আবার বিষয়মাখান হইয়া আপন পুরুষকে গ্রাহ্য করে না—না করিয়া আপন পুরুষের বক্ষে থাকিয়াই বিষয়-সঙ্গ করে, আর পুরুষ যখন আপন প্রকৃতিকে বশ করিতে চেষ্টা করেন তখন প্রকৃতি তাঁহাকে অতিশয় কষ্টপ্রদান করেন, নানা প্রকারে অপ্রস্তুত করেন, হয়কে নয় করিয়া কষ্ট দিতে দিতেই আপনার ব্যভিচার সমর্থন করেন—তুমিও ঠিক সেইরূপ। এখন ত বলিতেছ আমাকে আর কষ্ট দিবে না। বুঝাইতেছ তোমাকে সব বলিয়া উপাসনা করিলে, তুমি আর আমার উপর ভ্রূকুটী করিবে না—আমি ভাল মানুষ—আমি তাই করিতেছি। তুমিই সব, শতবার বলিতেছি। আর এই বেচারা মানুষকে দুঃখে ফেলিও না।

আমি তোমারই স্তব করিব—তোমাকেই সর্ব্বস্ব বলিব—তুমি একদিকে মহাপ্রলয়কারিণী, অন্য দিকে অমৃতবর্ষিণী। তুমিই একদিকে প্রকৃতি, একদিকে পরম শান্ত রমণীয় দর্শন। তোমাকেই আমি শতবার নমস্কার করি। তুমিই সব সাজিয়াছ, সব সাজিতেছ, সব সাজিবে, আবার এত সাজ সাজিয়াও তুমি পরমশান্ত, সুখময়, আনন্দময়, চিন্ময়ী, আনন্দময়ী। আর কি বলিব, তোমাকে প্রণাম করি। সুখ দুঃখ তোমার উপরে রঙ্গমাত্র—যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সেইরূপ। প্রণাম।

গীতায় সম্পূর্ণ ধর্ম্ম।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমরা সম্পূর্ণ ধর্ম্মের অঙ্গ বা অবস্থগুলির আলোচনা করিয়াছি।

এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে।

(১) সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাধকের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণের উদয় হইবে? "ধর্ম্মাহমৃত পানের গুণ" ইহাই প্রথম আলোচ্য।

(২) সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে আত্মদর্শন হয়, তাহাতে আত্মাকে কোন্ কোন্ ভাবে দর্শন করা যায়?

(৩) যে সাধক আত্মদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক?

(৪) সম্পূর্ণ ধর্ম্মের যে পাঁচটি অবস্থা বলা হইয়াছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কি কি সাধনা করিতে হয়। অর্থাৎ নির্গুণ উপাসকের সাধনা কি? বিশ্বরূপ উপাসকের কোন্ সাধনা? অভ্যাসযোগী কোন্ সাধনা লইয়া থাকেন? কর্ম্মযোগীরই বা সাধনা কিরূপ? সর্ব্বকর্ম্মার্পণ যিনি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে কি সাধনা করিতে হইবে?

এই সাধনাগুলি উল্লেখ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম তিনটি প্রশ্নালোচনা এখানে গৌণ। গীতা এই সমস্ত ব্যাপার দেখাইয়াছেন। আমরা তাহা বুঝিয়া গীতার আজ্ঞা পালন করি, সেইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই; ইহাই উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মামৃত পানের গুণ।

নির্গুণ উপাসনা, সগুণ উপাসনা, অভ্যাসযোগে সগুণ বিশ্বরূপ, মৎকর্ম্ম পরম সাধনা ও (দাসভাবে) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ সাধনা—এই পঞ্চাঙ্গ তপস্যার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্রম অনুসারে উপাসনা করিলে যে ধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই সম্পূর্ণ ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম অমৃত স্বরূপ। গীতা ইহাকে ধর্ম্মামৃত বলিতেছেন। এই অমৃতময় ধর্ম্মসুধা পান করিলে, সকল জ্বালা, সকল তাপ চিরতরে শান্ত হয়।

এই ধর্ম্মামৃত পান করিলে যে গুণরাশি মানুষকে অলঙ্কৃত করে, গীতা বহু স্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

মনুষ্যজাতির যে কেহ এই ধর্ম্মামৃত পান করিবেন, তিনি কোন ভূতের প্রতি দ্বেষ করিতে পারিবেন না। সর্ব্বজীবে আত্মভাবে ব্যবহার হইয়া যাইবে। আপনাকে পীড়া দিতে যেমন কেহই চায় না, কেননা আমাদের আত্মাই যে আমাদের অতীব প্রিয়—সেই আত্মদেবই যে আমাদের ঈপ্সিততম, তিনিই যে আমাদের দেবতা, আমাদের দয়িত, আমাদের রমণীয়দর্শন —তাঁহার পীড়া, আত্মদেবের যাতনা যেমন আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দিতে প্রস্তুত নহি,—সেইরূপ সর্ব্বপ্রাণীর দেহ, সর্ব্ব জীবের দেহসমষ্টিরূপ এই ইন্দ্রিয়গোচর বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই আমার হৃদয়ের রাজার, আমার ঈপ্সিততমের, আমার দয়িতের, আমার দেবতার, আমার একমাত্র রমণীয় দর্শন আত্মদেবের মন্দির, আমি ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করিতে পারি না; কোন জীব-হিংসা করিলে, কোন প্রাণীদেহকে ক্লেশ দিলে, পাছে সেই মন্দিরের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতার অসন্তোষ উৎপন্ন হয়—বুদ্ধিপূর্ব্বক আপনার অসন্তোষ যেমন করা যায় না—সেইরূপ কোন জীবকে ব্যথা বা ক্লেশও দেওয়া যায় না।

যিনি এই ধর্ম্মামৃত পান করিয়াছেন, অন্যে তাঁহাকে হিংসা করিলেও তিনি প্রারব্ধক্ষয় হইতেছে ভাবিয়া সেই আত্মদেবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, সেই হৃদয়ের রাজাকে স্মরণ করিয়া করিয়া সমস্তই সহ্য করিতে পারেন। লয় বিক্ষেপ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুখ, শীত উষ্ণ, তিরস্কার পুরস্কার, নিন্দা স্তুতি, দেহের পীড়া, দেহের স্বাস্থ্য—সমস্তই তিনি সহ্য করিতে পারেন।

লোকে যাঁহাকে উত্তম বলে তাঁহাকে তিনি হিংসা করেন না, লোকে যাঁহাকে তাঁহার সমান বলে তাহার সঙ্গে তাঁহার মিত্রতা হয়, লোকে যাহাকে অধম বলে তাহাকে অজ্ঞান দেখিয়া তাহার প্রতি তাঁহার করুণা হয়। কোথাও অহংকার তাঁহার নাই, কারণ তাঁহার অহংতা প্রসারিত হইয়া সেই সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ব অধিষ্ঠানভূত, সর্ব্ব অনুস্যূত শ্রীচৈতন্যে মিশিয়াছে; কোথাও তাঁহার মমতা নাই, কারণ তাঁহার মমতা প্রসারিত হইয়া সকলকেই আপনার করিয়া ফেলিয়াছে—হায়! জগৎ কবে এই ধর্ম্মামৃত পান করিবে? আরও বহুগুণ গীতা উল্লেখ করিতে-

ছেন। সদা সন্তোষ, অপ্রমত্ত, সংযত স্বভাব, স্থিতপ্রজ্ঞ, মদ্ভক্ত, যিনি কাহারও পীড়ার কারণ নহেন, তাঁহাকেও কেহ পীড়া দেয় না ইত্যাদি। আমরা বলিতেছি, এই সম্পূর্ণ ধর্ম্মটির পূর্ণভাবে পালন না করা পর্য্যন্ত মানুষের ক্ষুদ্রত্ব থাকিবেই। আমার ধর্ম্মটি ভাল আর সকলের ধর্ম্ম মন্দ, আমার ধর্ম্মটি আশ্রয় না করিলে জীব পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না, আমার ধর্ম্ম ভিন্ন পবিত্রতা কোথাও নাই, অন্য ধর্ম্মের বহু দোষ ইত্যাদি কদর্য্য ব্যবহারে জগতের শান্তি কিছুতেই থাকিতে পারিবে না।

শ্রীগীতা দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক হইতে ২০ শ্লোকে এই ধর্ম্মামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা উচিত।

(২)

কোন্ কোন্ ভাবে আত্মদর্শন হয়।

যাঁহারা আত্মদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে আত্মার আদি নাই; তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন; তিনি সর্ব্বত্র পাণি-পাদ-অক্ষ-শির-মুখ বিশিষ্ট; তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের গুণে প্রতিবিম্বিত; কাহারও সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, অথচ তিনি সকলের আধার; সত্ত্বরজস্তম কোনও গুণ তাঁহাতে নাই, অথচ তিনি গুণের পালক; সর্ব্বজীবের বাহিরেও তিনি অন্তরেও তিনি; স্থাবরও তিনি, জঙ্গমও তিনি; অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়; দূরেও তিনি, নিকটেও তিনি; তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত মত; তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা; তিনি সূর্য্যাদিরও প্রকাশক; তিনি প্রকৃতিরও অতীত; তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য; তিনিই সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত।

আত্মার পূর্ব্বলিখিত ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই আত্মা যে নির্গুণ হইয়াও সগুণ ইহা বুঝিতে পারা যায়।

আমরা আত্মদর্শনেচ্ছুর যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক—তন্মধ্যে দেখাইব আত্মদর্শনেচ্ছু সর্ব্বদা বেদান্তার্থ আলোচনা করিবেন।

উপনিষদ্‌গুলিকেই বেদান্ত বলে।

তিলেষু তৈলবৎ বেদে বেদান্তঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥

তিলে যেরূপ তৈল থাকে, বেদের মধ্যে সেইরূপ বেদান্ত বা উপনিষদ্ প্রতিষ্ঠিত।

গীতা যেরূপ ভাবে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের কথা একসঙ্গে বলিতেছেন, উপনিষদও সেইরূপ ভাবে বলিয়াছেন ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, হিন্দুশাস্ত্র হেঁয়ালীতে পূর্ণ ইহাও বলিয়া থাকেন। যাহা বুঝিতে পারা যায় না তাহা হেঁয়ালীই বটে।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কঠ ২য় বল্লী, ২১ শ্রুতি।

ব্রহ্ম বসিয়া থাকিয়াও দূরে বেড়াইতেছেন; আত্মা শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন। শুনিতে অসম্ভব মত, কিন্তু কথাটা ঠিক। সকলেই বুঝিতে পারেন মানুষের দেহটি ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু মনটি অন্য স্থানে ভ্রমণ করিতেও পারে। মনের শক্তিই যদি এইরূপ, তবে আত্মার শক্তি কতদূর? শ্রুতি আরও বলেন, তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। ঈষ ৭।

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে। শ্রুতির এই সমস্ত উক্তি—যিনি স্বরূপে নির্গুণ, তিনি স্বস্বরূপে থাকিয়াও যে স্বগুণ ভাব অবলম্বনে গুণবান্ ও ক্রিয়াশীল হয়েন, তাহাই দেখাইবার জন্য। সাধনার কথা আলোচনাকালে আমরা ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইব।

আত্মার এই সমস্ত ভাবের কথা, গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১২শ্লোক হইতে ১৭শ্লোকে লিখিত হইয়াছে।

"অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।
"সর্ব্বতঃ পাণি পাদং তৎ" ইত্যাদি।

আমরা আজ কাল দেখি সকলেই বলেন সত্য অনুসন্ধান কর। ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধানই সর্ব্ব প্রধান সত্যানুন্ধান। যে ধর্ম্ম ব্রহ্ম চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, জীব চৈতন্য সম্বন্ধে সত্য মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না, সেই ধর্ম্ম ঈশ্বরকে বিশ্বাসের বস্তু মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া নীতি লইয়াই থাকে। ঈশ্বরের নাম করিয়া, নীতি অবলম্বনে মানুষকে উন্নত করিবার চেষ্টাই এই সমস্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সমস্ত ধর্ম্মে ব্যাবহারিক জীবন উত্থান পতনের স্পন্দনে স্পন্দিত হইলেও, এই ধর্ম্ম শান্তি দিতে পারে না। যতক্ষণ না জীব ও ঈশ্বরকে জানা যায়, যতক্ষণ না জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিজ্ঞানচক্ষে দর্শন করা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব কিছুতেই দুঃখের হস্ত হইতে এড়াইতে পারে না। বেদাদি শাস্ত্র এই জন্য জ্ঞানই একমাত্র

মুক্তির কারণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বাসের ধর্ম্ম মানুষকে জ্ঞানপথে চালিত করিবার সর্ব্বনিম্ন ভূমিকা। এই সর্ব্বনিম্ন ভূমিকাতে আট্‌কাইয়া থাকিলে, জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। যাঁহারা বলেন আমরা বিশ্বাস করিয়াই থাকিব, বাকী যাহা তাহা ঈশ্বর করিয়া দিবেন—তাঁহাদের ইহাও বিবেচনা করা উচিত—ঈশ্বর যাঁহাদের বাকীটুকু করিয়া দিয়াছেন—তাঁহারাই বলিতেছেন ঈশ্বরকে জানা আবশ্যক। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিতেছেন, "দদামি বুদ্ধিযোগং তাং যেন মামুপযান্তিতে" তোমাকে আমি সেই বুদ্ধি প্রদান করিব, যাহাতে তুমি আমাকে পাইবে। বুদ্ধির কার্য্যই বিচার। শ্রীভগবান্ জীবকে বিচার দিয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার অনুগ্রহ। হাত ধরিয়া কাহাকেও ভবসংসার পার করিয়া দেন না। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে যাহা পরে পাইবে তাহা পূর্ব্বে জানিয়া, ঐ উচ্চাবস্থায় যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে। সেই জন্য জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা সকলেরই স্বাভাবিক। শুধু বিশ্বাস লইয়া চলিলে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। কাজেই মানুষের সুখ কিছুতেই হইতে পারে না। যে গুলি বিশ্বাসের ধর্ম্ম, সে গুলিও ঠিক বিশ্বাস লইয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বরকে জানিতে যাইও না—এ উক্তি তবে নিতান্ত অস্বাভাবিক। এখানে এই মাত্র বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যাহা জানিতে হইবে তাহা তত্ত্বস্বরূপে জানাই আবশ্যক। যতক্ষণ না সত্যে উপনীত হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার করিতে হইবে। যে ধর্ম্মে বিচারের অনাদর, সে ধর্ম্ম যথার্থ-সাধুকে আপনার ভাবে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবে না।

আমরা এই কারণে বেদ প্রমুখ শাস্ত্রে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব সম্বন্ধে যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গীতোক্ত সম্পূর্ণ ধর্ম্ম হইতে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। এক্ষণে অতি সংক্ষেপে সেই মীমাংসা উল্লেখ করা হইতেছে মাত্র।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আত্মা ইত্যাদি শব্দে সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ চৈতন্যকেই লক্ষ্য করা হয়। উপাধি জন্যই আত্মার বহু নাম। "স্ফটিকে নানাবিধ বর্ণের পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইলে, উহা যে প্রকার নানারূপে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাও সেইরূপ মায়া দ্বারা বিবিধ নামরূপে পরিচ্ছিন্ন (মত) হইয়া বিচিত্র বিশ্বরূপ ধারণ করেন। এক ব্যক্তিই ক্রিয়া ও কর্ম্মভেদে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েন, মহৈশ্বর্য্য পরমাত্মাও সেইরূপ কর্ম্মভেদে বিবিধ নামরূপে উক্ত হইয়া থাকেন। মায়ার মনোমুগ্ধকর নৃত্য-বিমোহিত চিত্তেই ভেদজ্ঞান আধিপত্য

করে—মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিই কার্য্যকে কারণ হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ সামগ্রী ভাবিয়া থাকেন। আর্য্য শাস্ত্রপ্রদীপ।

উপনিষদাদিতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব সম্বন্ধে মীমাংসা-বাক্য এইরূপ :—

যে আত্মদর্শন দ্বারা জরামৃত্যু পুনর্জ্জন্মাদি দূর করিতে পারা যায়—সেই আত্মা আপন স্বরূপে আপনিই আপনি। আত্মার স্বস্বরূপটি নিগুর্ণ। নিগুর্ণ ব্রহ্ম হইতে যখন মণির ঝলকের মত মায়ার উদ্ভব হয়, তখন সেই ব্রহ্ম স্বস্বরূপে থাকিয়াও আত্মমায়ার সঙ্গ করেন। মায়া যদি আত্মার ধর্ম্ম হইত, তবে মায়ার সহিত আত্মার সঙ্গ হয়—ইহা বলা যাইত না। ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর সঙ্গ কি? যাহা হউক মায়ার সঙ্গ হইলে আত্মার নাম হয় পুরুষ, সগুণ ব্রহ্ম, বিশ্বরূপ, ঈশ্বর, অন্তর্যামী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ইত্যাদি।

আর মায়ার নাম হয় অব্যক্ত, প্রধান, প্রকৃতি, সত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা ইত্যাদি।

প্রকৃতির গুণে গুণবান্ মত হইয়া পুরুষ কিরূপ হয়েন, গীতা তাহা ১৩।২১ শ্লোকে বলিতেছেন। বলিতেছেন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়াও, এবং প্রকৃতির পরিণাম যে এই দেহ—এই দেহে অধিষ্ঠান করিয়াও সেই পুরুষ উপদ্রষ্টা, সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমেশ্বর।

জীব সর্ব্বদা স্মরণ রাখুক, জীবের দেহে এই পুরুষ আছেন। এই পুরুষই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকৃতির গুণ সকল ভোগ করেন। যখন প্রকৃতি তাঁহাকে নানান্ ভোগ করাইয়াও কিছুতেই স্ববশে আনিতে পারেন না তখন তিনি ঈশ্বর। যখন প্রকৃতির গুণসঙ্গে তিনি বদ্ধ হন, মুগ্ধ হন, "আমি, আমার" ইহাতে জড়িত হন, তখনই তাঁহার জীবত্ব ঘটে এবং সদসৎ যোনিতে তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। প্রকৃতি জড়। ১৩।২০ শ্লোকে বলা হইয়াছে, তিনি কার্য্যকারণরূপে পরিণত হন—পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ। কিন্তু সুখ দুঃখ, শোক মোহাদি ধর্ম্মে জড়িত পুরুষ বা জীবাত্মা—ইহা প্রকৃতিসঙ্গ বশতঃই তাঁহার হয়। প্রকৃতির ধর্ম্ম তাঁহাতে আরোপ হয় মাত্র। এই যে প্রকৃতি—তাঁহার বিকার ও তাঁহার গুণ এবং তৎসঙ্গে জড়িত পুরুষ—ইঁহারা উভয়েই অনাদি (১৩।১৯)। মণির ঝলকের মত মায়া, ব্রহ্ম হইতে উঠেন—উঠিলেই ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুষ ও প্রকৃতি সাজেন। ইহা অনাদিকাল হইতেই হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি হইলেও অনন্ত নহেন। কেননা ব্রহ্ম যখন স্বস্বরূপে আপনিই আপনি ভাবে অবস্থান করেন, তখন প্রকৃতি পুরুষ থাকেন না, মায়াও থাকেন না। সমস্ত

স্পন্দন, সমস্ত স্পন্দনাত্মিকা সঙ্কল্পশক্তিরূপা মায়া, তখন পরমশান্ত চলনরহিত শক্তিমান্ স্পর্শে তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়া যান। এই অবস্থায় মায়া আছেন বা নাই কিছুই বলা যায় না। তিনি অনির্ব্বচনীয়া। সেই জন্য বলা হইল, অনাদি হইলেও ইহাদের অন্ত আছে।

প্রকৃতি ও পুরুষই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ; অপরা ও পরা প্রকৃতি। যাঁহার এই দুই প্রকৃতি তিনিই আত্মা, তিনিই নির্গুণ, তিনিই আপনি আপনি।

আত্মদর্শনেচ্ছু কোন্ কোন্ ভাবে আত্মাকে দর্শন করেন? পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই আবার বলা হইল।

আত্মদর্শনেচ্ছু আত্মাকে দেখিবেন (১) তিনি অনাদিমৎ (২) তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন (৩) তিনি সর্ব্বত্র পাণি-পাদ-অক্ষি-শির-মুখ বিশিষ্ট (৪) সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের গুণে প্রতিবিম্বিত (৫) কাহারও সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, অথচ তিনি সকলের আধার (৬) সত্ত্ব রজ তম কোন গুণ তাঁহাতে নাই, অথচ তিনি গুণের পালক (৭) সর্ব্ব জীবের বাহিরে অন্তরে তিনি (৮) স্থাবর জঙ্গম তিনি (৯) অতিসূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয় (১০) দূরে ও নিকটে তিনি (১১) তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তমত (১২) তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা (১৩) তিনি সূর্য্যাদিরও প্রকাশক (১৪) তিনি প্রকৃতিরও অতীত (১৫) তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য (১৬) তিনি সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত।

সাধক সর্ব্বদা আত্মার আপনিই আপনি বা নির্গুণ ভাব ও সগুণ ভাব ধরিয়া আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপ ভাবে দেখিবার নাম আত্ম-দর্শন।

(৩)

প্রকৃত ধার্ম্মিকের কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক?

শ্রীগীতা বলিতেছেন—যিনি ব্রহ্মকে জানিতে চাহেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে চাহেন, তাঁহার নিম্নলিখিত ২০টী গুণ থাকা আবশ্যক। এই গুণগুলি উপার্জ্জন করিতে যিনি পারেন নাই, অথবা উপার্জ্জনে যাঁহার চেষ্টা নাই, অথবা চেষ্টা করিলেও যিনি লাভ করিতে পারিতেছেন না তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলা যায় না। ঐরূপ সাধক অশুদ্ধচিত্ত। চিত্ত যতদিন অশুদ্ধ থাকে, ততদিন সগুণ উপাসনা এবং মূর্ত্তি-অবলম্বনে বিশ্বরূপের উপাসনতেও তাঁহার অধিকার জন্মায়

নাই। তিনি বিশ্বাসের ধর্ম্মে থাকিয়া কর্ম্মের সর্ব্বনিম্ন অবস্থা যে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ তাহাই অভ্যাস করিবেন। একথা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

এই ২০টী গুণকে জ্ঞানের সাধনও বলে।

(১) মানত্যাগ। লোকের নিকট কোন প্রকার সম্মান প্রার্থনা না করা।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ ভাবিতে হইবে; পদদলিত করিয়া গেলেও, ঈশ্বরই অন্যরূপে চরণধূলি দিয়াছেন মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অন্যে পীড়ন করিলেও, তরুর মত সহিষ্ণু হইতে হইবে; বৃক্ষ যেমন প্রহারকারীকে আপনার সর্ব্বস্ব যে ফল ফুল ও ছায়া তাহাই দান করে, সেইরূপ সাধকও উৎপীড়নকারীকে হাসিতে হাসিতে যথাসর্ব্বস্ব দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নিজে সম্মান আকাঙ্ক্ষা না করিয়া অন্য সকলকে মান্যপ্রদান করা এইরূপ সাধকের কর্ত্তব্য।

গুণ থাক্ বা না থাক্ আমি গুণবান্ এই বোধে যে আত্মশ্লাঘা, সেই আত্মশ্লাঘা জন্য মানুষ লোকের কাছে সম্মান চায়। আত্মশ্লাঘা না থাকাই অমানিত্ব। সবই তুমি এই দেখিতে যিনি চান, তিনি তোমার সর্ব্বরূপের কাছে আপনাকে আপনি অণু জ্ঞান করিয়াই থাকেন।

(২) দম্ভত্যাগ—আমি ধার্ম্মিক, আমি বিদ্বান্, অন্যে আর বুঝিবে কি; কেহই উদারচেতা নহে, কারণ আমার উদারধর্ম্ম সে গ্রহণ করে নাই—এই সমস্ত অভিমানই দম্ভ। এই দম্ভসহকারে ধর্ম্মপ্রচারই দাম্ভিকতা। আত্মদর্শনেচ্ছুর এই দম্ভ ত্যাগ করা চাই।

(৩) অহিংসা—বাক্য, মন ও কায় দ্বারা পরপীড়া বর্জ্জন। অন্যকে উপদেশ দিতে গেলেও ভালবাসিয়া উপদেশ দেওয়া চাই, পীড়া দিয়া বা হিংসা করিয়া উপদেশে কোন কার্য্য হয় না। শ্রীভগবানের ভাব যাঁহার আসিয়াছে, তিনি বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা কোন প্রাণীর মৎস্য, পক্ষী, ছাগ, কুক্কুট, এমন কি অণ্ডস্থিত হংসেরও পীড়া দিতে পারিবেন না। নিজের জীবনরক্ষার জন্য অন্যের প্রাণবিনাশ না করিয়া আত্মজ্ঞানেচ্ছু নিজের জীবন দিয়াও অন্যের

প্রাণরক্ষা করিবেন। এইরূপ করিলে, তবে সর্ব্বপ্রাণীর যিনি ঈশ্বর তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে তিনি পড়িবেন।

(৪) ক্ষান্তি—পরকে পীড়া ত দিবেনই না, কিন্তু অকাতরে তিনি পরপীড়ন সহ্য করিবেন।

(৫) আর্জ্জব—ঋজু বা সরল হওয়া। মনে মনে ঘৃণা আর মুখে আপ্যায়িত করা ইহা কুটিলতা। কুটিলতা ত্যাগই আর্জ্জব-সাধনা। সমস্তই ঈশ্বর—এই ধারণা যাঁহার হইয়াছে, তিনি কুটিল হইবেন কাহার নিকট ?

(৬) আচার্য্যোপাসনা—আত্মজ্ঞ গুরুর উপাসনা, সেবা ইত্যাদি।

(৭) শৌচ—মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি দ্বারা বাহ্যশুচি এবং সুখীর প্রতি মিত্রভাব, দুঃখীর প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি হর্ষভাব এবং কুৎসিত্ কর্ম্ম-কারীর প্রতি উপেক্ষা—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা অন্তঃশুচি হওয়া।

(৮) স্থৈর্য্য—শত বাধা প্রাপ্ত হইলেও, ঈশ্বরলাভের সাধনা ত্যাগ না করিয়া পুনঃ পুনঃ তল্লাভে চেষ্টা।

(৯) আত্মনিগ্রহ—মন, বাক্য ও কায় দণ্ড গ্রহণ। আত্মা শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে যাহার ব্যাপক সে তাহার আত্মা। মন, বাক্য ও শরীরকে ছন্দমত স্পন্দিত করিয়া, উহাদিগকে সম্মার্গে নিরোধ করাই আত্মনিগ্রহ বা আত্মসংযম।

(১০) বিষয়বৈরাগ্য—বিষয়সুখ ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণধ্বংসী এই ভাবে বিষয়-দোষ দর্শন করিয়া বিষয়ভোগেও ভিতরে অরুচি আনয়ন করা।

(১১) অনহঙ্কার—দেহাদিতে অভিমান করিয়া আমি উৎকৃষ্ট এই অভিমান না করা।

(১২) দোষদর্শন—জন্মমৃত্যু জরা প্রভৃতি দোষের বারম্বার আলোচনা করা।

(১৩) (১৪) অসক্তি, অনভিসঙ্গ —স্ত্রী পুত্র দেহাদিতে ভিতরে আমি আমার ত্যাগ করিয়া বাহিরে একটা মৌখিক কর্ত্তৃত্ব।

(১৫) সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব—ইষ্টই আসুক বা অনিষ্টই আসুক, সর্ব্বদা হর্ষ-বিষাদশূন্যত্ব।

(১৬) অনন্যযোগে ভক্তি—পরমেশ্বর ভিন্ন আমার গতি নাই এই নিশ্চিত বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে ভজনা করা।

(১৭) বিবিক্ত দেশ সেবা—ভয়বর্জ্জিত, বিঘ্নবর্জ্জিত, চিত্তপ্রসাদকর অরণ্য, নদীতট বা দেবগৃহে একা থাকিতে ভালবাসা।

(১৮) প্রাকৃত লোকসঙ্গ ত্যাগ—পামর ও বিষয়ীর সঙ্গ না করা।

(১৯) আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা—আত্মজ্ঞানলাভে সদা উদ্যোগ। অবিদ্যাপাদ, বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ ও তুরীয়পাদের কথা শ্রবণ করিয়া, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মদর্শন চেষ্টা।

(২০) তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা, বেদান্তের অর্থ আলোচনা—এইগুলি যিনি উপার্জ্জন করিবেন, তাঁহাকে নিষিধ্য ত্যাগ, বিহিত গ্রহণ, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাদের সাধনা করিতে হইবে।

আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিতে যিনি ইচ্ছুক, সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে স্থিতি যাঁহার লক্ষ্য, তিনি উপরোক্ত ২০টী জ্ঞানসাধন করিবেন।

(৪)

গীতার পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ জন্য সাধনা।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি সাধনাটিই আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়। বিষয়টি জানিয়া যদি লাভ করিতে চেষ্টা না করিলাম, তবে জানা বৃথা। ধর্ম্মামৃত পান করিলে সকল শোক দূর হয় জানিলাম, সকল জ্বালার নিবৃত্তি হয় বুঝিলাম, কিন্তু ঐ অমৃত পান করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম না; সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমার ঈপ্সিততমকে, দয়িতকে, রমণীয়দর্শনকে অপূর্ব্বভাবে দর্শন করা যায় শুনিলাম—শুনিয়াও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাণপণ করিলাম না; যে যে গুণ উপার্জ্জন করিলে তাঁহাকে পাই, তাঁহাতে চিরস্থিতি লাভ করিতে পারি, তাহা জানিয়াও রজ তম নিবৃত্তি করিয়া নিত্যসত্ত্বস্থ হইতে চেষ্টা করিলাম না—নিত্যসত্ত্বস্থ হইয়া আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পুনঃ পুনঃ যত্ন করিলাম না—ইহারই নাম প্রকৃত আত্মহত্যা; সাধনা না করিয়া ব্যভিচারিহৃদয় লইয়া থাকাই আত্মবধ নাটকের অভিনয় করা। নির্জ্জনে একান্তে আছি, কিন্তু অন্তরে কি এক যাতনা অনুভব করি; কেহ প্রহার করিতেছে না, কেহ তিরস্কার করিতেছে না, তথাপি প্রাণে একটা যাতনা অনুভব করিতেছি; এ যাতনা কোথা হইতে আইসে? আমাদের প্রিয় যাহা তাহার বিনাশ যখন হয়, তখনই মর্ম্মান্তিক যাতনা হয়। বাহিরে কোন ক্লেশের কারণ নাই—তথাপি যাতনা যখন পাই, তখন বুঝিতে হইবে আমি আত্মহত্যা করিতেছি। রমণীয়দর্শনকে লাভ করিবার চেষ্টা না

করিয়া যখন অসুন্দরকে সুন্দর মনে করিয়া তাহার পানে ধাবিত হই, তখনও আত্মবধ নাটকের অভিনয় হয়। সাধনা না করাই আত্মহত্যা।

শরীর, মন ও বাক্যকে ছন্দমত স্পন্দন করিতে চেষ্টা না করিয়া, অন্য বিষয়ে চেষ্টা করাকে উন্মত্ত চেষ্টা বলে। উন্মত্ত চেষ্টা যেখানে হয়, সেখানেও আত্মবধ হয়। আত্মহত্যা নিবারণ জন্যই গীতোক্ত এই সাধনা আমাদিগের করা উচিত। শ্রীগীতা সেইজন্যই পূর্ণ ধর্ম্মের সাধনাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে পঞ্চাঙ্গ ধর্ম্মের সাধনার কথা আলোচনা করিব।

শ্রীগীতা দুইটি মাত্র শ্লোকে সমস্ত সাধনাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোক দুইটি এই :—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতি পরায়ণাঃ॥

কেহ কেহ ধ্যানযোগে আত্মা দ্বারা আত্মাকে আত্মাতে দর্শন করেন। অন্যে সাংখ্যযোগে, অপরে কর্ম্মযোগে ঐরূপে দর্শন করেন।

আবার অন্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে না জানিয়া, আচার্য্যের নিকট শুনিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারও শ্রবণপরায়ণ হয়েন বলিয়া—মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন।

ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ ও বিশ্বাসযোগ এই চারিটি সাধনা দ্বারা ধর্ম্মামৃত পান করা যায়, অপূর্ব্বভাবে আত্মদর্শন করা যায়। আত্মদর্শনে যে যে গুণের উদয় হয়, সেই সমস্ত গুণগুলিও আপনা হইতে এই সাধনার ফলে লাভ করা যায়।

গীতোক্ত সম্পূর্ণ ধর্ম্মের যে পাঁচটি অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিরই শেষ লক্ষ্য আত্মদর্শন।

আত্মদর্শন যে হইবে তাহাতে দর্শন করিবে কে? দর্শন হইবেই বা কোথায়?

আত্মাই ত দ্রষ্টা। দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে কে? দ্রষ্টা আপনাকে দর্শন করিবেন—কোথায় করিবেন?

শ্রীগীতা বলিতেছেন আত্মাকে আত্মাদ্বারা আত্মাতে দর্শন করিতে হইবে। তিনবার আত্মাশব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহারা কি এক অর্থেই ব্যবহৃত? প্রথমে ইহার আলোচনা হউক।

শাস্ত্র আত্মা শব্দকে বহু অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যে যাহার ব্যাপক, সে তাহার আত্মা।

আত্মাকে আত্মাদ্বারা আত্মাতে দর্শন করার অর্থ—আত্মাকে মন দ্বারা বুদ্ধিতে দর্শন করিতে হয়।

আমরা এক্ষণে পঞ্চাঙ্গ ধর্ম্মের সহিত এই চারিপ্রকার সাধনার সম্পর্ক দেখাইতেছি।

(১) নিগুর্ণ উপাসকের জন্য ধ্যানযোগ।

(২) সগুণ বিশ্বরূপ উপাসকের জন্য জ্ঞানযোগ।

(৩) অভ্যাসযোগীর জন্য অন্তরঙ্গ কর্ম্ম যোগ।

(৪) মৎকর্ম্মপরমের জন্য বহিরঙ্গ কর্ম্মযোগ।

(৫) সর্ব্ব কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণকারীর জন্য বিশ্বাসযোগ।

আমরা নিম্নসাধনা হইতে উচ্চসাধনাগুলির আলোচনা করিতেছি।

বিশ্বাস যোগ। তুমি সর্ব্বত্র আছ। জড় আকাশ যেমন সর্ব্ব বস্তুর ভিতরে বাহিরে আছে, তুমি জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও সকলের ভিতরে বাহিরে আছ। জড় জড়ের মত থাকে, তুমি চৈতন্যরূপে আছ। যখন আপনস্বরূপে আপনিই আপনি তুমি,তখন সৃষ্টি নাই। যখন মায়াময় তুমি, তখন তুমি সকলের নিয়ন্তারূপে আছ। জড় কিন্তু তোমাকে জানে না, জানিতে পারেও না জড়ের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা তোমাকে জানিতে পারে। তোমার সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষই তোমাকে জানিতে পারে। সে শক্তি তুমিই মানুষকে দিয়াছ। এই জন্য মানুষ, সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তোমাকে জানিবার প্রথম কৌশল হইতেছে তুমি আছ এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস লইয়া সাধনা করিতে হইবে, তবে তোমাকে ক্রমে ক্রমে জানা যাইবে। বিশ্বাসীর সাধনা কর্ম্ম। কর্ম্ম কিন্তু যেমন তেমন করিয়া করিলে হইবে না। কর্ম্ম করিতে হইবে—কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া নহে। ফলাকাঙ্ক্ষার অর্থ সুখলাভ বা দুঃখ-নাশের জন্য কর্ম্ম করা। সাধারণ মনুষ্য সুখলাভ বা দুঃখনাশের জন্যই কর্ম্ম করে। সাধক কোন কর্ম্ম সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তি বা বিনাশের জন্য করিবেন না। তিনি তোমাকে বিশ্বাস করেন বলিয়া তুমি প্রসন্ন হও, এইটি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিবেন। তুমি প্রসন্ন হও এইটি তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্ম্মে সুখ বা দুঃখ যাহা আসুক, তাহা তাঁহার গৌণ। বরং তিনি সুখ ও দুঃখকে অগ্রাহ্য করিবেন। সুখও দুঃখকে সহ্য করিয়া কর্ম্ম করিবেন। এমন কি, তোমার আজ্ঞাপালন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে তিনি কাতর হইবেন না। সুখ বা দুঃখ সহ্য করার কৌশল হইতেছে এই। সুখ বা দুঃখ যাহা আইসে, তাহা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল মাত্র। যাহা করা হইয়াছে তাহার ফলভোগ হইবেই; কিন্তু তাহাতে সাধকের বিচলিত হইবার কিছুই নাই; অসন্তুষ্ট হইবারও কিছুই নাই।

সাধক যে অবস্থাতেই পড়ুন না কেন, তিনি কখন অসন্তুষ্ট নহেন। সুখ দুঃখ যাহা আসিতেছে, তাহাতে তাঁহার প্রারব্ধ ভোগ হইয়া যাইতেছে ;—তুমিই তাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া দিতেছ—সাধক এইটি মনে রাখিয়া আর তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তোমাকে স্মরণ করিয়া করিয়া, সুখ বা দুঃখের অবস্থা কাটাইয়া যাইবেন। সকলের মধ্যে তুমি আছ এইটি স্মরণ করিয়া সকল অপমান, সকল তাড়না সহ্য করিবেন। সকল অবস্থাতে তোমাকে স্মরণ করাই তাঁহার আত্মরক্ষা। নিত্যকর্ম্মে কখন তাঁহার অবহেলা বা আলস্য হইবে না। সংসারকর্ম্মেও তাঁহার কোন প্রকার কাতরোক্তি থাকিবে না। পাপ করিতে তিনি পারেন না, কারণ পাপ করিতে তুমি আজ্ঞা কর নাই। তিনি সকলের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন, কারণ ধর্ম্মরূপে তুমিই সকলের মধ্যে ; কিন্তু পাপের সেবা করিতে তিনি পারেন না, পাপীকে বিনাশও তিনি করেন না ; কারণ বিনাশভার তুমি তাঁহাকে দাও নাই। বিশ্বাসী কর্ম্ম দ্বারা তোমার প্রসন্নতা লক্ষ্য করিবেন, ইহাই বিশ্বাসীর সাধনা।

কর্ম্মীর বহিরঙ্গ সাধনা—যাহাদের সকল প্রকার কর্ত্তব্য বোধ আছে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদির উপর কর্ত্তব্য আছে, তাহারও ঐ সমস্ত কর্ম্ম করিবে তোমার প্রীতি জন্য। বিশ্বাসী যাহা যাহা করেন, কর্ম্মী তাহার উপরেও বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কর্ম্ম করিবেন। কর্ম্মযোগী যিনি—তিনি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার পর্য্যন্ত অভ্যাস করেন। সংসারের কর্ত্তব্য তোমার প্রীতির জন্য করেন, আবার উপরোক্ত কর্ম্মগুলিও তোমার প্রীতির জন্য করেন। আর নিম্নশ্রেণীর ভক্তগণ বাহ্যপূজা, মন্দিরমার্জ্জন, ধূপ দীপাদি দান, নাম জপাদি ভক্তি-উৎপাদককর্ম্ম দ্বারা ক্রমে উন্নত অবস্থা লাভ করিবেন।

কর্ম্মীর অন্তরঙ্গ সাধনা—তুমি বলিতেছ মৎকর্ম্মপরম হওয়াই এইরূপ সাধকের কার্য্য। ইহাদের আর অন্য কর্ত্তব্য নাই। এক কর্ত্তব্য, তোমার কর্ম্ম করা। এই কর্ম্ম যোগী ও ভক্তের পক্ষে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাস। ভক্ত মানসপূজার অভ্যাস করেন, যোগী আত্মসংস্থ হইবার জন্য যোগের অন্তরঙ্গ সাধনা করেন। ইঁহারা বিশেষরূপে ধারণাভ্যাসী। ইঁহারা ক্রমমুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করেন। ইঁহারা কোন একটি অবলম্বনে, তোমার ভাব আরোপ করিয়া নিজের হৃদয়ে তাঁহাকে দেখেন ; সর্ব্ব বস্তুতেও সেই উপাস্য আছেন স্মরণ করেন। সেই উপাস্যের সহিত সর্ব্বদা থাকা, সর্ব্বদা কথা কওয়া, সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করা

এই অবস্থার কার্য্য। অন্য কর্ত্তব্য ইঁহাদের নাই। ইঁহারাই অভ্যাসযোগী। অভ্যাসযোগী উপাস্য অবলম্বনে বিশ্বরূপে পৌছিবেন। ইহাই অভ্যাসযোগীর অন্তরঙ্গ কর্ম্মযোগ।

সগুণ উপাসকের জন্য জ্ঞানযোগ ও নির্গুণ উপাসকের জন্য ধ্যানযোগ।—এই দুই প্রকার সাধকের অবস্থা প্রায় একরূপ। একটি সাধনা সম্পন্ন হইলেই অন্যটি আসিবেই।

যখন কর্ম্মদ্বারা চিত্ত হইতে রাগদ্বেষ দূর হয়, যখন উপাসনা দ্বারা চিত্ত আপন উপাস্যে একাগ্র হইয়া ভগবৎরসে পূর্ণ হইতে থাকে, তখন একান্তে গমন করিয়া জ্ঞানসাধনার সময় আইসে।

এই অবস্থায় সাধক প্রাতে শুভজলে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্মাদি শেষ করেন,—করিয়া বাহিরে প্রবাহিত শক্তিগুলিকে কুম্ভক বা মানস পূজাদি ব্যাপারে ভিতরে প্রত্যগ্ আত্মায় প্রবাহিত করিয়া, সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করেন—কর্ম্ম করে প্রকৃতি। যতদিন কর্ম্ম আছে, ততদিন প্রকৃতিই তাহা করিতেছেন। আত্মা কিন্তু প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানাই জ্ঞান। অন্য সমস্তই অজ্ঞান। এই জ্ঞান. যোগসাধনা হইলেই নির্গুণ উপাসনায় আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভের সময় আইসে। আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—এই বিচার করিতে পারিলেই, ক্ষুদ্র জীব সমাধিকালে আপনাকে মহান্ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। পারিয়া ঐ অবস্থায় স্থিতিলাভ করেন, ইহাই ধ্যান যোগ। ইহাতেই সদ্যোমুক্তি হয়।

আমরা আর একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

সম্পূর্ণ ধর্ম্মের এই যে পাঁচটি অবস্থা বলা হইল, ইহাদের প্রত্যেকটি দ্বারাই কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়;—না ইহাদের সমস্ত সাধনাগুলির সাহায্যে তবে ক্রমে ক্রমে পূর্ণভাবে ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়?

ব্রহ্মভাবে স্থিতিই ব্রহ্মজ্ঞান। অন্যগুলি সাধনা মাত্র। বিশ্বাসী ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা লাভ করেন, আর ধ্যানযোগী ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা অনুভব করেন,—এই দুই অবস্থা কখন একরূপ হইতে পারে না। বিশ্বাসী ব্রহ্মসম্বন্ধে বিশ্বাস মাত্র রাখেন;—তিনি আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন না, আত্মভাবে চিরস্থিতি লাভ করিতেও পারেন না। বিশ্বাসীর আত্মানুভব অপেক্ষা, বহিরঙ্গ কর্ম্মীর আত্মদেবের অনুভব অনেক অধিক। তদপেক্ষা অন্তরঙ্গ অভ্যাসযোগীর জ্ঞান অনেক প্রবল এবং সুখও

নিরতিশয়। এতদপেক্ষা জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান অনেক পরিপুষ্ট। আর একমাত্র ধ্যানযোগ দ্বারাই ব্রহ্মভাবে বা আপনি আপনি ভাবে স্থিতি ঘটে। ইহা ভিন্ন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। তাই শ্রুতি বলেন,

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইতি।

ঈশ্বর অনুসন্ধান।

"চল"

কোথায় ?

"যেখানে সুখ পাওয়া যায়।"

"কোথায় সে স্থান"?

সূর্য্য উঠিলে বাহিরের সমস্ত দৃশ্য বস্তু প্রকাশিত হয়, কিন্তু এই প্রকাশে কি সব দেখা গেল ? না। বৃক্ষের ভিতরে, বায়ুর মধ্যে, জলেব অন্তরে যেন কত কি রহিয়া গেল তাহার প্রকাশ ত হইল না। একটা গাছকে বহুক্ষণ ধরিয়া যদি দেখা যায় যতক্ষণ না চক্ষে জল আইসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যদি একটি বৃক্ষের একটী স্থানে দৃষ্টিকে একাগ্র করা যায়, তবে গাছটা যে একটা আলোকরাশি পরিবেষ্টিত—ইহা এই বাহিরের চক্ষু দিয়াই দেখা যায়। ঐ একাগ্র অবস্থা যে সাধনা দ্বারা বেশীক্ষণ ধরিয়া ভাবের সহিত রাখিতে পারা যায়, সেই সাধনা দ্বারা আর এক চক্ষু খুলিয়া যায় ইহার নাম জ্ঞানচক্ষু। এই চক্ষুতে সকল বস্তুর ভিতরে যিনি আছেন তাঁহাকে দেখা যায়। তাই বলিতেছি, জ্যোতিরাশির ভিতরে যে রাজ্য, সেই রাজ্যে যাই চল। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার কাছে থাকিয়া সুখ পাইবে।

"এই জ্যোতিটা কি"—"কোথা হইতে আইসে ?"

সূর্য্যমণ্ডলের ভিতরে যে পুরুষ আছেন, তাঁহারই অঙ্গের জ্যোতি এই সূর্য্য। সেইরূপ যেখানে যা ভর্গ আছে, সবই তাঁহার অঙ্গ জ্যোতি। এই জন্য এই মন্ত্র :—

প্রাতঃ স্মারমি দেবস্য সবিতুর্ভর্গমাত্মনঃ।
বরেণ্যং তদ্ধিয়ো যো ন শ্চিদানন্দে প্রচোদয়াৎ॥

প্রভাতে সমস্ত ভাবের প্রসবকর্ত্তা যে আত্মদেবতা—যে দেবতা সর্ব্বদা

ক্রীড়াশীল—যিনি জ্যোতির্ম্ময় তাঁহার উপাসনীয় যে ভর্গ—যে জ্যোতি—তাঁহাকে স্মরণ করি। (এই জ্যাতিধ্যান করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইনিই আত্মার অতি নিকট যে বুদ্ধি—আমাদের সেই অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিকে জ্ঞানানন্দে প্রেরণ করেন। এই যে বরণীয় ভর্গ, এইটি সেই সবিতার চিৎশক্তি। অগ্নির যেমন প্রকাশ-শক্তি ও দাহিকা-শক্তি, সেইরূপ আত্মার ও চিৎশক্তি ও মায়াশক্তি আছে। চিৎশক্তির রাজ্যে যাই চল।

"সেখানে কি অন্য লোক আছে ?"

যে দেখিতে চায়, তাহার জন্য আছে। সেই দেবস্থ ভর্গই বহুরূপ ধরেন। যিনি সত্যসত্যই দেখিতে চান, তিনি দেখিতে পান। আর যিনি অন্য কিছুই দেখিতে চান না তাঁহার জন্য তিনি একাই আছেন !

"তিনিই বহু মূর্ত্তিতে—আসুন—তা যেন বুঝিলাম, কিন্তু সেখানকার লোক সকল কেমন ?

সেখানকার লোক বলেন—

"আমি আপনি যেমন পীড়িত হইলে ক্লেশ বোধ করি, নিখিল প্রাণীর জন্যও আমার সেইরূপ ক্লেশ হয়। তাই আমি অন্যকে পীড়া দিতে পারিনা। আমি প্রজাপীড়ন করিতে পারি না।"

"আবার যেমন আমি সুখলাভে আনন্দিত হই, সেইরূপ সকলেই হয়। সেই জন্য সকলকেই আনন্দিত করা কর্ত্তব্য। প্রজাপীড়ন প্রয়োজন নাই—ধন, সুখ ইত্যাদি সকলকে বিতরণ করা যাউক। সে দেশের লোক এইরূপ বিচার করেন।"

"আর এক রকম পীড়া আছে। তাহা মনঃপীড়া। যাঁহারা পীড়ার বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা সন্দেহকেই পরম পীড়া বলেন। আত্মবিচারেই মনঃপীড়া প্রশমিত হয়'। ইহাও তাঁহারা বলেন।

তবে এসনা একবার তাঁহার অনুসন্ধান করি। আমার মধ্যে যিনি ঈশ্বর, যিনি ভর্গ, যিনি দেবতার ভর্গ—যে ভর্গে ও দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল সেই দেবতাতে কোন ভেদ নাই—সেই জ্যোতি—সেই আত্ম চৈতন্যের—সেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান কর না। মনঃপীড়া প্রশমিত হইবে।

সকলেই বলে আমি চেতন, আমি জড় নহি ; কিন্তু চেতনটি কি ?

লৌহপিণ্ড অগ্নিসংযোগে যখন অগ্নির মত লাল হইয়া যায়; তখন লৌহপিণ্ডটাই যেন আগুণ মত হয়। কিন্তু লৌহটা লৌহই, আর অগ্নিটি উত্তাপ। সেইরূপ আত্মচৈতন্যটি উত্তাপ বটে। ঐ উত্তাপটি দেহে থাকে বলিয়া ইন্দ্রিয়গুলি, বা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার সবাই সজীব থাকে। কিন্তু তাপটি বায়ু হইতে জন্মে—বায়ুর স্বভাব হইতেছে স্পন্দন—সেই স্পন্দনটিই তাপ। কাজেই প্রাণবায়ুটিই তাপ। প্রাণটি গেলেই তাপ যায়। তবে প্রাণে ও আত্মচৈতন্যে যোগ আছে।

এই প্রাণের মধ্যে আবার চিত্ত থাকে, আবার চিত্তের মধ্যে থাকে সংসার।

প্রাণকে স্থির কর, চিত্তস্থির হইবে; এই সংসার মিটিয়া যাইবে, জ্যোতিরাজ্যে ঢুকিতে পারিবে; আত্মচৈতন্যের দর্শন মিলিবে।

"কোথায় তুমি আছ আমার দেবতা ?"

"আমি চেতন" এই ব্যাপারের অনুভবে—হে ভগবান্ তুমি যেন আমার মধ্যেই আছ। কিন্তু আমার মধ্যে তোমাকে যাহা অনুভব করি, তাহা খণ্ড মত। কিন্তু চৈতন্য যে অখণ্ড? উপাসনা না করিলে বুঝি খণ্ডচৈতন্য আপন স্বরূপ দেখিতে পায় না—তাই খণ্ডচৈতন্য মন্ত্র সাহায্যে, নাম সাহায্যে, বিচারসাহায্যে সেই অখণ্ডের ধ্যান করে। বিন্দু, সিন্ধুর সহিত মিশিবার মানসে উপাসনা করে। উপাসনা কর, কাতর হইয়া ডাক; দর্শন মিলিবে।

সংবাদ।

১। জার্ম্মেনীর অন্তর্গত জেনা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেকেল সাহেব প্রণীত ব্রহ্মাণ্ড রহস্য (The Riddle of the Universe) পুস্তকে পাওয়া যায়—

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীতে ১,৫০০,০০০,০০০ লোক বাস করে। তন্মধ্যে—

ব্রহ্ম-বৌদ্ধ সংখ্যা	...	৬০০,০০০,০০০।
খ্রীষ্টান্	...	৫০০,০০০,০০০।
অখ্রীষ্টান্ বা হিদেন (নানা প্রকার)	...	২০০,০০০,০০০।
মুসলমান	...	১৮০,০০০,০০০।
ধর্ম্মশূন্য মনুষ্য	...	১০,০০০,০০০।

২। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্য উপাসনা—সর্ব্বপ্রকার ঈশ্বর উপাসনা হইতে শ্রেষ্ঠ। আধুনিক বিজ্ঞান, সূর্য্যোপাসনাতে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কিছুই দেখেন না। কারণ সর্ব্বপ্রকার শরীরী পদার্থ সূর্য্য হইতে জীবনপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের পৃথিবী সূর্য্যেরই এক বিচ্ছিন্ন অংশ;—ইহা ধ্বংস হইয়া পুনরায় সূর্য্যে গিয়াই মিশিবে। মনুষ্যের দেহ, এমন কি, মন পর্য্যন্ত সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ হইতে জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছে। ঐ

৩। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ পর্য্যন্ত পঁচিশ লক্ষ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মালব্যের বিশ্বাস, এক মাসের মধ্যেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উঠিবে। বসুমতী ২৩ ভাদ্র ১৩১৮।

৪। শ্রীযুক্ত মালবীয়ের প্রস্তাবিত হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাটনায় ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হাজার উঠিয়াছে, আরও পঞ্চাশ হাজার উঠিবে। লক্ষ্ণৌ সহরে পঞ্চাশ হাজার উঠিয়াছে। ঐ

৫। মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে মহাশয়ের প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্য, গত শনিবার (২৩ ভাদ্র ১৩১৮) কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভা হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারটিকে রাজবিধির অনুমত করাই পাণ্ডুলিপির উদ্দিষ্ট বিষয়। বসুমতী।

৬। বঙ্গবাসী পত্রিকা প্রাথমিক শিক্ষার বিরুদ্ধে ২৩ ভাদ্র শনিবার ১৩১৮ বোল ও গোল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বঙ্গবাসী বলেন "যে শিক্ষাই দাও, ধর্ম্মশিক্ষাই

যে একান্ত প্রয়োজনীয়, ভারতে অনেক শিক্ষিত এবং অন্যান্য লোক এখন তাহা বুঝিয়াছেন। উচ্চশিক্ষায় যে ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, প্রাথমিক শিক্ষায় যে সে ধর্ম্মশিক্ষার অভাব হইবে না—কেহ কি সে অভয় দিতে পারেন? ইত্যাদি।

প্রবন্ধশেষে বঙ্গবাসী লিখিতেছেন যে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রয়াসী কর্ম্মী। আমরা বার বার বলি, সঙ্কল্প ত্যাগ কর। শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া, দেশের বক্ষে বিবিধ বজ্রনিপাতে প্রয়াসী হইও না। যাহাতে লোকে বাঁচে, যাহাতে লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, অগ্রে তাহার চেষ্টা কর।

আমরা বলি, সকল সম্প্রদায় এ বিষয়ে চেষ্টা করিলে শিক্ষা ও ধর্ম্ম সমকালে প্রসারতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা কি হইবে?

৭। আধুনিক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে জার্ম্মেনীর হেকেল সাহেব অন্যতম। তিনি বহু বিজ্ঞানবিতের মত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই জগৎ ঈশ্বর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে। ঈশ্বর নাই, আত্মাও অমর নহে এবং স্বাধীনতাও নাই—এই তিনটি কুসংস্কার খণ্ডন করিয়া, তিনি নূতন একটি ধর্ম্মমত ভাবী জগতের জন্য গঠন করিয়াছেন।

গীতা শাস্ত্রের ষোড়শ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে পাওয়া যায়

"অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥"

৮। বসুমতী বলেন, স্বর্গীয় হরিনাথ দের মৃত্যুতে ভারতের—শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। হরিনাথের ন্যায় মনস্বী বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ভারতে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় ভাষাবিৎ পণ্ডিত সমগ্র পৃথিবীতেও বিরল ছিল। নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে তিনি বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

(১) ইংলিশ (২) লাটিন (৩) গ্রীক (৪) সংস্কৃত (৫) আরবী (৬) পালী (৭) পার্সী (৮) উর্দ্দু (৯) উড়িয়া (১০) হিন্দী (১১) বাঙ্গালা (১২) ইটালিয়ান (১৩) ফ্রেঞ্চ (১৪) স্পেনিস্ (১৫) জার্ম্মেন্ (১৬) টার্কিস (১৭) পর্ত্তুগীজ (১৮) পুস্তু (১৯) রুষীয় (২০) পালীয় (২১) হিব্রু (২২) চীনীয় (২৩) জাপানী (২৪) বর্ম্মিজ (২৫) শ্যামীয় (২৬) সিলোনিজ (২৭) তির্ব্বতীয় (২৮) মারাঠী (২৯) গুজরাতী।

হরিনাথ-জননী এখনও জীবিত আছেন। তিনি বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী ও হিন্দী এই পঞ্চ ভাষা জানেন।

৯। পল্লীগ্রামসমূহ প্রায় জনহীন হইতে চলিল। ইহার মূল কারণ ম্যালেরিয়া। সাহেরাও ঠিক করিয়াছেন, তুলসীপত্রের ম্যালেরিয়ানাশিকা শক্তি আছে। ম্যালেরিয়ায় দুষ্ট গ্রামে গ্রামে প্রতি বাড়ীর চারিদিকে তুলসী বৃক্ষের বাগান করিলে, ম্যালেরিয়া দূর হইতে পারে। ইহাতে বিশেষ পরিশ্রম কিছুই নাই। বর্ষাকালে সহজেই এই বৃক্ষের বাগান করা যায়। হিন্দু, তুলসীকে পূজা করেন। হিন্দুর ইহা করিতে দোষ কি? এতটুকু চেষ্টার জন্যও কি ভারত জীবিত নাই?

১০। ৺তারা পীঠের মহাত্মা বামা ক্ষেপা বাবার নামে দীন দরিদ্রগণের সেবা ও হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিকল্পে বাবার এই অঞ্চলের ভক্তগণ, কলিকাতায় "মহাত্মা বামা ক্ষেপার স্মৃতিরক্ষিণী সমিতি" নামক একটি সমিতি গড়িয়াছেন। ইহাদের উদ্দেশ্য।

১। বাবার সমাধিস্থলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ।

২। মন্দিরে বাণলিঙ্গ ও বাবার মূর্ত্তি স্থাপন।

৩। সেবার স্থায়িত্ববিধান।

৪। ৺তারাপীঠের যাত্রিদিগের থাকিবার সুবিধা জন্য ধর্ম্মশালা স্থাপন।

৫। অনাথ দীন দরিদ্র আতুরগণের আর্ত্তি নিবারণ জন্য, অনাথ আশ্রম স্থাপন।

২০,০০০ টাকা প্রয়োজন। ৫০০ উঠিয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উকিল হাইকোর্ট, ১৯নং প্রাণকৃষ্ণ মুখোর গলি, টালা, কলিকাতা—এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইতে হইবে। বসুমতী।

১১। সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর ভারত আগমন উপলক্ষে আজ পর্য্যন্ত ২৫,৭, ১২ ৪৭০ টাকা উঠিয়াছে। দরভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাঁদা দিয়াছেন। দিয়াছেন ২৫,০০০ টাকা।

সুখসেব্য আসনে বসিয়া বিচার কর। করিয়া পরমপদে প্রবিষ্ট হইয়া ধ্যান-পরায়ণ হও। সমস্তই নশ্বর সর্ব্বদা স্মরণ রাখ, তবেই মনোজয় করিতে পারিবে। শান্তি ও সন্তোষ দ্বারাই মন জীত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা শমগুণ আশ্রয় কর। দুঃখ, তৃষ্ণা প্রভৃতি শমগুণ দ্বারা শান্ত হয়। শমগুণে পরমতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়। শমগুণে সর্ব্বভূতহিতে রত হওয়া যায়—সকল জীব শমশালী ব্যক্তিতে মাতার ন্যায় বিশ্বাসপ্রাপ্ত হয়। সমস্তই নশ্বর ইহা বুঝিয়া শান্ত হওয়াই শমগুণের পরিচয়। যাঁহার শম সাধনা হইয়াছে,—সে ব্যক্তি শুভাশুভ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ভোজন, শুভাশুভ জলে স্নান করিয়া হর্ষ বা গ্লানিযুক্ত হন না। সে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা শূন্য, প্রাপ্তবস্তু অত্যাগী হয়েন। মরণে ব্যাকুলতা নাই, উৎসবে চঞ্চলতা নাই; এরূপ ব্যক্তিই শান্ত।

---

১৪ সর্গঃ

বিচার-নিরূপণ।

কোঽহং কথময়ং দোষঃ সংসারাখ্য উপাগতাঃ।
ন্যায়েনেতি পরামর্শো বিচার ইতি কথ্যতে॥ ৫০॥

আমি কে? কি প্রকারে এই সংসারনামক দোষ আসিল? এই বিষয়ে শ্রুতি, মুনি, আচার্য্য প্রভৃতি প্রদর্শিত পরামর্শের বা অনুসন্ধানের নাম বিচার। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলি চিন্তার গোচর কর, বিচারবান্ হইবে। বিচার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সত্যগ্রহণও হয় না, অসত্য ত্যাগও হয় না। বিচার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তত্ত্বজ্ঞান হইতে আত্মবিশ্রান্তি, আত্মবিশ্রান্তি হইতে সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারক পরমা শান্তি লাভ হয়।

কুটুম্বপোষণে ব্যাপৃত ও বিপদে নিপতিত থাকিলেও আমি কে, সংসার কাহার? এই বিচার করিবে। চিত্তে যখন যাহা কিছু আসিবে, চিত্ত যখন যাহা আসক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চাহিবে, তাহারই বিচার করিবে; করিয়া যদি তাহা অনাত্মা হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহা ত্যাগ করিবে।

বিচার ব্যতীত অশুভ নিবারণের অন্য উপায় নাই। মোক্ষনামক পরমসুখ বিচারতরুর ফল।

বরং কর্দ্দমের ভেক হওয়া ভাল, মলের কীট হওয়া ভাল, পর্ব্বতগুহার সর্প হওয়া ভাল—তথাপি বিচারহীন হওয়া ভাল নহে।

শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া, সর্ব্বদা আমি কে এই বিচার করিবে।

বিচারাৎ তীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদম্।
দীর্ঘ সংসার রোগস্য বিচারোহি মহৌষধম্॥

বিচার দ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়।—বিচারই দীর্ঘ সংসার-রোগের একমাত্র ঔষধ। বিচার আশ্রয় ভিন্ন সংসারসমুদ্র পার হইবার অন্য উপায় নাই। হে রাঘব! কজ্জল চূর্ণের ন্যায় মলিন, মদিরা-মদ সদৃশ তোমার অবিচারময়ী নিদ্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হউক। যাহা কিছু মানুষের ক্লেশ, তাহা অবিচারেই আইসে। এই জগৎও অবিচারে সুন্দর দেখায়। বিচারবান্ হও, হইয়া অসত্য ত্যাগ কর; সত্য দেখিয়া ধন্য হইবে।

রাম।—ভগবন্! আমি কি? সংসার কোথায়? ইহার বিচার কিরূপ করিতে হইবে তাহা আরও খুলিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ।—সমস্ত যোগবাশিষ্ঠে এই প্রশ্নেরই উত্তর করা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে একটু আভাস দেওয়া যাউক।

প্রশ্ন—আমি কি?

উত্তর—যিনি জাগ্রতে বিষয় ভোগ করেন, যিনি স্বপ্নে সংস্কার লইয়া বিলাস করেন, যিনি সুষুপ্তিতে কোন কিছুই চিন্তা করেন না, কোন কিছুই অনুভব করেন না; আর যিনি তুরীয় অবস্থায় আপনি আপনি, তিনিই আমি।

যৎ স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূত সংঙ্ঘঃ।

আমি কে? আমি আপনিই আপনি। অথচ আত্মমায়ায় আমি আপনি আপনি থাকিয়াও, আমি জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় আসিয়া বহু খেলা করি। আমি কে? আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মন নহি, ইহাদের সমষ্টিও নহি; নেতি নেতি করিবার পরে যাহা থাকে তাহাতে স্থিতিই আপনি আপনির সাক্ষাৎকার। প্রশ্ন—সংসার কোথায়?

উত্তর—আমি ও আমার মায়া এই দুইটির কোন একটি বাদ দিলে, সৃষ্টি নাই। সংসারটি মায়ারচিত। সংসার মিথ্যা।

আমি ও আমার শক্তি এই উভয়ের দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ। আমি যখন শক্তির বশ হইয়া যাই, তখন আমার আর পৃথক্ অস্তিত্বই যেন থাকে না;

শক্তিই তখন সব—আমি মাত্র সুখ বা দুঃখ ভোগ করি। শক্তির কার্য্যকে, আমি মনে করি আমার কার্য্য। কাজেই সেই কার্য্যের ফলে নিরন্তর সুখদুঃখ ভোগ করি।

আবার যখন আমি শক্তিকে বশ করি, করিয়া শক্তির সহিত মিশিয়া খণ্ড জীবশক্তিকে খণ্ড শক্তিমানে মিশাইয়া, উভয়ে মিলিয়া অখণ্ডকে ডাকিয়া, ডাকিয়া, উভয়ে অখণ্ড হইয়া আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করি, তখনই পরমানন্দপ্রাপ্তি ঘটে।

এই শেষোক্ত অবস্থা লাভের জন্যই বিচারবান্ হইতে বলা। বিচারবান্ হইতে হইলে প্রথমে ধারণাভ্যাসী হইতে হয়। প্রথমে আপনার খণ্ড খণ্ড চক্ষু কর্ণাদি শক্তিগুলিকে একটি আধ্যাত্মিক স্থানে ধারণা করিতে হয়; তবে খণ্ডশক্তি গুলি একত্র হইয়া আমার শক্তি হইয়া আমার সহিত সর্ব্বদা থাকে। আমারা পুরুষ ও প্রকৃতি তখন মিলিত হইয়া আমাদের অখণ্ডস্বরূপে যাইতে চেষ্টা করি। যখন পারি তখনই আমাদের আর কোন অজ্ঞান থাকে না। আমাদের পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়।

রাম—প্রত্যহ কোন্ সাধনা করিতে হইবে ?

বশিষ্ঠ—প্রথমে রম্যস্থানে সাধু সঙ্গে বাস কর। সেই দেশে প্রত্যহ প্রভাতে শুভজলে স্নান কর। করিয়া সন্ধ্যাদি কার্য্য সমাপন কর। পরে সুখাসনে একান্তে উপবেশন করিয়া নিম্নলিখিত কর্ম্মগুলি কর।

(১) হৃদয়ে প্রিয় মৃত ব্যক্তির শেষের নিরাশ্রয় ভাব ভাবনা করিয়া, অন্য সমস্ত বিষয়-চিন্তা ত্যাগ কর। হৃদয়কে শ্মশান করা ইহারই নাম। শ্মশান-বহ্নির ভীষণ আলোকে চারিদিকে প্রিয়জনের শেষ নিরাশ্রয় ভাব দেখিয়া, মনকে কাতর কর। ইহাই বৈরাগ্য অভ্যাস। সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, কিছুই থাকিবে না—দেহও থাকিবে না, মনও নষ্ট হইবে এই সমস্ত ঠিক ঠিক ভাবিতে পারিলে মন বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া প্রবৃত্তিপথ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিপথে আসিবে।

(২) নাভি, কুম্ভকাদি সাহায্যে তখন মনের লয় বিক্ষেপ কাটাও; কাটাইয়া যোনিদ্বারা নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া, হৃদয়পদ্মে সমস্ত শক্তির বরণীয় ভর্গকে আনয়ন কর। করিয়া আবার কুম্ভকে শান্ত অবস্থা লাভ কর।

(৩) পরে বিচার কর শক্তিই আমার মন। ইহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে আমি পৃথক্। যাহা দেখি, শুনি, অনুভব করি—তাহা প্রকৃতি; তাহাই

মায়া ; তাহাই মিথ্যা ; আমি দ্রষ্টা মাত্র। দ্রষ্টা মাত্রই চেতন, অন্য সমস্ত জড়। অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া তৎ-ত্বং-অসির বিচার গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া, ত্বং কে তৎ এর সহিত মিশাইয়া সোঽহং হইয়া, আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ কর। ইহার জন্য প্রণব আশ্রয় কর। প্রণব পিতা ও গায়ত্রী মাতা। ওঁকার প্রণব ; ব্যাহৃতিযুক্ত হইয়া ইনি গায়ত্রী। এই সগুণ ব্রহ্মই মূলে সেই আপনি আপনির বরণীয় ভর্গ। আপনাকে ইষ্টদেবতা ভাবনা করিয়া, আর তিনি কোলে করিয়া তোমাকে সেই রমণীয়দর্শন পরমপদে প্রবেশ করিতেছেন চিন্তা কর ; করিয়া পরমপদে সেই পরমশান্ত ত্রিপাদ মধ্যে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া, পরমশান্ত অবস্থা লাভ কর।

(৪) ইহা না পার, তখন কল্পবৃক্ষমূলে মণিমণ্ডপে শক্তি-শক্তিমান্‌কে দর্শন কর, প্রণাম কর, প্রদক্ষিণ কর, এক কথায় মানসপূজায় ধারণাভ্যাসী হও। শেষে প্রিয়ের সহিত আমি কে, সংসার কি বিচার কর—হইবে।

বিচার পাঁচ প্রকার : (১) অর্থানর্থ বিচার, (২) সারাসার বিচার, (৩) হেয় উপাদেয় বিচার, (৪) প্রমাণ তাৎপর্য্য বিচার, (৫) আত্মতত্ত্ব-পরীক্ষা বিচার।

(১) বিষয়ে যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহাই অনর্থ। ইহাকে শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি এবং বৈরাগ্যাদি পুরুষার্থ দ্বারা খর্ব্ব করিতে হইবে। অনর্থ যাহা তাহা সর্ব্বদা লক্ষ্য কর—করিয়া বৈরাগ্য ও শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি দ্বারা উহা ত্যাগ কর ; ইহা প্রথম বিচারের কার্য্য।

(২) স্ত্রী, পুত্র, স্বদেহ ইত্যাদি—অশুচি বিষ্ঠামূত্রাদিপূর্ণ এজন্য ইহা অপবিত্র। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাহা কিছু বিষয়-সুখ তাহাই অনিত্য দুঃখপূর্ণ এই বিচারই দ্বিতীয়।

এই দুই বিচার দ্বারা বৈরাগ্য জন্মে ও মুক্তির ইচ্ছা হয়।

(৩) মুমুক্ষু কর্ম্ম করিবে কি উপাসনা করিবে,—জ্ঞান, কর্ম্ম বা উপাসনা ইহাদের সমুচ্চয় হয় কিনা এই বিচারই তৃতীয়।

(৪) জ্ঞানই মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয়। সেই জ্ঞান কি সাংখ্য বৈশেষিক আদির অভিমত জ্ঞান, না কপিল গৌতমোক্ত শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত জ্ঞান, না শ্রুতি-প্রদর্শিত জ্ঞান? কোন্ জ্ঞানমত অনুষ্ঠান করিতে হইবে? যদি শ্রৌতজ্ঞানই অবলম্বন করা হয়, তবে কি দ্বৈতজ্ঞান অবলম্বন করিতে হইবে অথবা অদ্বৈত-

জ্ঞান অবলম্বন করিতে হইবে? নির্ব্বিশেষ আত্মাকে ধরিতে হইবে, না সবিশেষ আত্মাকে ধরিতে হইবে? এই বিচারই চতুর্থ।

(৫) শ্রুতি প্রমাণে অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই আত্মা। এখন জীবের আত্মাই কি পরমাত্মা, ইহার পরীক্ষা কর; করিয়া জীব, ঈশ্বর, জগত্তত্ত্ব পরিশোধ দ্বারা যথার্থ বিষয় অবধারণ করাই পঞ্চম।

প্রথম তিনটি বিচারের ফল সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি; শেষ দুইটির ফল প্রমাণ-প্রমেয়-অসম্ভাবনা নিবৃত্তি। যদি ভাগ্যবশে আপনা হইতে প্রথম তিনটি বিচার লাভ হয় তথাপি আপনার প্রত্যয় দূর করিবার জন্য গুরু ও শাস্ত্র আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। শেষ দুইটি গুরু ও শাস্ত্র দ্বারাই লাভ হয়।

হে রাম! বিচারই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের দূত। যাহা তাহা চিন্তা করাকে বিচার বলে না। শাস্ত্রসিদ্ধান্তমত আমি কে এবং সংসার কি, ইহার অনুভব-চেষ্টাই বিচার। আমি আপনি আপনি, সংসার মিথ্যা; ইহা লাভ করাই বিচারের ফল। শ্রুতি বলেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

আবার বলেন—

তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎপ্রজাপতিঃ॥

আবার বলেন—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

আরও বলেন—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

আবার এই পুরুষই—

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

আমি কে? না—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥

যে দেবতা অগ্নিতে, জলেতে, যিনি সকলে, যিনি ওষধীতে, বনস্পতিতে, যিনি অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্রমা, শুক্র, ব্রহ্ম, প্রজাপতি ; যে দেবতা স্ত্রী পুমান্, কুমার বা কুমারী, যে দেবতা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হইয়া সমস্ত লোকের হৃদয়ে, যে দেবতার অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত হস্ত, অনন্ত পদ—সেই দেবতাই আমি—অন্য কেহই আমি নই। আমিই ব্রহ্ম, কোন শোক আমার নাই। আমিই সচ্চিদানন্দরূপ আমিই নিত্য মুক্তস্বভাব। আমাতে ও ওষধী-বনপতিস্থ দেবতাতে কোন প্রভেদ নাই—ইহার অনুভবই বিচারের কার্য্য। শুধু মুখে বলিলাম আমি ব্রহ্ম, আর কার্য্যে করিলাম শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য, এটা মহাপাপ। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বাক্যটি লইলাম অথচ শাস্ত্রটি মানিলাম না—এইরূপ লোক কৃতঘ্ন। মুখে মানিলে ও কার্য্যে অন্যরূপ ব্যবহার করিলে তুমি অসুর হইলে। আমিই সেই দেবতা কিরূপে হইলাম,—আমি ভূত, ভবিষ্যৎ জানিনা তিনি জানেন ; আমি সুখ দুঃখ অনুভব করি তিনি শুধু আনন্দময়; আমি সত্ত্ব রজ তম গুণে অস্থির হই, তিনি গুণাতীত—গুণ থাক্ বা যাক্ তাহাতে তাঁহার বিচলন হয় না। একটা ছেলে বা স্ত্রী, বা স্বামী বা পিতা মরিয়াই আমি শোকের বেগে সন্ন্যাসী হইলাম, আর তিনি স্বয়ং অনন্ত কোটি জীব দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আপনি সংহার করিতেছেন ; আমি একটা চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী গড়িতে পারি না তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড দণ্ডে দণ্ডে সৃজন করিতেছেন ; আমি একটা সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারি না, তিনি সত্যসঙ্কল্প পুরুষ ; যাহা সঙ্কল্প করেন তাহাই মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হয়। সেই পুরুষ আর এই পুরুষ একই ব্যক্তি—শুধু মুখের কথায় ইহার অনুভব হয় না ; ইহার জন্যই বিচার।

তাই বলা হইতেছে—

> ন বিচারং বিনা কশ্চিদুপায়োস্তি বিপশ্চিতাম্।
> বিচারাদশুভং ত্যক্ত্বা শুভমায়াতি ধীঃ সতাম্॥

পণ্ডিত যাঁহারা সত্য সত্যই হইবেন, তাঁহারা বিচার ভিন্ন আপনি আপনিতে স্থিতি হইবার উপায় আছে তাহা বলিবেন না। বিচার দ্বারা জগদীন্দ্র-জালরূপ অশুভ দূর হয় এবং সচ্চিদানন্দরূপশুভে স্থিতি হয়।

বিচারো নাম কেশরী মহামোহমতঙ্গজান বিদারয়তি। বিচার-সিংহ মহামোহ হস্তীকে বিদীর্ণ করে।

বিচার-প্রদীপ দ্বারা পরমপদ দর্শন হয়। বিচার-কল্পবৃক্ষের ফল নিত্য অমৃত-আস্বাদন।

মানসে সরসিস্বচ্ছে বিচার কমলোৎকরঃ।
নূনং বিকসিতো যস্য হিমবানিব ভাতি সঃ॥

হিমালয়ের নিতম্ব দেশেই মানস সরোবর। যাঁহার স্বচ্ছ মানসসরোবরে বিচার-কমল প্রস্ফুটিত হয়, তিনি ইহ জগতে হিমাচল সদৃশ শোভা ধারণ করেন।

---

১৫ সর্গঃ

সন্তোষ-নিরূপণ।

বৈরাগ্য-কল্পবৃক্ষের ছায়া কত সুখশীতল। মোক্ষরাজ্যের তৃতীয় দ্বারপাল সন্তোষও সেইরূপ সুখশীতল।

আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিই সন্তোষ। অন্য কিছু যখন থাকে, তাহা দেখা, শুনা বা পাওয়া যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অসন্তোষ।

অপ্রাপ্ত বাঞ্ছামুৎসৃজ্য সম্প্রাপ্তে সমতাং গতঃ।
অদৃষ্ট খেদাখেদো যঃ স সন্তুষ্ট ইহোচ্যতে॥

অপ্রাপ্ত বিষয়ের বাঞ্ছা নাই, প্রাপ্ত বিষয়েও হর্ষ বা দ্বেষ নাই, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-জন্যই সুখ বা দুঃখ হয়। যাহা করা হইয়া গিয়াছে তাহার উপর হাত নাই তাহাই অদৃষ্ট। অদৃষ্টই সুখ দুঃখ আনিয়া দিতেছে, ইহাতে উপস্থিত আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই এই ভাব যাঁহার আসিয়াছে, তিনিই সন্তোষ কি জানেন।

নাভিবাঞ্ছত্যসম্প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভুঙ্‌ক্তে যথাক্রমম্।
যঃ সুসৌম্য সমাচারঃ সন্তুষ্ট ইতি কথ্যতে॥

যাহা নাই তাহার জন্য বাঞ্ছা নাই ; উপস্থিত সুখ দুঃখ ভোগ দ্বারা প্রাক্তন নাশ হইতেছে বলিয়া, সুখ বা দুঃখ ভোগে যিনি হর্ষবিষাদ প্রাপ্ত হন না ; যাঁহার আচার ব্যবহার সর্ব্বমনোহর তিনিই সন্তুষ্ট।

আপনি আপনি থাকাই পূর্ণ আনন্দ। আপনি আপনি থাকিবার জন্য যাঁহার বাহিরের কোন কিছুর দরকার হয় না, বাহিরের কোন কিছুর অভাব বোধ থাকা পর্য্যন্ত কিছুতেই পরমানন্দে স্থিতি হয় না—ইহা জানিয়া পৌরুষ প্রযত্নে যিনি সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণা ত্যাগ করেন তিনিই সন্তুষ্ট।

সংসারী যিনি—সংসারপথের পথিক যিনি তাঁহার সন্তোষ নাই। যাঁহার সন্তোষ আছে, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি যাঁহার হইয়াছে যিনি আত্মক্রীড়—তাঁহার কাছে পার্থিব সাম্রাজ্য জীর্ণ তৃণের মত। যাঁহার সন্তোষ আছে, যিনি আপনা আপনি থাকা কি জানিয়াছেন, তিনি সঙ্কটেও উদ্বিগ্ন নহেন। ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী তাঁহার নিকট হলাহল বিষ। সন্তোষ যাঁহার আছে তিনি দরিদ্র হইলেও রাজা। মনঃপীড়া ও ব্যাধি তাঁহার থাকে না। সন্তুষ্ট-মুখ দেখিলেও আনন্দ।

সন্তোষ যাঁহার আছে তিনি কখন কোন বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন না। যে মানুষ সর্ব্বদা দুঃখের কথা বলে, সর্ব্বদা আধি ব্যাধির কথা কয় তাহাকে দেখিয়া মানুষের আনন্দ হয় না।

বালক দেখিয়া সুখ হয়। বালিকা দেখিয়া সুখ হয়, বৃক্ষ লতা, আকাশ সমুদ্র ইহাদিগকে দেখিয়া সুখ হয়; কারণ ইহারা কখন নিজ দুঃখ জানায় না। কখন কাঁদে না। তখন যাহা আইসে তখন তাহা সহ্য করে। উপস্থিতের জন্য উৎপীড়িত হয় সত্য, কিন্তু উৎপাত মনে করিয়া রাখে না। উৎপাত চুকিয়া গেলেই আবার যাহা ছিল তাহাই থাকে। মানুষ ইহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। দুঃখ আসিলেও সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। কারণ সে বিচার করিতে পারে—পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম এইরূপ অবস্থা আনিয়াছে, ইহাতে আমার কি? কর্ম্ম যাহা করা হইয়া গিয়াছে তাহার ফলভোগ হউক না কেন আমি কিন্তু কর্ম্মও নই, আমি কর্ত্তাও নই আমি আপনিই আপনি এই বিচার দ্বারা মানুষ সর্ব্বদা আপনি আপনি ভাবে থাকিতে চেষ্টা করুক, তাহার কোন দুঃখ আর নাই।

মলিন দর্পণে যেমন মুখ প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ আশা দ্বারা যাহার চিত্ত চঞ্চল সেরূপ চিত্তে সন্তোষের ছায়া পড়ে না।

যিনি সর্ব্বদা আপনি আপনি তিনিই পরম পুরুষ। মনদর্পণকে সেই পরম পুরুষের দিকে ধর, মনদর্পণ আপনি আপনির প্রতিকৃতি ধরিয়া আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিবে। কিন্তু মনদর্পণকে পৃথিবীর দিকে ধর, ইহাতে বাহ্য বস্তুর ছায়া পড়িয়া ইহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। পরম পুরুষের দিকে মনকে ফিরাও, সন্তোষ আসিল। মোক্ষরাজ্যে প্রবেশ তখন করিতে পারিলে। আপনি আপনি স্থিতিই পরমানন্দপ্রাপ্তি। এই জন্য সন্তোষকে মোক্ষরাজ্যের তৃতীয় দ্বারপাল বলা হইল।

জ।

Registered No. [illegible]

৬ষ্ঠ বর্ষ।] পৌষ ১৩১৮ সাল। [৯ম [illegible]

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কলিকাতা, ১০নং শম্ভু চন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ৬০২ নং বউবাজার ষ্ট্রীট,
উৎসব কার্য্যালয় হইতে—শ্রীযুক্ত ননীলাল রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র।

পৌষ।

সম্পাদকের ঠিকনা— ৪২ হাজরা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৬ষ্ঠ বর্ষ।] ১৩১৮ সাল, পৌষ। [৯ম সংখ্যা।

প্রার্থনা---উপাসনা---স্থিতি।

কার কাছে প্রার্থনা করিব?

তোমার কাছে।

কে তুমি?

কাহারও কাছে নিগুর্ণ ব্রহ্ম, কাহারও কাছে সগুণ ব্রহ্ম, কাহারও কাছে জ্যোতিস্বরূপ, কাহারও কাছে শ্রীমূর্ত্তি। যাহার যাহাতে রুচি; যাহার যাহাতে অধিকার।

পরমাত্মা তুরীয় শান্ত, শিব অদ্বৈত; তিনি দৃশ্যপ্রপঞ্চের অতীত, তিনি আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ, তিনি অনির্দ্দেশ্য, তিনি অচিন্ত্য; তিনি লক্ষণের অতীত, তিনি ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, দর্শনের অতীত; তিনি অপ্রজ্ঞও নহেন, প্রজ্ঞও নহেন, প্রজ্ঞান ঘনও নহেন; তাঁহার জ্ঞান বহির্ম্মুখও নহে, অন্তর্ম্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে। ইনিই নিগুর্ণ ব্রহ্ম।

কি এই পরমাত্মা?

ইনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ, ইনি আপনিই আপনি; বেদ ইঁহাকে জানেন না, মন ইঁহাকে চিন্তা করিতে গিয়া কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আইসে, বাক্য ইঁহার কথা বলিতে সামর্থ্যশূন্য হয়। ইনিই মাত্র নিরাকার, ইনি নিরুপাধি, ইনি নিগুর্ণ।

ইঁহার আভাস কে দেয় ?

শ্রুতি ইঁহার আভাস দিয়াছেন। ঋষিগণ ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করিয়াছেন।

কিরূপে ?

পৃথিবী স্থূল – জল তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, তেজ জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম, বায়ু তেজ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, আবার আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। আকাশ অতিশয় সূক্ষ্ম। অবকাশ দেওয়াই আকাশের ধর্ম্ম।

আকাশকে শূন্য বলা হয়। এই শূন্যে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুত্ ঝুলিতেছে, খেলা করিতেছে, ছুটিতেছে। এই শূন্যে সমস্ত জাগতিক ব্যাপার চলিতেছে ; কত যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে, কত বাড়ী ইমারত উঠিতেছে, কত বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় যান চলিতেছে, ফিরিতেছে। আকাশ কিন্তু কাহারও সহিত মিশিতেছে না। অগ্নি জ্বালিয়া দাও আকাশ পোড়ে না, জল ঢালিয়া দাও আকাশ ভেজে না, বায়ুতে রাখ আকাশ শুষ্ক হয় না, অস্ত্রাঘাত কর আকাশকে কাটা যায় না। সকল লোক মরিয়া গেলেও ও আকাশ মরে না ; দেহ ধ্বংস হইলেও আকাশের কোনও ক্ষতি হয় না।

আকাশ অতি সূক্ষ্ম। অতি সূক্ষ্ম হইয়াও ইহা অতি বলবান্ ; যেহেতু কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ইহা ধরিয়া আছে। পৃথিবীর শক্তি অপেক্ষা জলের শক্তি অধিক, জল অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা বায়ু, বায়ু অপেক্ষা আকাশ। আকাশ প্রবল শক্তিসম্পন্ন। আকাশ অতি সূক্ষ্ম, আকাশ অতি বলবান্। আকাশ শূন্যস্বরূপ।

এই শূন্যকে, এই আকাশকে ওতপ্রোতভাবে কে ব্যাপিয়া আছে ? যিনি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, যিনি শূন্য অপেক্ষাও পূর্ণ, যিনি শূন্য অপেক্ষাও শক্তি-সম্পন্ন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনিই পরমাত্মা।

এই পরমাত্মা মহাশূন্য স্বরূপ হইয়াও পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—কিছুই বলা যায়না, তথাপি শ্রুতি ইঁহাকে পরম শান্ত সর্ব্ব চলন রহিত, পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বলিয়া থাকেন। স্মৃতি ইঁহাকেই অপ্রেমেয় বলেন, কারণ ইনি স্বতঃসিদ্ধ। ইনি ত্রয়াতীত, ইনিই নির্ম্মল জ্ঞানমূর্ত্তি। ইনি মন ও বাক্যের অতীত। ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলেন :—

ব্রহ্মানন্দং নিত্যানন্দং বা পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং বিশ্বাতীতং বা গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥

ইনিই সদ্গুরু। ত্রিজগৎ ইঁহাকেই নমস্কার করে। শুকরহস্যোপনিষৎ ইঁহার সম্বন্ধেই বলা হয় "যৎস্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যম্"—ইনিই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় নিত্য খেলা করেন। যিনি চলনরহিত তিনি খেলা করেন কি? না! তিনি সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও আত্মমায়ায় ব্রহ্মাণ্ড সাজিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পুনঃ পুনঃ তুলিতেছেন কেহ বলেন মণির ঝলক যেমন স্বাভাবিক—তাহা হইতে বা তাঁহাতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী মায়াশক্তির উদ্ভবও সেইরূপ স্বাভাবিক কিন্তু সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রকৃতি-পুরুষ যোগেই হইয়া থাকে। তবেই দেখ পরমাত্মা কত নিকটে? আর ঈশ্বর ও জীব ইঁহারা মায়াকর্ত্তৃক ব্রহ্মে রূপ কল্পনামাত্র।

শূন্য যেমন অতি নিকটে, শূন্য যেমন ভিতরে বাহিরে, শূন্য যেমন সম্মুখে পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে অধে; শূন্য যেমন দূরে নিকটে, শূন্য যেমন সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা—এই শূন্যকে যিনি ওতপ্রোতভাবে ছাইয়া আছেন, তিনিও সেইরূপ অতি নিকটে, অতি দূরে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা।

শূন্যকে লোকে অভাব পদার্থ বলে—কিন্তু এই মহাশূন্য সদৃশ অতি সূক্ষ্ম পরম পুরুষ সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া অভাব পদার্থ নহেন; পূর্ণ তিনি।

এই পরমাত্মাই যখন শক্তি গ্রহণ করেন—যখন নিগুর্ণই সগুণ হয়েন, যখন নিরাকারই মায়াপরিচ্ছিন্ন হইয়া আকার গ্রহণ করেন, যখন তুরীয়ই প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্বরূপ ধারণ করেন, যখন বিদ্যা, আনন্দ, তুরীয় এই ত্রিপাদ ব্রহ্ম, আপন স্বরূপে থাকিয়াও কেবল অবিদ্যাপাদে ব্রহ্মাণ্ড-তরঙ্গ উত্তোলন করেন—তখন ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলেন:—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ ওঁ শান্তিঃ॥ ওঁ শান্তিঃ॥ ওঁ শান্তিঃ॥

ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া অপর শ্রুতি বলেন:—

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সারং বচ্মি যথার্থতঃ।
স্বয়ং মৃত্বা স্বয়ং ভূত্বা স্বয়মেবাঽবশিষ্যতে॥

সর্ব্ব বেদান্ত সার এই—স্বয়ং যান, স্বয়ং আসেন, স্বয়ংই অবশিষ্ট থাকেন।

কি এই পরমাত্মা ? উত্তর দিতে গিয়া বলা হইল তাঁহার স্বস্বরূপটি অবিজ্ঞাত। কিন্তু তিনি আপনি আপনাকে প্রকাশ করেন। তিনিই নিগুর্ণ নিরাকার হইতে সগুণ সাকারে আইসেন। ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত বলেন :—

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যশ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা ছিল, যাহা হইবে, যাহা এখনও আছে—ভাবনা কর এই পুরুষই তিনি। উত অপিচ—আরও তিনি "অমৃতস্য মোক্ষস্য ঈশানঃ প্রভুঃ" তিনি জীবের মোক্ষদাতা। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ অন্নেন প্রাণিনামন্নেন ভোগ্যেন নিমিত্তেনাতিরোহতি স্বকীয়াং কারণাবস্থামতিক্রম্য পরিদৃশ্যমানাং জগদবস্থাং প্রাপ্নোতি। তস্মাৎ প্রাণিনাং কর্ম্মফলভোগায় জগদবস্থা স্বীকারান্নেদং তস্য বস্তুত্বমিত্যর্থঃ। পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য ও হলায়ুধ হইতে ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল। কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের মোক্ষ হইতে পারে না। মহাপ্রলয়ে জীব প্রকৃতিতে সুপ্ত থাকিলেও—আবার প্রকৃতি-পুরুষে মিলিত হইলেও—আবার প্রকৃতির উত্থানে জীবের সৃষ্টি হইবেই। পুরুষ যদি প্রকৃতিকে আর জাগিতে না দেন, তবেই ত জীবের আর জনমমরণরূপ সংসার হয় না। না তাহা হইতে পারে না। মহানিয়তির ক্রম ভঙ্গ তিনি করেন না। করিলেই বা তাঁহার কে কি করিতে পারেন ? কিন্তু তিনি করেন না। জীবকে মুক্তিসুখ প্রদানজন্য তিনি তাহাদের কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া দিয়া থাকেন। 'জীবন্মুক্তি সুখ প্রাপ্তি হেতবে জন্মধারিতম্' সেইজন্য আপন কারণাবস্থা অতিক্রম করিয়া তিনি পরিদৃশ্যমান্ জগদবস্থা গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার গীতায় ঈশ্বরবাদ পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত পুরুষসূক্ত লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "জীবের হিতার্থে ভগবানের বিশাল আত্মত্যাগ" এই মহাযজ্ঞ। শ্রীখৃষ্টের আত্মত্যাগের ব্যাখ্যা এই অতি সূক্তের সাকারগ্রহণের অবলম্বনে কি না, তাহা ঐ ধর্ম্মাবলম্বীগণই বলিতে পারেন।

এই যে নিগুর্ণ ব্রহ্মের মায়া অবলম্বনে সগুণত্ব প্রাপ্তি, ইহা উপাসনার জন্য। পূজ্যপাদ সায়ন বলিতেছেন "যদ্যপি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাম্নাতস্য পরব্রহ্মণ ইয়ত্তায়া অভাবাৎ পাদচতুষ্টয়ং নিরূপয়িতুমশক্যং তথাহপি জগদিদং ব্রহ্মস্বরূপাপেক্ষয়াহল্পমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ পাদত্বোপন্যাসঃ॥ বাস্তবিক যিনি সত্যংজ্ঞানমনন্তং বলিয়া বেদে কথিত, তাঁহার পরিমাণ কে করিবে ? পাদচতুষ্টয় তিনি ইহাত বলা

যায় না। তথাপি এই জগৎ, ব্রহ্মের তুলনায় অতি অল্প মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্ম নিরবয়ব, হইলেও, তাঁহার মায়ার পরিচ্ছেদ আছে। এই মায়ার অবয়বত্ব তাঁহাতে আরোপ মাত্র। উপাসনার জন্য যিনি অংশশূন্য তাঁহাতে অংশের আরোপ হয় মাত্র।

শ্রুতি আপনি ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই বলিতেছেন।

শ্রুতি বলেন :— কথং ব্রহ্ম ?

কাল ত্রয়াঽবাধিতম্ ব্রহ্ম।

সর্ব্ব কালাঽ বাধিতম্ ব্রহ্ম।

মায়াতীত গুণাতীতং ব্রহ্ম।

অনন্তমপ্রমেয়াঽখণ্ড পরিপূর্ণং ব্রহ্ম।

অদ্বিতীয় পরমানন্দশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বরূপব্যাপকাভিন্নাঽপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম।

সচ্চিদানন্দ স প্রকাশং ব্রহ্ম।

মনোবাচামগোচরং ব্রহ্ম।

অখিল প্রমাণাঽগোচরং ব্রহ্ম।

অমিতবেদান্তবেদ্যং ব্রহ্ম।

দেশতঃ কালতো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিতং ব্রহ্ম।

সর্ব্ব পরিপূর্ণং ব্রহ্ম।

তুরীয়নিরাকারমেকং ব্রহ্ম।

অদ্বৈতমনির্ব্বাচ্যং ব্রহ্ম।

প্রণবাত্মকং ব্রহ্ম।

প্রণবাত্মকত্বেনোক্তং ব্রহ্ম।

প্রণবাদ্যখিল মন্ত্রাত্মকং ব্রহ্ম।

পাদচতুষ্টয়াত্মকং ব্রহ্ম।

কিং তৎ পাদ চতুষ্টয়ং ভবতি ?

অবিদ্যা পাদঃ প্রথমঃ পাদো বিদ্যাপাদো দ্বিতীয়ঃ আনন্দপাদস্তৃতীয়স্তুরীয়পাদস্তুরীয় ইতি। তত্রাধস্তনমেকংপাদমবিদ্যাশবলং ভবতি। উপরিতন পাদত্রয়ং শুদ্ধবোধাঽনন্দলক্ষণমমৃতং ভবতি। তুরীয়স্তু নিরাকারম্। সাকারঃ সাবয়বো নিরবয়বঃ নিরাকারম্। তস্মাৎ সাকারমনিত্যং নিত্যং নিরাকারমিতি শ্রুতেঃ। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে শ্রুতির মীমাংসা সুন্দর। শ্রুতি বলেন সাকার দ্বিবিধ।

আমরা চিত্র দিতেছি।

ত্রিবিধ সাকার আবার দুই প্রকার
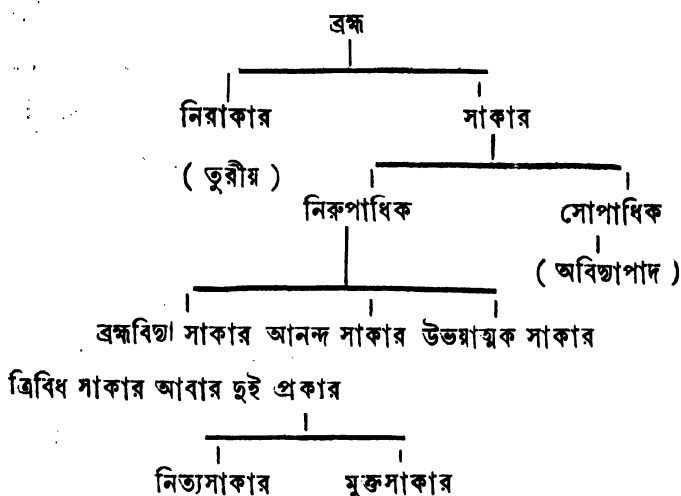
নিত্যসাকার মুক্তসাকার

নিত্য সাকারস্ত্বাদ্যন্তশূন্যঃ শাশ্বতঃ। উপাসনায়া যে মুক্তিং গতাস্তেষাং সাকারো মুক্ত সাকারঃ। যিনি নিত্য সাকার তিনি আদ্যন্তশূন্য, শাশ্বত; আর মুক্ত সাকার তাঁহারা যাঁহারা উপাসনা দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন।

উপস্থিত সময়ে সাকার নিরাকার লইয়া বহু বিবাদ চলিতেছে—এই শ্রুতি-প্রমাণে বিবাদের নিষ্পত্তি আছে। তবে এই শ্রুতিবাক্য বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া আবশ্যক, যদি কেহ বিশেষরূপে আলোচনা করেন তবে ভালই হইবে। শ্রুতি আরও বলেন, নিরবয়বং ব্রহ্মচৈতন্যমিতি সর্ব্বোপনিষৎসু সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তেষু শ্রূয়তে। অথচ বিদ্যানন্দতুরীয়াণামভেদএব শ্রূয়তে। অভেদ যদি তবে বিদ্যাদি সাকার কেন? শ্রুতি বলেন বিদ্যাপ্রাধান্যেন বিদ্যাসাকারঃ, আনন্দপ্রাধান্যেনানন্দ সাকারঃ—উভয় প্রাধান্যেনোভয়াত্মক সাকারশ্চেতি। প্রাধান্যমাত্রেই ভেদ বস্তুতঃ ইহা অভেদই। যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা ত্রিপাদবিভূতি মহানারায়ণউপনিষদ্ দেখিতে পারেন।

অমোদের বলিবার কথা এই যিনি নির্গুণ তিনি সগুণ বিশ্বরূপ হয়েন, আবার সগুণ বিশ্বরূপের উপাসনার জন্য শ্রীমূর্ত্তির অবতার। এই কথা পরে দেখা যাইবে।

কার কাছে প্রার্থনা করিব ইহার উত্তর পাইলাম। সমকালে যিনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ, যিনি সাকার বিশ্বরূপ, যিনি মায়ামানুষ বা মানুষী অবতার তাঁহার

নিকট। যিনি যাঁহাকে ডাকিতে অধিকারী তিনি তাঁহাকেই ডাকিবেন। কারণ তিনিই অভেদ।

দ্বিতীয় কথা কি প্রার্থনা করিব? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় প্রার্থনাটা কর্ম্মনিষ্পত্তি জন্য। যতদিন কর্ম্ম আছে ততদিন প্রার্থনা। সিদ্ধাবস্থায় প্রার্থনা নাই, সাধক অবস্থাতেই প্রার্থনা। যাহারা মুমুক্ষু তাঁহারা গুরুমুখে তত্ত্বমসির বিচার শুনিয়াই মুক্তিলাভ করেন। যিনি ইহার অধিকারী নহেন তিনি নিগুর্ণ উপাসনা করিবেন। যাঁহারা নিগুর্ণ উপাসনা করেন, তাঁহারা সিদ্ধবস্থায় কর্ম্মশূন্য। ইঁহারা সন্ন্যাসী। সাধক অবস্থায় ইঁহারা নিত্যানিত্য বস্তু বিচার, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি, এবং মুমুক্ষুত্ব অভ্যাস করিবেন। পরে গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি বিচার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিয়া সোঽহং জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিবেন।

নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসকগণ স্বস্বরূপে নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্থিতিলাভ ভিন্ন অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষার বস্তু আছে ইঁহারা সমস্তকেই অনাস্থা করেন, ভোগ যাহা তাহা দূরে বর্জ্জন করেন। দেহধারণও ভোগ, জগতের কোন কিছু দেখা বা শোনা তাহাও ভোগ, আহার নিদ্রাও ভোগ—এই সমস্ত ত্যাগ করেন। মনের কোন সংস্কার লইয়া থাকেন না। দেহভোগ ত্যাগ করিয়া, সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া, মহাশূন্যস্বরূপে, সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থান মাত্রই ইঁহারা প্রার্থনা করেন। আমি আপনিই আপনি অন্য কিছুই নাই—ইহাই ইঁহাদের স্থিতি। নির্ব্বিকল্প সমাধি ভিন্ন এ-স্থিতি হয় না। অব্যক্ত অক্ষরের উপাসকগণ, ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন। গীতা বলেন "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব"। ইঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয়না। ইঁহারাও সদ্যোমুক্তি লাভ করেন। অন্য উপাসকদিগের প্রাণের উৎক্রমণ হয়। তাঁহাদের মুক্তি ক্রমমুক্তি।

নিগুর্ণ উপাসকদিগের এই যে উদ্দেশ্য, ইহার কি কোন ভিত্তি আছে? এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড—এই দৃশ্যদর্শন ইহা কি অন্তরে বাহিরে বিস্মৃত হওয়া যায়? মানবের এমন অবস্থা কি হয় যখন দৃশ্যদর্শন মার্জ্জন হয়? যদি ইহা হওয়া অসম্ভব হয়, তবে এ চেষ্টা বিফল।

এই অবস্থা সকল মনুষ্যেরই হয়। যাঁহারা সাধক তাহারা এই স্বাভাবিক

অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কোন্ কৌশলে ইহা আয়ত্তাধীন করা যায় তাহা জানিয়া, এই অবস্থা লাভ করেন।

সকল মনুষ্যের এই নিঃসঙ্গ অবস্থা হয়—ইহার প্রমাণ কি ?

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সদাচার গ্রন্থের ৯ম্ শ্লোকে বলিতেছেন :—

লয় বিক্ষেপয়োঃ সন্ধৌ মনস্তত্র নিরামিষম্।
স সন্ধিঃ সাধিতো যেন স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥

নিদ্রা ও জাগরণ এই উভয়ের সন্ধিকালে মন বিষয়আমিষ শূন্য হয়—মন নিঃসঙ্গ হইয়া পবিত্র হয়। সেই সন্ধ্যার সাধন যিনি করেন তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত হয়েন।

যখন মানুষ জাগ্রত থাকে তখন বহির্জ্জগৎ দেখে অথবা বহির্জ্জগতের সংস্কার লইয়া চিন্তা করে। আবার নিদ্রাকালে যখন স্বপ্ন দেখে, তখন মনোজগতের সংস্কার লইয়া বিব্রত থাকে। জাগ্রত অবস্থা ছুটিয়া যাইতেছে অথচ স্বপ্ন এখনও আইসে নাই—এই জাগরণ ও নিদ্রার মধ্যবর্ত্তী কালে যখন দৃশ্যদর্শন নাই এবং স্বপ্নরাজ্যেও যাওয়া হয় নাই—এই সন্ধিকালের সাধন যিনি করেন, তিনি নির্গুণ-ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন। প্রতিজীবেরই এককক্ষণকাল মধ্যেই দৃশ্যদর্শন মুছিয়া যায়—বেশ কথা কহিতেছে এক মুহূর্ত্ত মধ্যে তন্দ্রা আসিল—দৃশ্য জগৎ ভুল হইয়া গেল, দেহ ভুল হইয়া গেল, সঙ্কল্প বিকল্প ছুটিয়া গেল, ভোগ দূর হইয়া গেল—এই এই মুহূর্ত্তকালকে যিনি সাধনা দ্বারা স্থায়ী করিতে পারিলেন, তিনি মুক্ত হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলেন। শুধু মনুষ্যের কেন, জীবমাত্রেরই এই মুহূর্ত্ত কতবার আসিতেছে, যাইতেছে স্বভাবতঃ ইহা হয়। এইটিকে ধরিয়া চিত্তকে স্বপ্নরাজ্যে এবং জাগ্রতরাজ্যে যদি যাইতে না দেওয়া যায়, তবেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্থিতিলাভ করা যায়। সাধারণ মানুষ এই অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু ইহা লক্ষ্য ত করেনা—লক্ষ্য করিলেও কিরূপে এই অবস্থায় স্থিতিলাভ করা যায় তাহার সাধনাও করেনা। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা ঐ অবস্থা স্থায়ী করিবার জন্য সাধনা করেন। এই মার্গটিকেও প্রকৃত জ্ঞানমার্গ বলে।

এই মার্গের সাধনা শাস্ত্র বহুপ্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্কর যে সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই।—

প্রভাতে উঠিয়াই সর্ব্বভাব-প্রসবিতা আত্মদেবতার বরণীয় ভর্গকে স্মরণ কর। এই ভর্গ আমাদের চিত্তকে জ্ঞানানন্দে প্রেরণ করেণ। সূর্য্যদেব উদিত হইলে লোকে যেমন আপন আপন কর্ম্মের প্রতি প্রেরিত হয়, সেইরূপ

আত্মদেবের স্মরণে মন, বিষয়ের দিকে না ছুটিয়া তাঁহারই দিকে প্রেরিত হয়। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে টানিয়া লয়, সেইরূপ প্রভাতে অন্য অন্য বাসনা জাগিবার পূর্ব্বেই যখন আত্মদেবের স্মরণ করা যায়, তখন মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়।

স্মরণটা এইরূপ ;—এইত এতক্ষণ জড়ের মত ছিলাম। নিদ্রার সময় বাহিরের কোন জ্ঞানই ছিল না। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় মৃতপ্রায় ছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে এইমাত্র নিদ্রা ভাঙ্গিল। এই ত চক্ষু মিলিবা মাত্র গৃহের সমস্ত বস্তু দেখিতেছি, আবার মনের ভিতর কত বাসনা জাগিতেছে! কিন্তু কে আমাকে জাগাইল ? কার সুখস্পর্শে আবার আমার চেতনা হইল ? যিনি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে, মনকে, দেহকে চেতন করাইলেন—তিনিই আমার আত্মদেব। প্রাতঃস্মরামি হৃদিসংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং। সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্। যৎস্বপ্নজাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যম্। তদ্‌ব্রহ্মনিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ॥ ইত্যাদি।

নির্গুণ উপাসনার অঙ্গ ১৫টি। যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্‌স্থিতি, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান ও সমাধি। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে ভগবান্ শঙ্কর এই সাধনার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত বলা হইল সর্ব্বোচ্চ সাধনা নির্গুণ উপাসনা। আপনি আপনি ভাবে স্থিতিই ইহার লক্ষ্য। গীতা ইহাকেই ধ্যানযোগ বলেন। ইহার পরেই সাংখ্যজ্ঞান। প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন ইহার বিচারই জ্ঞানযোগ, এই উভয় সাধনাতে সদ্যোমুক্তি লাভ হয়। এই সাধনা যাঁহারা পারেন না, তাঁহাদের জন্য সগুণ উপাসনা। সগুণ উপাসকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আমরা একটা তালিকা দিতেছি।
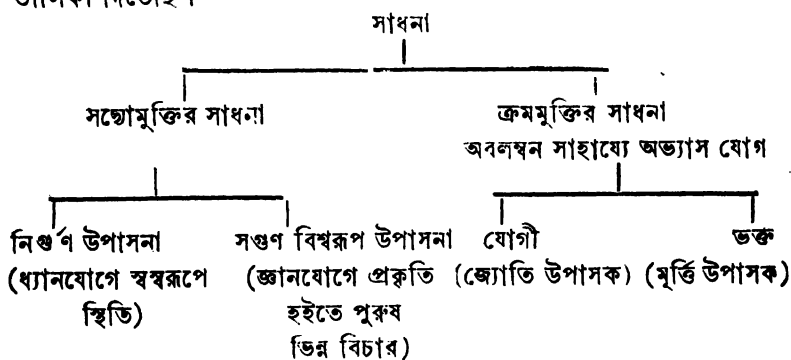
যোগী ও ভক্ত হইবার জন্য কর্ম্মযোগের বহিরঙ্গ সাধনা ও অন্তরঙ্গ সাধনা করিতে হয়। ইহারও জন্য সাধনার সর্ব্ব-নিম্নভূমিকা যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস হইতে আরম্ভ করিতে হয়। বিশ্বাস সর্ব্ব নিম্ন অবস্থা। এই অবস্থায় কোন নির্দ্ধারিত কর্ম্ম অভ্যাস করা নাই। কিন্তু যাহা কিছু কর, তাহাই ঈশ্বর প্রীতি জন্য কর—ইহাই ইহার শিক্ষা। বিশ্বাসের উপরে কর্ম্মযোগ। এই দ্বিতীয় স্তরে বিশ্বাসের সাধনাও আছে, তাহার উপরে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মও আছে। তৃতীয় স্তরে কোন অবলম্বন-আশ্রয়ে অভ্যাস-যোগ। ইহাতে বিশ্বাস আছে, কর্ম্ম আছে; তাহার উপরে আরও কিছু আছে। সেই আরও কিছুটুকু অবলম্বনে বিশ্বরূপ আরোপ। এই পর্য্যন্ত ক্রমমুক্তির সাধনা বলা হইল।

ইহার উপরে যে দুই সাধনা—তাহার উদ্দেশ্য সদ্যোমুক্তি। এই দুইটি সাধনার একটির নাম জ্ঞানযোগ। এই জ্ঞানযোগ সাধন করিতে হইলে নিত্য কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তির ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া একান্তে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করিতে হয় আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন কিরূপে? চেতন জড় হইতে বিভিন্ন কিরূপে? আমি মন হইতে বিভিন্ন কিরূপে? এই বিচারের ফলে সমাধি আসিবে। সমাধিতে এই বোধ হইবে যে, যে চৈতন্য আমার মধ্যে থাকিয়া খণ্ডরূপে অনুভূত হইতেছেন—তিনিই সমাধিকালে অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, মহান্। এই অবস্থা যখন অনুভূত হয়, তখন ধ্যানযোগে আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ আয়ত্ত হইয়া যায়। ইহাই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি।

উপসংহারে আমরা বলি জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বিনা ভক্তিতে জ্ঞানলাভ কিছুতেই হইতে পারে না। আবার বিশ্বাসী ও কর্ম্মী না হইলে ভক্তিলাভের উপায় নাই। এক কথায় এই বলা যায় যে, সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অবলম্বনে বিশ্বাস, কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান কাহার নাম তাহা বুঝিতে পারা যায়। অতি হীন অবস্থার লোকও সৎসঙ্গে ও সৎশাস্ত্র সাহায্যে শ্রীভগবানে রুচিলাভ করে। রুচি লাগিলেই সংসারের স্বরূপ দেখা হয়। তখন বৈরাগ্য দ্বারা মনকে কাতর করিয়া সাধনা করিতে হয়। ফল কথা সমস্ত সাধনার ভিত্তিই বিশ্বাস। বিশ্বাসী হইয়া নিত্য কর্ম্ম কর। করিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন কর। ভক্তি-পথই নিরুপদ্রব।

এই ভক্তিপথের প্রধান সাধনা হইতেছে হে ভগবান্ আমার সামর্থ্য কিছুই নাই—তুমি এস—এই বলিয়া নিত্যকর্ম্ম অবসানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা। তুমি এস, তুমি ভিন্ন আমার গতি নাই—তুমি ভিন্ন

আমার শক্তি নাই। আমি প্রত্যহ তিন বেলায় তোমার আজ্ঞাপালন জন্য নিত্য কর্ম্ম সারিয়া বসিয়া থাকি তুমি আসিবে বলিয়া। কবে আসিবে প্রভু! তুমি সর্ব্ব জীবের অন্তরে অন্তর্যামী; আবার তুমি ওষধিতে, বনস্পতিতে, অগ্নিতে, বায়ুতে, পুরুষে, স্ত্রীতে। তুমিই আদিত্য, তুমিই অগ্নি, তুমিই বায়ু, তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী—শাস্ত্রে ইহা শুনি, কবে আসিবে প্রভু! একবার দেখা দাও। আমার বিশ্বাস প্রবল হইয়া যাউক। এক ক্ষণকালের জন্য—হে অন্তর্যামী আমার হৃদয়ে উদয় হও—আমার চক্ষের গোচর হও। তবেই আমার সকল সন্দেহ দূর হইবে। লোকে বলে তোমার আকার নাই। তোমার মূর্ত্তি নাই—আমি পুরাণে শুনি তুমি বহুজনের হৃদয়ে উদয় হইয়াছ, তুমি সুন্দর মূর্ত্তিতে ধ্রুব প্রহ্লাদের চক্ষের বিষয় হইয়াছে। তুমি একবার এস—একবার দেখা দাও। এইত আমি কতদিন—কতদিন তোমাকে দেখিব বলিয়া নিত্য নিত্য তোমার পূজা করিতে বসি—চিরদিনই বসিব—তুমি একবার এস, একবার দেখা দাও। একবার দেখা পাইলে আমার ভক্তি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া যাইবে, তখন আমি ভাবনায় তোমায় আনিয়া নিত্য তোমার সহিত কথা কহিব—নিত্য তোমার পূজা মানসে করিব। যাহা কিছু বলিবার, যাহা কিছু জানিবার তাহা তোমার কাছেই জানাইব। তুমি এস। গো যেমন গ্রামে আইসে, যোদ্ধা যেমন অশ্বের নিকটে আইসে, পতি যেমন জায়ার নিকটে আইসে সেইরূপে তুমি এস। বেদ যে এই কথা বলিতেছেন। তুমি এস। আমি নিত্য তোমার জন্য বসিয়া থাকিব; তুমি একদিনের জন্য, এককক্ষণের জন্যও এস। তুমি আসিলে তবে আমার কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে, তুমি আসিলে আমার বিচার নিষ্পন্ন হইবে; তুমি আসিলে আমার ধ্যানযোগ সিদ্ধ হইবে। এই ভাবে উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে ভগবান্‌কে ডাকাই ভক্তিযোগের সাধনা। ক্রমে জ্ঞান ও ধ্যান লাভে সমস্তই হইবে। অধিক কি।

নিত্য পূজায় প্রার্থনা।

আজি

এ মোর নীরব নিভৃত হিয়া-মন্দিরে
আরতি প্রদীপ জ্বালি,
ফলে-ফুলে-তৃণ-পল্লব-দলে সাজায়ে,
এনেছি পূজার থালি।

বিশ্ব-বীণায় হ'তেছে ঝঙ্কার, বিচিত্র
তোমারি প্রেমের তান,
কণ্ঠে আমার ভরিয়া উঠুক, তোমারি
পূজার মহিমা গান।

কত দৃশ্যে, গন্ধে, গানে শোভাময়ী ধরা,
আলোকে পুলকে ভরা,
কত লাবণ্য-জলধি উছলি উঠিছে,
নয়নে যায় না ধরা।

শুধু কল্পনা-স্বপনে বাঁচেনা'ক প্রাণ,
চরণে লুটাতে চাহি।
অমৃত সরস বরষে প্রেমের রব
তব প্রেমে অবগাহি।

তুমি শুভ্র সুন্দর মনোমোহন বেশে
দাঁড়াও সমুখে আসি!
মোর সারাটী জীবন, ভরি অনুরাগে,
হিয়া-মাঝে পরকাশি।

এই শিশির-সিক্ত পরাণ-পুষ্প দিব
তোমারি চরণে দান;
তুমি পথ-ধূলি হ'তে ছোটো করে রেখো
জাগা'য়োনা অভিমান।

আমি জানিগো জানি যে, অনাথ আতুরে
র'বেনা তুমি ভুলিয়ে ;
তৃষিতে তৃষাহারী, মুছায়ে আঁখি তার
নেবেগো কোলে তুলিয়ে ॥

গৃঃ......

ভগবদ্দর্শন।

প্রথম প্রকার।

আগে বিশ্বাসে দেখ, পরে দেখিবে প্রত্যক্ষে। প্রথম যৌবনে জগৎ সুন্দর, সবই দেখিবার আছে ; বৃদ্ধের দৃষ্টিতে জগৎ পুরাতন; দেখিবার কিছুই নাই। কেন এমন হয়? কারণ আছে। বালক যখন মাতৃগর্ভ হইতে আইসে, তখনও সে কি জানি কোন্ আনন্দ-সমুদ্র হইতে যেন আসে। যত তীরে উঠিতে থাকে, ততই সমুদ্র ভুলিয়া যাইতে থাকে ; যত আরও অধিক দূরে যায়, ততই সে আর সমুদ্রের গর্জ্জন পর্য্যন্ত শুনিতে পায় না। ক্রমে সমুদ্রের ও নিজের মধ্যে একটা পরদা পড়িয়া যায়। আর আনন্দ-সমুদ্রের নামও করে না। কেহ নাম করিলেও রুচিকর হয় না।

ফুল কত সুন্দর ; ফুলে ফুলে প্রজাপতি আরও কত সুন্দর! যুবাকালে ফুল দেখিয়া কাঁদিতে দেখা যায় ; ফুলে প্রজাপতি দেখিয়া উন্মত্ত হইতে শুনা যায়। সেই ফুল চিরদিন থাকে, সেই প্রজাপতি চিরদিন ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায়—কিন্তু সে আনন্দ থাকে না কেন? সে উন্মত্ততা ছুটিয়া যায় কেন?

সুন্দরের নিকট হইতে আসিয়া যাহা দেখা যায়, তাহাই সুন্দর লাগে। কিন্তু কেন সুন্দর লাগে তখন বুঝা যায় না। কত কবি, কত প্রেমিক, প্রথম অবস্থায় ভালবাসেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—কেন ভালবাসি তাহা জানি না। এই না জানিয়া ভালবাসার মূলেই, ভালবাসা ছুটিয়া যাইবার কিছু থাকে। আগে না জানিয়া ভালবাসা হইয়া গেল ; কিন্তু শেষে যদি জানা হইয়া যায়, তবে ভালবাসা আর ছুটে না। ভালবাসা অনুদিন বাড়ল' অবধি না গেল হইয়া যায়।

তাই কি হয়? তাই হয়।

আগে না দেখিলে হইত না, না কথা কহিলে হইত না, শেষে নিজের ভিতরের ভাব দেখিয়া দেখা হয়; নিজের মনোভাব দেখিয়া, কথা কওয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাও ভালবাসাকে জানা। ক্রমে এই জানা আরও বাড়িয়া যায়। জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। সকলে সে, বুঝা যায়; আবার তাতেই সকল, জানা যায়। এই যখন হয়, যখন সকলকে দেখিয়াও তাকে দেখি মনে হয়, আবার তাকে দেখিয়া তাতেই সকলকে দেখি মনে হয়—তখন আর সে আমার অদৃশ্য হয় না, তখন আমিও তার অদৃশ্য হই না; তখন দেখাদেখি, মাখামাখি সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণের জন্য হয়। ইহাই প্রকৃত দর্শন।

প্রথম বয়সে ফুল ভাল লাগিয়াছিল, শেষ বয়সে সবার লাগে না। কেন লাগে না? যখন ভাল লাগিয়াছিল, তখন কেন লাগিয়াছিল জানিতে ইচ্ছা ছিল না। যদি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু জানিবার চেষ্টা হয় নাই। যদিও কাহারও চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার সে চেষ্টার ফলে জ্ঞানের স্ফুরণ হয় নাই। যদি জানা হইত, তবে প্রেম ছুটিত না।

ফুলকে প্রথম বয়সে কেন ভাল লাগে? বলিতেছিলাম সুন্দরের নিকট হইতে আসা যায় বলিয়া, সেই ভাবে সকলকে দেখা হইয়া যায়। ক্রমে বয়সের আধিক্যে সংসার আপনার রূপ দেখাইয়া, সেই সুন্দরের উপরে একটি আবরণ টানিয়া দেয়। সংসার আর সে সুন্দরকে দেখিতে দেয় না, ভাবিবার অবসরও দেয় না। সংসার, হিংসুক স্ত্রীলোকের মত কৌশল করিয়া সব ছুটাইয়া, নিজের করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সংসারের সে সৌন্দর্য্য ত নাই? তাই সে সুন্দরও যায়, সংসারও ভাল লাগে না। একটা থাকিতে হয়, তাই সংসারে থাকা হইয়া যায়। যাহোক করিয়া দিন কাটানই সার হয়। সংসারের নেশা একটা থাকে বলিয়া, কখন কখন বিরক্ত হইয়া সংসার গুছাইবার জন্য একটা উদ্যম হয়; সেটা ক্ষণিক। ক্ষণকাল পরে সে উদ্যমও থাকে না, আবার য্যায়সাকে ত্যায়সা হইয়া যায়। পনেরো আনা পনেরো গণ্ডা তিনকড়া মানুষ মানুষী, এই ভাবে সংসারে থাকে।

কিন্তু ফুল কেন সুন্দর লাগে, মানুষ কেন সুন্দর লাগে, যুবক যুবতীর কাছে "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র" কেন হয়? কেন হয়, ইহার জ্ঞান যাহার চক্ষে

ভাসে, তার কাছে সবই মধুর হয়; চিরদিন মধুর থাকে। কখন ভালবাসা ছোটে না। শেষে সর্ব্ববস্তু সর্ব্বত্র মধুময় হইয়া যাইতে দেখে।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বী নঃ সন্তোষধিঃ।
ওঁ মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
ওঁ মধুমান্ নো বনস্পতির্ম্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তুনঃ ॥

বহু স্থানে এই বেদমন্ত্র পঠিত হয়। কি সুন্দর ভাব!

বায়ুসকল মধু ক্ষরণ করুক; নদী সমুদ্র মধু ক্ষরণ করুক। ওষধি সকল আমাদের পক্ষে মধুময় হউক।

রাত্রি ও দিনসকল মধুময় হউক। পার্থিব রজঃ মধুযুক্ত হউক। আমাদের পিতা-স্বর্গ মধুময় হউক।

বনস্পতি আমাদের নিকট মধুময় হউক, সূর্য্য মধুময় হউন। ধেনু সকল মধুময় হউক।

যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহা হইতে নিরন্তর আনন্দকণার স্ফুরণ হইতেছে; অম্বরে, অবনীতলে সেই আনন্দকণা ছড়াইয়া পড়িতেছে; যিনি জানিয়াছেন সেই আনন্দই সকলের জীবন, তিনি কেননা বলিতে পারিবেন—সব মধুময় হউক?

স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাৎ আনন্দস্যাম্বরে বনৌ
সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ।

যিনি ব্রহ্মানন্দ জানিয়াছেন, তিনি যেখানে জীবনের ভাব দেখিবেন—সেই-খানেই সেই আনন্দ-উৎসকে দেখিয়া কেননা প্রণাম করিবেন?

ফুল যে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে, ইহাতে একজন আর একজনকে সাজ-সজ্জা দেখাইতেই ফুটে। যেখানে সাজা আছে, সেইখানে পরের জন্যই সাজা। প্রকৃতি ও পুরুষের খেলাই এই জগৎ। সর্ব্বত্র প্রকৃতিই পুরুষের জন্য সাজে।

প্রকৃতি ফলে ফুলে সাজিয়া সেই চরণেই লুটাইয়া পড়িতে চায়। জগতের সর্ব্বত্র যে এই খেলা দেখিতে পায়, তার কাছে কি আর কিছু কখন পুরাতন হয়? তুমিও দেখ না—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি,
"তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।
"সকলেতে আছি আমি আমাতে সকল
"হেন ভাবে দেখে যেই পৃথিবীমণ্ডল ;
"তাহার সাক্ষাতে সদা থাকি বিরাজিত,
"সার এই কথা আমি করিনু বিদিত।

এইত ভগবৎদর্শন। এই ভাবে ফুল দেখ, আকাশ দেখ, চাঁদ দেখ, স্বামী দেখ, পুত্র দেখ—দেখিবে চিরদিন সবই সুন্দর থাকিবে। যদি দেখ—

হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ
হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনুঃ।
ইতি যস্যমতিঃ পরমার্থ গতিঃ
স নরো ভবসাগরমুদ্ধরতি ॥

হরিই জগৎ, জগতই হরি। হরিতে জগতেতে ভিন্ন দেহ নয়। এই যার মতি, তার গতি পরমার্থ। সেই মানুষ সংসারসাগরের পারে যায়।

তাই বলিতেছিলাম আগে বিশ্বাস, শেষে প্রত্যক্ষ। তাই আবার বলি—এইটি বুঝিয়া, নিত্য এইরূপে দেখা অভ্যাস কর—সর্ব্বত্র ঈশ্বর অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহাকে পাইবেই ; কিন্তু প্রতিদিন তিন বেলায় নিত্য-কর্ম্মরূপ তাঁর আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ না করিলে, সংসাররূপা অপরা তোমার পরাকে চাপিয়া রাখিবে।

নিত্যকর্ম্ম নিরালস্যভাবে কর, তাঁর আজ্ঞা বলিয়া। আর লৌকিককর্ম্ম দ্বারাও তাঁহার পূজা কর। সকল কর্ম্মের আদিতে বলিতে অভ্যাস কর—তুমি প্রসন্ন হও ; অন্তে কর্ম্ম সারিয়া বল—প্রসন্ন কি হইলে ? তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া কর্ম্ম করার অভ্যাস কর ; নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতেই পারিবে না। সর্ব্বদা কথা কহিতে অভ্যাস হইয়া যাইবে, আর সর্ব্বত্র তাঁরে দেখিয়া ও তাঁতে সব দেখিয়া মধুময় হইয়া যাইবে।

ভগবদ্দর্শন—দ্বিতীয় প্রকার।

ভক্তিমার্গে ভগবদ্দর্শনের কথা বলা হইল। দ্বিতীয় প্রকার ভগবদ্দর্শনের কথা বলা হইবে। ইহা জ্ঞানমার্গে।

ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান নাই। ভক্তিমার্গে ভিতরে বাহিরে সুখময়ের দর্শন হইলে তবে জ্ঞানে অধিকার।

ভিতরে বাহিরে শ্রীভগবান্‌কে যে দেখে, তাহার কি আর কিছু বাকী থাকে যে সে আবার জ্ঞানের জন্য ব্যাকুল হইবে?

কিছু বাকী থাকে বৈ কি। চিরদিন দেখি, নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে দেখি—এই ইচ্ছা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছা হয় কি না হয়, এতৎসম্বন্ধে সন্দেহ উঠিতেই পারে না। যাহা স্বাভাবিক তাহার বিরুদ্ধে কথা কওয়া প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করা।

অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীভগবান্‌কে ভোগ করা যায় কি না? এই প্রশ্ন।

অবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ—ইহা করিতে হইলে ভোগের বস্তুটির চিরদিন থাকা আবশ্যক এবং যে ভোগ করিবে তাহারও চিরদিন থাকা দরকার এবং যাহার সহিত মাখাইয়া শ্রীভগবান্‌কে ভোগ করিব তাহারও চিরদিন থাকা আবশ্যক।

যে ভোগ করিবে সে জীব বা জীবচৈতন্য। যাঁহাকে ভোগ করা হইবে তিনি ঈশ্বর বা ঈশ্বরচৈতন্য এবং যাহা ভিন্ন ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না—যাহার সহিত মাখাইয়া ঈশ্বরকে ভোগের জন্য পাওয়া যায়, তাহা এই জগৎ—সূক্ষ্ম অন্তর্জগৎ বা স্থূল বহির্জ্জগৎ। বল সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ দেহবিশিষ্ট ভগবান্। স্থূল ও সূক্ষ্ম সৃষ্টি যদি না থাকে, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রকাশ হইবেন কোথায়? সৃষ্টি ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা কাহার কাছে প্রকাশ হইবেন? দেহশূন্য, উপাধিশূন্য চৈতন্য কোথায়, কবে, কাহার কাছে প্রকাশিত? দেহশূন্য চেতন কি—কেহ কি তাহা অনুভব করিয়াছেন, না অনুভব করিতে পারেন?

তবে পাওয়া গেল—অবিচ্ছেদে চিরদিন ভোগ করিবার জন্য ঈশ্বরকে নিত্য থাকা চাই, জীবকে নিত্য থাকা চাই এবং জগৎকেও নিত্য থাকা চাই।

ভক্তিমার্গে এই জন্য জীব নিত্য, ঈশ্বর নিত্য, এবং জগৎ নিত্য; অন্ততঃ সূক্ষ্মজগৎ নিত্য এই হওয়া আবশ্যক। নিত্য জগৎ আছে, নিত্য ঈশ্বর আছেন এবং নিত্য জীব আছেন—ভক্তের এই তিন বিশ্বাস অবশ্যম্ভাবী। বিশিষ্টা-দ্বৈতমতকে এবং শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়কে এই তিনের নিত্যত্ব বিশ্বাস করিতেই হইবে।

শ্রুতি বলেন, মহাপ্রলয়ে জগৎ থাকে না। স্থূল জগৎও থাকে না, সূক্ষ্ম জগৎও থাকে না। যদি স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ না থাকিল, তবে ঈশ্বর প্রকাশ

হইলেন কোথায়? তিনি থাকিলেন কোথায়? উপাধিশূন্য, দেহশূন্য ঈশ্বর কি?

শ্রুতি বলেন, জীব ও ঈশ্বর মায়াকর্ত্তৃক ব্রহ্মে রূপ-কল্পনা মাত্র। জীব ও ঈশ্বর-কল্পনা মানুষে করে না, করেন মায়া। এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমস্তই মায়ার কল্পনা। "বস্তুতো নহি।"

জগৎ নিত্য ইহা বলিতে গেলে শ্রুতি অনাদর করা হয়। আচ্ছা, খাতিরে ধরা যাউক—যেন জগৎ নিত্য হইল; অথবা বলা যাউক, ঈশ্বর ও জগৎলীলা চিরদিন আছেন বা আছে বা থাকে না। যাহোক একটা বলা হইল। আবার ভাল করিয়া বলা যাউক। জগৎ চিরদিন আছে বা থাকিবে বা নাই—যাহা হয় একটা হউক; কিন্তু যে জীব চিরদিন ঈশ্বরকে ভোগ করিবে, যে জীব চিরদিন ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য জগতে থাকিবে—সেই জীবকে ত চিরদিন থাকিতে হইবে। শুধু চিরদিন থাকিলেও হইবে না—অবিচ্ছেদে ভোগ করিবার জন্য জীবকে সদা জাগ্রৎ অবস্থায় ঈশ্বর লইয়া থাকিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক জীবের এই অবস্থা কতদূর স্বাভাবিক?

জীব, জাগ্রৎকালে স্থূল জগৎ লইয়া থাকে। স্বপ্নে স্থূল জগৎ লইয়া থাকিতে পারে না, সূক্ষ্ম সংস্কার লইয়া থাকিতে হয়। আবার জাগ্রৎকালে চৈতন্যের যে অবস্থা, স্বপ্নকালে ঠিক সে অবস্থা থাকে না। জাগ্রৎকালে যাহা দেখা যায়, যাহা শোনা যায়—তাহার মধ্যে কোনটা ত্যাগ, কোনটা গ্রহণ, এইরূপ ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য থাকে। কিন্তু স্বপ্নে যাহা দেখা-শোনা যায়, তাহাতে জীবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার শক্তি থাকে না। জীব যেন অবশ হইয়া কার্য্য করিতে থাকে।

জাগ্রৎ স্বপ্ন ত এইরূপ হইল; কিন্তু ইহার পরেও সুষুপ্তি অবস্থা আছে। এই অবস্থায় জগৎ কোথায়? আর যে ভোগ করিবে সেই বা কোথায়? সুষুপ্তিতে কোন কিছুর অনুভব কি থাকে? সুষুপ্তি অবস্থাতে সকলেই স্থিতি-লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু "আমি সুষুপ্ত" ইহা কেহ কি অনুভব করিতে পারেন? তাহা পারেন না।

জাগ্রতের অনুভব যাহা, স্বপ্নের অনুভব তদপেক্ষা যেন অন্যরূপ। স্বপ্নের অনুভবে শুধু "আছে" "অস্তি" এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু সুষুপ্তিতে ত কোন অনুভবই থাকে না। সুষুপ্তিতে যে অনুভব করিবে সেই আমি পর্য্যন্ত থাকে না। সুষুপ্তিতে দুই থাকে না—যেন সব এক হইয়া যায়। শুধু আপনি

আপনি ভাবে স্থিতি হয়। সুষুপ্তিকালে তাহা অনুভব হয় না, কিন্তু সুষুপ্তি-ভঙ্গে তাহা অনুমান করিয়া বলা যায় মাত্র। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে যাহা হয়, তাহার বিরুদ্ধে কোন কিছুই বলিবার ত উপায় নাই। বলিতে গেলে প্রত্যক্ষের বিরোধী কথা বলিতে হয়। কাজেই বলিতে হয়, সুষুপ্তিতে জীব যেন আর কাহারও সহিত মিশিয়া গিয়া, তাহাতে আপনার সত্ত্বা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে। বিন্দু, সিন্ধুর সহিত মিশিয়া সিন্ধুই হইয়া যায়। কাজেই জীবকে নিত্য বলা যাইবে কিরূপে? জগৎও ত নিত্য নহে। জীবও নিত্য নহে। সুষুপ্তিতে সৃষ্টিও নাই, কাজেই যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহারও প্রকাশ হইবার বস্তু নাই; আর যে জীব, সৃষ্টিতে সৃষ্টি-কর্ত্তার খেলা দেখিতেছিল—সেও নাই। স্থূলসৃষ্টি সূক্ষ্মে মিলিল, সূক্ষ্ম আবার কারণ-চৈতন্যে মিশিল, দৃশ্য-দর্শন-দ্রষ্টা সব মিশিয়া এক চৈতন্যসাগরে পড়িল। থাকিল একমাত্র উপাধিশূন্য চৈতন্য। কাজেই মহাপ্রলয় নাই—ইহা বলিবার উপায় নাই। এই জন্য জ্ঞানীর ভগবদ্দর্শন অন্যপ্রকার। এখানে দর্শন অর্থ সেইরূপে স্থিতি। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মকে জানাই ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া।

ব্রহ্মভাবে স্থিতিই দ্বিতীয় প্রকারের ভগবদ্দর্শন। এ দর্শনে দুই নাই—এ দর্শনে এক মাত্র থাকেন। স্থূল জগৎ জাগ্রতে অনুভূত হয়, স্বপ্নে স্থূলের সূক্ষ্ম সংস্কার অনুভূত হয়; কিন্তু সুষুপ্তিতে স্থূলেরও অনুভব নাই, সূক্ষ্মেরও অনুভব নাই—যে অনুভব করিবে সেও নাই; যে অনুভব করিবে সে আর একজনকে স্পর্শ করিতে গিয়া, স্পর্শ করিয়া তাই হইয়া এক মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইটি আপনি আপনি ভাব।

অনুভব হয় না বলিয়াই কি জগৎ থাকে না? যে অনুভব করে না, তাহার কাছে ত থাকেনা—তা ছাড়া যে অনুভব করিবে সেও থাকে না।

তবে কি হইল? বিষম গোলমাল যে বাধে? কিরূপ?

কোন কোন আধুনিক বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায়, ব্রহ্মজ্ঞান যেখানে শেষ সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আরম্ভ। ব্রহ্মজ্ঞানে শান্ত ভাব। ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গেলে তবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর মধুর ভাব।

কিন্তু লোকে ত জিজ্ঞাসা করিতে পারে, যতদিন চিত্ত থাকে ততদিনই ধূলো-খেলা। ব্রহ্মজ্ঞানে ত চিত্তও থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানে লবণ-পুত্তলিকা, সমুদ্র মাপিতে গিয়া সমুদ্রই হইয়া যায়। চিত্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া গলিয়া যায়—খেলিবে কে, খেলা দেখিবেই বা কে?

তবে কি দাস্য, সখ্যাদি ভাব মিথ্যা? মিথ্যা হইবে কেন—ভাব, অভাব যাহা কিছু সব ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে। ব্রহ্মজ্ঞানে দুই থাকে না—খেলা হইবে কার সঙ্গে?

খেলা খেলি ভাবনারাজ্য পর্য্যন্ত। কিন্তু ব্রহ্মরাজ্যে খেলা নাই। প্রবেশের মুখে অত্যন্ত আনন্দ। প্রবেশ হইয়া—তাঁহাকে স্পর্শ করা মাত্র সেই ভাবে স্থিতি।

তবে কি ভক্তির সহিত জ্ঞানের বিরোধ? কিছুই বিরোধও নাই। বালক অবস্থার সহিত যৌবন অবস্থার বিরোধ কি? একটি অন্যটিতে পরিণত হয় মাত্র। স্বপ্নটি সুষুপ্তি হইয়া যায়। এই জন্য সর্ব্বশাস্ত্রে দেখা যায়—বিনা ভক্তিতে কখন জ্ঞানে স্থিতিলাভ হইতে পারে না। তাই আগে জগৎ ভরিয়া সেই তেজোময়, অমৃতময়,সর্ব্বানভূ পরমপুরুষের সহিত পরমাপ্রকৃতির খেলা দেখ—ভিতরে বাহিরে যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন অনুভব কর, তবেই উপাসনা শেষ হইল। সর্ব্বত্র তাঁকে দেখ, সব তাঁতে দেখ—তবেই চিত্ত পূর্ণরূপে রসে ডুবিয়া, রসে গলিয়া, রসময়রূপে চিরস্থিতি লাভ করিল। আবার প্রকৃতি পুরুষের খেলা উঠিতে পারে, কিন্তু মুক্ত পুরুষের তাহাতে কোন ভয় নাই। ব্রহ্ম যেমন স্বস্বরূপে থাকিয়াও জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে খেলা দেখিতে পারেন, খেলা করিতেও পারেন—সেইরূপ মুক্ত পুরুষও ব্রহ্মের সমান হইয়া যান; স্বস্বরূপে থাকিয়াও মায়াকে আয়ত্ত করেন বলিয়া, বহুরূপে বহুসাজে খেলা করিতে পারেন। সব করিয়াও অথচ কিছুই করেন না।

অযথা বিরোধে কিছু লাভ নাই। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে সমস্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। দেখিলেই হইল।

ভক্তিপথ বড়ই নিরুপদ্রব। আবার ভক্তিপথ ধরিলে জ্ঞান আপনিই আসে, সেই জন্য ভক্তিপথই আশ্রয় করিতে হয়; কিন্তু জ্ঞানবিরোধী হইলে ভক্তিও হয় না—জ্ঞান ত পূর্ব্বেই নাই।

শাস্ত্রে বিরোধ কিছুই নাই। সম্প্রদায় রক্ষা করিতে গিয়াই বিরোধ। বুদ্ধিমান্ জনে নিজের দোষ সংশোধন সকল জীবনেই করিতে পারেন। তাহাতেই মহত্ত্ব। আর ভিতরে বুঝিয়া, বাহিরে চাপিয়া রাখা নিতান্ত গর্হিত। হে ভগবান্! আর কি বলিব—তুমি প্রসন্ন হও। তবেই আমাদের সর্ব্বসিদ্ধি হইবে।

অনুকরণে ব্যভিচার।

এই পৃথিবীতে জীবসমূহের কার্য্যবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জীব জগৎ অনুকরণশীল ; জড়ের কার্য্য করিবার শক্তি নাই বলিয়া তাহাদের অনুকরণ বৃত্তি নাই। জীবমাত্রেই এই বৃত্তির বশবর্ত্তী। সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে যে, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। শিশু, পিতা মাতা বা অপর আত্মীয়ের অনুকরণ করে ; ছাত্র শিক্ষকের অনুকরণ করে ; ভৃত্য প্রভুর অনুকরণ করে ; ক্ষুদ্র মহানের অনুকরণ করে ; ঠিক পারুক বা নাই পারুক, চেষ্টা করে। পশুপক্ষী আদি সকল জীবই এই বৃত্তির বশবর্ত্তী। যথার্থপক্ষে এই বৃত্তিই জগতের উন্নতির মূল। এই বৃত্তি না থাকিলে জগতে শিক্ষাবিস্তার বা উন্নতিমূলক কোন কার্য্যই হইত না। শিক্ষক 'ক' বলিতেছেন, শিশু ছাত্রও সঙ্গে সঙ্গে 'ক' বলিবার চেষ্টা করিতেছে ; তিনি যাহা বলেন সে তাহাই বলে। পক্ষীর সম্মুখে 'সীতারাম' 'রাধাকৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম করিতে থাক, সেও কালে ঐ সকল বুলি আবৃত্তি করে। এইরূপে নিকৃষ্ট, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টের অনুকরণ করিতেছে। অসভ্য জাতি, সভ্যজাতির অনুকরণে স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতেছে। এই বৃত্তির সাহায্যে জগৎ ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে। জীবহৃদয়ে এই বৃত্তি না থাকিলে, জড়জগতের ন্যায় জীবজগৎ নিশ্চেষ্ট থাকিত। কোন লোক একটি কার্য্য করিলে, সে কার্য্যটী সকলের মনোনীত হইলেই, অমনি অপরে সেটি অনুকরণ করিতে লাগিল। অনুকরণ অর্থাৎ পশ্চাৎ করণ। একজনের কৃত কর্ম্ম দেখিয়া আমি পশ্চাতে তদ্রূপ করিবার যে চেষ্টা করি, তাহাকেই অনুকরণ বলে। অনুকৃত কার্য্য ক্রমশঃ বিশেষত্ব লাভ করে, সুতরাং ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে। দেখা গেল যে, এই বৃত্তির বলেই প্রাণীজগৎ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে ; কিন্তু অলক্ষিত ভাবে যে; এই অনুকরণের ব্যভিচার হইতেছে, তাহা আমরা কেহই ধরিতে পারিতেছি না। এই ব্যভিচার-দোষেই আমাদের উন্নতির বিষম বিঘ্ন ঘটিতেছে, তাহাতে আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই, কেবল বাহ্যিক চটকেই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইয়া পড়িতেছি। উন্নতি করিতে গিয়া অবনতির পথে ধাবিত হইতেছি। নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিতেছি, অথচ ভাবিতেছি যে, আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি। ঐ উন্নতির

পথে যে, ব্যভিচার-দোষ প্রবিষ্ট করাইয়াছি তাহা ধরিতে পারিতেছি না। কোথা হইতে অনুকরণে এই ব্যভিচার ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অমঙ্গল কখন কিভাবে আগমন করে তাহা জানা যায় না, জানিতেও যেন দেয় ন। যখন চতুষ্পাদ অমঙ্গলে পূর্ণ হয় তখন বুঝা যায়, তখন প্রতীকারের চেষ্টা করি। কোন কোন স্থলে ঐ চেষ্টা হয় ত ফলবতী হয়; কিন্তু সাধারণতঃ উহা নিষ্ফলা হইতেই দেখা যায়। অমঙ্গলের চতুষ্পাদ পূর্ণ হইলে জীবের যে চেতনা হয়, তাহাও মঙ্গলময়ের কৃপাকটাক্ষ। বাল্যে পিতা মাতা প্রভৃতি নিকট-আত্মীয় স্বজনের অনুকরণে যাহা কিছু শিক্ষা হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রদর্শিত রীতিনীতি হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত বদ্ধমূল হইতেছিল; ক্রমে যত বাহিরে মিশিতে লাগিলাম, আরও নানা প্রকার শিক্ষা হইতে লাগিল। ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, অনুকরণবৃত্তিও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; কেবল উন্নতির আশায় বুক বাঁধিয়া আছি, হরি হরি! একি? উন্নতির বিনিময়ে অবনতি কোথা হইতে প্রচ্ছন্নভাবে এই ব্যভিচার আনয়ন করিল, বুঝিতে পারি না—যেমন কোন অট্টালিকার কোন নিভৃত অংশে একটি ক্ষুদ্র অশ্বত্থবীজের সঞ্চার গৃহস্বামীর অলক্ষিত থাকে; বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইল, ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মিল, গৃহস্বামী দেখিয়াও দেখিলেন না বা দেখিতে পাইলেন না; গাছটী ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া বৃহদাকার হইল, এবং অট্টালিকার ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তখনও যদি গৃহস্বামীর চেতনা হয়, তাহা হইলে হয়ত অট্টালিকা রক্ষা হইতে পারে; নতুবা স্বল্পদিনে অট্টালিকা ধ্বংসীভূত হয়। আমাদেরও এই ভাবে অনুকরণে ব্যভিচার-দোষ প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। আমাদিগকে উন্নতির পথ হইতে দূরে ফেলিতেছে। এখন দেখা যাউক, অনুকরণের এই ব্যভিচার কোথায়? অনুকরণ অর্থাৎ একজনের কোন কার্য্য দেখিয়া তদ্রূপ কার্য্য করিবার চেষ্টা; ইহাতে অনুকৃত কর্ম্মটি আদিকৃত কর্ম্মের মতন বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইলে, অনুকারী যাঁহার অনুকরণ করিল তাঁহার নিকট ঋণী; সুতরাং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ইহাই প্রকৃত অনুকরণ। কারণ অনুকরণ শব্দের অর্থ শুদ্ধ যে পশ্চাৎ করার চেষ্টা তাহা নহে, উহার আর একটি প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে—(অনু=ক্ষুদ্র) আপনাকে ক্ষুদ্রীকরণ। তাৎপর্য্য এই যে, অন্যের কার্য্য দেখিয়া পশ্চাৎ তদ্রূপ কার্য্য সম্পাদিত করিলে, আমি যাঁহার কৃতকর্ম্মের আদর্শে অনুকরণ করিয়াছি, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাঁহার নিকট

আপনাকে ক্ষুদ্র স্বীকার করিব ; তিনি শ্রেষ্ঠ, আমি নিকৃষ্ট এইরূপ ভাবিব। ইহাই প্রকৃত অনুকরণ। কারণ আমি অমুকের প্রদর্শিত পথে তৎসাধিত কর্ম্মের অনুকরণ করিয়াছি। আমি শিষ্য, তিনি গুরু। আমি ক্ষুদ্র, তিনি মহান্। এই ভাব হৃদয়ে থাকিলে কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিতে পারে না, অনুস্বীকাররূপ মহাধর্ম্ম সাধিত হয়। জগতে বহুকর্ম্মের অনুকরণ করিতে পারিলে জগৎময় গুরুর উপাধি হয়, সুতরাং লৌকিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারা যায় ; কিন্তু এখন আমরা এই ভাবে অনুকরণ না করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়াছি, মহান্‌কে উপেক্ষ করিতেছি ; সুতরাং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। অবনতির চরমসীমায় আসিয়াছি, এখনও চৈতন্য হইতেছে না। মন আর ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিও না, উহা অলক্ষিতে শত্রু দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, এখনি সর্ব্বনাশ করিবে ; বিলম্ব করিও না, যিনি স্বতঃ মুক্ত সেই মঙ্গলময়ের আশ্রয় গ্রহণ কর—তাঁহার নিকট ব্যভিচার নাই, তিনি বিপদবারণ, বিপদ দূর করিবেন। তাঁহার অনুকরণে শত শত ক্ষুদ্র সংসার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া নিজে কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়াছি। পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, এ পাপের শাস্তি শাস্তিদাতার কৃপা বিনা কিরূপে হইবে ? যাঁহার কৃপায় তোমার অস্তিত্ব-মোহকুহকে তাঁহারই বিদ্রোহী হইয়াছ বটে, কিন্তু তিনি দয়াধার, ক্ষমাসার কাতর প্রাণে ক্ষমা চাও, তিনি ক্ষমা করিবেন ; তাঁহার কৃপা ভিন্ন এ ব্যভিচার-দোষ দূর হইবে না। নিজে যে কত পাপী তাহা তুমি জান, সব পাপই তাঁহার কৃপাকটাক্ষে ভস্মীভূত হইবে ; তাঁহার পদে আশ্রয় লও, তিনি ভিন্ন তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাশ করিবার আর কেহ নাই। তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়া অনুকরণ করিলে, ব্যভিচার-দোষ ঘটিবে না। মনে হইবে, যাঁহার কার্য্য দেখিয়া কার্য্য করিলাম, এ কার্য্য তো আমার নয় তাঁহার ; কারণ তাঁহার কৃতকর্ম্ম আমার অন্তরে লইয়া সেইটীকে আদর্শ করিয়া, এই কর্ম্ম আমাকর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইল ; সুতরাং কর্ত্তা কে, আমিতো নহি, যাঁহার আদর্শে করিয়াছি তিনি। সূক্ষ্মভাবে তাঁহার কার্য্যটী আমার অন্তরে না থাকিলে, আমি কি করিতে পারিতাম ? কখনই না। অতএব তিনি কর্ত্তা, আমি কেহ নহি ; তিনি মহান্, আমি ক্ষুদ্র ; তিনি গুরু, আমি শিষ্য। প্রভো ! কবে এই ভাব জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে যখন জীবগণ এই ভাবে অনুকরণ করিতে শিখিবে ? তখন বুঝিবে যে স্বর্গ কোথাও নাই, এই পৃথিবীই স্বর্গ।

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়।

বালিকা যোগিনী।

(১)

নিকেতনে সন্নিহিত সরোবর-তীরে,
বয়সী আত্মীয়া কাঁদি আঘাতিল শিরে ;
বসায়ে মুছিয়া দিল সীমন্তে সিঁদুর,
এলায়িয়ে দিল চির চাঁচর চিকুর।

(২)

দূরেতে ফেলিয়া দিল লৌহ খাড়ু খুলে,
যোগিনী সাজায়ে দিল বসি সরঃকূলে ;
পাষাণ মুরতি আমি অবাক্ অচল,
মাঝে মাঝে দগ্ধ হয় মম হৃদিতল।

(৩)

ভাবি মনে সত্য নহে এ মিথ্যা স্বপন,
"আমি কি বিধবা!" হায় মিথ্যা এ স্বপন ;
চারিধারে আঁখি মেলি চাহিনু আবার
সেই নিদারুণ দৃশ্য ভীম হাহাকার !

(৪)

কি যেন কি অপমানে, কি জানি কি খেদে,
বালিকা-হৃদয় মম উঠিল যে কেঁদে ;
হেলা ফেলা বিধবারা আমিও কি তাই,
এ বিশ্ব ঘুরিল চক্ষে—সব ! সব ! ছাই।

(৫)

বরষা রজনী শেষে বিবাহ খেলায়,
বাঁধাবাঁধি হয়েছিল যূথিকা মালায় ;
শরতে বিচ্ছিন্ন আজ অশ্রুমালা লয়ে,
এসে বসি পিতৃপদে বুকে শিশু বয়ে॥

সু

অভিষেক-সঙ্গীত।

——*——

[কবিবর শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত।]

——*——

১

প্রবল বাড়ববহ্নির মত বারিধিবক্ষ হ'তে
উঠিয়া, যে জাতি চলিল রঙ্গে আবার আলোকস্রোতে;
মথিয়া জলধি, দলিয়া মেদিনী, লঙ্ঘি' শৈলরাজি;—
সে জাতির রাজা মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজি।
বাজুক শঙ্খ, উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি';—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

২

যে জাতি গ্রীসের করিল মুক্ত দৃঢ় বন্ধনপাশ;
করিল বিধান—রবে না মানুষ মানুষের ক্রীতদাস;
প্রচারিল স্বাধীনতার তন্ত্র বিপুল বিশ্ব-মাঝে;—
সে জাতির রাজা মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজি।
বাজুক শঙ্খ, উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি';—
ভারতের রাজা ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

৩

নিউটন যার বাঁধিল সূত্রে জগৎ জগৎ সনে;
ডারুইন যার বাঁধিল নিয়মে জগতের জীবগণে;
সেক্সপীর যার বাঁধিল ছন্দে হৃদয়রতনখনি;—
এসেছে প্রথম আজি এ ভারতে সে জাতির নৃপমণি।
বাজুক শঙ্খ, উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি;—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

৪

মানিয়া লইল শাসন যার অনার্য্য আর্য্যসুত
স্থাপিল ভারতে গভীর শান্তি সাম্যমন্ত্রপূত ;
মুক্ত করিল স্বাধীন ধর্ম্ম, স্বাধীন চিন্তাস্রোত ;—
সে জাতির রাজা এসেছে ভারতে সুদূর বৃটন হ'তে।
বাজুক শঙ্খ উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি ;—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

৫

কোথায় বৃটন, কোথায় ভারত, ভিন্ন আকাশ যার !
এখানে যখন আলোক, তখন সেখানে অন্ধকার ;
মধ্যে গভীর গরজে জলধি,—লঙ্ঘি' সে পারাবারে,
এসেছে ভূপতি—লহ মা ভারত বরণ করিয়া তারে।
বাজুক শঙ্খ, উড়ুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি ;—
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

(বসুমতী হইতে)

অভিষেক।

এই ত স্বাভাবিক। সমস্ত ভারত ভরিয়া একটা আনন্দ-উচ্ছ্বাস। ভয়ে উচ্ছ্বাস দেখান এক কথা, আর আপনা হইতে উচ্ছ্বাস অন্য কথা। এ উচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি, ভাবুকের নিভৃত কক্ষেও ধ্বনিত হইতেছে। এ উচ্ছ্বাস ভক্তিতে, ভয়ে নহে।

কত শত বৎসর গিয়াছে ভারত যেন প্রাণভরিয়া আনন্দ করে নাই। ভারতের ঈশ্বর ভারতের ঈশ্বরী, আজ প্রত্যক্ষে ভারতে। উচ্ছ্বাস হইবে না ?

এক দিকে ভালবাসা, অন্য দিকে ভক্তি।

মানবহৃদয়ের পরমরমণীয় ভাব এই ভালবাসা ও ভক্তি। সকলের হৃদয়েই ইহা আছে। বিকাশ হইলেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

রাজা ভালবাসিলেন—প্রজা সে ভালবাসা অনুভব করিল। ভালবাসার অনুভবই ভক্তিরূপে ফুটিয়া উঠিল। প্রজাবৎসল রাজা, দৃঢ়রূপে প্রজার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। হৃদয়-অধিকার কলে বলে কৌশলে হয় না। হয় ভালবাসায়। আসমুদ্র হিমাচল, ভালবাসা অনুভব করিয়া কম্পিত হইল।

পুরাতন-নূতনের মিলনক্ষেত্র এই ইন্দ্রপ্রস্থে রাজরাজ্যেশ্বর দান করিলেন—এ দান রাজোচিত। এ দানের প্রতিদান প্রজার হৃদয়। তাই এই উচ্ছ্বাস।

প্রজাবৎসল রাজার অধীনে থাকাই প্রজার প্রকৃত স্বাধীনতা। যেমন বড় আমির অধীনে ছোট আমির অধিষ্ঠানই প্রকৃত স্বাধীনতা। অন্যথা স্বাধীনতার অপব্যবহার—সমস্ত ব্যভিচার।

ভারত এই শিক্ষা চিরদিন পাইয়াছে। লোকে বলুক ভারত নির্জ্জীব। ভারত কখন ব্যভিচার করিয়া সজীবতা দেখাইবে না। অধীনতাই যে স্বাধীনতা এ শিক্ষা ভারত কখন ভুলিবে না। আজ ভক্ত প্রজা, রাজার ভালবাসা অনুভব করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কি দেখিল, ভাবনার চক্ষে আরও কত কি দেখিল—দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বাস তুলিল।

আর ভারতেশ্বরি! কেমন করিয়া হৃদয় মোহিত করিতে হয়, তাহা মা জানেন না ত আর কে জানে? আমরা বসুমতী পত্রিকা-অনূদিত ভারত-মহিলাগণের অভিনন্দন পত্রে রাজরাজেশ্বরীর উত্তর, অনারেবল্ জেঙ্কিন্সের অভিনন্দন পত্র ও রাজরাজেশ্বরের উত্তর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাজরাজেশ্বরীর বক্তৃতা।

ভারতীয় মহিলাগণের পক্ষ হইতে সম্রাজ্ঞীকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার উত্তরে ভারতেশ্বরী বলিয়াছিলেন,—যে মনোজ্ঞভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনারা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহা আমার হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত আছেন, এই

প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন ও ঐকান্তিক রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্য আমার প্রীতিপূর্ণ ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন এবং ভারতীয় মহিলামণ্ডলীকে এই ধন্যবাদের কথা জ্ঞাপন করিবেন।

অন্তঃপুরচারিণীদিগের মঙ্গল ও সুখের জন্য আমার হৃদয়ে ব্যাকুলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এ কথা আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি। ভারতীয় মহিলা-দিগের প্রভাবে গৃহস্থের যেরূপ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে এবং জননীগণের শিক্ষা-প্রভাবে তাঁহাদের সন্তানগণের হৃদয়ে কিরূপ রাজভক্তি উদ্রিত হইয়াছে, ইতি-হাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে তাহা বর্ণিত আছে। শুদ্ধান্তর্বাসিনীদিগের মধ্যে ক্রমশঃ উন্নতির চিহ্ন কিরূপ ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহা জানিতে পারিয়া আমি সুখী হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আপনারা আপনাদের কন্যাদিগকে এরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদান করিবেন যে, তাহারা যেন ভবিষ্যতে স্বামীর উপযোগী ও শিক্ষিতা সহধর্ম্মিণী হয়। আপনারা আমাকে যে সমস্ত রত্নালঙ্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমার দৃষ্টিতে চিরকালই বহুমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে; এবং যখন আমি ইহা পরিধান করিব, তখন সহস্র সহস্র মাইলব্যাপী সাগরপ্রান্তর আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও, আমার চিন্তা ভারতবর্ষের অন্তঃপুরের দিকে ধাবিত হইবে; এবং আপনাদের সম্মিলনে আমার মনে যে প্রীতির বিকাশ করিয়া দিয়াছে, তাহা পুনরায় জাগিয়া উঠিবে।

আপনাদের প্রদত্ত অলঙ্কার ভবিষ্যতে রাজবংশের ঐশ্বর্য্যরূপে ব্যবহৃত হইবে, এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারত-মহিলাদিগের প্রথম সাক্ষাতের নিদর্শনস্বরূপ রহিয়া যাইবে। আপনারা সম্রাট্ ও আমার মঙ্গলকামনায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি আপনারা এই সাম্রাজ্যের শক্তি, একতা ও মঙ্গলের জন্য যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই প্রার্থ-নার সহিত আমিও আমার প্রার্থনা সম্মিলিত করিতেছি।

অনারেবল্ জেঙ্কিন্সের অভিনন্দন পত্র।

রাজরাজেশ্বর ও রাজরাজেশ্বরি! ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যবর্গ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবাসীর পক্ষ হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা করিতেছি। ভারতের যে প্রাচীন নগরীতে অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত হইয়াছে, সমগ্র ভারতের শাসকরূপে আপনি তাহাতে প্রথম পদার্পণ করিলেন। এই নগরীতে অনেক রাজা ও সম্রাটের অতীত-গৌরবের কীর্ত্তিচিহ্ন আজিও বিদ্যমান

রহিয়াছে। ইহা তাঁহাদের মহত্বের ও ক্ষমতার সূচনা করিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী, তাঁহারাও আপনার ন্যায় অখণ্ড ভারতে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং আপনার এই স্থানে আগমন, ভারতের ইতিহাসে অপূর্ব্ব ঘটনা এবং ইহা ভারতবাসীর মনে চিরকাল জাগরূক রহিবে। যুগযুগান্তর হইতে ভারতীয় মনীষী এবং ধর্ম্মশিক্ষকগণ ভারতবাসীর মনে রাজভক্তি সন্ধুক্ষিত করিয়া দিয়াছেন এবং আপনাদের এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্রিটিশশাসিত ভারতের অধিবাসিবর্গ যেরূপ রাজভক্ত, আর সেরূপ রাজভক্ত কোথাও নাই। ভারতীয় সাম্রাজ্যে নানা জাতি, বহু ভাষাভাষী ও বহুধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস। কিন্তু তুষারমণ্ডিত হিমাচল হইতে পুরাণবিশ্রুত রামেশ্বর পর্য্যন্ত ও পশ্চিম সীমান্তস্থ পর্ব্বতমালা হইতে চীন সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ আপনাদের প্রতি ভক্তিসূত্রে গ্রথিত। আপনাদিগের এই স্বল্পকালস্থায়ী ভারতপ্রবাসে যে রাজভক্তির ভাব, আনন্দ ও গর্ব্ব লোকের মনে বিকশিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আপনারা পাইয়াছেন এবং ভারতের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে তাহার অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইতেছে। আপনার সহিত রাজরাজেশ্বরীর আগমনে আমাদের আনন্দ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা রাজরাজেশ্বরীকে কেবল আপনার সহধর্ম্মিণীরূপে অভ্যর্থনা করিতেছি না, কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁহার উদারচরিতে যে ভক্তিমান্, তাহার জন্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনারা দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া, ভারতসাম্রাজ্যের মঙ্গলকল্পে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে থাকুন। আপনাদের শাসনাধীনে ভারতের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে থাকুক, ইহাই আমাদের ভগবানের নিকট প্রার্থনা।”

সম্রাটের উত্তর।

এই অভিভাষণের উত্তরে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ সুস্পষ্টস্বরে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর, বৃতি-পরিবেষ্টিত স্থানের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

"আপনারা আমাদিগকে যে রাজভক্তিপূর্ণ সুন্দর অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহার কথাগুলি আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। আমি আমার নিজের ও রাজরাজেশ্বরীর পক্ষ হইতে সে জন্য আপনাদের অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যে সময়ে ইংলণ্ডে আমাদের অভিষেক হইয়াছিল, সে সময়ে ভারত হইতে যে অগণিত ভক্তিপূর্ণ সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল এবং এদেশে উপনীত হইবার পর ভারতে নানা জাতি, নানা ধর্ম্মাবলম্বী প্রজা আমাদিগকে যেরূপ অভিবাদন করিয়াছে, আপনাদের অভিনন্দনে আমাদের সেই সকল কথা মনে পড়িতেছে। ব্যবস্থাপক পরিষদের জ্ঞানী ও বহুদর্শী সদস্যবর্গ ব্রিটিশশাসিত ভারতের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে গবর্ণর জেনারেল যে শক্তি ও সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা আমি তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি। প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে আপনারা আমাকে যে অভ্যর্থনা করিতেছেন, তাহা আমি বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আপনাদের অভিনন্দন-পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, ভারত-সাম্রাজ্য ক্রমশঃ শান্তি, সমৃদ্ধি ও সন্তোষের পথে অগ্রসর হউক, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক কামনা। আপনারা নিশ্চিন্তরূপে জানিবেন, ইহা অপেক্ষা আমাদের হৃদয়ের প্রিয়তর কামনা আর নাই।

শাস্ত্রপাঠ ও জপ।

ভগবান্ বশিষ্ঠের বাক্য :—

পরমানন্দপ্রাপ্তির উপায় শাস্ত্রচর্চ্চা, সাধুসঙ্গ ও ধ্যান।

বিষয়ের প্রতি সাতিশয় বৈরাগ্যই সমাধি। যিনি বিষয়বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে ব্রহ্ম; তাঁহাকে নমস্কার করি। যতদিন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ না করা যায়, ততদিন মন বিষয়ের অনুসন্ধান করে, ধ্যান লাভ করিতে পারে না।

যোগী পরমাত্মায় রমণ কবিতে থাকিলে তাঁহার নিখিল ভোগ বিদূরিত হয়; ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রশান্ত হয়; নিখিল দৃশ্য নীরস হয়।

প্রথম অবস্থাটি বৈরাগ্য অভ্যাস, দ্বিতীয়টি অভ্যাস। বৈরাগ্য ও অভ্যাস বিনা পরমপদ লাভের অন্য উপায় নাই।

তত্ত্বজ্ঞান বলে বিষয়ের প্রতি যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাকেই সমাধি বলে; অন্য কাহাকেও নহে।

সুদৃঢ় বিষয়বৈরাগ্যকেই বলে ধ্যান। সেই বিষয়বৈরাগ্য ক্রমে পরিপক্ব হইয়া বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়।

এই বিষয়বৈরাগ্যই অঙ্কুরাবস্থ ধ্যান। সাক্ষাৎকার বৃত্তিতে আবির্ভূত ব্রহ্মই অবিদ্যার উচ্ছেদে জ্ঞানস্বরূপ, নিখিল বাসনার উচ্ছেদে ধ্যানস্বরূপ এবং নিখিল দুঃখের উচ্ছেদে আনন্দস্বরূপ।

যদি ভোগবৈরাগ্য উপস্থিত হয়, অন্য ধ্যানের কোন আবশ্যক নাই; যদি ভোগবিতৃষ্ণা না হয়, তাহা হইলে ধ্যান করিয়া কি ফল হইবে?

যিনি সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, দৃশ্য পদার্থের আস্বাদ বাসনা যাঁহার একবারে নাই, নির্ব্বিকল্প সমাধি তাঁহার অবিরত হইতে থাকে।

তিনি বুদ্ধ, যাঁহার দৃশ্যবস্তু আর রুচিকর বোধ হয় না। যখন ভোগ সকল বিরক্তিকর বোধ হয়, তখনই সম্যক্ জ্ঞান উদিত হয়। যিনি স্ব স্বভাবে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর ভোগের আবশ্যকতা নাই। আপনার নিজ স্বভাব প্রাপ্ত না হওয়াই ভোগের কারণ। তাহা প্রাপ্ত হইলে আর ভোগ কি?

শাস্ত্রচর্চ্চা ও জপাদির পরে সমাধি নিরত হইবে। যখন সমাধি বিরত হইয়া বিশ্রান্তি লাভ করিবে তখনও শাস্ত্রপাঠ এবং জপ করিতে হয়।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের বাক্যে আধুনিক মৌখিক জ্ঞানিগণ আত্মপ্রবঞ্চনা ধরিয়া শাস্ত্রমত চলিতে চেষ্টা করেন, ইহাই প্রার্থনা। ভোগবাসনা-ত্যাগ ভিন্ন জ্ঞানে স্থিতি লাভ হইবে না ইহাই কথা।

যাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহারা নির্ব্বাণ উত্তর প্রকরণ ৪৫।৪৫ অধ্যায় পাঠ করিবেন।

স্মরণ রাখা উচিত সাধু ব্যক্তি প্রথমে পরকীয় বস্তু গ্রহণে নিবৃত্তিকে অতি যত্নে অভ্যাস করিবেন পরে স্বার্থ বিষয়েও বিরক্তি ভাবকে সাদরে সংগ্রহ করিবেন ইহাই বৈরাগ্য অভ্যাসের ক্রম। এ সংসারে অসংখ্য নরক মধ্যেও তাদৃশ দুঃখ অনুভূত হয় না, যাহা যাবজ্জীবন অর্থোপার্জ্জনে হয়। সমকালে বৈরাগ্যও গ্রহণ কর।

---

১৬ সর্গঃ।

সৎসঙ্গ।

৪র্থ দ্বারপাল।

মোক্ষের চারি দ্বারপাল কি কি?

সন্তোষঃ সাধুসঙ্গশ্চ বিচারোথ শমস্তথা।
এত এব ভবাম্ভোধা-বুপায়াস্তরণে নৃণাম্॥

সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, বিচার এবং শম (মনের নিগ্রহ) এই চারিটি ভব-সাগর পারের উপায়স্বরূপ। সন্তোষ, বিচার, শম—ইহাদের কথা বলা হইয়াছে। এখন সাধুসমাগমের কথা বলা হইতেছে।

জগতে পরমলাভ কি?

সন্তোষঃ পরমো লাভঃ। সন্তোষই প্রধান লাভ।

পরম গতি কি?

সৎসঙ্গঃ পরমা গতিঃ॥ সৎসঙ্গই পরমা গতি।

পরম জ্ঞান কি?

বিচার পরমোজ্ঞানম্। বিচরাই পরম জ্ঞান।

পরম সুখ কি?

শমোহি পরমং সুখম্। শম বা মনের নিগ্রহই পরম সুখ;

সৎসঙ্গ দ্বারা কি লাভ হয়?

সাধুসঙ্গ তরোর্জ্জাতং বিবেককুসুমং সিতম্।

সাধুসঙ্গরূপ বৃক্ষ হইতে বিবেকরূপ শুভ্র পুষ্প জন্মে।

বিবেকঃ পরমোদীপো জায়তে সাধুসঙ্গমাৎ॥

সাধুসঙ্গ হইতে বিবেক নামক উৎকৃষ্ট আলোক জন্মে।

দারিদ্র্যং মরণং দুঃখ-মিত্যাদি বিষয়োভ্রমঃ।
সম্প্রশাম্যত্যশেষেণ সাধুসঙ্গম ভেষজৈঃ॥

সৎসঙ্গরূপ ঔষধে দারিদ্র্য, মরণ, দুঃখ ইত্যাদি বিষয়—রোগ (সান্নিপাতিক রোগ) সকল সমূলে নষ্ট হয়। অতিশয় কষ্টের দশায় পড়িলেও, অধিকতর পরবশ হইলেও—মানুষ সৎসঙ্গত্যাগের কল্পনাও কখন মনে আনিবে না। কারণ ইহাই সদাচারের দীপিকা এবং ইহাই হৃদয়-অন্ধকার নাশ জন্য জ্ঞানসূর্য্য।

যঃ স্নাতঃ শীতসিতয়া সাধুসঙ্গতি গঙ্গয়া।
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥

যিনি শীতল শুভ্র (নির্ম্মল) সাধুসঙ্গরূপ গঙ্গায় স্নান করেন, তাঁহার আর দান, তীর্থ, তপস্যা ও যজ্ঞের প্রয়োজন কি?

সৎসঙ্গ দ্বারা বিষয়ে অনুরাগ থাকে না, মনের সন্দেহ থাকে না চিদচিৎ হৃদয়গ্রন্থি থাকে না,—সংসারভেদের এমন উপায় আর কি আছে?

পৌরুষ দ্বারা মনকে বৈরাগ্যযুক্ত করিয়া, এই চারিটির একটিও যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিবে। একটি পাইলে চারিটি পাইবে। গুণ বৃদ্ধি হইলে দোষ-ক্ষয়কারী অন্যগুণও দেখা দিবে; আবার দোষ বৃদ্ধি হইলে গুণবিনাশক অন্য দোষ বৃদ্ধি পাইবে।

হৃদয়—অরণ্যে বেগবতী বাসনানদী। ইহার শুভ অশুভ উভয় তীর। সকল জীবের উপর এই নদী প্রবাহিত। পৌরুষবলে বাসনানদীকে শুভ-তীরানুগামিনী কর। বিদ্বজ্জনসমাগমের অনেক গুণ;—

শূন্যমাকীর্ণতামেতি মৃতিরপ্যুৎসবায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন সমাগমে॥

বিদ্বানগণের মিলনে শূন্যদেশ জনাকীর্ণ হয়, মৃত্যু উৎসবময় হয়, আপদও সম্পদের ন্যায় অনুভূত হয়। এইজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে সৎসঙ্গ কর।

কোন্ দেশের সাহিত্য কিরূপ, কোন্ দেশের কবি কিরূপ কবিতা লেখেন, কোন্ দেশের লোকের আচার ব্যবহার কিরূপ, কোন্ দেশ বাণিজ্য শিল্প দ্বারা কত অর্থ উপায় করে, কোন্ দেশের স্ত্রীলোক কত স্বাধীন—এই সমস্ত আলোচনাকে সৎসঙ্গ বলে না। এই সমস্ত আলোচনায় মানুষকে প্রকৃত সুখী করা যায় না, সংসারে কিছু সুবিধা হইতে পারে। মানুষের হৃদয়কে ইহাতে শান্ত করা যায় না। জরামরণ-হর্ষামর্ষ-শোকাদি-সহস্রসঙ্কল্পসঙ্কুল-সংসারমহারণ্য হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়, কিরূপে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, এক কথায় কিরূপে মনের নিবৃত্তি লাভ করিয়া চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে, কিরূপে সদ্যোমুক্তি হয়—সৎসঙ্গ তাহাই দেখাইয়া দেন।

---

১৭ সর্গঃ।

গ্রন্থসংখ্যাদি বর্ণন।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন :—

নির্ম্মেঘ আকাশ যেমন শারদ-শশধরের উপযুক্ত স্থান, সেইরূপ অন্তর্ব্বিবেকী মহাপুরুষই জ্ঞানশাস্ত্র শ্রবণের যোগ্য। যিনি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন, তিনিই মৎকথিত বাক্যনিচয় শ্রবণে সমুৎসুক হইবেন।

সর্ব্বসংহিতার সার এই যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে মোক্ষোপায় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অবগত হইতে পারিলে মুক্তিলাভ নিশ্চয়ই হইবে। এই সংহিতার শ্লোকসংখ্যা ৩২,০০০ হাজার। এই সংহিতা পাঠে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভ্রান্তি দূর হইয়া অনির্ব্বচনীয় সুখপ্রাপ্তিই এই সংহিতার একমাত্র উদ্দেশ্য।

যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের ছয়টী প্রকরণ।

(১) বৈরাগ্যপ্রকরণ :—শ্লোকসংখ্যা ১৫০০। ইহার শ্লোকসংখ্যা বিচার কর, অজ্ঞানজনিত বুদ্ধিমালিন্য দূর হইবে। বৈরাগ্য বর্দ্ধিত হইবে। বৈরাগ্য ব্যতীত ধর্ম্মজগতে প্রবেশ হইতেই পারে না।

(২) মুমুক্ষু-ব্যবহার প্রকরণ :—শ্লোকসংখ্যা ১০০০। মুমুক্ষুর স্বভাব কার্য্য ইহাতে বর্ণিত। বৈরাগ্য না জন্মিলে মুক্তির ইচ্ছা হয় না। মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হইলে, তবে তদনুরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্তি হয়।

(৩) উৎপত্তি প্রকরণ :—শ্লোকসংখ্যা ৭০০০। এই প্রকরণে "আমি" "তুমি" ইত্যাদি দ্রষ্টৃ-দৃশ্য ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শ্রবণে আমি, তুমি, ব্রহ্মাণ্ড-বিস্তৃতি, যাবতীয় লোক, আকাশ-পর্ব্বত প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় সংসার যে অবাস্তবিক, অমূলক ইহা বোধ হয়। সংসার, সঙ্কল্প-রচিত মনোরথ মাত্র। ইহা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অলীক, মনোরাজ্যের ন্যায় নামমাত্র বিস্তৃত, মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় ভ্রমবিজৃম্ভিত, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় তুচ্ছ, দ্বিচন্দ্রের ন্যায় ভ্রমময়, পিশাচের ন্যায় মোহকল্পিত। নৌকারোহী ব্যক্তির তীর-তরুর চলন-দর্শন যেরূপ, অজ্ঞজনের আকাশে মুক্তামালা দর্শন যেরূপ, সুবর্ণে কটক, জলে তরঙ্গ, গগনে নীলিমা-দর্শন যেরূপ,—এই সংসারও যে সেইরূপ এই প্রকরণ-বিচারে তাহাই প্রতিভাত হয়। আলেখ্যলিখিত বহ্নি অসত্য

হইলেও যেমন বহির্ভাবে প্রতীয়মান হয়,—এই জগৎ অসত্য হইলেও সেইরূপ সত্যের মত প্রতীয়মান হইতেছে। উৎপত্তিপ্রকরণ পাঠে ধারণা হইবে—এই সংসার, তরঙ্গসমূহে উৎপলমালাদর্শনভ্রমের ন্যায়, দৃষ্টনৃত্যের স্থিতির ন্যায়, চক্রবাক চীৎকার শ্রবণে আকাশে জলরাশি আছে এই ভ্রমের ন্যায়।

বাস্তবিক এই সংসার, মরণব্যগ্র-পুরুষের চিত্তের বিভীষিকাদর্শনের ন্যায় মনেরই বিকার মাত্র। পরমার্থদর্শনে যখন মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, তখনই সেই আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাভ হয়। ইহাই পরমানন্দ-প্রাপ্তি।

(৪) স্থিতি প্রকরণ :—শ্লোকসংখ্যা ৩০০০। ইহাতে জগতের স্বরূপ কি, তাহার ভ্রম-প্রভবত্ব কিরূপে—ইহা দেখান হইয়াছে। অহংকার হইতেছে ইহার স্থিতি। এই প্রকরণে দৃষ্টদৃশ্যের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আরও দেখান হইয়াছে, এই ভ্রান্তজগৎ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

(৫) উপশম প্রকরণ :—শ্লোকসংখ্যা ৫০০০। জগৎ ভ্রম, সংসার ভ্রম, দেহ ভ্রম, যেরূপে উপশম প্রাপ্ত হয়, এই প্রকরণে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকরণ শ্রবণে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে এই সংসার বন্ধ্যানারীর মুখে তদীয় বীরপুত্রের যুদ্ধাদি-কথাপ্রসঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণ অলীক।

(৬) নির্ব্বাণপ্রকরণ :—শ্লোকসংখ্যা ১৪,৫০০। এই প্রকরণ বিচারে মূল অবিদ্যার উচ্ছেদ হয়, কল্পনাসমূহ বিগলিত হয়, এবং আপনি আপনি ভাবে স্থিতিরূপ নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয়। আত্মভাবে স্থিতিই সংসারভ্রমের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এইরূপ হইলে দৃশ্য-দর্শন বিনষ্ট হয়, জগৎ, সাক্ষী-চৈতন্যরূপে প্রতীয়মান হয়। এই প্রকরণ পাঠে জানা যায় যে, রোমাগ্রের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন অবিদ্যার কোন এক অংশে এই জগৎ ছিল। চিন্ময় আকাশ, নিজ অন্তরে কল্পিত আকাশরূপ প্রত্যেক পরমাণুতে সহস্র সহস্র জগৎ-সমৃদ্ধি উৎপন্ন করিতে পারেন ও দর্শন করিতে পারেন। নির্ব্বাণ-প্রকরণ বিচারেই জীবন্মুক্তি।

---

১৮ সর্গঃ।

দৃষ্টান্ত নিরূপণ।

রাম—এই গ্রন্থকে মোক্ষোপায়-সংহিতা বলিতেছেন। ইহা পাঠ করিবার অধিকারী কে? ইহা পাঠ করিলে কিরূপে মুক্তি হইবে? জ্ঞানলাভের জন্য আর কি করা আবশ্যক? এই গ্রন্থে আপনি বহুবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান জন্মাইবেন বলিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্ম নিরাকার। সাকার দৃষ্টান্তে, নিরাকার ব্রহ্মকে জানিব কিরূপে? আমার এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।

বশিষ্ঠ—একে একে তোমার সমুদায় প্রশ্নের সদুত্তর দিতেছি।

(১) এই মোক্ষোপায় সংহিতা পাঠে অধিকারী কে?

এই সংহিতা একখানি রসময় কাব্য। যাঁহার পদ ও পদার্থে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, তিনি স্বয়ং ইহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহার তাহা নাই, তিনি পণ্ডিতের নিকট শ্রবণ করিয়া ইহার অর্থ অবগত হইবেন।

এই গ্রন্থ প্রথমে শ্রবণ কর। শ্রবণ করিয়া বিচার কর, করিয়া ইহার অর্থ অবগত হও। এইরূপ করিলে তপস্যা, ধ্যান জপ ইত্যাদি মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় আর পৃথক্‌ভাবে করিতে হইবে না। ইহা দ্বারা সমস্ত সিদ্ধি হইবে।

পুনঃ পুনঃ এই শাস্ত্র দর্শন করিতে থাক—এবং বিশিষ্টরূপে ইহার বিচার অভ্যাস করিতে থাক। তবেই তোমায় চিত্ত, সংস্কারসহ অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভ করিবে।

(২) এই গ্রন্থ পাঠে মুক্তি কিরূপ হইবে?

এই গ্রন্থে যথাপদ্ধতিক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল যুক্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল শাস্ত্রই মুমুক্ষুর গ্রাহ্য। কাম্যকর্ম্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্র গ্রাহ্য নহে। কাম্য বর্জ্জন না করিলে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইতেই পারে না। যেখানে যুক্তি পাও, তাহাই গ্রহণ কর। ব্রহ্মাও যদি যুক্তিশূন্য কিছু বলেন, তাহা ত্যাগ কর।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।

বালকের নিকটেও যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করা উচিত। অযুক্ত বাক্য, ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত হইলেও তৃণের ন্যায় ত্যাগ করিবে।

সম্মুখে গঙ্গাজল। যে ব্যক্তি ঐ গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া "ইহা আমার পিতার কূপ" এই বলিয়া কূপোদক পান করে তাহার কিরূপ জ্ঞানলাভ হইতে পারে বল? কালে কালে আরও কত বিপরীত বুদ্ধি হইতে দেখা যায়। এমন সময় আসিবে যখন স্বদেশের যুক্তিযুক্ত রীতিনীতি ত্যাগ করিয়া, পরদেশের যুক্তিশূন্য আপাতমনোহর রীতিনীতিই মানুষ গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ত্যাগ করিয়া, বিষয় জ্ঞানকেই সাদরে মানুষ আলিঙ্গন করিবে। সংসার পার হইবার উপায় ত্যাগ করিয়া, যাহাতে সংসার ভোগ করিতে পারে তাহাই করিবে। যাহাতে অমর হইতে পারে তাহা ত্যাগ করিয়া, যাহাতে পুনঃ পুনঃ মরিবে তাহারই উপায়কে প্রশস্ত বলিবে। এই পুস্তক বিচারে, মানুষের অজ্ঞাননাশ হইবেই।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মুখে এই সংহিতা শ্রবণ কর,—দেখিবে বুদ্ধি বিচার-বলে শুভ সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। তখন আপন অন্তরেই শুভবাণী শুনিতে পাইবে। তখন যথার্থ চতুরতা যাহা, তাহাই লাভ করিতে পারিবে। সেই চাতুরীই চাতুরী যে চাতুরীতে ধর্ম্ম-রক্ষা হয়। প্রদীপ-সাহায্যে যেমন অন্ধকারেও সমুদায় পদার্থ অবগত হওয়া যায়, এই শাস্ত্রজ্ঞান-প্রভাবেও মানুষ সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই শাস্ত্র-সাহায্যে বুদ্ধির লোভ, মোহ, ক্রোধ, কাম ইত্যাদি দোষ ক্ষীণ করা যায়।

বুদ্ধিকে বিবেকাভ্যাসী করাই কার্য্য। বুদ্ধি বিচারশূন্য হইলেই জীবনে বহু দোষ ঘটে। বিচারপরায়ণ হইতেই পুনঃ পুনঃ যত্ন কর। মনে যাহা কিছু উঠিবে তাহারই বিচার কর; করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয়, সেই মত কর্ম্ম কর—যাহা যুক্তি-যুক্ত নহে তাহা করিও না। কোন ক্রিয়াই অভ্যাস ব্যতীত ফলবতী হয় না। একদিন বিচার করিলেই হইবে না। সর্ব্বদা বিচার অভ্যাস কর। অভ্যাস ইষ্ট-লাভের একমাত্র উপায় জানিও।

এই শাস্ত্র-বিচার-অভ্যাসে মনের নিবৃত্তি হইবে। সংসারের দোষ কি এই শাস্ত্র-বিচারে তাহাও দেখিতে পাইবে। সংসার তখন তোমার মর্ম্মভেদ করিতে পারিবে না। দৈন্য-দারিদ্র্যাদি দোষপূর্ণ সংসার আর তখন ভীতি উৎপাদন করিতে পারিবে না। কোন সংশয় আর থাকিবে না। অগ্রেই জন্ম, তাহার

পর কর্ম্ম ;—না অগ্রে কর্ম্ম, পরে জন্ম ;—দৈব অগ্রে, না পুরুষকার অগ্রে—এরূপ কোন সংশয় আর মনকে দুঃখী করিতে পারিবে না।

অধিক কি বলিব এই শাস্ত্রবিচারে জীবন্মুক্তি হইবে ; তুমি পরম শান্ত আত্ম-পদে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে। কোন কিছুতেই বিচলিত হইবে না। তাহা বলিয়া জ্ঞানী কখনও যথেচ্ছাচারীও হইতে পারেন না। জ্ঞানীর বুদ্ধি, সৎশাস্ত্র ও সদাচারের অবিরুদ্ধ যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মেই স্পন্দিত হইবে। সাধ্বী-স্ত্রী যেমন অন্তঃপুর ভিন্ন কখন বাহিরে আসে না, সেইরূপ বিচারসম্পন্ন বুদ্ধি কখনও বাহিরের বিষয়-সঙ্গে ব্যভিচার করিতে পারে না।

এই শাস্ত্রবিচারে বুঝিবে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুরই সমষ্টি। প্রতি অণুই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। অসঙ্গ পুরুষ, আপন অন্তরে ঐ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াও কিছুতেই লিপ্ত নহেন।

যে ব্যক্তি মোক্ষোপায় জানিয়াছেন তিনি ভোগপ্রাপ্তিতে দুঃখও করেন না, আনন্দিতও হন না। কোন কর্ম্মে ইঁহার দ্বেষও থাকিবে না ; আবার কর্ম্ম-নিবৃত্তিতেও অনুরাগ থাকিবে না।

স্বপ্ন মোহ জানিলেই যেমন উহা থাকে না, সেইরূপ জগৎ ও আমি এই ভ্রম থাকিলেও উহা উপশমপ্রাপ্ত হইবে।

যেমন মনঃকল্পিত নগর কল্পনামাত্র ইহা জানিলে কাহারও হর্ষ বিষাদ হয় না, সেইরূপ জগৎভ্রম জ্ঞাত হইলে কোন প্রকার পীড়া আর থাকে না।

"ইহা চিত্রিত" এইটি জানিলে যেমন চিত্রিত সর্পের সর্পত্ব নষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞান প্রভাবে এই সংসার অধিষ্ঠান-চৈতন্যে পর্য্যবসিত হইয়া উপশান্ত হইবে।

পুষ্প ও পল্লবের মর্দ্দনে কিছু যত্নও করিতে হয়, কিন্তু পরমার্থলাভে কোনই ক্লেশ নাই। জ্ঞান হইলে অলীক প্রপঞ্চ থাকে না, ইন্দ্রজাল শেষ হইয়া ব্রহ্মই পরমপদে স্থিতিলাভ করেন। পুষ্পমর্দ্দনে অঙ্গ-পরিচালনা আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্পন্দন রোধ করাই ব্রহ্মভাবে স্থিতি—ইহাতে কোন অঙ্গের পরিচালনা নাই।

(৩) <u>জ্ঞান লাভ জন্য আর কি আবশ্যক ?</u>

সুখাসনে উপবেশন, যথাসম্ভব ভোগা ভোগ, সদাচারবিরুদ্ধ কার্য্য না করা, গুরু-আজ্ঞামত সৎসঙ্গে অবস্থান এবং এই শাস্ত্রের বা অন্য আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বিচার—জ্ঞানলাভ জন্য ইহাই কর্ত্তব্য।

(৪) দৃষ্টান্তে ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি হয় কিরূপে ?

এই শাস্ত্রে অর্থ-ধারণা জন্য দৃষ্টান্ত ও সঙ্কেত আবশ্যক। অপরিজ্ঞাত বিষয়ের বোধ জন্য দৃষ্টবিষয় আবশ্যক। যাহা জানা নাই, তাহা জানিবার জন্য যে দৃষ্ট-বিষয় ব্যবহার করা হয় তাহাই দৃষ্টান্ত।

দৃষ্টান্তে পরব্রহ্মের আংশিক সাদৃশ্যমাত্রই গ্রহণ করিতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যেমন কুণ্ডলের কারণ সুবর্ণ সেইরূপ জগতের কারণ ব্রহ্ম। কিন্তু সুবর্ণের বিকার আছে, ব্রহ্মের বিকার নাই। এখানে আংশিক সাদৃশ্যমাত্র গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা সুবর্ণের সম্পূর্ণ সমধর্ম্মতা ব্রহ্মে সিদ্ধ হয় না। একাংশ মাত্রে দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্যমাত্র স্বীকার করিতে হইবে।

দৃষ্টান্তের অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া জ্ঞাতব্যসম্বন্ধে পরিজ্ঞান হইলে ব্রহ্ম-নিশ্চয় হয়।

সকল পুস্তক পাঠ করার কোন প্রয়োজন নাই। পরমার্থ-তত্ত্ব যাহাতে নাই, তাদৃশ বাক্য স্বীয় প্রেয়সী কর্ত্তৃক কথিত হইলেও তাহা প্রলাপবাক্য মাত্র। হে রাম! যে বুদ্ধিবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাদৃশ বুদ্ধি আমাদের আছে। সেই বুদ্ধি দ্বারাই সেই অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করা হইয়াছে। তত্ত্বমসির অর্থ নির্দ্ধারণই আবশ্যক। পরমার্থ সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রের বিরোধ নাই। মায়িক বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকাই সঙ্গত। বেদান্তবিরোধী শাস্ত্র, শ্রুতির ভাব-বিরোধী তর্ক দ্বারা পরিপুষ্ট। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের অর্থ তাঁহারা শ্রুতিবিরুদ্ধভাবেই করেন, তজ্জন্য তাহা পরিত্যজ্য। বেদানুগত যুক্তিই যুক্তি, অন্য সমস্ত কুযুক্তি।

---

১৯ সর্গঃ।

প্রমাণ নিরূপণ।

রাম—হে ভগবন্! আপনি বলিতেছেন দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের বোধ জন্মে। দুইটি বস্তুর বিশিষ্ট অংশে যখন সাধর্ম্ম্য হয়, তখন একটিকে বিশেষরূপে বুঝিবার জন্য অন্যটির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায়। উপমান ও উপমেয় বিশিষ্ট অংশে সমান। কিন্তু যদি সর্ব্বাংশে সমান হইত, তবে আর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইত না; একটিব

Registered No. C. 681.

৬ষ্ঠ বর্ষ।] মাঘ ১৩১৮ সাল। [১০ম সংখ্যা।

উৎসব

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কলিকাতা, ১০ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৬২নং বউবাজার ষ্ট্রীট
উৎসব কার্য্যালয় হইতে—শ্রীযুত ননীলাল রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

সম্পাদকের ঠিকনা— ৪২ হাজরা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৬ষ্ঠ বর্ষ।] ১৩১৮ সাল, মাঘ। [১০ম সংখ্যা।

অনুগীতা-সংক্ষেপ।

মনের অশান্তি।

নিত্যবস্তু কোথায়? কি নিত্যবস্তু?

কিরূপে নিত্যবস্তু অনুভব করা যায়? কিরূপে নিত্যবস্তু পাওয়া যায়?

মহাভারতীয় অনুগীতা বলিতেছেন :—

জীবগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ দুঃখকে অনিত্য, শরীরকে অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশকে কর্ম্মের ফল ও সুখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি অনায়াসে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন।

যিনি এই জরামৃত্যু ও রোগের অধীন অচিরস্থায়ী শরীর ধারণ করিয়া সমুদায় জীবে সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তিনি ব্রহ্মকে অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন।

যেরূপে সেই শাশ্বত, অব্যয় পরমপুরুষকে অবগত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ কর।

জ্ঞান ও যোগ এই দুইটি উপায়।

জ্ঞানপথ। জরাযুক্ত জগৎকে অনিত্য বোধ কর। বৈরাগ্য-বুদ্ধি জাগাইয়া আত্মদোষ দর্শন কর। বুদ্ধিবলে মানসিক ও দৈহিক সঙ্কল্প ত্যাগ কর। নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তপোবলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কর; ব্রহ্মকে প্রাপ্ত

হইবে। মন জয় করিলেই ইন্দ্রিয় জয় হইবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যে মনোজয় কর। যোগই অভ্যাস।

যোগপথ। ইন্দ্রিয় রোধ কর। সমাধি অভ্যাস কর।

স্বপ্নযোগে অদৃষ্টচর বস্তু দর্শন পূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইলে, পুনরায় তাহার জ্ঞান-লাভ হয়। সেইরূপ সমাধিবলে বিশ্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও, তাঁহার অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে।

ধ্যান দ্বারা যোগ। মনকে দেহের বাহিরে রাখিও না। ইন্দ্রিয় জয় করিয়া, নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে একাগ্রচিত্তে দেহের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্ম চিন্তা কর। সর্ব্বাগ্রে দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানিয়া ও দেখিয়া, সেই আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত লীন করিয়া, নির্গুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কর। ছয়মাস যোগ সাধনেই ফললাভ হয়।

বাক্য ও মন। লৌকিক ব্যাপারে বাক্যের উপর মনের অধিকার। পারলৌকিক ব্যাপারে বাক্য, মন্ত্রাদিরূপে পরিণত হইয়া পারলৌকিক বিষয় প্রকাশ না করিলে, মন স্বয়ং কিছু পারে না।

জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়।

সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীব হইল জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্যবস্তু জ্ঞেয়, এবং দ্রব্যের প্রকাশটি জ্ঞান।

নিয়মের বশ। বলবান্ নিয়মের বশ নহেন। দুর্ব্বলই নিয়মের বশ। ভগবান এই জন্য নিয়মের বশ নহেন।

ওঁকার। এক ওঁকার আলোচনা দ্বারা ঋষি, অসুর, সর্প, দেবতা আপন আপন স্বভাব পাইয়াছেন।

নারায়ণ। সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বময় নারায়ণ সর্ব্বত্র বিরাজিত। তিনি আপনিই গুরু, আপনিই শিষ্য। শিষ্যরূপে প্রশ্ন করেন, গুরুরূপে উত্তর দেন। তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য্য হয়। গুরুও তিনি, শ্রোতাও তিনি, বোদ্ধাও তিনি, দ্বেষ্টাও তিনি।

তিনি সকলের হৃদয়ে—

তিনি পাপকার্য্যে নিরত হইয়া পাপচারী,

পুণ্যকর্ম্মে নিরত হইয়া পুণ্যচারী,

ইন্দ্রিয়সুখে নিরত হইয়া কামচারী,
ইন্দ্রিয়-পরাজয়ে ব্রহ্মে অবস্থিত ও ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মচারী।

ভোগ। জীবাত্মা ভোগ করে না—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা ভোগ করেন।

সাধু। সাধুদিগের নিগূঢ় হৃদয়াকাশে, উপদেশ রূপ পর্ব্বত হইতে জ্ঞানরূপ নদী প্রবাহিত হইয়া পরব্রহ্মে সঙ্গত হইয়াছে।

বিষয়কামনা। গন্ধাঘ্রাণ ইচ্ছা না করা, রসাস্বাদন ইচ্ছা না করা, স্পর্শ ইচ্ছা না করা, শব্দ-শ্রবণ ইচ্ছা না করা, রূপ-দর্শন ইচ্ছা না করা—ইহারা বিষয়ত্যাগ।

জীবাত্মা নিত্য। জীবাত্মা জন্তুশরীরে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক স্বভাব সমুদায় দর্শন করিতেছেন। তিনি ভিন্ন আর সমুদায়ই অনিত্য।

ইন্দ্রিয়জয়। মন চঞ্চল বলিয়াই অতি সূক্ষ্ম পরব্রহ্মে যাইতে চায় না—স্থূলবিষয় লইয়া উন্মত্ত হয়। ইন্দ্রিয়গণ তখন দৌরাত্ম্য করে। মনোজয়েই ইন্দ্রিয়জয় হইবে।

মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি লৌকিক শরসন্ধানে কার্য্য হইবে না। অলৌকিক শর প্রয়োগ আবশ্যক।

যোগই এই অলৌকিক শর। শমদমাদি দ্বারা অন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া, পরে বাক্যাদি বাহ্যশত্রু জয় করা উচিত।

প্রধান দোষ লোভ। লোভকে নিগ্রহ কর, আত্মরাজ্য উদ্ধার হইবে। নিত্যবস্তু বিচার নিশ্চয় কর, অনিত্য জয় হইবে।

অহিংসা।

সন্ন্যাসী—দেখিতেছি পশুটিকে বধ করিবার জন্য যজ্ঞে পশু প্রোক্ষণ করিতেছেন। এরূপ হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করা আপনার উচিত নহে।

যাজ্ঞিক—যজ্ঞে এই ছাগকে ছেদন করিলে ইহার কোন অপকার হইবে না। প্রত্যুত বহু উপকার হইবে। এই পশু যজ্ঞে নিহত হইলে ইহার উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইবে। যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে শাস্ত্রানুসারে প্রোক্ষণকার্য্য সম্পাদন করিলে—ইহার পার্থিবাংশ পৃথিবীতে, জলীয়ভাগ জলে, চক্ষুঃ সূর্য্যে, শ্রোত্র দিক্ সমুদায়ে এবং প্রাণ আকাশমার্গে অবস্থান করিবে। আমি শাস্ত্রমত যে কার্য্য করিতেছি, তাহাতে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে না।

সন্ন্যাসী—(১) যজ্ঞে ছাগের প্রাণবিয়োগ হইলে যদি কেবল ছাগেরই শ্রেয়ঃ লাভ হয়, তবে আপনার যজ্ঞ করিবার আবশ্যক কি? আপনি কেন করেন?

(২) এই পশু পরাধীন। ইহার পিতামাতা আত্মীয়বর্গের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ইহাকে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

(৩) আরও যদি মন্ত্রদ্বারা এই পশুর প্রাণসমূহকে যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার নিশ্চেষ্ট শরীর মাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব ইহাতে ও কাষ্ঠে ভেদ কি? সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ দ্বারা যজ্ঞ করুন।

অহিংসাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। হিংসাবিহীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই উচিত। আমি এমন বলিতেছি না যে, আমরা (সন্ন্যাসিগণ) একবারে সমস্ত হিংসা-শূন্য কার্য্য করি।

আমার মতে যথাসাধ্য প্রাণিহিংসা না করাই পরমধর্ম্ম। আমি কেবল প্রত্যক্ষ হিংসাকেই দোষাবহ মনে করি।

যাজ্ঞিক—সকল পদার্থেরই প্রাণ আছে।

আঘ্রাণ, আস্বাদন, দর্শন, সেবন, শ্রবণ, যাহা কিছু করুন, কিছুতেই হিংসা-বর্জ্জিত হওয়া যায় না। হিংসা ভিন্ন আঘ্রাণাদি কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে না। হিংসা ভিন্ন কাহারও কোন কার্য্য হয় না। আপনার মতে অহিংসা কি?

সন্ন্যাসী—আত্মা দুইপ্রকার। ক্ষর ও অক্ষর। উপাধিযুক্ত আত্মা ক্ষর; উপাধিবিহীন অক্ষর। যে ব্যক্তির আত্মা, মায়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যক্তির হিংসাজনিত ভয় হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির আত্মা, প্রাণাদি হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া নির্দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়, তাহাকে হিংসাজনিত ভয়ে ব্যাকুল হইতে হয় না। অতএব আমার মতে প্রাণাদি হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থানই অহিংসা।

যাজ্ঞিক—আপনার মত সাধুসঙ্গে আমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্ম্মল হইল। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি শাস্ত্রমত পশুহিংসাতে কোন অপরাধ হইতে পারে না। কারণ আমার আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহে।

ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না, সন্ন্যাসিগণ কুক্কুটাদির মাংস ভক্ষণ করিলেও দোষ হইবে না। বলা হইল যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞার্থে শাস্ত্রমত পশুবধ করিতে

পারেন, কিন্তু মাংসভক্ষণের জন্য পশুবধ করা নিতান্ত অন্যায়। আর সন্ন্যাসী যাঁহারা, তাঁহাদের ত কোন কর্ম্মই নাই; তাঁহাদের পক্ষে পশুবধ অপেক্ষা পাপ আর হইতেই পারে না।

বৌদ্ধমতে সকলেই (এমন কি স্ত্রীলোকেও) সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইতে পারে, কিন্তু ইঁহাদের মতে ত পশুবধ হইতেই পারে না। অতএব সন্ন্যাস লইয়া যাঁহারা পশুবধরূপ মহাপাতক করিবেন, তাঁহাদের নিজের গতি অতি ভয়ানক, তাঁহারা অন্যকে রক্ষা করিবেন কিরূপে?

মমতাত্যাগ। সমুদায় পদার্থই অচিরস্থায়ী। মমতা করিবে কাহার উপর? শাস্ত্রানুসারে কোন পদার্থেই কাহারও অধিকার নাই।

জনক বলিলেন—আমি আত্মতৃপ্তির জন্য গন্ধাঘ্রাণ, রসাস্বাদন, রূপদর্শন, স্পর্শানুভব, শব্দ শ্রবণ এবং মনের কার্য্য যে মন্তব্য বিষয়ের আলোচনা কিছুই করি না। তুমিও আত্মতৃপ্তির জন্য কোন ইন্দ্রিয় বা মন ইহাদের কার্য্য করিও না। যদি পার তবে মনকে বশ করিতে পারিবে এবং বায়ু তেজ জল আকাশ পৃথিবী সকল ভূতকেও বশে রাখিবে। জগতের সমুদায় পদার্থই দেবতাদিগের বা পিতৃলোকের বা অতিথিগণের নিমিত্ত ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা বিস্মৃত হইও না। হইবে।

জ্ঞানলাভ। গুরুমুখে বেদান্ত শ্রবণ করিয়া মনন কর, জ্ঞান জন্মিবে। জ্ঞান—জীব নির্গুণ ও দেহ পরিশূন্য। ভ্রান্ত জনে ভ্রমবশতঃ উহাকে সগুণ ও দেহযুক্ত বলে। যোগীরা শ্রবণ মননাদি দ্বারা শরীরস্থিত আত্মাকে পৃথক্ দেখেন।

শমদমাদির অভ্যাস কর, পর ব্রহ্মের সাক্ষাৎ হইবে।

মন—ব্রাহ্মণ

বুদ্ধি—ব্রাহ্মণী

আমি বাসুদেব—ক্ষেত্রজ্ঞ

কি শিখিলাম।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)।

ভক্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিবার জন্য অনুমতি করিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, বিদ্যায় কুলায় না। আমার বিদ্যার দৌড় আপনার অবিদিত নাই।

ভক্তির চিত্র যখন মনে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করি, তখনি মাথা নেড়া, গোঁপ কামান, কপালে "আপৃষ্টলম্বিত ফোঁটা" যেন যাওয়া আসা চেনা ভার, হাতে মালার ঝুলি, গলায় কণ্ঠী, কাছা খোলা, পেট মোটা নধর গোছের ভাব মনে আসে। যেন এই ষষ্ঠাঙ্গসেবী যোগীর কাছে, ভক্তি দেবী একচেটে গোছের বাঁধা।

হরি হরি হইল না। যখন ধর্ম্মপথে যাইবার জন্য প্রাক্তন সংস্কারের বলে আমাদের শুভ ইচ্ছার উদয় হয়, তখন শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিতে আমাদের প্রথম চেষ্টা হয় সত্য; কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ এত দুর্গম, এক হইয়াও এত বহু যে, মহাজনো যেনঃ গতঃ সঃ পন্থা—অবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে (পাড়াগেঁয়ে পুরোহিত ঠাকুরই এ সম্বন্ধে great authority) কিছু ভক্তিতত্ত্ব—শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিবা মাত্রই তিনি বলিলেন, "অথাতো ভক্তি জিজ্ঞাসা। অথ অনন্তরং অতঃ কারণাৎ ভক্তি-জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা—অনন্তর এই হেতু ভক্তি জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য।"

এই কথা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার পর? তিনি বলিলেন ইহার ভিতরেই সব। প্রথমতঃ বিধি পূর্ব্বক যথাসম্ভব বেদ অধ্যয়ন। শম দমাদি সাধন ব্যতীত প্রকৃত বেদার্থজ্ঞান জন্মে না। পরে বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে জ্ঞানোৎপত্তির সহিত চিত্তশুদ্ধি। সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা প্রেমের অভ্যুদয় ভিন্ন প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি ঘটে না।

চিত্তশুদ্ধির পর নির্ব্বেদ। নির্ব্বেদের তারতম্য অনুযায়ী জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ। এই খানে parenthetically বলিলেন, নির্ব্বেদাধিক্য ভক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ। কারণ মুমুক্ষা উহার সহচর।

"ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি মুলস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

ভুক্তি, স্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহারূপা পিশাচী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে বাস করে, সে পর্য্যন্ত ভক্তির অভ্যুদয়-সম্ভাবনা নাই; কাজেই ভোগাভিলাষের ন্যায় মোক্ষাভিলাষও ভক্তিমার্গে একান্ত পরিত্যাজ্য।

তাহার পর এইরূপ ভক্তের সঙ্গপ্রসাদাৎ কর্ম্ম সকল অনিত্য, পরিমিত ফলপ্রদ এবং ভগবান্ ভক্তিমাত্র লভ্য এবং অনন্ত, অক্ষয়, চিৎসুখস্বরূপ নিত্য জ্ঞানাদিগুণশালী ও নিত্যসুখের কারণ এইরূপ বিশ্বাস জন্মে।

তখন ভক্তি জিজ্ঞাসার অর্থাৎ বিচারের প্রয়োজন হয়। ইহাই শাস্ত্রীয় ক্রম। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, সেই খানেই জন্মজন্মান্তরীণ এই জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তির অনুষ্ঠান কল্পনা সূচনা করিতে হইবে।

তাহার পর অধিকারীভেদে মামুলী উত্তম, মধ্যম ও অধম ভক্তের পরিচয় দিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের সেই ডঙ্কামারা প্রার্থনা—

"নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরাচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি"।

শুনাইয়া দিয়া নিষ্কাম ভক্তির চূড়ান্ত উপহার দিলেন। তৎপরে ভক্তির লক্ষণ "সা তু স্বরূপ শক্তি বৃত্তি বিশেষ রূপা" আরম্ভ করিয়া স্বরূপ শক্তি কিনা, ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ কিনা, সৎ চিৎ আনন্দের সহিত সন্ধিনী সম্বিৎ, আর একটা কি শক্তি আমার মনে নাই—মনে করিবার ইচ্ছাও নাই—তাহাদিগের সহিত সম্পর্ক দেখাইয়া, ইহার উপর আবার অপ্রকট প্রকট ভেদে দ্বিবিধ আবির্ভাব+সত্যসঙ্কলন, পরমেশ্বরের নিত্য সত্য নানা লীলার সামঞ্জস্য স্থাপন ইত্যাদি ইত্যাদি বৃষোৎসর্গ ব্যাপার তিনি চক্ষু বুজিয়া আরম্ভ করিতেছেন দেখিয়া, আমি বেমালুম সরিয়া পড়িলাম। যাইবার সময় কাণে গেল যে 'সা তু নির্গুণা"। মুখ্যা ভক্তিতে গুণের সম্বন্ধ দেখা যায় না, গৌণী ভক্তি গুণ-সম্বন্ধ যুক্ত। নির্গুণ কর্ম্ম এবং নির্গুণ জ্ঞান, ভক্তির সঙ্গ বলিয়া তদাকারে আকারিত। ফলকথা নির্গুণ কর্ম্ম ও নির্গুণ জ্ঞানই ভক্তি।

ভক্তির লক্ষণ দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইল এ বড় সুলক্ষণ নয়, আমরা সাধারণভাবে ভক্তি অর্থে যা বুঝি "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" বা "সা কস্মৈ

পরম প্রেমরূপা” ইহার মধ্য হইতে পরা ও পরম কথা বাদ দিয়া সোজা বাঙ্গালায় দাঁড়ায়—ভগবৎ পাদপদ্মে যে একান্ত রতি, তাহার নামই ভক্তি।

অধিকারীভেদে ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; রাগাত্মিকা অহৈতুকী বা মুখ্যা ও বৈধীহৈতুকী বা গৌণ অর্থাৎ নিষ্কাম ও সকাম ভক্তিকে সাধারণতঃ কার্য্য কারিণী বৃত্তি বলা হয়। হৃদয়ের অন্য অন্য বৃত্তির ন্যায় ইহার পরিচালন ও উৎকর্ষ সাধন বিশেষ সাধনা সাপেক্ষ। সাধনা ব্যতীত আমরা কার্য্য-সিদ্ধির অভিমুখে একপদও অগ্রসর হইতে পারি না। ভক্তিসাধনার প্রথম সোপান প্রার্থনা। অবশ্য প্রার্থনার পূর্ব্বাবস্থা ঈশ্বরে বিশ্বাস—একথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বর-বিশ্বাস স্বভাব-সিদ্ধ। ইহা যদি এখন উপলব্ধি করিতে না পার, শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস কর। কেন তুমি শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, তাহার কারণ দেখাইতে পার না। শাস্ত্র তোমায় অসঙ্গত বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন না। দীপশিখা নিম্নমুখী বা খপুষ্পে বিশ্বাস কর—শাস্ত্র মাথার দিব্য দিয়া এ অনুরোধ তোমায় করেন না।

আর অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করিব না বলিলে, তোমায় ঠকিতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিও না ভাই, বলি মাতার কথায় বিশ্বাস স্থাপন ভিন্ন পিতা নিরূপণ করিবার গত্যন্তর আছে কি? গুরুমহাশয়ের কথায় বিশ্বাস স্থাপন ভিন্ন ক এর পর খ কোথা হইতে শিখিলে?

বলিতেছিলাম সাধনার প্রথম সোপান প্রার্থনা। ইহার প্রথম অবস্থায় ঈশ্বর জগতের নির্ম্মাতা কি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নির্গুণ—এ সব বিচারের আবশ্যকতা থাকে না। তিনি মঙ্গলময়, তিনি আমার মঙ্গল করিবেন—এই বিশ্বাস রাখিলেই চলে।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বা প্রার্থনা কিরূপ করিয়া করিতে হয় তাহার শিখাইবার কিছু নাই। সংসারে অভাব নাই কার? “এই অনাদি মোহনিশাসুপ্ত জীবজগতে অনবরত কত দুঃস্বপ্ন উঠিতেছে। জরা, মরণ, হর্ষামর্ষাদি অনর্থ-সঙ্কুল কত বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। তাপত্রিতয়দাবানল জ্বালামালাকুল সংসারারণ্যে কত বিবেক-অন্ধ জীব, নিরন্তর মোমুহ্যমান হইতেছে। অরিষড়বর্গ ব্যাধ-বধ্যমান প্রাণীনিকর কণ্ঠ হইতে কতই কাতর উক্তি নিরন্তর উত্থিত হইতেছে। ধনী হউন, দরিদ্র হউন, পণ্ডিত হউন, মূর্খ হউন, স্ত্রী হউন,

পুরুষ হউন, শূদ্র হউন, ভদ্র হউন, যুবা হউন, বৃদ্ধ হউন, ইংরাজ হউন, বাঙ্গালী হউন এমন কেহই নাই যে, তিনি জীবনে একদিন না একদিন প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই।

দুঃখ নাই কার? শরীরের দিকে চাহিয়া দেখ, ইহার নিত্য রোগ; সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, ইহার নিত্য অভাব; সমাজের উপর চাহিয়া দেখ, তোমার উপর অত্যাচারও বিরল নহে। এতদ্ভিন্ন ধনবানের কটাক্ষ, বিদ্বানের অবজ্ঞা, অহংকারীর ঘৃণা অর্থহীনের প্রতি, সংসারের নির্দ্দয় ব্যবহার নিত্যই আছে। মৃত্যুর দিকে চাহিয়া দেখ—তোমার প্রিয়বস্তু, তোমার প্রাণের প্রাণ তোমার সম্মুখে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিবে; তুমি শতকাতর হইলেও, কেহ তোমার কাতরতায় কর্ণপাত করিবে না। তাই বলিতেছি, সংসারে অভাব নাই কার? প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই এমন লোক বিরল।

প্রার্থনা করিতে করিতে ইহার উপকারিতা অনুভূতি হয়। প্রায় দেখা যায়, প্রার্থনার সফলতা ও নিষ্ফলতার উপর ঈশ্বর-বিশ্বাসের গুরুত্ব বা লঘুত্ব নির্ভর করে। তথাপি ক্রমশঃ অভ্যাসবশে ঈশ্বর-বিশ্বাস্‌ ঘনীভূত হইতে থাকে। প্রথমে তাঁহাকে পরের কথায় দয়াময় ধরিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্‌ বলিতে হৃদয়ে স্বতঃই প্রবৃত্তি আইসে। প্রার্থনা দ্বারা যখন পুনঃপুনঃ ভগবৎ-কৃপা অনুভব হয়, তখন উপাসনা আরম্ভ হয়। প্রথমে নিজের জন্য তাঁহাকে ডাকিয়াছিলে, এখন নিজ জনের জন্য, তাহার পর অপরের জন্য ডাকা আইসে। তখন দুঃখের অবস্থায় ডাকিয়াছিলে, এখন দুঃখ না থাকিলেও ডাকা আপনি আইসে।

প্রথম অবস্থায় নিষিদ্ধ ত্যাগ, দ্বিতীয় অবস্থায় বিহিত গ্রহণ। উপাসনাই ধর্ম্মজগতের দ্বিতীয় সোপান।

উপাসনার বাধা বিঘ্ন অনেক। চিত্তের অস্থিরতা ইহার প্রধান বিঘ্ন। এই জন্য শাস্ত্রে ইহার অনেক কায়দা কানুন আছে, এবং দেশ কাল পাত্র ভেদে ইহার ব্যবস্থাও ভিন্ন। সোজা কথায় পরমহংস ৺শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন, ধ্যান কর্‌বে বনে, মনে, কোনে। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় সকলের পক্ষে বনে ধ্যান করা কতদুর সম্ভব বলিতে পারি না। তবে মনে ও কোনের ব্যবস্থা (impracticable) নহে। মন লইয়াই কথা, ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়—ইহাই লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।

"Ask it shall be given, seek you shall find, knock it shall be open unto you"। ডাকের মতন ডাক, দেখিবে কেমন শ্যামা রইতে পারে। সাধনার প্রথম অবস্থায় সংসারই প্রেম। ভবে শিখিবার স্থান সংসার। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি হইতেই শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ ভাবের আভাস পাওয়া যায়। তবে বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত ঈশ্বরলাভের দ্বিতীয় পন্থা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং তাহা হইবারও নহে—ইহা বলা বাহুল্য। উপাসনা বা নিত্য কর্ম্ম দ্বারা ক্রমে চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইতে অভ্যস্ত হয়। চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাসই ধর্ম্মজগতের তৃতীয় সোপান।

এতদিন ভগবানের প্রসন্নতার উপর লক্ষ্য ও তাঁহার কৃপা অনুভূতি হইত; এখন একাগ্রতার দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে বাসনা, তাঁহার সহিত কথা কহিবার লালসা, তাঁহার বিচিত্র সুন্দর রূপ উপভোগ করিবার ইচ্ছা জন্মে। ক্রমে চিত্ত-শুদ্ধির পথ আরও পরিস্কৃত হইয়া, তাঁহার সহিত একটি সম্পর্ক পাতাইবার ভাব মনে উদয় হইয়া থাকে। তিনি আমার কে, আমার সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাঁহাকে যেন না দেখিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না ইত্যাদি ভাব আইসে। ইহাই ভক্তির উদ্রেক।

ভাব পাকিলেই প্রেম বা পরা ভক্তি। ভক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তিতে সাধকের যে অবস্থা হয় তাহাকে মহাভাব কহে। পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি অষ্ট বিধ অবস্থা মহাভাব প্রকাশক। শ্রীমতী রাধিকা এই অষ্টবিধ ভাবসমষ্টির একমাত্র উদাহরণ। এ অবস্থায় উপাস্য উপাসক ভেদ থাকে না। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এক বস্তু। ইহাই সাধকের চরম অবস্থা।

ভক্তি as ভক্তি সম্বন্ধে—এ প্রবন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাংখ্যেরা যাহাই বলুন, ভক্তি গ্রন্থাদি পাঠ করিলে ইহাতে কোন সংশয় থাকে না;

অধ্যাত্ম রামায়ণ বলেন "ভক্তি দৃঢ়া নৌর্ভবতি"—ভক্তি, ভবসাগরতরণের প্রসিদ্ধ তরণী। ভক্তি প্রসিদ্ধা ভব মোক্ষণায়—ভক্তিই সংসারের মোক্ষের প্রসিদ্ধ সাধন। সংসারতপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে আপনার প্রতি ভক্তিই সংসার-পীড়ায় অভিজ্ঞ জীবের একমাত্র ঔষধ। ভক্তিজ´নৈত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মো´ক্ষ প্রদায়িণী" ইত্যাদি। গীতাও বলেন পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

ধর্ম্মজগতে ভক্তির আবশ্যকতা প্রমাণ জন্য পুরাণাদি হইতে শ্লোক ও ভক্তের জীবনকাহিনী তুলিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার ইচ্ছা নাই। সাংখ্যেরা ব্যতীত ঈশ্বরবাদী অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে ভক্তির নিষ্প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ আছে কি না বলিতে পারি না। রাজার রাজত্বে থাকিয়া রাজকীয় কর দিলাম, তাঁহার আইন কানুন মানিয়া চলিলাম অথচ রাজাকে দেখিয়া মাথার টুপি খুলিলাম না—এ বড় বিষম রাজভক্তি। সাধারণ ভাবে ভক্তি কি বস্তু এবং ধর্ম্মজগতে ইহার আবশ্যকতা কি জানা হইল।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস ভক্তিমার্গ বড় সুগম, যেন লাফ দিলেই হইল উঠিলেই এক কাঁদি। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত হইতে হইলে কত কঠোর তপস্যা, কত সাধনা, কত স্বার্থত্যাগ, কত কাঠ খড় পোড়াইতে হয় তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

নিষেবিতা নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেন মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥
মদ্বিষ্ণ্য দর্শন স্পর্শ পূজাস্তুত্যভি বন্দনৈঃ,
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্বেনাসঙ্গ যেন চ
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া,
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ।

ধনাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া, নিষ্কামে অনতিহিংস্র অর্থাৎ একবারে হিংসাদি বর্জ্জন না করিয়া পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত পূজা-প্রকরণ। আমার প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎব্যক্তিদিগকে বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি যে অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রতা, যম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ, এবং নিরহঙ্কারিতা প্রদর্শন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ।

* * *

মহতা কামহীনেন স্বধর্ম্মাচরণে চ॥

কর্ম্মযোগেন শস্তেন বর্জ্জিতেন বিহিংসনম্।
মদ্দর্শনস্তুতি মহাপূজাভিঃ স্মৃতি বন্দনৈঃ॥
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সাঙ্গেনাসত্যবর্জ্জনৈঃ
বহুমানেন মহতাং দুঃখিনামনুকম্পয়া॥
স্বসমানেষু মৈত্র্যা চ যমাদীনাং নিষেবয়া
বেদান্ত বাক্য শ্রবণান্মম নামানুকীর্ত্তনাৎ॥
সৎসঙ্গেনার্জ্জবেনৈব হ্যহমঃ পরিবর্দ্ধনাৎ
কাঙ্ক্ষয়া মম ধর্ম্মস্য পরিশুদ্ধান্তরো জনঃ॥

নিষ্কাম স্বধর্ম্মপালন, হিংসা পরিত্যাগ, আমার দর্শন, স্মরণ, বন্দনা, স্তব ও মহাপূজা, সর্ব্বভূতে আমাকে ভাবনা করা, দুষ্টসঙ্গ ত্যাগ, অসত্য বর্দ্ধন, মহৎ ব্যক্তিদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, দুঃখীর প্রতি দয়া প্রকাশ, তুল্য ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, যম নিয়মাদি সেবা, বেদান্তবাক্য শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সৎসঙ্গ, অহংবুদ্ধি পরিহার, এবং মৎপূজাদি ধর্ম্মে একান্ত অভিলাষ"।

অধ্যাত্মরামায়ণ উত্তর কাণ্ড ৭ম অধ্যায়।

এই হইতেছে ঐকান্তিক ভক্তির recipe দুইখানি prescriptionই এক, যেন এক জায়গায় বসিয়া c0nsultation করিয়া লেখা। ইহা পাঠ করিলে অনেক খুচরা ভক্তই আপন আপন মাথায় হাত দিয়া বলিবেন—প্রভো, তবে আমার চিনি খাওয়া হইল না, আমি চিনি হইব। যাইহোগ ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইবার কারণ নাই এ সেকেলে ব্যবস্থা; এ কলিযুগে নানা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উন্নতির সহিত এ ব্যবস্থারও অনেক কাটানছিড়েন করা হইয়াছে আপনার মুখে শুনিয়াছি। আর এক কথা—পূর্ব্বে ভক্তিকে কার্য্যকারিণী বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এমনও অনেকে বলেন যে, কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। এ গোলের কথা। এবং সেকেলে কৃষ্ণযাত্রার শুক শারীর ঝগড়ার ন্যায় জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড়, এ বিবাদও সময়ে সময়ে উঠিয়া থাকে।

এক পক্ষ নাকিসুরে বামা গলায় গাইয়া থাকেন—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥

অভাগীয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥

অন্য পক্ষ ধ্রুপদি বাজখেঁয়ে আওয়াজে আলাপ করেন—

কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং
ব্রত পরিপালনমথবা দানং
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দ মূঢ়মতে।

ফলে আমরা গরীব দু'টানে পড়িয়া মারা যাই। যাহা হউক এ সব বড় কথা। আমরা আদ্র বণিক, অর্ণবপোতের সংবাদের ধার ধারি না। তবে এই পর্য্যন্ত শিখিয়াছি যে,আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিয়া মুক্তিই হউক বা ভগবানের সঙ্গলাভ সুখই হউক বিশেষ সাধনা সাপেক্ষ।

গীতোক্ত কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন সাধনপ্রণালী। ইহার মধ্যে কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের অন্তর্নিবিষ্ট। এতদুভয়ই কর্ম্মসাপেক্ষ। মুক্তি উভয়েরই অবিভাজ্য সাধারণ সম্পত্তি। মুক্তাবস্থা ভক্তিমার্গের পক্ষে যেমন অবশ্যম্ভাবী, জ্ঞানমার্গের পক্ষেও ঠিক তদনুরূপ; এবং প্রকৃত ভক্ত ও প্রকৃত জ্ঞানীর মধ্যে line of demarction টানিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল কথার কচ্ কচি। বড় যদি বলিতে হয়, তবে কর্ম্মকাণ্ডকেই বল; কারণ জ্ঞান, ভক্তি উভয়ই কর্ম্মসাপেক্ষ। বিনা কর্ম্মে কিছুই হইবার নয়। ছোট হইয়াও বড়।

আপনার মুখে যাহা শুনিয়াছি, বই পড়িয়া যাহা শিখিয়াছি—বুঝিতে পারি বা নাই পারি, উপলব্ধি করিতে পারি বা না পারি,—না পারি কেন, পারি নাই, তাহা কোন রকমে উদ্গীরণ করিলাম।

শেষ আমার বিনীত নিবেদন ও জিজ্ঞাস্য এই শাস্ত্র যাহাই, বলেন বলুন' শাস্ত্র সুখে থাকুন। তবে একথা বলিবার কি সকলের অধিকার নাই যে, প্রভো—আমি দীন, অতিদীন, সংসারক্লেশ-ক্লিষ্ট, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, ভক্তি শ্রদ্ধা বিহীন। শুনেছি তুমি দয়ার সাগর, পতিতের পাবন, দীনের বন্ধু, শরণাগতের রক্ষক। তাই বলি হে প্রভো, হে সর্ব্বাশ্রয়, হে সন্তানবৎসল, আমি যাহাই হই, যতই মলিন হই, আমি তোমারই, আজ তোমারি শরণাগত। স্বদেশে যাইবার আমার দিন সংক্ষেপ যথাপ্রয়োজন পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

সম্মুখে ভীষণ কান্তার, দিনমণি অস্তগ্রস্ত প্রায়। তাই আজ তোমার শরণাগত হে জগদীশ! হে জগন্নাথ! তুমি আমার যাহা হয় কর ত্বমস্য শরণং মম দীনবন্ধো। কেন এ কথা বলিবার অধিকার ত সকলেরই আছে। ইহাতে ত পয়সা খরচা নাই। সংসার-সুখের ইহা অন্তরায় নহে। তবে আমরা প্রাণ খুলিয়া ইহা বলিতে পারি না কেন?

পারিনা বলিয়াই বলিনা, না বলিনা বলিয়াই পারি না?

শ্রীভো.........

শ্রীপঞ্চমী।

(১)

বিসর্জ্জনে চক্ষুদান।

শ্রীপঞ্চমী আসিয়া পড়িল। আরও কতদিন আসিবে তাহা বলা যাইতেছে না। তবে ইহা স্থির যাহা সত্য তাহা চিরদিন ছিল, আছে, থাকিবে। এখন জগতে যাহা হইতেছে তাহা কতবার হইয়া গিয়াছে, আরও কতবার হইবে। চিরদিনই দিন যাইবে আবার রাত্রি আসিবে। রাত্রি যাইবে দিন আসিবে। ভয়ের কারণ কিছুই নাই। ধৈর্য্য ধরিয়া দিনের কার্য্য দিনে ও রাত্রির কার্য্য রাত্রিতে করাই সাধু পরামর্শ।

জগতে যাহাকে বিসর্জ্জন দিতেছে, তুমি সেই বিসর্জ্জনকালে তাহার চক্ষুদানের ব্যবস্থা কর কেন?

দিউক জগৎ বিসর্জ্জন—তোমার সেবক দেখিতেছে বিসর্জ্জনেই প্রতিষ্ঠা। তুমি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী, তুমি বাগ্‌বাদিনী,—তুমি প্রসন্ন হও আমরা বিসর্জ্জনে চক্ষুদান দেখি, আমরা বিসর্জ্জনে প্রতিষ্ঠা আলোচনা করি।

মূর্ত্তির বিসর্জ্জন কি হইয়া গিয়াছে?

এখনও হয় নাই। বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছে মাত্র। অন্য দিক্ দিয়া বিসর্জ্জনে প্রতিষ্ঠা হইতেছে। আমরা সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিব।

আধুনিক বিজ্ঞান শক্তির সর্ব্বপ্রাধান্য স্বীকার করিতেছেন। ইহাও বলা

হইতেছে যে, যদি ব্রহ্মের অস্তিত্ব করিতে হয়; তবে বলা হউক শক্তির সাম্যাবস্থাই (equilibrium) ব্রহ্ম। সত্ত্ব রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থাই ব্রহ্ম। সাম্যাবস্থার মধ্যেই বৈষম্যের বীজ আছে। সমভাব কিছুদিনের জন্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত বৈষম্য থাকাতেই, আপনা হইতেই গুণবৈষম্য ঘটে—তাহাতেই এই সৃষ্টি।

সাম্যাবস্থাটি অব্যক্ত। এই অব্যক্তটিই ব্রহ্মাবস্থা। ঐ অব্যক্তে যে গুণত্রয় থাকে তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশ হইতে চায়, তম তাহাকে বাধা দেয়, আর রজ সেই বাধা অতিক্রমে চেষ্টা করে। এই প্রকাশ, বাধা ও চেষ্টার ব্যাপারে জগতের সৃষ্টি। চিরদিন ইহা আছে, তাইসৃষ্টি স্থিতি ও লয় চিরদিনই আছে, হইতেছে ও হইবে।

মহাপ্রলয়ে শক্তি যখন সাম্যাবস্থা লাভ করেন, তখন সৃষ্টির কিছুই থাকে না। সুষুপ্তিতে দুই থাকে না—এক মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। কিন্তু সাম্যাবস্থা চিরদিন থাকে না। ইহা কিছুক্ষণের জন্য। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নরূপে ভাসে, আবার স্বপ্ন যাহা তাহাই স্থূল হইয়া জাগ্রৎ অবস্থায় পরিণত হয়—সেইরূপ অব্যক্তও সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্থূল ব্যক্তাবস্থায় পরিণত হয়। শক্তির স্বভাবই অব্যক্ত হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন। স্বভাবের পরিবর্ত্তন কখন হয় না এজন্য সৃষ্টিও চিরদিনের।

বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য তাহার আলোচনা করা যাউক।

আমরা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সহিত অন্য সিদ্ধান্তের তুলনা করিয়া ইহার দোষ গুণ বিচার করিব।

সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ সাম্যাবস্থা লাভ করিয়া অব্যক্তাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ইহা ব্রহ্ম হইয়া যায় না। কারণ গুণের সাম্যাবস্থা যাহাকে বলা হইতেছে তাহা অব্যক্ত সত্য, কিন্তু সীমাশূন্য নহে। শক্তি পরিচ্ছিন্ন। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন। অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের এক পাদের অংশৈকদেশে মাত্র শক্তির খেলা হয়। অন্য ত্রিপাদ, পরমশান্ত অচলন অবস্থায় সর্ব্বদা স্থিত। শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিতেছেন

ত্রিপাদূর্দ্ধং উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।

ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ পুরুষসূক্ত।

চতুষ্পাদ পুরুষের পাদমাত্রে এই সৃষ্টিসংহারাত্মক শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। গীতা।

পরিপূর্ণ চলনরহিত পরমশান্ত নিগুর্ণ ব্রহ্মের একপাদ মাত্র মায়া বা শক্তি দ্বারা পুনঃ পুনঃ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় যাতায়াত করিতেছে।

শক্তির সাম্যাবস্থাই যদি ব্রহ্ম হয়েন তবে ব্রহ্মের পরমশান্ত ত্রিপাদ থাকার কোন আবশ্যক নাই। বিজ্ঞানের সহিত শ্রুতির বিরোধ এইরূপে দেখান যায়।

বিজ্ঞান যখন মণিপ্রভাকেই মণি বলিয়া ভ্রম করিতেছেন, তখন এই ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলা যাইতে পারে। সম্বাদীভ্রম অবলম্বন করিয়াও চিন্মণি লাভ হইতে পারে - যদি ঐ প্রভাতেই বিজ্ঞান আটকাইয়া না যায়।

প্রভা কিন্তু অনেক প্রকারের হইতে পারে। প্রভা একরূপ হইলেও যে যে বস্তু হইতে প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে তাহারা এক নহে। অন্ধকার গৃহ হইতে প্রদীপের প্রভা বাহির হইতেছে। সেই প্রভা ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে, মণি পাওয়া যাইবে না। ইহা বিষম্বাদী ভ্রম। মণিপ্রভাকে মণিভ্রম করিয়া মণিলোভে ধাবমান হইলে, যদিও সম্বাদীভ্রমে পতিত হওয়া যায়, তথাপি মণিলাভ হইতে পারে; কিন্তু প্রদীপের প্রভাকে মণিভ্রম করিয়া মণিলোভে ধাবমান হইলে, বিষম্বাদীভ্রমে পতিত হইতে হয়। ইহাতে কখন মণিলাভ হইতে পারে না। আমরা আশা করি, বিজ্ঞানের ভ্রম যেন সম্বাদীভ্রমই হয়; তবেই একদিন বিজ্ঞান, অনন্ত অখণ্ড চিন্মণির দিকে ছুটিতে পারে।

ব্রহ্মসম্বন্ধে মায়াশবলিত অতএব পরিচ্ছিন্ন সগুণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত জানা যায়। নিগুর্ণ ব্রহ্মকে জানা যায় না। নিগুর্ণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা যায়। সগুণ ব্রহ্মকে ধরিতে পারিলে যখন তাঁহা হইতে মায়াকে পৃথক্ করা যায়—যখন প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে পৃথক্—বিচার দ্বারা ইহা উপলব্ধি করা যায়—তখনই নিগুর্ণ ব্রহ্মকে জানা যায়। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা এই জ্ঞান পরিপক্ক হইলে যখন তত্ত্বাভ্যাস হয়, এবং সমকালে মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইয়া যায় তখনই বিদ্বৎসন্ন্যাসী ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করেন। এই স্থিতিলাভ না হইলে যে উপাসনা, তাহাই সগুণ উপাসনা। মূর্ত্তি, সগুণ উপাসনার অবলম্বন। যাঁহারা মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে চান, তাঁহারা ঠিক মত উপাসনাতত্ত্ব বুঝিলেই, মূর্ত্তির চক্ষুদান করিবেন।

(২)

সরস্বতী-বরণীয় ভর্গ।

তুমি বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেবতা, তুমি বাগ্‌দেবী—শ্রীপঞ্চমীতে তোমার পূজা হয়। পূজা এখনও অনেককে করিতে হয়। কিন্তু "দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজাং কথং ভবেৎ?" দেবতার সহিত যদি পরিচয় না থাকে, বল তবে পূজা কিরূপে হয়? এই জন্য দেবতার একটু পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি।

দেবতার সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় হইলে পূজাও থাকে না, ইহা সত্য-কথা। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন পূজাও আছে, পরিচয়ও লওয়াও আবশ্যক।

সম্পূর্ণ জানা হইলে পূজা হয় না। কারণ এ ক্ষেত্রে জানা ও হওয়া এক। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মই হওয়া হইয়া যায়; ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ হয়। ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে জানাই ব্রাহ্মীস্থিতি। অপরোক্ষভাবে না জানা পর্য্যন্ত পূজা।

কে জানে? চেতনেরই জ্ঞান আছে। জড়ের [যদি জড় বলিয়া কিছু থাকে] অথবা যাহাকে জড় বলা যায় তাহার জ্ঞান নাই। চেতনই জ্ঞাতা, চেতনই দ্রষ্টা—জ্ঞাতাকে জানা কিরূপ? দ্রষ্টাকে দেখা কিরূপ?

খণ্ডজ্ঞাতা, খণ্ডদ্রষ্টা—ইঁহারা দেখেন জানেন। অখণ্ডভাবে গেলে জানা ও দেখা অখণ্ড হইয়া যায়। অখণ্ডজ্ঞাতা অখণ্ডদ্রষ্টা এক। সেখানে দুই নাই। তাই বলা হইল ব্রহ্মকে জানাই ব্রাহ্মীস্থিতি।

এই যে বাগ্‌দেবী, বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ ইনি কে? দেবতার যত মূর্ত্তি আছে, ইঁহার প্রত্যেকটিই বরণীয় ভর্গ।

সেই দীপ্তিশীল, ক্রীড়াশীল সবিতার বরণীয় ভর্গই জগৎজীবের উপাস্য। ইনি সগুণব্রহ্ম। অনন্তমূর্ত্তি ইঁহারই। ইনিই প্রণব। ইনিই গায়ত্রী। ইনিই সরস্বতী। ইনিই বাগ্‌দেবী। ইনিই ব্রহ্মময়ী। নির্গুণব্রহ্মকে সগুণ ভাবেই পাওয়া যায়। সগুণ ভাবেই জানা যায়। নির্গুণ অবস্থায় স্থিতিলাভ হয় মাত্র। সগুণ অবস্থা যে জানা যায়—তাহা কেবল গুণযুক্ত বলিয়া।

ব্রহ্মের স্বরূপটি নির্গুণ। ব্রহ্ম স্বস্বরূপে অপরিচ্ছিন্ন। তিনি সর্ব্বদা স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। ইঁহারই উপরে স্বভাবতঃ একটা ইন্দ্রজাল ভাসে।

মায়া তাঁহার উপরে ভাসিয়া পূর্ণ-চৈতন্যের আভায় আভাময়ী হইয়া ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন মত দেখান। মায়া অচেতন হইয়াও ব্রহ্মপ্রভায় ব্রহ্মময়ী হইয়া কর্ম্ম করেন। অবুধজনে প্রকৃতির কর্ম্ম সমুদায়কে নিগু‍র্ণব্রহ্মে আরোপ করে মাত্র। ব্রহ্মে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব মায়ার কল্পনা মাত্র।

আভাজড়িত মণিই সগুণব্রহ্ম। ইনিই মায়াশবলিত ব্রহ্ম। মায়া সর্ব্বদা ত্রিগুণময়ী। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাটিই বরণীয় ভর্গ। বরণীয় ভর্গ সর্ব্বদা আদিত্য-পথগামিনী।

শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা লাভ কর—দেখিবে রজস্তমের আকর্ষণ আর নাই। গ্রহণ কিছুই নাই, সব ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ত্যাগ হইয়া গেলেই, সমস্ত আকর্ষণ ছুটিয়া কালে সত্ত্বটি উর্দ্ধমুখে ছুটিবেই। তুমি বিচার দ্বারা নিত্যসত্ত্বস্থ হও—দেখিবে ইহা তোমাকে ব্রহ্মের সহিত মিলাইয়া দিবে।

বরণীয় ভর্গ সর্ব্বদা ব্রহ্মের সহিত মিশিতে যাইতেছেন। যে ইঁহার উপাসনা করিবে, সেই মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া পিতার সহিত মিশিতে পারিবে।

সমস্ত দেবদেবী এই বরণীয় ভর্গেরই মূর্ত্তি।

(৩)

পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুক্তিতে দেখা যায়, যতদিন চিত্তশুদ্ধি না হইতেছে ততদিন মূর্ত্তি-পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার শাস্ত্রপ্রমাণেও দেখা যায়—প্রাচীন ঋষিগণ সরস্বতী পূজা করিতেন। সরস্বতী-রহস্যোপনিষদ্ ইহার প্রমাণ।

প্রতিমাপূজার কথা যে সমস্ত উপনিষদে আছে, তাহাকে যদি তুমি ঋষিপ্রণীত না বলিতে চাও তজ্জন্য তুমি কি যুক্তি দিবে? ভগবান্ শঙ্কর দশখানি উপনিষদের টীকা করিয়াছেন বলিয়া, তুমি ঐ দশখানিকেই প্রাচীন বলিতে চাও। এই যুক্তিতে অন্য উপনিষদ্‌গুলি প্রক্ষিপ্ত ইহা প্রমাণ হয় না।

মুক্তিকোপনিষদ্ বলেন, মুক্তির জন্য মাণ্ডূক্য উপনিষদই যথেষ্ট। ভগবান্ গৌড়পাদ এই জন্য ইঁহার টীকা করিয়াছেন। যদি একখানিতে না হয়, তবে ঐ উপনিষদ্ বলিতেছেন—দশোপনিষদং পঠ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের

কার্য্য-নিষ্পত্তি জন্য দশখানি মাত্র প্রয়োজন হইয়াছিল। ভগবান্ গৌড়-পাদের কার্য্য একখানিতে হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যের শিষ্য দশখানিতে কার্য্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহাতে যাঁহাদের না হইবে, তাঁহাদের জন্য ৩২ খানি। তাহাতেও না হয় ১০৮ খানি। অন্যগুলি অপ্রামাণিক—ইহার যুক্তি তুমি দিতে পার না। তোমার মত আধুনিকের কথা শুনিয়া প্রাচীন ঋষিগণের কথায় অশ্রদ্ধা করা বাতুলতা মাত্র। অন্য শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞান ১০৮ খানি উপনিষদে রহিয়াছে। অন্য জাতি প্রতিমাপূজা করে না, অতএব যে সমস্ত উপনিষদে প্রতিমাপূজার কথা আছে, তাহা আধুনিক—এ যুক্তি নিতান্ত অসার। অন্য জাতি যদি প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলেও কি তাঁহাদের সাংসারিক উন্নতি দেখিয়া এবং আধ্যাত্মিক অবনতি লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাদের অনুকরণ করিতে হইবে? ঋষিগণের বাক্যে অবিশ্বাস করিতে যিনি বলেন, তাঁহার কথায় মানুষ কয়দিন বিশ্বাস রাখিবে?

আমরা শ্রদ্ধাশীল সাধকের বিশ্বাস পরিপুষ্টি জন্য সরস্বতী রহস্যোপনিষদের অনুবাদ এই প্রবন্ধে দিলাম। সরস্বতী কে, কি প্রকারে ইঁহার উপাসনা করা হইত—এই উপনিষদ্ পাঠ করিয়া তাহা জানা আবশ্যক।

সরস্বতী দেবীকে জানিয়া ভক্তিভাবে সরস্বতী পূজা করিলে, অবশ্যই তিনি প্রসন্ন হইবেন।

বরণীয় ভর্গ প্রসন্ন হইলেই অবশ্যই তিনি আমাদিগকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবেন। আর অধিক কি বলিব। আমরা মূর্খ, তথাপি শাস্ত্র-বিশ্বাসী। তুমি প্রসন্ন হও, এই বলিয়া তোমার আজ্ঞাপালন করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। অন্য সমস্ত ভার তোমার উপর।

অথ সরস্বতীরহস্যোপনিষত্

ভূমিকা।

বেদে শ্রীসরস্বতীর উপাসনা আছে। ভগবান্ আশ্বলায়ন ঋক্‌মন্ত্র ও বীজ-মিশ্রিত সরস্বতীদশশ্লোকী দ্বারা এই মহাসরস্বতীর উপাসনা করেন, করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। শ্রীসরস্বতীরহস্যোপনিষদে ইহা দৃষ্ট হয়।

আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বত্র দেখা যায় নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম ও মূর্ত্তি এই তিন ভাবে পরমপুরুষকে ধারণা করিতে বলা হইয়াছে। এই তিনের কোন একটি বাদ দিলে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র বুঝা যাইবে না। এই তিনের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মই স্বরূপ। স্বরূপটি সর্ব্বদা অবিজ্ঞাত বলিয়া, তাঁহার মায়াগুণযুক্ত সগুণরূপ ও মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার উপাসনার বিধি। কিন্তু সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তিটি স্বরূপে স্থিতি ভিন্ন হইবে না। স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার কেহ নাই—যন্ন বেদা বিজানন্তি মনোযত্রাপি কুণ্ঠিতম্। ন যত্র বাক্ প্রভবতি। বেদও জানেন না, মন কুণ্ঠিত হয়, বাক্যও স্ফ রিত হয় না। এইটি স্বরূপ। যেমন সুষুপ্তিতে স্থিতিলাভ হয়, কিন্তু সুষুপ্তি-কালে বলা যায় না আমি সুষুপ্ত—অথচ সুষুপ্তিভঙ্গে অনুমান করা যায় সুষুপ্তি অবস্থা কিরূপ, ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তাই। তুরীয় অবস্থা না উল্লেখ করিয়া সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল; কারণ সুষুপ্তি সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা যায়, কিন্তু তুরীয় সম্বন্ধে আদি অন্ত কিছুই ধরিবার উপায় নাই। চতুষ্পাদ ব্রহ্মের তিনপাদ তুরীয়, একপাদের একদেশে মায়ার খেলায় এই জগৎ।

চতুষ্পাদ ব্রহ্মের একপাদের একদেশে যে জগৎ তাহা ব্রহ্মের তুলনায় সূর্য্য-কিরণে ত্রসরেণুর মত। পরমার্কের উদয়ে ত্রসরেণুর মত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে, লয় পাইতেছে। ত্রসরেণুর মত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোন এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই, মানুষ কত মতামত চালাইতেছে—ইহারা পরিপূর্ণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কি বলিবে? মায়াসাগরে নিমজ্জিত হইয়া, মায়ার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া ইহারা সর্ব্বদা এককে আর দেখিতেছে—ইহারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিবে কি?

নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতিও অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, নেতি নেতি ভিন্ন কিছুই বলেন না।

পরমব্রহ্ম পরাবাক্। মণির যেমন ঝলক উঠে, সেইরূপ অনন্ত অখণ্ড চিন্মণি হইতে স্বভাবতঃ যে ঝলক উঠে,—চিন্মণির সেই স্পন্দধর্ম্মাত্মিকা বাসনারূপটিই মায়া, সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত পরমশান্ত ব্রহ্মের যে কাল্পনিক চলন, তাহাই মায়া। মায়াকেই ব্রহ্ম বলা যায় না, যেমন মণির প্রভাকে মণি বলা হয় না সেইরূপ। আভাজড়িত মণি যিনি, তিনি মায়াশবলিত ব্রহ্ম। এই ঝলক-জড়িত মণিটিই সগুণ ব্রহ্ম। ইনি পশ্যন্তি বাক্। বরণীয় ভর্গ ইনিই। প্রণব, সমস্ত মন্ত্র, সমস্ত দেবমূর্ত্তি এই বরণীয় ভর্গ। মণির ঝলক যেটি, ব্রহ্মের মায়া যিনি, সেই প্রভাটি মধ্যমা বাক্।

মায়াশবলিত সগুণব্রহ্মের যে বাহিরের রূপ তাহাই বিরাট্পুরুষ—তাহাই বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপই বৈখরীবাক্। তুরীয় ব্রহ্মের উপর মায়ার স্বাভাবিক উদয়ে সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রৎ এই তিন মায়িক অবস্থা যাতায়াত করে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে শক্তি বা মায়ার অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনই সৃষ্টি। আবার সেই স্পন্দনাত্মিকা মায়াশক্তির ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় যে গমন—তাহাতেই মহাপ্রলয়। যে স্পন্দনের বহির্ম্মুখ, আগমনে সৃষ্টি, সেই স্পন্দন যখন চলনরহিত পরমশান্ত ব্রহ্মবস্তুকে স্পর্শ করিতে ছুটিয়া যান, মহাকালী নৃত্য করিতে করিতে যখন মহাকালকে স্পর্শ করেন, তখনই মহাপ্রলয় ঘটে।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব মহাকালীর এই নৃত্য-বর্ণনাকালে বলিতেছেন—

ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং পচ পচ সহসা
ঝম্যঝম্যং প্রঝম্যং
নৃত্যন্তি শব্দবাদ্যৈঃ স্রজমুরসি শিরঃ
শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
পূর্ণং রক্তাবসানাং যমমহিষমহা-
শৃঙ্গমাদায় পাণৌ
পায়াদ্বো বন্দ্যমানঃ প্রলয়মুদিতয়া
ভৈবরঃ কালরাত্র্যা॥

ভগবতী কালীরূপিণী ময়ূরী যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিষধর ভুজঙ্গ সকল গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করেন, যখন সূর্য্যাদি দেবদানবগণের

বিবিধ বর্ণের মস্তক কমলমালা দ্বারা গ্রন্থন করিয়া তাহাই কণ্ঠে ধারণ করেন,—আবার ঐ মালার সহিত যখন কৈলাস, মেরু, মন্দর, দহ্য প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী ঐ মালার সঙ্গে তাঁহার গলদেশ হইতে দোদুল্যমান হয়, তখন বাস্তব পক্ষে শৈলকাননাদি সমবেত সেই পূর্ব্বতন ব্রহ্মাণ্ডই মহাপ্রলয়কালে এক মহাপিণ্ডাকার ধারণ করিয়াই নৃত্য করিতে থাকে। প্রলয় তাণ্ডব কি ভয়ানক! সমুদ্র পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পর্ব্বত অত্যুচ্চ গগনে উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, আকাশ চন্দ্রসূর্য্যের সহিত ভূমণ্ডলের অধঃপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। আকাশে যে স্থানে চন্দ্র সূর্য্য ছিল, সেই স্থানে পাহাড় পর্ব্বত সহ বনজাল উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে। সমস্ত জগৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া, সাগরস্রোতে নিপতিত তৃণের ন্যায়, নৃত্যবেগে দিক্‌প্রান্তে গিয়া ঘুরিতে থাকে।

ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, হে শ্রোতৃবর্গ! যে মহাদেবী, মহাপ্রলয়ে মস্তক গরুড়পক্ষনির্ম্মিত শিখায় বিভূষিত করেন, যিনি গলদেশে মুণ্ডমালাধারিণী, যিনি হস্তে যম মহিষের বিশাল শৃঙ্গ লইয়া পরমানন্দে ডিমি ডিমি ঝম্য ঝম্য পচ পচ ইত্যাকার পদশব্দে নৃত্য করেন, আর ঐ নৃত্যকালে সেই কালভৈরবের দিকে মধ্যে মধ্যে কটাক্ষ করেন—হে শ্রোতৃবর্গ! ভগবতী কালরাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্যমান সেই কালরুদ্র তোমাদের রক্ষা করুন।

এই স্পন্দশক্তিই মহাপ্রলয়ে মহাকালী, ইনিই সৃষ্টিসময়ে মহাসরস্বতী। শ্রুতি ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলেন—

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদীদ্বিপদীসা
চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্।

নিগু‍র্ণব্রহ্মরূপ পরমব্যোমে প্রতিষ্ঠিতা গৌরবর্ণা শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্‌দেবী পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণ, পদ, বাক্যসকল সৃষ্টি করিয়া শব্দ করিয়াছিলেন ইত্যাদি। বাক্‌ই পরাপশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। বৈখরী বাক্‌ই মনুষ্য জানে। অন্য তিন অবস্থা গুহানিহিত। শ্রুতি ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন।

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানিতানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥

আবার এই স্পন্দশক্তিই আবির্ভাব ও তিরোভাবের অন্তরালে—সৃষ্টি ও সংহারের মধ্যকালে স্থিতিরূপিণী মহালক্ষ্মী।

মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী সেই একই স্পন্দনাত্মিকা মহাশক্তি-মায়া। অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিয়া ইনিই রূপ ধারণ করেন। ইঁহার মুর্ত্তিরই পূজা হয়।

শ্রীসরস্বতী উপনিষদে কিরূপে ইহার উপাসনা করিতে হয় তাহা বলা হইয়াছে। প্রথম দশশ্লোকে সরস্বতী দশশ্লোকী মহামন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি, কীলক এবং বিনিয়োগ-বিধি আছে। অঙ্গন্যাস আছে, ধ্যান আছে, ঋক্ মন্ত্র আছে। এই দশ মন্ত্রে স্বরূপের কথা বলিয়া শেষ ৩৩ শ্লোকে ইঁহার মূর্ত্তি ও সৃষ্টিতত্ত্বাদি সহ প্রার্থনার কথা আছে। আমরা ঐ উপনিষদের অনুবাদ এবং প্রশ্নোত্তর সহ কঠিন তত্ত্বের অর্থ-আলোচনার প্রয়াস করিতেছি। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্য কাব্যতীর্থ ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। সময়াভাবে তিনি প্রশ্নোত্তরে ইহাকে সুগম করিবার অবসর পান নাই। তাহাও যথাসাধ্য করা হইল। ইহা জানিয়া সরস্বতীপূজা করিলে, তোমার আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করা হয়। অধিক বলিবার কি আছে। তুমি প্রসন্ন হও, ইহাই প্রার্থনা।

উপসংহারে আমরা আর দুইটি কথা বলিব। একটি সাধকের প্রতি, দ্বিতীয়টি সমালোচকের প্রতি।

বরণীয় ভর্গই আর্য্যজাতির একমাত্র উপাস্য। বরণীয় ভর্গটি বুঝিয়া সমস্ত মন্ত্র, সমস্ত মূর্ত্তি, সমস্ত দেবতা যে এই ঝলকজড়িত মণি, এই শুদ্ধসত্ত্ব মায়ামণ্ডিত ব্রহ্ম—এইটি মনে রাখিয়া সাধনা করিলে, এই বরণীয়-ভর্গই আমাদিগকে নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছাইয়া দিবেন; কারণ ইনিই গায়ত্রী, ইনিই মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী; ইনিই আদিত্যপথগামিনী। রজস্তম অভিভূত করিলেই, শুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হয়। শুদ্ধ সত্ত্ব সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে গমন করেন।

সমালোচকদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যে বলেন ১০ খানি উপনিষদ্‌ই প্রামাণিক, অন্যগুলি আধুনিক—এ সমালোচনা তাঁহারা পান কোথায়? আর্য্যজাতির শাস্ত্রনিহিত সমস্ত জ্ঞান এই ১০৮ খানি উপনিষদে দৃষ্ট হয়। ভগবান্ শঙ্কর ১০ খানির ভাষ্য করিয়াছেন, তাই ১০ খানি মাত্র উপনিষদ্—অন্যগুলি বাজে গ্রন্থ—এই কি যুক্তি? ভগবান্ শঙ্করের পরমগুরু

ভগবান্ গৌড়পাদ, একমাত্র মাণ্ডূক্যোপনিষদের কারিকা করিয়াছেন—তবে কি বলিতে হইবে ঐ খানি মাত্র প্রামাণিক? ভগবান্ শঙ্কর নিজের প্রয়োজন বুঝিয়া দশ খানির ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, যেমন তৎপূর্ব্বে গৌড়পাদাচার্য্য মুক্তিকোপনিষদের উপদেশ মত এক মাণ্ডূক্য মাত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন।

এক মাণ্ডূক্যেই মুক্তি হয়। যদি না হয়, দশোপনিষদং পঠ। যদি তাহাতেও না হয়, ৩২ খানি পাঠ কর; যদি তাহাতেও না হয়, ১০৮ খানিতে হইবেই। মুক্তিকোপনিষদ্ ইহাই বলিতেছেন।

আর মূর্ত্তি উপাসনার কথা আছে বলিয়া, ঐ উপনিষদ্গুলি ত্যাগ করিবে —এ যুক্তি দেয় কে? এ যুক্তিতে মহাভারত, রামায়ণ, সমস্ত পুরাণ, সমস্ত তন্ত্র, সমস্ত গীতা, অধিকাংশ উপনিষদ্ বা বেদ সমস্ত ত্যাগ করিতে হয়। বেদ-প্রমুখ শাস্ত্রের কথা অমান্য করিয়া, যুক্তির কথা অগ্রাহ্য করিয়া, কোন্ আধুনিকের পরামর্শে হিন্দু অবিশ্বাসী হইবে? মূর্ত্তির বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই আবশ্যক হইলে প্রমাণ করা যাইবে।

শ্রীসরস্বতীরহস্যোপনিষদ্।

ওঁ প্রতিযোগী বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মবিদ্যৈক গোচরম্।
অখণ্ড নির্ব্বিকল্পং তরামৎ চন্দ্রপদং ভজে ॥১।

যাঁহার প্রতিযোগী নাই,—যিনি অতুলনীয়,—একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার ফলে যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অখণ্ড নির্ব্বিকল্প সেই শ্রীরামচন্দ্রের পরমপদ আমরা ভজনা করি ॥১॥

শিষ্য—আধুনিক মত শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য। শ্রীরামচন্দ্র ভজিলে কি হইবে?

গুরু—কোন যুক্তিতে ইহা পাওয়া যায় না, প্রাচীন কোন শাস্ত্রেও ইহা নাই। শ্রুতিতে পাওয়া যায় ওঁ যো রামঃ কৃষ্ণতামেত্য ইত্যাদি। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়:—

(১) অহমেবাস পূর্ব্বস্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎসম্বিৎ পরব্রহ্মৈক নামকম্ ইত্যাদি।

(২) রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ইত্যাদি।

শাস্ত্রের মত সমস্ত দেবতাই বরণীয় ভর্গ। যিনি যাহার উপাসনা করুন না

কেন—মূর্ত্তিকে বিশ্বরূপে এবং বিশ্বরূপকে নিগুর্ণব্রহ্মে দেখিতে না পারিলে, তাঁহার দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি হইবে না। তুরীয় পদটি পরমপদ। সমস্ত উপাসনার লক্ষ্য ঐ পরমপদে স্থিতি। মূর্ত্তি বহু, কিন্তু ব্রহ্ম এক। বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত হইলে মানুষের আকার ভিন্ন ভিন্ন দেখায় বটে, কিন্তু মানুষটি একই থাকে; সেইরূপ নাম রূপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখায় বটে, কিন্তু পরমভাবটি, ব্রহ্মচৈতন্যটি সর্ব্বদাই এক। বহুমূর্ত্তিতে সেই একেরই ভজনা হয়। ভূমিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব-আভাসে সেই এক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই সরস্বতীরহস্যোপনিষদে সেই একেরই তত্ত্ব আলোচিত হইবে॥

বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিত—
মাবিরাবীর্ম এধি॥ বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা
প্রহাসীরণেনাধীতেনাহোরাত্রান্‌সংদধাম্যৃতং
বদিষ্যামি॥ সত্যং বদিষ্যামি॥ তন্মামবতু॥ তদ্বক্তারমবতু
মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ॥ শান্তিঃ॥ শান্তিঃ॥

শিষ্য—ইহা কি?

গুরু—ইহা শান্তিপাঠ মন্ত্র। পূর্ব্বে মাণ্ডূক্য উপনিষদের প্রথমে চারি বেদের শান্তিপাঠ মন্ত্রের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। প্রতি বেদের শান্তিপাঠ মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন। এই উপনিষদ্‌খানির শান্তিপাঠ মন্ত্রে জানা যাইতেছে ইহা ঋগ্-বেদের অন্তর্গত।

শিষ্য—অতি সংক্ষেপে এই মন্ত্রের একটু আভাস দিলে ভাল হয়।

গুরু—হে আবিঃ! হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য! তুমি এস। আমি রাগদ্বেষ-ভরা আমিষপূর্ণ হৃদয়ে তোমাকে আসিতে বলিতেছি না। আমি জানি সৌগন্ধ-পূর্ণ সুকোমল পুষ্প-শয্যা যাঁহার আসন, তিনি পূতিগন্ধপূর্ণ আমিষ-শয্যায় বসিতে পারেন না। এই জন্য আমি বেদবোধিত কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়াছি। গুরুকৃপায় আমি বহিঃপ্রবৃত্ত শক্তিগুলিকে প্রত্যগাত্মায় প্রবাহিত করিয়া সংযমী হইয়াছি। আমার বাক্য, মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাক্য মনেরই স্থূলরূপ। গুরু ও বেদান্ত মুখে যাহা শুনিয়াছি, মন তদ্ভিন্ন আর কোন কথা আর ধারণা করে না—বাক্যও মনের ধারণা ভিন্ন অন্য কোন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে না। আমার মন ও বাক্য এক হইয়াছে, হে ভগবতি ব্রহ্মবিদ্যে! তুমি আমায় কৃপাকর। হে বাক্য! হে মন! তোমরা

নিতান্ত শুদ্ধ হইয়াছ বলিয়া, আমার জন্ম বেদকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছ। ইত্যাদি।

শিষ্য—আহা কি সুন্দর! শুধু বলিলেই হইবে না—হে ভগবান্ আমার হৃদয়ে এস। আগে সংযমী হইয়া, চিত্ত শুদ্ধ করিয়া যদি ডাকা যায়, তবে তিনি হৃদয়ে উদয় হয়েন। অশুদ্ধ হৃদয়ে উপাসনা হয় না। এখন পরের কথা বলুন।

হরিঃ ওমৃষয়ো হ বৈ ভগবন্তমাশ্বলায়নং সম্পূজ্য পপ্রচ্ছুঃ কেনোপায়েন তজ্‌জ্ঞানং তৎপদার্থাহবভাসকম্। যদুপাসনয়া তত্ত্বং জানাসি ভগবন্ বদ ॥১॥

হরি ওঁ॥ ঋষিগণ ভগবান্ আশ্বলায়নকে যথাবিধি পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি উপায়ে তৎপদার্থ অবভাসনক্ষম সেই জ্ঞান লাভ হয় যাহার উপাসনা দ্বারা আপনি সেই তত্ত্ব জানিয়াছেন—হে ভগবন্! আপনি তাহা বলুন ॥১॥

শিষ্য—তৎপদার্থ অবভাসনক্ষম জ্ঞান কাহাকে বলে?

গুরু—তৎপদের অর্থ প্রকাশিত হয় যদ্দ্বারা তাহাই জ্ঞান। তৎপদটি স্বরূপতঃ ব্রহ্মের তুরীয় পদ। পরমশান্ত চলনরহিত এই তুরীয় ব্রহ্ম। ইনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ। যেমন মানুষ সুষুপ্ত হয়, কিন্তু সুষুপ্তিকালে দুই থাকে না বলিয়া আমি সুষুপ্ত একথা বলিবার কেহই থাকে না, সেইরূপ তৎপদার্থে বা নির্গুণ ব্রহ্মে বা আপনি আপনি ভাবে মানুষ স্থিতিলাভ করিতে পারে; কিন্তু সেই লাভ-কালে তৎসম্বন্ধে বলিবার কেহই থাকে না। এই জন্য শ্রুতি তটস্থ লক্ষণ যে সগুণ ব্রহ্ম—তাঁহার উপাসনা দ্বারা যেরূপে জ্ঞান লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন। তৎএর ভাবই তত্ত্ব। যাঁহার উপাসনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, ঋষিগণ ভগবান্ আশ্ব-লায়নকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥১॥

সরস্বতী দশশ্লোক্যা সঋচাবীজমিশ্রয়া।
স্তুত্বা জপ্ত্বা পরাং সিদ্ধিমলভং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥২॥

ঋক্ মন্ত্র এবং এবং বীজমিশ্রিত সারস্বতী দশশ্লোকী দ্বারা স্তব করিয়া এবং জপ করিয়া হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি॥

ঋষয় উচুঃ—

কথং সারস্বতপ্রাপ্তিঃ কেন ধ্যানেন সুব্রত।
মহাসরস্বতী যেন তুষ্টা ভগবতী বদ ॥৩॥

ঋষিগণ বলিলেন, হে সুব্রত! কি প্রকারে এবং কোন্ ধ্যানযোগে সারস্বত

মন্ত্র লাভ হইবে—যাহাতে ভগবতী মহা সরস্বতী প্রসন্ন হইবেন—হে ভগবন্! আপনি তাহা বলুন ॥৩॥

স হোবাচাশ্বলায়নঃ ॥

অস্য শ্রীস্বরস্বতী দশশ্লোকী মহামন্ত্রস্য। অহমাশ্বলায়ন ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীবাগীশ্বরী দেবতা। যদ্বাগিতি বীজম্। দেবীং বাচমিতি শক্তিঃ। প্র ণো দেবীতি কীলকম্। বিনিয়োগ স্তৎপ্রীত্যর্থে। শ্রদ্ধা মেধা প্রজ্ঞা ধারণা বাগ্দেবতা মহাসরস্বতীত্যেতৈরঙ্গন্যাসঃ ॥

নীহারহারঘনসারসুধাকরাভাং কল্যাণদাং কনকচম্পকদামভূষাম্।
উত্তুঙ্গপীকনকুচকুম্ভমনোহরাঙ্গীং বাণীং নমামি মনসা বচসা বিভূত্যৈ ॥১॥

ভগবান্ আশ্বলায়ন বলিলেন ॥ এই শ্রীসরস্বতী দশশ্লোকী মহামন্ত্রের আমি আশ্বলায়ন ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। শ্রীবাগীশ্বরী দেবতা। যৎ বাগ ইতি বীজ। দেবী বাচং এই শক্তি। প্র ণো দেবী এই কীলক। তৎপ্রীতিজন্য বিনিয়োগ। শ্রদ্ধা মেধা প্রজ্ঞা ধারণা বাগ্দেবতা মহাসরস্বতী এই সমস্ত দ্বারা অঙ্গন্যাস।

নীহার, মুক্তা, হার, কর্পূর এবং সুধাকরের ন্যায় ধবল কান্তি, কল্যাণ-দায়িনী, সুবর্ণময় চম্পকমাল্যে অলঙ্কৃতা, উন্নত-ঘন-স্তনকলস মনোহরাঙ্গী বাণীকে বিভূতিলাভের জন্য বাক্য ও মনযোগে প্রণাম করিতেছি ॥১॥

ওঁ প্রণোদেবীত্যস্য মন্ত্রস্য ভরদ্বাজ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। শ্রীসরস্বতী দেবতা। প্রণবেন বীজশক্তিঃ কীলকম্। ইষ্টার্থে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

যা বেদান্তার্থ তত্ত্বৈকস্বরূপা পরমার্থতঃ।
নামরূপাত্মনা ব্যক্তা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥

ঋক্‌মন্ত্র] ওঁ প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী ॥
ধীনাম বিত্র্যবতু ॥১॥

ওঁ প্রণো দেবী এই মন্ত্রের ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। শ্রীসরস্বতী দেবতা। প্রণব ইহার বীজ, শক্তি ও কীলক। ইষ্টলাভার্থ ইহার বিনিয়োগ। ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গকরন্যাস।

পারমার্থিকরূপে একমাত্র বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্বই যাঁহার স্বরূপ, এবং যিনি নামরূপের সাহায্যে ব্যক্ত হয়েন—সেই দেবী শ্রীসরস্বতী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

যিনি দানাদি গুণযুক্তা—যিনি দেবী, যে ক্রিয়ার ফলে অন্নলাভ হয়, যিনি

তৎসমন্বিতা—যিনি ধ্যাতৃগণের এবং স্তোতৃগণের বুদ্ধিরক্ষাকারিণী সেই সরস্বতী অন্নসমূহ দ্বারা আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন ॥১॥

সরস্বতীর স্বরূপ কি?

গুরু—বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্মই ইঁহার স্বরূপ। ইনি সৃষ্টিকে রসযুক্ত করেন ও অন্নদান করেন।

আ নো দিব ইতি মন্ত্রস্য অত্রি ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। হ্রীমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্ ইষ্টার্থে বিনিযোগঃ। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

যা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদেষু চতুর্ষ্বেকৈব গীয়তে।
অদ্বৈতা ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ সা মাং পাতু সরস্বতী ॥

ঋক্‌মন্ত্র] হ্রীমা নো দিবো বৃহতঃ পর্ব্বতাদা স্বরস্বতী যজতাগং তু যজ্ঞম্।
হবং দেবী জুজুষাণা ঘৃতাচী শগ্মান্নো বাচমুশতীশৃণোতু ॥২॥

আ নো দিব এই মন্ত্রের অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। হ্রীং এই বীজ, শক্তি ও কীলক। ইষ্টলাভার্থে ইহার বিনিয়োগ। মূল ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

অঙ্গ ও উপাঙ্গ সমন্বিত চারি বেদে একমাত্র যিনি গীত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মের সেই অদ্বৈত শক্তি শ্রীসরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

যজনীয়া দেবী সরস্বতী দ্যোতমান দ্যুলোক হইতে আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন। অপিচ জনতৃপ্তিকর মহৎ অন্তরীক্ষলোক হইতে শ্রীসরস্বতী আগমন করুন। (ইহা দ্বারা বুদ্ধিগত মাধ্যমিকা বাকের কথা বলা হইতেছে)। দেবী সরস্বতী আমাদের আহ্বান সেবন (শ্রবণ) করতঃ উদকরাশি দান করতঃ এবং সুখকরী আমাদের স্তুতি-ভাষা আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বক শ্রবণ করুন ॥২॥

শিষ্য—চারিবেদের অঙ্গ ও উপাঙ্গ কি কি?

গুরু—সাম, ঋক্, যজু ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ বেদের এই ছয় অঙ্গ। চারিবেদের চারি উপাঙ্গ। গন্ধর্ব্ব বেদ বা সঙ্গীত শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ বা বৈদিক শাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ ও শিল্প-বিদ্যা ক্রমান্বয়ে উপরোক্ত চারিবেদের উপর বেদ।

শিষ্য—ব্রহ্মের অদ্বৈতশক্তি কে?

গুরু—চিন্মণিপ্রভা যাহা, যিনি মায়া, যিনি মধ্যমা বাক্ তিনি সরস্বতী।

সর্ব্বলোক ও অন্তরীক্ষ লোক ব্যাপিয়া এই শক্তিই অবস্থান করেন ।

পাবকান ইতি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দ ঋষিঃ। গায়ত্রীছন্দঃ। সরস্বতীদেবতা। শ্রীমীতি বীজশক্তিঃ কীলকম্‌। ইষ্টার্থে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

যা বর্ণপদ বাক্যার্থ স্বরূপেণৈব বর্ত্ততে।
অনাদিনিধনাঽনন্তা সা মাং পাতু সরস্বতী॥

ঋক্‌মন্ত্র] শ্রীং পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসুঃ॥৩॥

পাবকান এই মন্ত্রের মধুচ্ছন্দ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। শ্রীং এই বীজ, শক্তি ও কীলক। ইষ্টলাভার্থে ইহার বিনিয়োগ। ঋক মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

যিনি বর্ণ, পদ, বাক্য ও তদর্থরূপে বর্ত্তমান,—সেই অনাদি নিধনা,—উৎপত্তি-নাশশূন্যা, অনন্তা শ্রীসরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

যিনি যাজ্ঞিক জনপাবনী এবং প্রচুর অন্নসমন্বিত যজ্ঞাদি ব্যাপারের সম্পাদয়িত্রী এবং কর্ম্মলভ্য ধনের প্রদাত্রী,ঈদৃশী দেবী সরস্বতী আমাদের যজ্ঞ ইচ্ছামাত্রে নির্ব্বাহ করুন॥৩॥

শিষ্য—আবার বলুন শ্রীসরস্বতী কে?

গুরু। যিনি অনাদিনিধনা, যিনি অনন্ত অনন্তকাল ধরিয়া আপন স্বরূপে আপনিই অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি সীমাশূন্যা, যিনি বর্ত্তমানে বর্ণ, পদ, বাক্য ও বাক্যের অর্থরূপে বিশ্বরূপধারিণী—তিনিই সরস্বতী। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি রসযুক্ত করিয়া রাখেন, যিনি জীবকে অন্ন প্রদান করেন, যিনি ধন দান করেন, যিনি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের সম্পাদয়িত্রী তিনিই শ্রীসরস্বতী। প্রভাসমন্বিতা চিন্মণিই এই সরস্বতী। ইনিই আপন নির্গুণ স্বরূপে থাকিয়াও সগুণ ব্রহ্ম।

চোদয়িত্রীতি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। ব্লূমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্‌। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

অধ্যাত্মমধিদৈবং চ দেবানাং সম্যগীশ্বরী।
প্রত্যগাস্তে বদন্তী যা সা মাং পাতু সরস্বতী॥

ঋক্‌মন্ত্র] ব্লূং চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্‌। যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥৪॥

চোদয়িত্রী মন্ত্রের মধুচ্ছন্দ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। স্বরস্বতী দেবতা। ব্লূং ইতি বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবতাগণের সম্যক্ ঈশ্বরী। প্রত্যগাত্মা—প্রতি-দেহে আত্মা আছেন ইহা যিনি বলিয়া দেন সেই শ্রীসরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

প্রিয় সত্যবাক্য প্রেরণকারিণী, সুবুদ্ধিসম্পন্ন অনুষ্ঠাতৃজনগণের নিকট তদীয় অনুষ্ঠেয় জ্ঞাপয়িত্রী যে সরস্বতী তিনি যজ্ঞ ধারণ করিয়াছেন॥ ৪॥

শিষ্য—এই সরস্বতী আর কি প্রকার?

গুরু—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক যত দেবতা আছেন—সমস্ত দেবতার ঈশ্বরী ইনি। ইনিই বরণীয় ভর্গ। মূলে ইনিই আছেন। একেরই পৃথক নামরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। এই বরণীয় ভর্গই মানুষকে জানাইয়া দিতেছেন দেহের মধ্যে আত্মা কে? ইঁহারই প্রেরণায় মানুষ প্রিয়বাক্য ও সত্যবাক্য বলিয়া থাকে। যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মানুষ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, এই অদ্বৈতা শক্তিই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়া থাকেন। ইনিই জ্ঞপ্তী দেবী। জ্ঞান ইনিই দান করেন। যজ্ঞাদিষ্ঠাত্রী দেবী ইনিই।

মহো অর্ণেতি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। সৌরিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

অন্তর্যাম্যাত্মনা বিশ্বং ত্রৈলোক্যং যা নিযচ্ছতি।
রুদ্রাদিত্যাদিরূপস্থা যস্যামাবেশ্য তাং পুনঃ॥
ধ্যায়ন্তি সর্ব্বরূপৈকা সা মাং পাতু সরস্বতী।

ঋক্‌মন্ত্র] সৌর্ম্মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি॥৫॥

মহো অর্ণ এই মন্ত্রের মধুচ্ছন্দ ঋষি। গায়ত্রীছন্দ। সরস্বতী দেবতা। সৌঃ ইতি বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

যিনি অন্তর্যামিনীরূপে ত্রৈলোক্য নিয়মিত করেন, এবং রুদ্র, আদিত্যরূপে অবস্থিত দেবগণ যাঁহাতে আবিষ্ট এবং পুনরায় যাঁহাকে তাঁহারা ধ্যান করেন সেই সর্ব্বময়ী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

সরস্বতী দ্বিবিধভাবে বিবর্ত্তিত, বিগ্রহবতী দেবতারূপে এবং নদী সরস্বতী রূপে। এই মন্ত্র দ্বারা নদীরূপিণী সরস্বতীর স্তুতি করা হইয়াছে। (সায়ন)

সরস্বতী নদীরূপিণী হইয়া স্বীয় প্রবাহরূপ কর্ম্ম দ্বারা প্রভূত উদকরাশি প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাপন করেন, অপিচ আপন দেবতারূপে বিশ্ববাসী অনুষ্ঠাতৃ

জনগণের প্রজ্ঞাকে বিশেষরূপে উদ্দীপিত করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা অনুষ্ঠান বিষয়ক বুদ্ধি উৎপাদন করেন ॥ ৫ ॥

শিষ্য—শ্রুতি, শ্রীদেবী সরস্বতীকে আরও কোন্ কোন্ ভাবে বর্ণনা করিতেছেন ?

গুরু—ইনি অন্তর্যামিনী। চতুষ্পাদ আত্মার তৃতীয় পাদই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা। যে সম্বিৎ, শক্তি আধারে, চিন্মাত্র আশ্রয় যে মায়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্টা তিনিই সদাকারা, সদানন্দা, সংসারোচ্ছেদ-কারিণী। ইনিই সরস্বতী। ইনি চৈতন্যপুরুষ হইতে অভিন্ন। মায়াটি মিথ্যা—মায়ার উপাসনা কোথাও বলা হয় নাই। মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যই উপাস্য। এই সরস্বতী অদ্বৈতাশক্তি হইলেও তিনি চৈতন্যরূপিণী। রুদ্র আদিত্যাদি রূপে অবস্থিত দেবগণ তাঁহারই মধ্যে। তিনি সর্ব্বময়ী। ইঁহারই দুই মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তি বিগ্রহরূপে পূজিত, অন্য মূর্ত্তি নদীরূপিণী। নদীর প্রবাহই কর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বারা ইনি আপনাকে সরস্বতীরূপে জানান। ইঁহার অঙ্গীভূত দেবতারা সাধকের প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করেন।

চত্বারি বাগিতি মন্ত্রস্য উচথ্যপুত্রো দীর্ঘতম ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। ঐমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

যা প্রত্যগ্ দৃষ্টিভি র্জীবৈ র্ব্যজ্যমানানুভূয়তে।
ব্যাপিনী জ্ঞপ্তিরূপৈকা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥

ঋক্‌মন্ত্র] ঐং চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদু র্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥৬॥

'চত্বারি বাক্' ইতি মন্ত্রের উচথ্যপুত্র ভগবান্ দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। ঐঁ ইতি বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

জীব যখন প্রত্যগাত্মা-বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে দর্শন করেন, তখন ঐ জীব কর্ত্তৃক অভিব্যঞ্জিত হইয়া যিনি অনুভব সীমায় উপনীত হয়েন, সর্ব্বব্যাপিনী জ্ঞপ্তিরূপা সেই সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

বাক্—বাঙ্ময়ী সরস্বতীর চারি পর্ব্ব। শব্দরাশির পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, ও বৈখরী এই চারি অবস্থা। যাঁহারা মনীষী ব্রাহ্মণ, তাঁহারা যোগনেত্রে সেই চারি অবস্থা বিশিষ্ট পদসমূহকে জানিতে পারেন। পরা পশ্যন্তী

মধ্যমা এই ত্রিপদ গুহানিহিত। উহা লোকবুদ্ধির অতীত। তুরীয় বা বৈখরী বাক্ যাহা, তাহাই মনুষ্যলোকে পরিচিত। মানবগণ বৈখরী বাক্ সাহায্যেই কথোপকথন করিয়া থাকে।

শিষ্য—বৈখরী বাকের স্বরূপ কি ?

গুরু—বৈখরী বাক্ই বিশ্বরূপ। ইনিই বিরাট্। বিবিধানি রাজ্যন্তে বস্তূন্যত্রেতি বিরাট্। বিবিধ বস্তু যাহাতে বিরাজ করে তাহাই বিরাট্। নিগুর্ণ ব্রহ্ম স্বাভাবিক আত্মমায়া দ্বারা বিরাট্ দেহ ধারণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার বিরাট্ দেহ। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর সেই নিগুর্ণ ব্রহ্মই সগুণ হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী হইয়া জীব-আখ্যা লাভ করেন।

ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।২২এ ঐ ঋক্ পাওয়া যায়। এই মন্ত্রের বহু ব্যাখ্যা আছে। যাজ্ঞিক, বৈয়াকরণ, নিরুক্তকার ও ঐতিহাসিকগণ ইহার পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করেন। মান্ত্রিকগণ বলেন—বাঙ্ময়ী সরস্বতীর পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চারি অবস্থা। একই নাদাত্মিকা বাক্ যখন মূলাধার হইতে উদিত হন, তখন ইনি পরা। উহাই হৃদয়গত হইয়া যখন যোগিগণের দর্শনপথে পতিত হয়েন, তখন উহা পশ্যন্তী। উহাই বুদ্ধিস্থ হইয়া যখন বচনেচ্ছার সহিত মিলিত হয়েন, তখন হৃদয়-মধ্যগত বলিয়া মধ্যমা নামে অভিহিত হয়েন। আবার উনিই যখন মুখমণ্ডলস্থিতা হইয়া তালু ওষ্ঠাদির ব্যাপারে বহির্গত হয়েন, তখন তাঁহাকে বৈখরী বলা যায়। স্বাধীনমনা, বাচ্য শব্দব্রহ্মের অধিগতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ বা যোগিগণ বাগ্দেবীর এই চারি পদ দর্শনে সমর্থ। তন্মধ্যে পরা পশ্যন্তী ও মধ্যমা নামক ত্রিবিধা বাক্, হৃদয়গুহায় নিহিত। সাধারণ মনুষ্য, বৈখরী সাহায্যে কথোপকথন করিয়া থাকে। বৈখরী বাক্ই সাধারণের মধ্যে পরিচিত। এই ঋকের অর্থাবধারণ করিলে বুঝিতে পারিবে শ্রীসরস্বতী দেবীকে বাগ্বাদিনী কেন বলা হয়—উনি বাগ্দেবী কেন ? ॥৬॥

যদ্ বাগ্ বদন্তীতি মন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। ক্লীমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

নাম জাত্যাদিভির্ভেদৈরষ্টধা যা বিকল্পিতা।
নির্ব্বিকল্পাত্মনা ব্যক্তা সা মাং পাতু সরস্বতী॥

ক্রমশঃ

নাগানন্দ।

বৃষকেতু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। * বৃষকেতু অনেকের দয়া আকর্ষণ করিয়াছে। সেই ভরসায় নাগানন্দের নায়ক জীমূতবাহন-চরিত্র বিবৃত করিতে সাহসী হইলাম। জীমূতবাহন, মহারাজ জীমূতকেতুর একমাত্র পুত্র। এই মহাত্মা যৌবনে সমস্ত ভোগসুখ, এমন কি রাজ্য পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া পিতৃ-মাতৃ সেবার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া পরের প্রাণরক্ষা করাও জীমূতবাহনের জীবনের প্রধান ঘটনা। এ কথায় কি আমাদের পতিত জাতির কোন উপকার হইবে?

গন্ধর্ব্বপতি মহারাজ জীমূতকেতু বার্দ্ধক্যে, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র জীমূতবাহনের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া বনগমন করেন। রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া কুমার অতি সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে লাগিলেন। কুমারের প্রতাপে রাজ্য শত্রুশূন্য ও প্রজাবর্গ অপরাধশূন্য হইল। কোষাগার ধনরত্নে পূর্ণ হইল, এবং শস্যাগার প্রচুর শস্যে পূর্ণ হইল। রাজা নিজ ব্যয়ে দরিদ্র, অনাথ, আতুরের জন্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, পথ, জলা-শয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। বহু নদনদীর স্রোতধারা একত্র মিলাইয়া বাণিজ্যপথ সুগম করিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক কার্য্য, নিজে ও সুবিচক্ষণ সাধু মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া করি-তেন। প্রজাদের বিচারভার ও রাজ্যের শান্তিরক্ষার ভার উপযুক্ত পাত্রেই অর্পণ করিলেন। নিজের আয়ব্যয় নিজে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজ-প্রাসাদে প্রজাগণ অর্থগৃধ্নু, অত্যাচারী অমাত্যবর্গের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি-লাভ করিল। জীমূতবাহন ননাবিধ যজ্ঞ করিয়া দেবগণের প্রীতি সম্পাদন করিলেন।

নানা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিলেও কুমারের মনে সর্ব্বদা পিতৃমাতৃ-দর্শনের ইচ্ছা বড়ই বলবতী ছিল। কুমার দিবসে রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া সন্ধ্যাকালে যখন একাকী হইতেন, তখন মাতার জন্য চিত্ত বড় অধীর হইত। ঐরূপ সংযমী বীরও বালকের ন্যায় চঞ্চল হইতেন। কুমার উপযুক্ত মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, প্রিয় বয়স্য সঙ্গে পিতামাতার তপোবনে

---

* ১৩১৮ সাল জ্যৈষ্ঠ মাসের উৎসব পত্রিকা।

যাত্রা করিলেন। রাজার তপোবন মলয় পর্ব্বতের সানুদেশে; প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। কুমার বহু নগর, বহু গ্রাম পার হইয়া বনপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। বনের বিশাল বৃক্ষগুলি শাখা প্রসারণ করিয়া কুমারকে যেন আহ্বান করিল। কুমার সখাসহ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কতকদূর গমন করিয়া বনভূমির এক নির্জ্জন প্রদেশে কুমার এক দেবমন্দির দেখিতে পাইলেন। মন্দিরের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে, সুমধুর বীণাধ্বনি মিলিত নারীকণ্ঠোত্থিত মনোহর সঙ্গীতধ্বনি কুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কুমার সখাসহ স্বরলক্ষ্যে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, এক পরমাসুন্দরী কিশোরী বীণা-বাদন করিয়া মহামায়ার স্তুতিগান করিতেছে। সহসা অপরিচিত পুরুষ দর্শনে কিশোরী গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া অবনতমুখী হইয়া থাকিল। লজ্জায় সুন্দর মুখ রক্তাভ ধারণ করিল। কুমার কন্যার সঙ্গিনীসখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! তোমার সঙ্গিনী কাহার কন্যা? কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ইঁহার পরিচয় জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছে।" সখী বলিল—"মহাশয়, ইনি মহারাজ বিশ্বাবসুর কন্যা ও মিত্রাবসুর অনুজা। আপনার আকার, আচরণ দেখিয়া রাজবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়। আপনার পরিচয় দিয়া অনুগৃহীত করুন।" কুমারের সখা বলিল,—"ইনি গন্ধর্ব্বপতি মহারাজ জীমূতকেতুর পুত্র কুমার জীমূতবাহন।

জীমূতবাহন মন্দির হইতে বাহির হইয়া পিতামাতার তপোবনে প্রবেশ করিলেন। মাতা পুত্রের মুখদর্শন করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিলেন। গম্ভীর প্রকৃতি রাজার আনন্দ মুখে প্রকাশ পাইল না, কিন্তু সেই সৌম্যমূর্ত্তিতে যেন প্রচ্ছন্ন আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা দিল। কুমার, পিতামাতার কুটীরশোভিত তপোবনের শান্তভাবে বড়ই শান্তিবোধ করিতে লাগিলেন।

নির্জ্জন তপোবনের নিকট আজ কোলাহলময় রাজপ্রাসাদ যেন তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছবোধ হইতে লাগিল। মাতা পুত্রকে লইয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। পুত্র বিশ্রাম করিলে রাজমহিষী বনফলে ও নির্ঝরজলে কুমারের তৃপ্তিসাধন করিলেন। বৃক্ষের সপল্লব শাখায় পুত্রকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। জননীর পল্লব ব্যজন যেন মূর্ত্তি ধরিয়া, আশীর্ব্বাদরূপে পুত্রের অঙ্গে বর্ষিত হইতে লাগিল। কুমার কতক্ষণ পরে মাতাপিতার নিকট বিদায়

লইয়া, তপোবনের তপস্বী ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিবার জন্য গমন করিলেন। কুমারের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই পরম সুখী হইলেন। অতঃপর জীমূতবাহন পিতামাতার সর্ব্ববিধ সেবা স্বহস্তে করিতে লাগিলেন। কুমার পিতামাতার সেবা করিয়া, আশ্রমবাসী সকলের সহিত সদালাপ এবং অবসর মত সাধুগণের সহিত শাস্ত্রালাপে পরম আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া গেল। এ দিকে মহারাজ বিশ্বাবসুর কন্যাও বিবাহযোগ্যা হইল। মহারাজ বিশ্বাবসু নানাস্থলে পাত্র অনুসন্ধান করিয়া, সর্ব্বগুণান্বিত জীমূতবাহনে কন্যা মলয়াবতী সম্প্রদান করি-করিলেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী উভয়েই উভয়ের অনুরূপ। যেন বিধাতা উভয়ের জন্য উভয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া, উভয়ে পরম সুখী হইলেন। বিবাহের কিছুদিন পরে, একদা কুমার জীমূতবাহন ও কুমার মিত্রাবসু মলয়পর্ব্বতসন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতীরে ভ্রমণ জন্য গমন করেন। সমুদ্রতীরে বালুকারাশির উপর নাগগণের অস্থিরাশি দ্বিতীয় শৈলের ন্যায় পরিদর্শন করিয়া, কুমার জীমূতবাহন নিতান্ত বিস্মিত হইলেন,—হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে মিত্রাবসু! শুভ্র মলয়পর্ব্বততুল্য আর একটী পর্ব্বত যেন দেখা যাইতেছে। মিত্রাবসু বলিতে লাগিলেন, না সখা, উহা পর্ব্বত নহে। উহা নাগগণের অস্থি। পক্ষিরাজ গরুড় বহু সময়ে নাগলোকে পতিত হইয়া বড়ই উপদ্রব করিতেন, সেই জন্য মহারাজ বাসুকি প্রত্যহ একটী নাগ দিয়া গরুড়ের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। এই যে পর্ব্বতাকার বস্তুট দেখা যাইতেছে, ইহা গরুড়ভুক্ত নাগগণের অস্থিপঞ্জর। এই সংবাদ শুনিয়া কুমার শিহরিয়া উঠিলেন। মনে করিলেন কোন কি উপায় নাই,—যদ্দ্বারা এই প্রাণীবধরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য নিবারণ করা যায়? কুমার এই চিন্তায় মগ্ন, এমন সময়ে মহারাজ বিশ্বাবসুর কঞ্চুকী, মলয়াবতীর মাতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ রক্তবাসযুগল জীমূতবাহনকে প্রদান করিল।

কুমার মিত্রাবসু, কঞ্চুকীসহ অন্য কার্য্যে জীমূতবাহনের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। জীমূতবাহন একাকী। অকস্মাৎ করুণ ক্রন্দন জীমূত-বাহনের কর্ণে প্রবেশ করিল। জীমূতবাহন বিস্মিত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কতক্ষণ পরে দেখিলেন, একটী প্রৌঢ়া এক পরম রূপবান্ কোমলকান্তি বালকসহ ক্রন্দন করিতে

করিতে তাঁহার নিকটে আসিতেছে। জীমূতবাহন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনি কি জন্য রোদন করিতেছেন? আর এ কুমার বালকই বা কে?" প্রৌঢ়া বলিল, "মহাশয়! আমি নাগরাজের একজন ধনবান্ প্রজার পত্নী। আমার স্বামী এই শিশুপুত্রটীকে রাখিয়া অকালে দেহত্যাগ করেন। আমি অভাগিনী, ইহাকে লালন পালন করিয়া আজ ইহাকে যমের মুখে দিতে আসিয়াছি।

ইহাদের সঙ্গে নাগরাজের একজন অমাত্য ছিল। সে ইহাদের কথার সময় বহিয়া যায় দেখিয়া বলিল, মা! আমাকে পিশাচের কাজ করিবার জন্য এখানে আসিতে হইয়াছে। আমায় এই সময়ের উপযোগী কার্য্য করিতে হইবে। আর অযথা ক্রন্দনে কি ফল, আপনি গৃহে যান। আমি শঙ্খচূড়কে স্বস্তি চিহ্ন ও রক্ত বস্ত্রে সজ্জিত করিয়া বধ্যশীলায় আরোহণ করাই। নাগমাতা অমাত্যের বাক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড় উভয়ের যত্নে চৈতন্যলাভ করিয়া, পুত্রের কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক হাহাকার শব্দে কাঁদিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, বাছা শঙ্খচূড়! তোমায় জন্মের মত বিদায় দিয়া, আমি কিরূপে প্রাণধারণ করিব? বৎস! তোমার ঐ কোমল দেহ, গরুড়ের তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে যখন ক্ষত বিক্ষত হইবে, তখন আমি কি করিয়া সহ্য করিব? গরুড় তোমাকে বিনাশ না করিয়া, আমার পাপ-তাপ-শোকপূর্ণ দেহ গ্রহণ করুন। করিয়া আমাকে এ দুঃখ হইতে রক্ষা করুন। অভাগিনীর জীবনের মূল গ্রন্থি তুমি। আমার জীবন গিয়া, তোমার জীবন রক্ষিত হউক। শঙ্খচূড় বলিল, মা! কেন তুমি আমার মৃত্যুতে কাতর হইতেছ? আজ দশের হিতের জন্য আমায় প্রাণ দিতে হইতেছে। আমার প্রাণদানে নাগগণ কিছু দিনের জন্য শান্তিলাভ করিবে। মা! সেই মাতাই ধন্য যাঁহার গর্ভে দশের হিতকারী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যাঁহার পুত্রের শোণিতে বহুলোকের দুঃখ দূর হয়—সেই জননীই যথার্থ মা নামের যোগ্যা।

মা তুমি গোকর্ণনাথ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে চল। আমিও তোমার নিকট শেষ বিদায় লইয়া আসি। মাতা পুত্র, অমাত্য সহ গোকর্ণনাথ দর্শনে চলিয়া গেলেন। জীমূতবাহন মনে করিলেন, এই

রাণী কুসুমকামিনী দেবী। বলিহার।

ক্রমশঃ

পরিবর্ত্তে অন্যটিকে দেখাইয়া দিলেই হইত। এখন আম র জিজ্ঞাস্য এই—দৃষ্টান্ত দ্বারা যেন জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপবোধের সহায়তা হইল ; এই সহায়তা দ্বারা কি আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হইবে ?

বশিষ্ঠ :—বুঝিবার সুবিধার জন্যই দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে কোন যুক্তি দ্বারা মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা কর। মহাবাক্যের অর্থ-বিচারেই আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ হইবে। সেই স্ফুরণ দ্বারা অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের শান্তি হইবে। শান্তিই পরম শ্রেয়ঃ। শান্তিই নির্ব্বাণ। শান্তিই আপনি আপনি ভাবে স্থিতি।

যয়া কয়াচিৎ যুক্ত্যাতু মহাবাক্যার্থমাশ্রয়েৎ।

যে কোন যুক্তি হউক না, মহাবাক্যার্থ আশ্রয় কর। ইহাতেই শান্তি পাইবে।

শান্তিঃ শ্রেয়ঃ পরং বিদ্ধি তৎপ্রাপ্তৌ যত্নবান্ ভব।
ভোক্তব্য মোদনং প্রাপ্তং কিং তৎসিদ্ধৌ বিকল্পিতৈঃ।

শান্তিই পরম শ্রেয়ঃ জানিও। শান্তি পাইতেই যত্ন কর। ক্ষুধার সময় আহার পাইলে আহারই কর—আহার্য্য কিরূপে প্রস্তুত হইল ইহার জল্পনা কল্পনায় লাভ-কি ?

লোকের ভোগে আসক্তি দেখিয়াই বুঝা যায় লোকটি বিবেকহীন। বিচার-হীন ব্যক্তি "উপলোদরসঞ্জাত পরিপীনান্ধ ভেকবৎ" পাষাণ মধ্যে জাত স্থূল অথচ অন্ধ ভেকের মত।

"তত্ত্বমসি" ইহা একটি মহাবাক্য ; "সোঽহং" ইহাও একটি মহাবাক্য। তুমি সেই হও—আমি সেই—এই বিচারই শেষ বিচার। এই বিচার দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ হইবে। যতদিন আত্মবিশ্রান্তি লাভ না হয়, ততদিন সাধক—

(১) নিত্য কর্ম্ম করিবেন, (২) শাস্ত্রের উপদেশ শুনিবেন, (৩) সদাচারী হইবেন, (৪) ধর্ম্ম, গুরুশুশ্রূষা জন্য অর্থ এবং শাস্ত্রের অপূর্ব্ব সংগ্রহ করিবেন—করিয়া বিচারপরায়ণ হইবেন।

আমি কে ? জগৎ কি ? ইহার বিচারই বিচার। শাস্ত্র যে বিচার দ্বারা ইহার মীমাংসা করিয়াছেন, সেই বিচার অনুভব করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেই শান্তি পাওয়া যাইবে। আমি কে ? ইহার শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই

যে তুমিই সেই হও, আমিই সেই হই। শুধু শাস্ত্রসিদ্ধান্তটি পাখীর মতন চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া যদি বল সোঽহং স্বামী আমি—তবে তুমি আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে আটকাইয়া গেলে। শরীরে অরুচি হইয়াছে কিনা দেখ, সমস্ত ভোগ্যবস্তুতে অরুচি লাগিয়াছে কি না দেখ; আমি কে? জগৎ কি? ইহার বিচার শাস্ত্রমত করিতে পারিতেছ কি না দেখ; সর্ব্বদা যখন বিচার থাকিবে, সেই বিচারের ফলে নিজের হৃদয়ে যে ধর্ম্মামৃত উঠিবে, সেই ধর্ম্মামৃত পান করিয়া চিত্তবিশ্রান্তি লাভ করিবে। পরে সেই পরমপদে, সেই তুর্য্যপদে স্থিতিই পরমানন্দপ্রাপ্তি।

ব্রহ্মপদ লাভ জন্য যে যুক্তি প্রয়োজন তাহা অবলম্বন করিয়া বোধাহ বিষয় অবশ্য বোধ করা উচিত। বোধচক্ষু হইও না।

মূর্খ-পাণ্ডিত্য যাঁহাদের তাঁহারাই বোধচঞ্চু। যে ব্যক্তি ব্রহ্মবস্তুতে অনর্থ কল্পনা করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানসাধক যে জ্ঞান সেই জ্ঞানে বিকল্প উত্থাপন করে, করিয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞানের বোধকে মলিন করে—সেই বোধ-চঞ্চু। বোধচঞ্চু, মত খণ্ডনের জন্যই ব্যস্ত থাকেন। যাহাদের বোধ পরমত খণ্ডনের জন্য কেবল মুখেই থাকে, তাহারাই বোধচঞ্চু।

মুখ্য কথা শ্রবণ কর।

ইন্দ্রিয় না থাকিলে কোন কিছুরই প্রমাণ থাকে না। মনে কর চক্ষু নাই ও হস্ত নাই। এক বস্তু অন্য বস্তুর সমান কিরূপে প্রমাণ করিবে? চক্ষু নাই দেখিতে পাইলে না—হস্তাদি নাই মাপিতে পারিলে না। এই জন্য প্রমাণের সার ইন্দ্রিয়। আবার চৈতন্য না থাকিলে ইন্দ্রিয় জড় মাত্র, সেই জন্য ইন্দ্রিয়ের সার চেতন। মূল চৈতন্যই প্রধান প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষই সর্ব্ব-প্রমাণ সার। চক্ষু দিয়া দেখা বা কর্ণ দিয়া শোনা—ইহা যেমন প্রত্যক্ষ, অনুভবও সেইরূপ প্রত্যক্ষ। দেখা শোনা ইহারাও প্রত্যক্ষ বটে। অনুভবই প্রধান প্রত্যক্ষ বলিয়া, প্রত্যক্ষকে প্রমাণের সার বলা হইতেছে।

মূল প্রত্যক্ষই চৈতন্য। চৈতন্য যখন আপনি আপনি ভাবে থাকেন, যখন আর কিছুই থাকে না, তখন ইহা স্বতঃ প্রকাশ হইলেও ইহার স্ফুরণ নাই। চৈতন্য যখন প্রকাশ হন, তখন ইহা তিন ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকেন। "আমি ইহা দেখিতেছি" বা "আমি ইহা জানিতেছি" এখানে "আমি" = জ্ঞাতা; ইহা = জ্ঞেয়; জানিতেছি বা দেখিতেছি = জ্ঞান। "আমি"টি চৈতন্যের অবচ্ছেদ ভাব। 'ইহা"টি চৈতন্যের বিষয় ভাব এবং জানিতেছি বা

দেখিতেছি ইহা চৈতন্যের আশ্রয় ভাব। এই সম্মিলিত ত্রিভাবের নাম ত্রিপুটী। ত্রিপুটীর বোধ যাহা তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

ত্রিপুটীর প্রথম প্রকাশ বা উদয়=অনুভূতি।

ত্রিপুটীর অনুভবনীয় রূপে প্রকাশ বা বিষয় স্ফূর্ত্তি=বেদন=অনুপ্রকাশ

ত্রিপুটীর পৃথক পৃথক প্রকাশ যিনিনির্ব্বাহ করেন তিনি মনোবৃত্তিরূপ উপাধি বিশিষ্ট জীব। এই প্রকাশ=প্রতিপত্তি।

অনুভূতি বেদন ও প্রতিপত্তি এই তিনব্যাপী যে অবিচ্ছিন্ন স্বাধিন চৈতন্য তাঁহাকেই সাক্ষী চৈতন্য বলা হয়। ইনিই জীব। জীবই সংবিদ্. অহং ও প্রত্যয় উপহিত হইয়া পুরুষ। যে সংবিদ্ দ্বারা তিনি আবির্ভূত হন তাহাই বিষয় বা পদার্থ।

জল যেমন তরঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়েন, সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যও সঙ্কল্প রূপে জগৎ হইয়া প্রকাশিত হয়েন।

ব্রহ্মচৈতন্য সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ও অকারণ রূপে ছিলেন। সৃষ্টিকালে সৃষ্টিলীলা বশতঃ ইনি আপনিই আপনাতে কারণভাব উত্থাপিত করিলেন। এই কারণভাবটিই অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান। অজ্ঞানটাই অবিচার। মায়ার দ্বারা ইহা জন্মে এবং পরম প্রকৃতিতে ইহার অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিই জগৎ। জগৎটা কি? না মায়া দ্বারা অজ্ঞানের অভিব্যক্তি। জগৎটা অজ্ঞানেরই শরীর। এই জন্য অজ্ঞান ও অজ্ঞান শরীর জগৎ এই দুইয়ে কিছুই ভেদ নাই। অজ্ঞানটির নাম যেমন অবিচার সেইরূপ বিচারটি আত্মারই প্রকাশ বিশেষ ইহা আত্মাতেই আবির্ভূত হয়। বিচার আত্মাতে আবির্ভূত অবিচারের অর্থাৎ জগৎবপু অজ্ঞানের বিনাশ করে। তবেই হইল বিচার দ্বারাই অজ্ঞানের নাশ হয়।

যিনি বিচারবান্ তিনি আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করেন। বিচারবান্ পুরুষ আপনাকে আপনি জানিতে পারিলেই তাঁহার বিচারও থাকে না—বিচারই তখন পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয়।

মন বৃত্তিশূন্য হইলে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, কর্ম্ম—সমস্তই বাধিত হয়, তখন ইচ্ছা পর্য্যন্ত থাকে না—কার্য্য অকার্য্যের ত কথাই নাই। মন যখন ইচ্ছা শূন্য তখন কর্ম্মেন্দ্রিয় আর কর্ম্ম করিবে কেন? যেটি বেদন ভাব—যাহা বিষয়াকার জ্ঞান তাহাই না মনোযন্ত্রকে চালায়? স্পন্দন যেমন

বায়ুর অন্তর্গত, সেইরূপ সমস্ত চলন সমস্ত সঙ্কল্প, বেদন বা বিষয় স্ফূর্ত্তির অন্তর্গত।

বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণরূপ রূপালোক; মনের দ্বারা বিষয়ানুসন্ধান-রূপ মনস্কার এবং দুয়ের আশ্রয়রূপ যে পদার্থ পদার্থ—বস্তু—জগৎ এই তিন লইয়া।

শুধু চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্ম—ইনিই তত্ত্ব। বাহিরে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা পরমতত্ত্বের রূপ মাত্র। এই পরমতত্ত্বই দেহাদি ধরিয়া জীবভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন।

স সর্ব্বাত্মা যথা যত্র সমুল্লাসমুপাগতঃ।
তিষ্ঠত্যাশু তথা তত্র তদ্রূপ ইব রাজতে॥

সর্ব্বাত্মা পুরুষ যে দেশে যে কালে যে বস্তুতে প্রকাশ হন সেই দেশে সেই কালে সেই বস্তুতেই তিনি বিরাজমান ইহা জান। রাম! যেমন ভ্রম প্রযুক্ত রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় সেইরূপ এই জগৎও সেই সর্ব্বদর্শী দ্রষ্টার বৃথা দৃশ্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বিচার উদয় হউক, হইলে এ সকল দৃশ্য আর বাস্তবিক বোধ হইবে না।

যিনি সর্ব্বাত্মা তিনিই চিৎ তিনিই দ্রষ্টা। যিনি দ্রষ্টা যাঁহার দৃশ্যতুল্য হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। দ্রষ্টার স্বভাবেই দৃশ্যভাব আভাসিত হয় বলিয়া দৃশ্যভাব অবাস্তব।

দৃশ্যত্বং দ্রষ্টৃসদ্ভাবে দৃশ্যতাপি ন বাস্তবী॥

দৃশ্যস্বরূপ যে দ্রষ্টা তিনি যখন দৃশ্য স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন তখন তিনি অদৃশ্য হন। দ্রষ্টা নাই দৃশ্য আছে ইহা সিদ্ধ হয় না। আর যদি বলা যায় দ্রষ্টা দৃশ্য স্বরূপ হইতে কখন প্রচ্যুত হন না তবে বলিতে যে এই দৃশ্যতাটা ইহার বিবর্ত্ত মাত্র। রজ্জুস্বভাব হইতে অপ্রচ্যুত সর্প-ভাবের ন্যায়—ইহাও মিথ্যা।

অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বয় অকারণ চিৎবস্তু বিদ্যমান ছিলেন; তিনি এখন নানা কল্পনায় বিরাজমান। এই জন্য পরম তত্ত্বই মুখ্য প্রত্যক্ষ। যাহা কিছু অনুমান তাহা এই মুখ্য প্রত্যক্ষ হইতেই এবং এই মুখ্য প্রত্যক্ষেই সে সকলের পর্য্যবসান হয়। অতএব অনুমানাদি প্রমাণ সেই মুখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অংশ মাত্র।

তবেই দেখ আত্মাই তত্ত্ব; কার্য্য কারণ যাহা তাহা মিথ্যা। যিনি তত্ত্ব উপাসনা করেন, তিনি দৈবকে নিহত করিয়া স্বীয় পৌরুষ-বলে উত্তম পদ পাইয়া যান। যতদিন না পরব্রহ্মের বা পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইতেছে, ততদিন আচার্য্য-পরম্পরা মত বিচারপরায়ণ হও।

---

২০ সর্গঃ।

সদাচার নিরূপণ।

রাম—আমি মুমুক্ষু, আমাকে কি করিতে হইবে?

বশিষ্ঠ—সদাচার শিক্ষা করিয়া নিজের প্রজ্ঞা বৃদ্ধি কর।

রাম—সদাচার-শিক্ষা কিরূপ?

বশিষ্ঠ—মহাপুরুষ ভিন্ন সদাচার-পালন কেহই করিতে পারেন না। শম-দমাদি গুণ ও জ্ঞান যাহাতে আছে, তিনিই মহাপুরুষ। যদি কোন এক পুরুষে সমস্ত গুণ না পাওয়া যায়, তবে যে পুরুষে যে গুণের প্রভাব দৃষ্ট হয়—সেই পুরুষের সঙ্গ করিয়া সেই গুণ শিক্ষা কর—করিয়া নিজের প্রজ্ঞা বৃদ্ধি কর। সাধুসঙ্গ, সাধুজনের উপদেশ গ্রহণ ও সদাচার শিক্ষা দ্বারা প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হয়। মহাপুরুষের লক্ষণানুসারে স্বীয় মহাপুরুষত্ব সম্পাদন কর।

রাম—ইহা কিরূপে হইবে আবার বলুন।

বশিষ্ঠ—সম্যক্ জ্ঞান ভিন্ন মহাপুরুষ হওয়া যায় না। শম দমাদি গুণ অর্জ্জন করাই সদাচার লাভ করা। শম-দমাদি গুণ প্রাপ্ত হইলে, উত্তম জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়; আবার জ্ঞান হইতেও শম দমাদির বৃদ্ধি হয়। সদাচার দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি, আবার জ্ঞান হইতে সদাচার বৃদ্ধি।

শমাদিভ্যো গুণেভ্যশ্চ বর্দ্ধতে জ্ঞানমুত্তমম্।
পুনশ্চ গুণাঃ শমদয়ো জ্ঞানাচ্ছমাদিভ্যস্তথা জ্ঞতা।
পরস্পরং বিবর্দ্ধস্তে তে অব্জ সরসী ইব॥

যেমন পদ্ম দ্বারা সরোবরের শ্রীবৃদ্ধি হয়, আবার সরোবর হইতে পদ্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়—সেইরূপ জ্ঞান হইতে শম দমাদি গুণের বৃদ্ধি হয় এবং শম দমাদি গুণের দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়।

যে পর্য্যন্ত জ্ঞান ও শম দমাদি সদাচার যুগপৎ অভ্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তদুভয়ের কোনটিই আয়ত্ত হয় না।

দেখ নাই কি অনেকে এমন আছেন যে, তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন; কিন্তু মনের নিগ্রহ-অভ্যাস করেন নাই—অল্পেই রাগ-দ্বেষের কার্য্য করিয়া ফেলেন, আবার ইন্দ্রিয়ের দমনও নাই—সুখাদ্য যুটিয়া গেল অনেক খাইয়া ফেলিলেন, জিহ্বা দমন নাই। এরূপ ব্যক্তি জ্ঞানের উপদেশ শুনিয়াছেন সত্য, বুঝিয়াছেন সত্য, কিন্তু সদাচার অভ্যাস করেন নাই বলিয়া তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী নহেন। তবেই হইল সমকালে আত্মার কথা শ্রবণ মনন ইত্যাদি করা এবং মনের নিগ্রহরূপ শম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ দম অভ্যাস করা মুমুক্ষুর একান্ত কর্ত্তব্য। যেমন পক্ক শালিক্ষেত্ররক্ষিণী কৃষক কামিনী উচ্চ করতালি দিয়া যখন গান করে, তখন সে সমকালে খগোৎসাদনও করে এবং গীতানন্দও ভোগ করে—সেইরূপ মনের প্রবৃত্তিভাগকে দমন জন্য মনকে বিষয়-দোষ দর্শন করাও এবং যোগাদি সাধন দ্বারা ইহাকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ কর এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের নিবৃত্তিভাগকে আত্মার কথা শ্রবণ করাও, শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আত্মারামকে ভজন করাও, সমকালে অভ্যাস ও বৈরাগ্য অনুষ্ঠান কর; ইহাতেই তুমি জ্ঞানলাভ করিবে। সদাচারী হওয়া ইহাই। সদাচার কি তাহা বলিলাম—উত্তর প্রকরণে জ্ঞানোপদেশ করিব। সমকালে অভ্যাস ও বৈরাগ্য অনুষ্ঠান না করা পর্য্যন্ত, কেহই আপনি আপনি ভাবে পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিতে পারে না।

ইতি মুমুক্ষু-ব্যবহার-প্রকরণ সম্পূর্ণ।

Registered No. C. 583.

৬ষ্ঠ বর্ষ।] ফাল্গুন চৈত্র ১৩১৮ সাল। [১১শ, ১২শ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

প্রকাশক—শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী।

কলিকাতা, ১০ নং শম্ভু চন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, নিউ আর্য্য মিশন যন্ত্রে
শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা মুদ্রিত এবং ১৬২নং বউবাজার ষ্ট্রীট
উৎসব কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

সম্পাদকের ঠিকানা— ৪২ হাজরা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

উৎসব।

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

৬ষ্ঠ বর্ষ।] ১৩১৮ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র। [১১শ, ১২শ সংখ্যা।

শিবরাত্রি।

বসন্তের কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী নিশি,
কি মহান্ পবিত্রতা জাগাইছে আজি—
বিনা যোগে, বিনা ধ্যানে, বিনা সাধনায়,
উত্তরিলা ভবার্ণবে ব্যাধ মতিহীন;
অর্পি দূর্ব্বা বিল্বদল মহেশের শিরে—
সর্ব্বদেব পূজ্যদেব আশুতোষ যিনি।
আজন্ম যে হিংসাবৃত্তি-ব্রতপরায়ণ,
আজন্ম যে পশুমাংস করিল ভক্ষণ,
সেই লভে মোক্ষপদ—দলি' যম দূতে।
হেন শিক্ষা আছে কোন্ ব্রতে এ মহীতে?

ছ......

এযে শ্যামা ব্রহ্মময়ী।

ব্রহ্মকে ত আকারে পাই না। ব্রহ্মকে পাই ব্রহ্মময়ী আকারে। ব্রহ্ম হওয়া যায় আর ব্রহ্মময়ীকে পাওয়া যায়।

কি চাও? হ'তে চাও না পেতে চাও?

হৃদয়েই পেতে চাই। সেই পাওয়াই পাওয়া। অন্য পাওয়া চিরদিনের তরে নয়। যে পাওয়া চিরতরে নয়, সেটা পাওয়াই নয়। তাতে লাভ কি ?

আচ্ছা ব্রহ্মময়ী কে ?

যিনি কৃষ্ণময়ী, যিনি রামময়ী, যিনি শিবময়ী তিনিই ব্রহ্মময়ী। যিনি অতিশয় কৃষ্ণ, যিনি নিরতিশয় রাম, যিনি শিবাতিশয্য,—তিনিই অতিশয় ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মময়ী।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী তবে এক নয় ?

না এক নয়। ভেদে অভেদ, পৃথকে এক।

এ হেঁয়ালী কি বুঝিব ?

হেঁয়ালী নয় সত্য কথা। যিনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ, যাঁহাকে প্রকাশ করিতে গেলে লবণপুত্তলিকার সমুদ্র পরিমাণ করিতে যাওয়া হইয়া যায়—বল সে অবস্থায় গিয়া কে বলিতে পারে আমিই ব্রহ্ম গো তোমরা দেখ। কে বলিতে পারে আমি ব্রহ্মজ্ঞানী গো তোমরা আমায় দেখ ? সুষুপ্ত হইয়া যাওয়া যায়—আমি সুষুপ্ত গো কে বলিতে পারে ?

তবে যে লোকে ব্রহ্মের কথা বলে ? ব্রহ্মের কথা বলে না, বলে ব্রহ্মময়ীর কথা।

ব্রহ্ম অভাবে যিনি আছেন কি নাই কেহ বলিতে পারে না আবার ব্রহ্মকে পাইয়া যিনি চৈতন্যময়ী, যিনি আকার দিয়া সেই আকারে আকারবিশিষ্টা তিনিই ব্রহ্মময়ী। কৃষ্ণও কিছু করেন না, রামও না, শিবও না —করেন ব্রহ্মময়ীরা। নাম দেন কৃষ্ণ করিলেন, রাম করিলেন, শিব করিলেন।

এই ব্রহ্মময়ী কে একবার দেখাইতে পার ?

হাঁ পারি।

কোথায় ?

শঙ্কর হৃদি-সরোজে।

হৃদয়ে পদ্ম না পায়ে পদ্ম ?

হৃদয়ে কিছুই নাই। শঙ্করহৃদয়ে পা রাখিয়া যখন শঙ্করী দাঁড়ান তখন পায়ের স্পর্শে কি জানি কেমন করিয়া পদ্ম ফুটিয়া উঠে। সেই পদ্ম ফোটাও, দেখিবে যাঁহার শ্রীচরণে পদ্ম ফোটে তিনিই ব্রহ্মময়ী। তাই ভক্ত গান করেন।

(মায়ের) নখরে অরুণ ছোটে পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে
মকরন্দগন্ধে অন্ধ ভৃঙ্গ পুঞ্জগুঞ্জে ধায়
তড়িত কুন্তলজাল বিজড়িত পায় পায়। রে
মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।

এই ত আছে। দেখ না।

তাইত জিজ্ঞাসা করি কি ক'রে দেখিব?

বচন থামাতে পার?

পারি।

কি করে?

সুবচন কয়ে আগে কুবচন থামিয়ে। তাই কি কথা কওয়া?

তা নয় আর কি?

শুভ কথা কইতে অভ্যাস করিলে তবে অশুভ কথা ত্যাগ হয়। তখন শুভ কথাই থাকে। তারপরে, শুভ কথা—শুভ কথার আধারকে দেখিয়ে দিয়ে আপনিও থাকে না—থাকেন ব্রহ্মচৈতন্ত ধরিয়া চৈতন্তময়ী। শেষে তিনিও আপন প্রিয় বক্ষে মিশিয়া যান,—থাকেন যিনি চিরদিন সমান ভাবে সর্ব্বত্র আছেন তিনিই। ভাবনা কর না এই তত্ত্ব। যদি হইতে পার, তবে হওয়া ভঙ্গে দেখিবে ব্রহ্মময়ী কে? হ'বে কি? যেমন ক'রে সুষুপ্ত হও, তেমনি ক'রে একবার জাগ্রত্-সুষুপ্ত হওনা?

সুষুপ্ত হ'বার পূর্ব্বে যেমন ক'রে স্থির হয়ে শুয়ে থাক—কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর নড়ে না,—সেই রকম হও শুনিবে সেই সময়ে একটা শব্দ হয়। কখন কি সেই শব্দে মন দিয়াছ? না দিয়া থাক ত এখন একবার দিয়া দেখ। দেখ দেখি ঠিক কি না?

হঙ্কারেণ বহির্যাতি স কারেণ বিশেৎ পুনঃ।

হং শব্দ করিয়া বাহির হয় আবার সঃ শব্দ করিয়া ভিতরে যায়—এই শব্দ ধরিয়া শব্দভেদী বাণ ছুড়িতে শিক্ষা কর। শব্দ যেখানে পঁহুছিয়া দেয়, সেই সর্ব্বশব্দের বিরামস্থানই সেই। করিয়া দেখ—বহুদিন ধরিয়া দেখ—বুঝিবে।

শিবরাত্রি করার কথা।

১

তুমি ও আমি।

আবার ত এসেচি?

তাত আসবেই। দ্বিধা কি এখনও যায় নাই?

তুমি কি জান আমি সর্ব্বদাই আস্‌ব?

এই কথা কহিবার সময় চক্ষের যে ভাব হয়, যে আকার হয়, সেই আকারে সেই ভাবে দৃষ্টি পড়িলে কথা বন্ধ হইয়া যায়। সবারই যায়। সংযমীরও কথা বন্ধ হইয়া যায়, অসংযমীরও যায়। সংযমীর কথা বন্ধ হইয়া যায় এবং অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের সকল চলনও থামিয়া যায়; কিন্তু অসংযমীর কথা বন্ধ হইয়া যায় বটে, পরন্তু হৃদয়বেগে অন্য কিছু কার্য্য হয়। উভয়ই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক হইলেই যে সকল স্বভাবের কথা বলিতে হইবে, তাহা কুরুচি মাত্র। যে স্বাভাবিক ভাব সর্ব্বদা আবশ্যক, যে সকল স্বাভাবিক ভাব বরেণ্যং ভর্গের মত উর্দ্ধমুখে কোন এক আনন্দসাগরে মিশাইবার জন্য ছুটিয়া যায়, সেই সমস্ত স্বাভাবিক ভাবই আবশ্যক। নিম্ন স্বাভাবিক ভাবও আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু সেটা বিষে পরিণত হয়। প্রকৃত পক্ষে সেটা আনন্দ নয়—আনন্দের প্রলেপ দেওয়া বিষ মাত্র। বিষপানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু উচ্চ স্বাভাবিক ভাবে অমর করে—উহাই প্রকৃত আনন্দ। আমরা পূর্ব্বোক্ত কথায় সংযমীর যাহা হয় তাহাই বলিতেছি।

বলিতেছিলাম তুমি কি জান সর্ব্বদাই আস্‌ব? এ কথার উত্তর আর বাক্যে হয় না। যেখানে বাক্যের স্ফুরণ নাই, যেখানে ইন্দ্রিয়ের চলন নাই,—এই কথা অন্তরাত্মাকে যেন সেইখানে লইয়া যায়; সেই অবস্থায় পৌছাইয়া দেয়। এই ভাব হৃদয়ে আনিতে পারিলে যে দৃশ্য জাগিবে, আমরা সেই দৃশ্যের কথা বলিতেছি।

দেবাদিদেব স্থিরদৃষ্টিতে শ্রীপার্ব্বতীর পানে চাহিয়া আছেন, আর পার্ব্বতী? পার্ব্বতী এখানে—

অবৃষ্টি সংরম্ভমিবাম্বুবাহং
অপামিবাধার মনুত্তরঙ্গম্।

জলভরা মেঘ—কিন্তু বারিপাত নাই। তরঙ্গভরা তোয়নিধি—কিন্তু একটিও তরঙ্গ-ভঙ্গ নাই।

দুই জনেই যেন এই দৃশ্যপ্রপঞ্চে কোথাও নাই। যেন এই সর্ব্বদা শব্দ-পরিপূরিত জগতের শব্দরাশি ভেদ করিয়া গেলে—যেন এই শব্দময় ঊর্দ্ধাধঃ-পরিবেষ্টিত সীমাশূন্য আকাশ ছাড়াইয়া গেলে—যে আর একটা শব্দশূন্য জগৎ আছে—এই জাগ্রত্‌স্বপ্নশ্রুত শব্দরাশির অন্তরালে যে আর একটা নিঃশব্দ রাজ্য আছে,—যেন শ্রীহরপার্ব্বতী সেখানকার মূর্ত্তি।

সে রাজ্যে কথা নাই। আছে স্থির শান্তদৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে কথা হইল।

কথা নাই অথচ কথা হইল। বলাত চাই।

আবার কথা চলিল—

তোমায় কি পেয়েচি ?

তাকি আমি বলিব ?

তবে কে বলিবে ? কেহ কি আর আমার আছে ? আচ্ছা তাই। বল দেখি আমি কি তোমায় পেয়েচি ?

এই যে আমি বামাঙ্গে।

আর এই যে আমায় পাইয়াই তুমি। বুঝিলে তোমার প্রশ্নের উত্তর।

কথাটা এই। চৈতন্যের বক্ষে নাচিয়া শক্তি চৈতন্যময়ী চৈতন্যদীপ্তা। আবার চৈতন্যময়ী দ্বারা চৈতন্য আকার বিশিষ্ট। ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বরের ভিতরের কথা।

২

রাজা ও রাণী।

রাণী—মহাদেবকে আমার বড় ভাল লাগে।

রাজা—কেন ?

রাণী—এমন বিভোর হইয়া আর রাম রাম করিতে কে পারে ?

রাজা—শুধু কি সেই জন্য ?

রাণী—তবে আবার কি জন্য ?

রাজা—ঐ যে "বামাঙ্গে দধতম্"

রাণী—সত্যই এমন আর কোথায়?

রাজা—ঐটিই তোমাদের বড় প্রিয়।

রাণী—বলিতে হয় বল, কিন্তু বল দেখি এমন সুন্দর আর কোথায়? এমন স্বর্গে মর্ত্তে চিরদিই আর কে আছেন? ঐ দৃশ্য একবার ভাবনার চক্ষে দেখদেখি।

সুন্দর দক্ষিণামূর্ত্তি। মস্তকে জটাভার আবদ্ধ। তন্মধ্যে জটাটবীবিহারিণী গঙ্গা। মৌলিবদ্ধ জটামূলে, বিধুখণ্ডবিখণ্ডিত ভালতটে চন্দ্রকলা। গলদেশে গরল। কণ্ঠে নাগোপবীত। চক্ষু অনলপ্রভাতুল্য উজ্জ্বল। তৃতীয়ে বর। চতুর্থে অভয়। হিমবিধু-মুক্তাধবল দেহ। একবার এইরূপের কথা ভাবিয়া দেখ সুন্দর পুরুষ যোগাসনে উপবিষ্ট। বামাঙ্গে প্রালেয় শৈলাত্মজা।

ভগবতী পার্ব্বতীর দক্ষিণ হস্ত উমাপতির স্কন্ধদেশে অর্পিত। উমানাথকে স্পর্শ করিয়া হররাণী আলুথালু হইয়া গিয়াছেন। অঙ্গের বসন বিগলিত হইয়া গিয়াছে, দৃষ্টি নাই। সে স্পর্শে লজ্জার বন্ধন নাই। দক্ষিণ হস্ত বামস্কন্ধ হইতে এরূপ ভাবে লম্বিত—যাহা দেখিলে মনে হয়, শ্রীপার্ব্বতী বুঝি সব হারাইয়া ফেলিতেছেন। কোথাও চঞ্চলতা নাই। স্মরহরের স্পর্শে শ্রীপার্ব্বতী বিভোর হইয়া দেবাদিদেবকে দেখিতেছেন। আর মহেশ্বর? ভাল করিয়া দেখ দেখি—কোথায় দৃষ্টি? পার্ব্বতীর আলিঙ্গনেও কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। নয়ন দেখ—দেখিবে যেন এই দেবতা জগৎ ছাড়িয়া অন্য কোন আপনি আপনি রাজ্যে স্থিতিলাভ করিয়াছেন। যেন দৃশ্যপ্রপঞ্চ মার্জ্জন করিয়া, প্রপঞ্চ-দর্শনরূপ গরল পান করিয়া, নীলকণ্ঠ কি এক আনন্দে কি এক অপরিসীম আনন্দে ভাসিতেছেন; যেন ইনি আনন্দঘন মূর্ত্তিতে চাহিয়া চাহিয়া ত্রিভুবন পরিপূরিত করিয়া রহিয়াছেন।

বলনা, এমন দেবতা আর কোথায়?

অমৃত ও গরল একসঙ্গে আর কে ধারণ করিয়াছেন? কপালে চন্দ্রকলা সুধাবর্ষণ করিতেছে; আর কণ্ঠে হলাহল, সর্ব্বাঙ্গে বিষধর সর্প—বল এই বিষামৃত একসঙ্গে আর কে ধারণ করিতে পারেন?

সর্ব্বাপেক্ষা মধুর এই ত্রিপুরারির পঞ্চবক্ত্রে রাম নাম। বুঝি শিবত্বলাভ

করিতে না পারিলে, পূর্ণভাবে রামনাম করা হয় না। বুঝি তাই তিনি পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনাম তত্তুল্যং রামনাম বরাননে।

রাজা—রাণি! "বামাঙ্গে দধতং" শুনিয়া আমি একটু রহস্য করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার ভক্তিভরা শিবনামে আমি কি অপূর্ব্ব দেখিলাম! দেখিলাম সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে, ভ্রূযুগলমধ্যে দ্বিদল কমল। সেই কমলকর্ণিকায় এই সুন্দর পুরুষ ঐ পার্ব্বতীকে বামাঙ্গে ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। মণিমুক্তা বিজড়িত শ্রীপার্ব্বতীর দক্ষিণ হস্ত মহাদেবের গলদেশের পশ্চাৎভাগ বেষ্টন করিয়া, বামস্কন্ধের উপর অযত্নবিক্ষিপ্তভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কি স্বাভাবিক দৃশ্য ইহা! বসন আলুথালু,—কোথাও চঞ্চলতার ছায়া পর্য্যন্ত নাই। যেন এই দেবাদিদেব আমার ভ্রূমধ্যে সূর্য্যমণ্ডলে উপবিষ্ট হইয়া, রামনামের মধুর আস্বাদনে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন।

রাণি! যে দৃশ্য তুমি দেখাইলে ইহা যে শ্রীরামসেবকের ধ্যানের মূর্ত্তি। মনে হয় এমনি করিয়াই বুঝি রাম রাম করিতে হয়।

রাণী—তবে যে বলিতেছিলে "বামাঙ্গে দধতং" টিই স্ত্রীজাতির বড় প্রিয়।

রাজা—বলিবামাত্র এক ভাবিয়াছিলাম, তুমি সেই ভাবনাকে নির্ম্মল করিয়া দিয়াছ।

রাণী—কি ভাবিয়াছিলে?

রাজা—তুমি বলিবা মাত্র মনে হইল যেন তুমিই শ্রীপার্ব্বতী, মহাদেবের বামাঙ্গে উপবেশন করিয়াছ—তোমারই দক্ষিণ হস্ত ত্রিলোচনের বামস্কন্ধে। যেন তুমিই আমার দ্বিদলে। আর—

রাণী—আর মহাদেব তুমি আপনি। বলনা আমার মহাদেব আর কোথায়?

রাজা—তা তুমি যাহাই ভাব, তুমি যাহা বলিতেছিলে তাহাই কিন্তু ধ্যানের মূর্ত্তি।

রাণী—মহারাজ! আমি কিন্তু চাই, আমার মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় হইয়া অনন্ত অনন্ত কাল তাঁহার পার্ব্বতীকে বামাঙ্গে দধতং করিয়া ঐরূপে পরমানন্দে স্থিতিলাভ করেন।

রাজা—রাণি! আমি জানি তুমি এই চাও। কিন্তু—

রাণী—কিন্তু কি মহারাজ! ইহাতে আর কিন্তু নাই। তোমাকে মৃত্যুঞ্জয় হইতেই হইবে। এই জীবনেই। নতুবা তোমার পার্ব্বতীর গত্যন্তর নাই। তোমায় ছাড়িয়া আমি মরিতে পারিব না। আর তোমার দেহত্যাগে? সেখানে ত কথাই নাই। আমি যা করিব তাহা ত জানিই।

রাজা—বড় যে ব্যাকুল হইয়া পড়িলে? এই জন্যেই ত বলি স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!

রাণী—আর্য্যপুত্র! আমরা অমর হইব ইহা কি তুমি অসম্ভব মনে কর? আমার প্রেম কি শুধু দিন কয়েকের জন্য? অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া যদি এই নিত্যানন্দে স্থিতিলাভ করিতে না পারিলাম, তবে আর ভালবাসিয়া লাভ কি? দু'দিনের ভালবাসা যদি দু'দিনেই ফুরাইয়া যায়, তবে ভালবাসাটা কাম মাত্র। এ কাম কে চায় প্রভু! তুমি অদ্যই আমাদের রাজ্যে যেখানে যত সাধু আছেন, জ্ঞানী আছেন তাঁহাদিগকে আনয়ন জন্য মন্ত্রীকে আদেশ কর। তুমি নিজে এ কথা যদি না তোল, আমি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিব,—এই জীবনে, এই দেহেই অমরত্বলাভ কিরূপে হয়? আমরা অমর হইবই। মৃত্যুঞ্জয়ের মত রাম রাম করিয়া অমর হইব। হইতেই হইবে।

বারাণসী-বিশ্বনাথ।

(১)

নমি রাজা বিশ্বনাথ বারাণসী-পতি,
সদানন্দ জ্ঞানময় পবিত্র শঙ্কর,
হর হর বম্ বম্ অগতির গতি,
ঊর্দ্ধে অধে আশে পাশে নমি মহেশ্বর।

(২)

রাজ্য তব শান্তিময় ওহে শান্তিনাথ,
পবিত্র গঙ্গার নীর তৃপ্তিময় অতি,

মহাদেব হর হর শত প্রণিপাত,
শিবশম্ভু এ মূঢ়ের স্থির কর মতি।

(৩)

প্রত্যহ প্রভাতে স্নান করিয়া গঙ্গায়,
গঙ্গানীর বিল্বপত্র করি আহরণ,
যেই নর নিত্য পূজে মহেশ তোমায়,
অবসরে করে সদা শাস্ত্র আলোচন—

(৪)

সেই নর উপযুক্ত বারাণসী-বাসী,
রাজা, তব প্রিয় শিষ্য বিশ্বাসী সুধীর,
কি করিতে পারে তার মৃত্যুদিন আসি,
বারাণসীপুর-পতি পায়ে তার শির ॥

শু—

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

সরস্বতীরহস্যোপনিষত্।

ঋকমন্ত্র] ক্লীং যদ্ বাগ্ বদন্ত্যা বিচেতনানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা।
চতস্র ঊর্জং দুদুহে পয়াংসি ক্ব স্বিদস্যাঃ পরমং জগাম ॥ ৭ ॥

যদ্ বাগ্ বদন্তি এই মন্ত্রের ভার্গব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। ক্লীং ইতি বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋকমন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

যিনি নির্ব্বিকল্পস্বরূপে অব্যক্তা হইলেও নাম, জাতি ইত্যাদি অষ্টবিধ রূপে ব্যক্ত হয়েন, সেই শ্রীসরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

দীপ্তিশালিনী, দেবতৃপ্তিবিধায়িনী মাধ্যমিকা বাক্ যখন অচেতন বস্তু সমূহ জ্ঞাপন করিয়া কল্পিত যজ্ঞদেশে উপবেশন করেন, তখন ইতস্ততঃ অন্ন তৎকারণ জল দোহন করিয়াছেন, কিন্তু এই মাধ্যমিকা বাকের আপন পরমস্বরূপ কোথায় তাহা দেখা যায় না ॥৭॥

শিষ্য—শ্রীদেবী সরস্বতী আপন নির্ব্বিকল্পস্বরূপে আপনি আপনি ভাবে অব্যক্তা। কিন্তু যখন ব্যক্তাবস্থায় আগমন করেন, তখন নাম, জাতি ইত্যাদি অষ্টবিধ রূপেই ব্যক্ত হয়েন। ব্যক্তাবস্থায় তাঁহার রূপ কি?

গুরু—দীপ্তিময়ী—আনন্দময়ী ইনি এই মধ্যমাবস্থায় অচেতন জড়-সমূহকে জানাইয়া দেন। ইনি যজ্ঞস্থানে উপবেশন করেন। ইনি অন্ন ও জল প্রদান করেন। স্বরূপে কিন্তু ইনি অবিজ্ঞাতা ॥৭॥

দেবীং বাচমিতি মন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। সৌরিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ ॥

বাক্তাঽব্যক্তগিরঃ সর্ব্বে বেদাদ্যা ব্যাহরন্তি যাম্।
সর্ব্বকামদুঘা ধেনুঃ সা মাং পাতু সরস্বতী ॥

[ঋক্‌মন্ত্র] দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপসুষ্টুতৈতু ॥ ॥৮॥

দেবীং বাচং এই মন্ত্রের ভার্গব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। সৌঃ এই বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

সমস্ত বেদ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাষায় যাঁহার কথা কীর্ত্তন করেন, সর্ব্ব-কামধেনুস্বরূপা সেই দেবী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

এই মাধ্যমিকা বাক্ সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্গতা এবং ধর্ম্মাভিবাদিনী। শ্রুতি ইঁহার বিভূতি প্রকট করিতেছেন।

আধ্যাত্মিক দেবগণ, দেবী (দ্যোতমানা) মাধ্যমিকা বাক্‌কে আবিষ্কার করেন, বিশ্বরূপধারিগণ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাষায় সেই বাক্ ব্যবহার করিয়া থাকেন (কেননা বৈখরীর মূল এই মধ্যমা বাক্)। আনন্দজননী এই মাধ্যমিকা বাগ্‌দেবী বৃষ্টি দানে আমাদের জন্য অন্ন ও ঘৃতাদিরূপ রস ক্ষরণ করেন, অতএব সেই ধেনুরূপা বাগ্‌দেবী আমাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া আমাদের নিকটে আগমন করুন ॥৮॥

গুরু—বুঝিয়াছ কি দেবী সরস্বতী কে?

শিষ্য—সমস্ত বেদ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাষায় যাঁহার কথা কীর্ত্তন করেন, যিনি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন—এই ত বলিতেছেন।

গুরু—বেদ ব্যক্ত ভাষায় যাঁহার কথা কীর্ত্তন করেন, তিনি সগুণ ব্রহ্ম।

আর অব্যক্ত ভাষায় যাঁহার কথা কীর্ত্তন করেন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। সরস্বতী দেবী আপনস্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্মরূপিণী। তটস্থ লক্ষণে তিনিই বিশ্বরূপিণী। বিশ্বরূপটি তাঁহার সমষ্টিরূপ, কিন্তু ব্যষ্টিরূপে তিনি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দেব-নর মধ্যে পূজিতা।

দেবতাগণ এই জ্যোতিস্বরূপিণী মধ্যমা বাক্‌কে প্রথমে আবিষ্কার করেন। বরণীয় ভর্গকে (ভূমিকাতে) মধ্যমা বাক্ বলা হইয়াছে। ইনি আনন্দজননী। ইনি রসস্বরূপিণী। ইনিই বৃষ্টি দানে আমাদের জন্য অন্ন ও ঘৃতাদি রস ক্ষরণ করেন। সকল দেবতাই আপনস্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম। ব্যক্ত সমষ্টিভাবে বিশ্বরূপ এবং ব্যক্ত ব্যষ্টিভাবে প্রচলিত মূর্ত্তি। এই তিনের কোন একটি বাদ দিলে, ঋষিগণের কথা আমরা বুঝিতে অক্ষম হই। দেবতারাই মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহারও ধারণা চাই।

উতত্ব ইতি মন্ত্রস্য বৃহস্পতি ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা। সমিতি বীজঃ শক্তি কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাসঃ।

যাং বিদিত্বাখিলং বন্ধং নির্মথ্যামলবর্ত্মনা।
যোগী যাতি পরং স্থানং সা মাং পাতু সরস্বতী ॥

ঋক্‌মন্ত্র—উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং ত বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥৯॥

উতত্ব এই মন্ত্রের বৃহস্পতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। সং এই বীজ শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

যোগিগণ যদীয় জ্ঞানের সাহায্যে অখিল সংসারবন্ধন উন্মথিত করিয়া নির্ম্মল পথ দিয়া পরমস্থানে গমন করেন, সেই শ্রীদেবী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

ঋক্ মন্ত্রানুবাদ] কেহ কেহ মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়াও বাক্‌কে দেখিতে পান না, অর্থাৎ দর্শনেন ফলপ্রাপ্ত হন না। আবার কেহ কেহ ইহাকে শুনিয়াও শুনেন না অর্থাৎ শ্রবণের ফলপ্রাপ্ত হন না। শ্রুতির অর্দ্ধাংশ দ্বারা অজ্ঞজনের কথা বলা হইল। তৃতীয়পাদে বেদার্থবিৎজনের কথা বলা হইতেছে—অপর কাহারও নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ঋতুকালে সম্ভোগাভিলাষিণী জায়া যেমন সাজসজ্জা করিয়া পতির নিকট আপনাকে বিবৃত করেন,

সেইরূপ। অর্থাৎ বেদার্থবিদ্ বাক্‌কে শুনিতেও পান এবং বুঝিতেও পারেন—ইহাই বেদার্থবিদের প্রশংসা ॥৯॥

অম্বিতম ইতি মন্ত্রস্য গৃৎসমদ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। সরস্বতী দেবতা ঐমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্। মন্ত্রেণ ন্যাস।

নামরূপাত্মকং সর্ব্বং যস্যামাবেশ্যতাং পুনঃ।
ধ্যায়ন্তি ব্রহ্মরূপৈকা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥
ঐমম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তি মম্ব ন স্কৃধি ॥১০॥

অম্বিতম এই মন্ত্রের গৃৎসমদ ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। সরস্বতী দেবতা। ঐঁ এই বীজ, শক্তি ও কীলক। ঋক্‌মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস।

নামরূপাত্মক নিখিল বিশ্ব যাঁহাতে সমাবেশিত হইয়াছে এবং পুনর্বার যাঁহারই স্তব করিয়া থাকে,—অদ্বিতীয়া ব্রহ্মরূপা সেই শ্রীদেবী সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীসরস্বতীর নিগুর্ণ ব্রহ্মত্ব ও সগুণ বিশ্বরূপত্ব বর্ণনা করিয়া, শ্রুতি এক্ষণে ইঁহার মায়ামূর্ত্তি বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীদেবী সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা কতই সুন্দর। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব ও সমাধি—শ্রুতি বুঝাইয়াছেন।

চতুর্ম্মুখ-মুখাম্ভোজবনহংসবধূর্ম্ম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লাসরস্বতী ॥১॥
নমস্তে শারদে দেবি! কাশ্মীরপুরবাসিনি!
ত্বামহং প্রার্থয়ে নিত্যং বিদ্যাদানং চ দেহি মে ॥২॥
অক্ষসূত্রাঙ্কুশধরা পাশপুস্তকধারিণী।
মুক্তাহারসমাযুক্তা বাচি তিষ্ঠতু মে সদা ॥৩॥

চতুর্ম্মুখের মুখরূপ কমলবনের হংসবধূরূপা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী আমার মানস-সরোবরে বিহার করুন ॥১

হে কাশ্মীর-পুরবাসিনি! দেবি, শারদে! তোমাকে প্রণাম, তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তুমি আমায় বিদ্যাদান কর ॥২

অক্ষসূত্রাঙ্কুশধারিণী, পাশপুস্তক-ধরা, মুক্তাহারসমালঙ্কৃতা (সরস্বতী) সর্ব্বদা আমার বাক্যে অধিষ্ঠিত থাকুন ॥৩

কম্বুকণ্ঠী সুতাম্রোষ্ঠী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
মহাসরস্বতী দেবী জিহ্বাগ্রে সন্নিবেশ্যতাম্‌ ॥৪॥
যা শ্রদ্ধা ধারণা মেধা বাগ্‌দেবী বিধিবল্লভা।
ভক্তজিহ্বাগ্রসদনা শমাদিগুণদায়িনী ॥৫॥
নমামি যামিনীনাথ লেখালঙ্কৃতকুন্তলাম্‌।
ভবানীং ভবসন্তাপনির্ব্বাপণ-সুধানদীম্‌ ॥৬॥
যঃ কবিত্বং নিরাতঙ্কং ভুক্তিমুক্তিং চ বাঞ্ছতি।
সোঽভ্যর্চ্যৈনাং দশশ্লোক্যা নিত্যং স্তৌতি সরস্বতীম্‌ ॥৭॥
তস্যৈবং স্তবতো নিত্যং সমভ্যর্চ্য সরস্বতীম্‌।
ভক্তিশ্রদ্ধাঽভিযুক্তস্য ষাণ্মাসাৎ প্রত্যয়োভবেৎ ॥৮॥
ততঃ প্রবর্ত্ততে বাণী স্বেচ্ছয়া ললিতাঽক্ষরা।
গদ্যপদ্যাত্মকৈঃ শব্দৈরপ্রমেয়ৈর্ব্বিবক্ষিতৈঃ ॥৯॥
অশ্রুতো বুধ্যতে গ্রন্থঃ প্রায়ঃ সারস্বতঃ কবিঃ।
ইত্যেবং নিশ্চয়ং বিপ্রাঃ সা হো বাচ সরস্বতী ॥১০॥

যাঁহার কণ্ঠদেশ শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাযুক্ত, ওষ্ঠ আরক্ত, যিনি সর্ব্বাভরণে বিভূষিত,—সেই দেবী মহাসরস্বতী আমার জিহ্বাগ্রে সন্নিবিষ্ট হউন ॥৪

যে বাগ্‌দেবী শ্রদ্ধা, ধারণা ও মেধাস্বরূপা, যিনি বিধিবল্লভা (অর্থাৎ ব্রহ্মাণী) যিনি ভক্তজনের জিহ্বাগ্রবাসিনী এবং শমাদিগুণদায়িনী ॥৫

চন্দ্রলেখা দ্বারা যাঁহার অলকমালা অলঙ্কৃত, যিনি ভবানী এবং ভবসন্তাপ-নির্ব্বাপণে সুধাময়ী-নদী, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি ॥৬

কবিত্ব, অভয় ও ভোগ-মোক্ষে যাঁহার অভিলাষ আছে, সে ব্যক্তি সরস্বতীকে বিধিমতে পূজা করিয়া, এই দশশ্লোকী দ্বারা নিত্য তাঁহার স্তব করেন ॥৭

নিত্যপূজার অনন্তর ভক্তি শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া যে ব্যক্তি সরস্বতীর স্তব করেন, ছয়মাসে তাহার প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞানলাভ ঘটে ॥৮

অনন্তর স্বেচ্ছাক্রমে সুললিত বর্ণে গদ্য-পদ্যময় অভিপ্রেতার্থ-প্রকাশক ভাষা, তাঁহার মুখবিবর হইতে বহির্গত হইতে থাকে ॥৯

সরস্বতীর উপাসক ব্যক্তি প্রায়শঃ কবি হন, এবং গুরুমুখে না শুনিলেও তিনি অর্থবোধে সমর্থ হন। হে বিপ্রগণ! সরস্বতী এই নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন ॥১০

আত্মবিদ্যা ময়ালব্ধা ব্রহ্মণৈব সনাতনী।
ব্রহ্মত্বং মে সদা নিত্যং সচ্চিদানন্দরূপতঃ ॥১১॥
প্রকৃতিত্বং ততঃ সৃষ্টং সত্ত্বাদিগুণসাম্যতঃ।
সত্যমাভাতি চিচ্ছায়া দর্পণেপ্রতিবিম্ববৎ ॥১২॥
তেন চিৎপ্রতিবিম্বেন ত্রিবিধা ভাতি সা পুনঃ।
প্রকৃত্যবচ্ছিন্নতয়া পুরুষত্বং পুনশ্চ তে ॥১৩॥
শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানায়াং মায়ায়াং বিম্বিতো হ্যজঃ।
সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির্মায়েতি প্রতিপাদ্যতে ॥১৪॥
সা মায়া স্ববশোপাধিঃ সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য হি।
বশ্যমায়ত্বমেকত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং চ তস্য তু ॥১৫॥
সাত্ত্বিকত্বাৎ সমষ্টিত্বাৎ সাক্ষিত্বাজ্জগতামপি।
জগৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুং বা চান্যথা কর্ত্তুমীশতে ॥১৬

শ্রুতি সাহায্যেই আমি সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি। ব্যবহার-দৃষ্টিতে যাহা যুষ্মৎপদবাচ্য জীবচৈতন্য, তাহা সর্ব্বদা আমার নিকট সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত ॥১১

তাহা হইতে গুণসাম্যরূপিণী প্রকৃতির সৃষ্টি হয়,—দর্পণে যেমন মুখ প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ এই প্রকৃতিতে ছায়া বা আভাসরূপে চিৎ প্রতিবিম্বিত হয়েন ॥১২

সেই প্রকৃতি, সেই চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত হইয়া ত্রিবিধরূপে প্রতিভাত হয়েন। প্রকৃতি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়াতেই চিতের পুরুষত্ব হইয়া থাকে ॥১৩

সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে মায়া বলে। অজপুরুষ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানা মায়াতে প্রতিবিম্বিত হয়েন এবং ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন ॥১৪

সেই মায়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্ববশীভূত উপাধি। সুতরাং সেই ঈশ্বর বশীকৃত মায়া সর্ব্বজ্ঞ এবং এক ॥১৫

ঈশ্বরের উপাধিভূত মায়া সাত্ত্বিক বলিয়া, সমষ্টি উপাধি বলিয়া, তিনি এই জগৎ রচনা করিতে বা না করিতে বা অন্যরূপ জগৎ রচনা করিতে সমর্থ ॥১৬॥

যস্য ঈশ্বর ইত্যুক্তঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভিগুণৈঃ।
শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায়া বিক্ষেপাবৃতি রূপকম্॥১৭
বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ।
অন্তর্দৃগ দৃশ্যয়োর্ভেদং বহিশ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ॥১৮
আবৃণোত্যপরা শক্তিঃ সা সংসারস্য কারণম্।
সাক্ষিণঃ পুরতো ভাতং লিঙ্গদেহেন সংযুতম্॥১৯
চিতিচ্ছায়া সমাবেশাজ্জীবঃ স্যাদ্ব্যাবহারিকঃ।
অস্য জীবত্বমারোপাৎ সাক্ষিণ্যপ্যবভাসতে॥২০
আবৃতৌ তু বিনষ্টায়াং ভেদে ভাতেঽপ্রযাতি তৎ।
তথা সর্গ ব্রহ্মণোশ্চ ভেদমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥২১
যা শক্তিস্তদ্বাবশাৎ ব্রহ্ম বিকৃতত্বেন ভাসতে।
অত্রাপ্যাবৃতি নাশেন বিভাতি ব্রহ্ম সর্গয়োঃ॥২২

যিনি এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন, তিনি সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণে ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। মায়ার দুইটি শক্তি—বিক্ষেপ-শক্তি এবং আবরণ-শক্তি॥১৭

বিক্ষেপ-শক্তি (হিরণ্যগর্ভের সমষ্টি লিঙ্গশরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করে। ভিতরে দ্রষ্টা (পুরুষ), এবং দৃশ্য (বুদ্ধি-সত্ত্ব) এই উভয়ের এবং বাহিরে ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ॥১৮

অন্তর্ব্বহিঃ এই উভয়বিধ শক্তি, যে আবরণ করে, তাহাই আবরণশক্তি; এবং তাহাই সংসারের কারণ। সাক্ষিপুরুষের সম্মুখে লিঙ্গদেহের সহিত সংযুক্ত হইয়া দৃশ্য ভাসমান হয়॥১৯

এবং চিতিচ্ছায়ার আরোপে (বুদ্ধি-সত্ত্ব) ব্যাবহারিক জীবরূপে পরিণত হয়। এই আরোপ বশতঃ সাক্ষিচৈতন্যেরও জীবত্ব ভাসমান হয়॥২০

আবরণশক্তির বিনাশ হইলে এবং পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ভেদবুদ্ধির উদয় হইলে, আরোপিত জীবত্ব অপগত হয়। সেই সৃষ্টি ও ব্রহ্মে যে ভেদ রহিয়াছে—আবরণশক্তি এই ভেদকে আচ্ছাদন করিয়া বর্ত্তমান থাকে॥২১

এবং তজ্জন্যই, ব্রহ্ম অপ্রকৃত অবস্থায় (সংসাররূপে) ভাসমান হয়েন। এ স্থলেও (পূর্ব্ববৎ) আবরণ-বিনাশে ব্রহ্ম ও সংসারের ভেদ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে॥২২

ভেদস্তয়োর্বিকারঃ স্যাৎ সর্গে ন ব্রহ্মণি ক্বচিৎ।
অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্ ॥২৩
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্।
অপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দতৎপরঃ ॥২৪
সমাধিং সর্ব্বদা কুর্য্যাৎ হৃদয়ে বাঽথবা বহিঃ।
সবিকল্পো নির্বিকল্পঃ সমাধির্দ্বিবিধো হৃদি। ২৫
দৃশ্যশব্দানুভেদেন সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা।
কামাদ্যাশ্চিত্তগা দৃশ্যাস্তৎ সাক্ষিত্বেন চেতনম্ ॥২৬
ধ্যায়েৎ দৃশ্যানুবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ।
অসঙ্গ সচ্চিদানন্দঃ স্বপ্রভো দ্বৈতবর্জ্জিতঃ ॥২৭
অস্মীতিশব্দবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ।
স্বানুভূতি রসাবেশাৎ দৃশ্যশব্দাদ্যপেক্ষিতুঃ ॥২৮

তদুভয়ের ভেদ, ইহাই বিকৃতি, সৃষ্টিদশায় এই ভেদ হয়, ব্রহ্মাবস্থায় এ সমুদয় কিছুই থাকে না। অস্তি, ভাতি, প্রিয়, নাম ও রূপ এই পাঁচটি অংশ ॥২৩

তন্মধ্যে আদিস্থিত তিনটি অংশ ব্রহ্মের স্বরূপ, তদ্ভিন্ন দুইটি (অর্থাৎ নাম রূপ) জগতের স্বরূপ। প্রথমতঃ নামরূপ সাপেক্ষ হইয়া সচ্চিদানন্দ-পরায়ণ ব্যক্তি ॥২৪

সর্ব্বদা হৃদয়ে বা বাহিরে সমাধির অনুষ্ঠান করিবে। হৃদয়ে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে সমাধি দ্বিবিধ ॥২৫

তন্মধ্যে দৃশ্য ও শব্দানুবিদ্ধ সমাধি, সবিকল্প সমাধি নামে অভিহিত। চিত্ত-গত কামাদি বৃত্তিকে দৃশ্যরূপে এবং তাহার দ্রষ্টারূপ চেতনপুরুষকে ধ্যান করিবে ॥২৬

ইহা দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি। আমি অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ, স্বয়ংপ্রভ এবং দ্বৈতবর্জ্জিত ॥২৭

ইহা শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি। দৃশ্যশব্দাদি-সাপেক্ষ চিত্ত যখন সবিকল্প সমাধির ফলে স্বানুভূতি রসে ভরিয়া যাইবে ॥২৮

নির্ব্বিকল্পঃ সমাধিঃ স্যান্নিবাতস্থিতদীপবৎ ।
হৃদীব বাহ্যদেশেঽপি যস্মিন্ কস্মিংশ্চ বস্তুনি ॥২৯
সমাধিরাদ্য সন্মাত্রান্নামরূপ পৃথক্ কৃতিঃ ।
স্তব্ধীভাবো রসাস্বাদাৎ তৃতীয়ঃ পূর্ব্ববন্মতঃ ॥৩০
এতৈঃ সমাধিভিঃ ষড়্‌ভির্নয়েৎ কালং নিরন্তরম্ ।
দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি ।
যত্র যত্র মনোযাতি তত্র তত্র পরামৃতম্ ॥৩১
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাঽস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥৩২
ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি ।
ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩
ইত্যুপনিষত্ । ওঁ বাঙ্‌মে মনসীতি শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥

ইতি সরস্বতীরহস্যোপনিষদ্ সমাপ্তা ।

তখন নিবাতস্থিত দীপ শিখার ন্যায় চিত্ত স্থিরতালাভ করিবে ; ইহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি। যেমন হৃদয়ে, সেইরূপ বাহিরে, সেইরূপ যে কোনও বস্তুতে ॥২৯

আদি সন্মাত্র অবস্থা হইতে যে নামরূপ পৃথক করা এবং সচ্চিদানন্দ রসাস্বাদনে চিত্তের যে স্তব্ধীভাব (স্তব্ধতা)—তাহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি। ইহা পূর্ব্ববৎ ত্রিবিধ ॥৩০

এই ষড়্‌বিধ সমাধি দ্বারা নিরন্তর কালযাপন করিবে। এইরূপে দেহাভিমান বিগলিত হইয়া পরমাত্মা জ্ঞানগোচর হইলে, যেখানে সেখানে মন যায় সেইখানেই পরমামৃত দর্শন হয় ॥৩১

সেই পরাবর মূর্ত্তি দর্শন-সীমায় উপনীত হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্ব-সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্ম্ম ক্ষয় হয় ॥৩২

জীবত্ব এবং ঈশত্ব আমাতেই কল্পিত, বস্তুতঃ নহে ; যে ব্যক্তি বিশেষ-রূপে ইহা জানিতে পারে, সে ব্যক্তি মুক্ত—ইহাতে সংশয় নাই ॥৩৩

ইহাই উপনিষদের উপদেশ—

শান্তি পাঠ ।

ওঁ তৎসৎ ।

ইতি সরস্বতীরহস্যোপনিষদ্ সমাপ্তা ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর—

নাগানন্দ।

বালকের প্রাণরক্ষার জন্য আমার প্রাণ দিব। আহা! পরের উপকারের জন্য প্রাণ দেওয়ায় কি সুখ! যে এ সুখ ভোগ না করিয়াছে, তাহার জীবন পশুর জীবন। জীমূতবাহন শ্বশ্রূপ্রদত্ত রক্তবস্ত্র পরিয়া, বধ্যশীলায় আরোহণ করিলেন। বধ্যশীলায় বসিয়া প্রশান্তচিত্তে গরুড়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে পক্ষের শন্ শন্ শব্দে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া পক্ষিরাজ গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নাগ-ভ্রমে জীমূতবাহনকে নখরবিদ্ধ করিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। এদিকে শঙ্খচূড় গোকর্ণনাথ মন্দির হইতে ফিরিয়া, জীমূতবাহনকে না দেখিয়া, বড়ই ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিফল অনুসন্ধানের পর রক্তচিহ্ন তাঁহার চক্ষে পড়িল। রক্তচিহ্ন দেখিয়া শঙ্খচূড়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। শঙ্খচূড় ভাবিতে লাগিলেন, আমার জন্য এই মহাত্মা আপন জীবন গরুড়ের মুখে দিলেন। আমার জন্য জগতের এই গৌরব মণি লুপ্ত হইল। শঙ্খচূড় কাতর হইয়া যথেচ্ছাক্রমে চলিতে চলিতে, মহারাজ জীমূতকেতুর আশ্রম পার্শ্বে আসিলেন। আশ্রমপ্রাঙ্গণে জীমূতকেতু, পত্নী ও বধূ সহকারে উপবেশন করিয়া, নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের মুখে জীমূতবাহনের নাম শুনিয়া, শঙ্খচূড় আর অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিলেন না! কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মহাশয়! আপনি যে মহাত্মার নাম করিতেছেন—এই দুর্ভাগ্যের জন্য তিনি আজ গরুড়ের কবলে পতিত। আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন। শঙ্খচূড়ের বাক্যে রাণী ও মলয়াবতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মহারাজ অটল; তিনি শঙ্খচূড়কে ডাকিয়া সবিশেষ শুনিলেন। শঙ্খচূড় ও রাজার যত্নে রাণী ও মলয়াবতীর চৈতন্যলাভ হইল।

পতি, পত্নী ও বধূসহ শঙ্খচূড়ের অনুবর্ত্তী হইলেন। গরুড় নাগভ্রমে কুমারকে পর্ব্বতশৃঙ্গে লইয়া তাহার রক্ত মাংস আহার করিতে লাগিলেন। কুমারের চম্পকদলোপম দেহ, গরুড়ের চঞ্চুর আঘাতে শতধা বিদীর্ণ; তথাপি কুমারের সৌম্য মুখ মলিন-বোধ হইতেছিল না। কুমারের মনে পরম আনন্দ!

কুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আজ আমার যে আনন্দ, ভগবান! যদি আবার পৃথিবীতে আসিতে হয়, তবে যেন এইরূপ পরের হিতে প্রাণ দিতে পারি।" গরুড় কুমারের ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে?

আমি চঞ্চুবলে আপনার দেহের রক্ত পান করিয়াছি, কিন্তু আপনি ধৈর্য্যবলে আমার বক্ষের শোণিত পান করিলেন। জীমূতবাহন কিছুই বলিতে পারিতেছেন না—সহসা সেখানে জনসমাগম অনুভব করিয়া বিস্মিত হইলেন। শঙ্খচূড়, রাজা, রাণী ও মলয়াবতী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। শঙ্খচূড়ের চক্ষুজলের বিরাম নাই। গলবস্ত্রে যোড়হাতে বলিতে লাগিলেন, আমি আপনার বাসুকি-প্রেরিত ভক্ষ্য নাগ; আপনি ভ্রমে জগতের সার-বস্তু গন্ধর্ব্ব-রাজকুমার জীমূতবাহনকে বধ করিলেন। হতভাগ্য শঙ্খচূড়! আজ তোর জন্য এই মহাপুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন! অতি ক্লেশে কুমার বলিলেন, ভাই শঙ্খচূড়! আমার সর্ব্বশরীর উত্তরীয় দিয়া আবৃত কর। আমার এ ক্ষত বিক্ষত দেহ দেখিয়া আমার মাতা পিতা এখনি প্রাণত্যাগ করিবেন। শঙ্খচূড়, কুমারের আজ্ঞানুসারে কুমারের সর্ব্বশরীর বস্ত্রে আবৃত করিল। পিতা মাতা নিকটে আসিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু জীমূতবাহনের তখন শেষ অবস্থা। জীমূতবাহন পিতা মাতার চরণ স্পর্শের জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু হস্ত অবশ। হস্ত, চরণস্পর্শ করিতে পারিল না। ক্রমে রক্তপাতে দুর্ব্বল কুমার প্রাণত্যাগ করিল। শোকাতুরা মাতার রোদনে বনের লতা, পাতা, পশু, পাখী পয্যন্ত যেন অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। পিতা ঈশ্বরপরায়ণ। এই বিষম শোকের ভার ঈশ্বর চরণে অর্পণ করিয়া যেন সর্ব্বদুঃখ দূর করার চেষ্টা করিলেন। তখন মলয়াবতী বাহ্যজ্ঞানহীনা; শঙ্খ-চূড়ের যত্নে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আবার আসিল। মলয়াবতী নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিল। এখন মলয়াবতীর জীবন নিরর্থক। বিধবার জীবনের প্রয়োজন কি? তাই মলয়াবতী প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। মলয়াবতী সহমৃতা হইবেন সঙ্কল্প করিলেন,—করিয়া—শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অনুজ্ঞা লইতে গিয়াছেন। শ্বশ্রূ বধূর সহিত নিজের জীবন দিবেন সঙ্কল্প করিয়া শঙ্খচূড়কে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। তখন শঙ্খচূড়ের মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। গরুড় বিশেষ বিপন্ন; তিনি মনে মনে নিরতিশয়

গ্লানি অনুভব করিতেছেন। রাণীর আদেশে শঙ্খচূড় পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া চিতা প্রস্তুত করিল। মলয়াবতী চিতা প্রদক্ষিণ করিবার পূর্ব্বে, স্বীয় ইষ্ট-দেবী গৌরীকে স্মরণ করিলেন। যোড়হস্তে, সজলনয়নে, শূন্যপানে চাহিয়া চাহিয়া নমস্কার করিলেন,—করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! তোমার প্রসাদে আমি দেবতা-স্বামী পাইয়াছিলাম, কিন্তু মা! আমার কর্ম্মদোষে আজ আমি সেই স্বামী হইতে বঞ্চিত হইলাম। মা! আর আমি কি জানাইব? তুমি প্রসন্ন হও। মা, আমার শেষ নিবেদন যেন জন্মে জন্মে তোমার প্রসাদে ইঁহাকেই স্বামীরূপে পাই। সহসা বনভুমি কোমল আলোকে এবং মধুর সৌরভে পূরিয়া উঠিল। কনকচম্পকদামবর্ণা গৌরীদেবী বনভূমে প্রবেশ করিলেন। মলয়াবতী দেবীর পদতলে লুণ্ঠিতা। দেবী বলিতে লাগিলেন—মলয়াবতি! তুমি সতী। সতীর স্বামী চিরজীবি; তুমি মনের সর্ব্বদুঃখ দুর কর। মলয়াবতী দেবীর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া কুমারের মস্তকে ধরিল। জগন্মাতার পদধূলি মস্তক স্পর্শ করিবা মাত্র, কুমারের মৃতশরীরে জীবনের সঞ্চার অনুমিত হইল। দেখিতে দেখিতে কুমার জীমূতবাহন সুস্থ হইলেন ও উঠিয়া বসিলেন তখন দম্পতী জগন্মাতার চরণে লুণ্ঠিত। ঈশ্বরগতপ্রাণা রাণী ও রাজা, দেবীর চরণে লুণ্ঠিত হইলেন। দেবী বলিলেন, "রাজা! তোমার পুত্র পরের হিতের জন্য নিজের প্রাণ দিয়াছে; এ মহাপ্রাণের প্রাণ ইহার জন্যই রক্ষা করিয়াছি। ইহাকে আর একটী পুরস্কার দিব। জীমূতবাহন! তুমি গন্ধর্ব্ব রাজচক্রবর্ত্তী হইলে। যাও মহারাজ, রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র লইয়া যাও। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। পক্ষিরাজ এই অদ্ভুত দৃশ্যে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলেন,—হইয়া জীমূতবাহনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, হে নরদেহধারী দেব! কি করিলে তুমি তুষ্ট হও? তুমি প্রসন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝি আমার এ পাপ যাইবে না। জীমূতবাহন তখন কৃতাঞ্জলিপুটে পক্ষিরাজের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, প্রভু! চন্দ্রলোক হইতে অমৃত আনিয়া যদি মৃত নাগদিগের জীবনদান করেন, তাহা হইলে আমার আনন্দ পূর্ণ হয়। গরুড় পরমানন্দে চন্দ্রলোকে গমন করিলেন, এবং অমৃত আনয়ন করিয়া মৃত নাগদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন নাগানন্দের উপক্রমণিকা মাত্র করা হইল। সময় পাই তবে ইহার চরিত্রগুলি প্রস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব]।

রাণী কুসুমকামিনী দেবী। বলিহার।

মনোময় দেবতা ও শেষ ঋণ শোধ।

এই শরীর পঞ্চভূতের সমষ্টি। শরীর বিনষ্ট হইলে পঞ্চভূতের সকলেই ইহা হইতে আপন আপন অংশ লইয়া লয়। সকলের ঋণ শোধ হইয়া গেলেও একটি জিনিস কিন্তু বাকী থাকিয়া যায়। সেটির নাম অন্তঃকরণ, বা চলিত কথায়, মন। ভূতেরা ইঁহার উপর কোন দাবী করে না, কারণ ইঁহাতে স্থূলের কিঞ্চিৎ আবরণ থাকিলেও, ইনি অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেও, ইনি ক্ষিত্যাদি স্থূল বস্তুর সহিত মিশিয়া যান না। ভূতগণ জীবদ্দশায় ইঁহাকে ঘিরিয়া রাখে মাত্র। দেহ বিনষ্ট হইলে ইনি পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যান; কিন্তু উড়িয়া কোথায় যান কাহার আশ্রয় অন্বেষণ করেন,—ইহাই এখন বিচার্য্য।

মন বস্তুটি কি? শাস্ত্র বলেন "সঙ্কল্পবিকল্পরূপ যে বৃত্তি তাহাকে মন বলে"। পঞ্চভূতের সহিত এই মনের যে একেবারে কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বলা যায় না, কারণ সকলেই মনকে আপন আপন সত্ত্বগুণের অংশ প্রদান করিয়াছে। এই জন্য মনকে ইহাদের ঋণও কিছু কিছু পরিশোধ করিতে হয়। তাহা না হইলে ইঁহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু মন যে কেবল এই কয় জড়ভূতের সমষ্টি নন—তাহা ইঁহার অসাধারণ শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে অতিসহজে উপলব্ধি করা যায়। প্রথমেই দেখা যায়, মনের সাহায্য ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না, এবং যে কার্য্যে পূর্ণ মনোযোগ করা যায় তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। অতএব মন যে সকল কর্ম্মের সিদ্ধি-দাতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহলৌকিক বা পারলৌকিক যে কর্ম্মই কর, সর্ব্বাগ্রে মনের পূজা করিতেই হইবে। ইঁহার শরণাপন্ন হইয়া, ইঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার পর কার্য্যারম্ভ কর, ইনি গণেশমূর্ত্তিতে তোমার সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন। ইঁহাকে স্মরণ না করিয়া ব্রত, জপ, পূজা করিতে গেলে দেবতারা তাহা গ্রহণ করেন না। গণেশজননী ভগবতীর সে সকল কর্ম্মের প্রতি অভিসম্পাত আছে। সকল যুগে, সকল সময়ে, সকলেই অগ্রে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল কলিযুগে ইনি ভিন্ন গতি নাই। "কলৌ চণ্ডী বিনায়কঃ"। দেবতা কিংবা

ঋষিদের আশ্রয় এখন দুর্লভ; শাস্ত্র প্রায় লোপ হইয়া আসিতেছে, সদ্গুরু কিম্বা সৎসঙ্গ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এ দুর্দ্দিনে তীব্র একাগ্রতা না থাকিলে, কিছু যে হইবে এমন আশা করা না। তাই বলি আমাদের মন জড়ভূতের সমষ্টি নহেন, ইনি দেবতা। আমাদের কর্ম্মসম্বন্ধে ইনি সাক্ষাৎ গণপতি বলিলেও হয়। ইনি যে দেবতা তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ ইনি সন্তুষ্ট হইলে মোক্ষপদ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তে দিতে পারেন। যে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তির জন্য কত লোকে কত পরিশ্রম করেন, কত সাধন ভজন করেন, কত কঠোর তপস্যা করেন,—মনরূপী এই দেবতাকে যদি সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় তবে আর কিছুই করিতে হয় না। মুক্তি আপনা হইতেই করতলগত হইয়া থাকে। যদি মুক্তি অপেক্ষা পরাভক্তি বা পরমপ্রেমকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। হউক শ্রেষ্ঠ—ইঁনি কৃপা করিলে ভক্তি, মুক্তি, প্রেম কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। একবার ইঁনি মনে করিলে সমস্ত আয়ত্তাধীন হয়। কেবল একবার মনে করিলেই হয়, আর কিছু করিতে হয় না। আমাদের উচিত আর সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া দিবারাত্র এই দেবতার উপাসনা করা; কিন্তু আমাদের কর্ম্মের ফের বড়ই প্রবল,—তাই আমরা এমন জীবন্ত দেবতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া "ঠাকুর, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি" করিয়া বেড়াই। তুমি নাস্তিক হইতে পার, সমস্ত অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু এই দেবতাকে অবিশ্বাস করিবে কি করিয়া? দুঃখের বিষয় এই যে, এমন দেবতা সঙ্গে থাকিতেও লোকে আপনাকে নিরাশ্রয় মনে করিয়া কত সময়ে কত দুঃখ করে, কত কাতর হইয়া দিক্‌বিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়, এবং অবশেষে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া 'মৃত্যুরূপ সর্পের বিস্তৃত মুখবিবরে ধীরে ধীরে প্রবেশ প্রবেশ করে। ইহাও সেই মনোময় দেবতার মোহময়ী শক্তির বিকাশ মাত্র। শক্তির কথা বলিতে বলিতে ইঁহার রূপের কথা মনে আসে। যেমন অসীম ইঁহার শক্তি, তেমনি অনন্ত ইঁহার রূপ। তুমি যখন, যেখানে যে মূর্ত্তিতে তাঁহাকে স্মরণ করিবে সেইখানে, সেই মুহূর্ত্তে, তিনি তোমার কাছে দেখা দিবেন। আকাশ অপেক্ষা বৃহৎ এবং তদপেক্ষাও বৃহত্তর যদি কোন মূর্ত্তির কল্পনা তুমি করিতে পার, দেখিবে ইনিই সেই মূর্ত্তিতে তোমার কল্পনার সীমাদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আবার অণু-

পরমাণু যাহা কল্পনাতেও আসিতে পারে না তাহাও ইঁহারই মূর্ত্তিভেদ মাত্র। স্বপ্নে অথবা জাগ্রদবস্থায় সংসারে যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্ত তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। তুমি নিকটে যাহা দেখিতেছ তাহা যেমন তাঁহার রূপ,—দূরে থাকার জন্য যাহাকে দেখিতেছ বা মনে করিতেছ তাহাও তেমনি তাঁহারই রূপ। তিনি মনে করিলে দূরস্থকে নিকটে আনিতে পারেন এবং নিকটস্থকে দূর করিয়া দিতে পারেন। তুমি যদি দূরস্থ বন্ধুকে দেখিতে চাও, পরলোকগত প্রিয়ব্যক্তির সহিত মিলিত হইতে চাও,—অসম্ভব ভাবিয়া হতাশ হইও না। একবার ইঁহার শরণ লও, দেখিবে তৎক্ষণাৎ ইঁনি তাহাকে তোমার নিকটে, অতি নিকটে আনিয়া দিবেন। জড়পুত্তলিকা বা ছবির মত নহে, সজীব সচেতন ভাবে, সে তোমার কাছে আসিয়া বসিবে, কথা কহিবে, তোমার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবে, কত পুরাতন কথা তুলিবে, কত নূতন কথা বলিবে। তুমি ইহা বোঝনা তাই হতাশ হও, অসম্ভব মনে কর। কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিও না। সত্যসঙ্কল্প হও, তোমার কল্পনাও সত্য হইবে। কে আসে সে বিষয়ে সন্দেহ কারও না। তিনি নিজেই আসেন অথবা সত্যসত্যই তাহাকে পাঠাইয়া দেন, তাহা বিচার করিবার আবশ্যক কি? তুমি ত তোমার বস্তু পাইলে। শেষ কথা, তিনি নিজে ছিলেন তাই নিজেই আসেন, তিনি ছাড়া আর ত কিছুই নাই। এইরূপ অনন্তশক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনি কখনও জড় হইতে পারেন না। একবারে চেতনের প্রতিবিম্ব মাখিয়া ইনি চেতনেরই মত হইয়া যান। তাঁহার কথা বলিয়া শেষ করা অসম্ভব। যতই চিন্তা করা যায়, ততই তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্বরূপ কি তাহা ঠিক বলা যায় না। তিনি ব্যক্তিগত আছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ব্যক্তিগত সমস্তই জানেন ইহাও স্থির এবং ব্যক্তিগত যে আনন্দ তাহাও তাঁহারই করুণা কণা মাত্র ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং খণ্ডভাবে তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। বৈদিক ভাষায় মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকারাধিষ্ঠিত চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে একভাবে বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যও বলে। এখন বিচার করিয়া দেখা যাক, ইনি কোথা হইতে আসেন এবং কাহার কাছে যান।

শাস্ত্রে বলেন জীবশরীরে পঞ্চভূতের অংশ আছে। মৃত্যুর পর সকলে আপন আপন অংশ ফিরাইয়া লয় এবং জীব পুনরায় সংস্কারানুযায়ী শরীর গ্রহণ করিয়া

সংসারে ফিরিয়া আসেন। শাস্ত্রের কথা শিরোধার্য্য করিয়া তথাপি বলি, জীবশরীর অতভাগে ভাগ না করিয়া, কেবল দুইভাগ করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। একটি ভাগ শ্মশানের অংশ ও অপর ভাগ শ্মশানবাসীর অংশ। মৃত্যুর পর শ্মশান আপনার অংশ লইয়া লয়, বাকী থাকে কেবল শ্মশানবাসীর অংশ। তিনি সেটি লইয়া লইলেই জঞ্জাল মিটিয়া যায়, কিন্তু তিনি তাহা নেন না। না জানি কাহার ধ্যানে তিনি সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন,—অত দেনা পাওনার ধার তিনি ধারেন না। তাঁহার কাছে স্থান পায় না বলিয়া, তাঁহার সেই অংশটী আবার শ্মশানের অংশে আসিয়া মেশে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতেছে।

একবার এই মহাশ্মশানের কথা চিন্তা করা যাক্। অনন্ত এই মহাশ্মশান! কোটি কোটি শবরাশি এখানে পড়িয়া আছে। নানাপ্রকার জীবজন্তুর শব কোথাও পুঞ্জীকৃত, কোথাও বা বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কোনটি সদ্যোমৃত, কোনটি অর্দ্ধগলিত, কোনটি বা কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট। মাংসাশী পক্ষী সকল ও কুক্কুর শৃগালগণ স্থানে স্থানে শবদেহ টানিয়া আহার করিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া বিকট শব্দ করিতেছে। ভগ্ন অস্থিপঞ্জর সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোথাও কোথাও মাংসবিহীন মুণ্ড সকল বিকট হাস্যের অনুকরণ করিয়া দন্ত বাহির করিয়া আছে। কোথাও জ্বলিত শবপুঞ্জের ধূম আকাশ ব্যাপ্ত করিয়াছে এবং কোন স্থান বা দগ্ধঅস্থি ও অঙ্গারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির শব ত আছেই। বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, সকলের শবই এখানে বিকীর্ণ রহিয়াছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলের মৃতদেহ এখানে দেখা যাইতেছে। এই অগণ্য শবরাশির মধ্যে অতি মহান্ এই মহাশ্মশানে এক অতি বিশালকায়, তেজঃপুঞ্জ, শুভ্রবর্ণ মহাপুরুষ ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। ইনিই সেই শ্মশানবাসী। এত শবের মধ্যে, ইনিই সেই মহাশিব—একাকী স্থিরভাবে, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কি এক মহাধ্যানে নিমগ্ন আছেন। এই ভীষণ শ্মশানের মহারৌদ্রতা যেন তাঁহার স্নিগ্ধ, শুভ্র, অঙ্গজ্যোতিতে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। সেই জ্যোতির ভিতর দিয়া নিরীক্ষণ করিলে এই

মহাশ্মশানও যেন সজীব, সচেতন মনে হয়। সেই মহাজ্যোতির ভিতর ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, ইহার গগনভেদী অতিবিশাল মূর্ত্তি স্পষ্ট করিয়া দেখা যায়। রজতবর্ণ দিগন্তব্যাপী বিরাট শরীর, মস্তকোপরি মুকুটস্বরূপ স্বর্ণবর্ণ বিপুল জটাভার, তাহার মধ্যস্থিত বিমলসলিলা পুণ্যতোয়া মন্দাকিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা বড়ই সুন্দর! বড়ই অপূর্ব্ব দেখাইতেছে। শ্মশানে অহঃরহঃ কত জীবের গমনাগমন হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইনি কিন্তু কাহারও দিকে লক্ষ্য করেন না। কে যেন এই মহাপুরুষের চিত্তটি ষোলআনা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইঁহার যেন আর কিছু দেখিবার ক্ষমতা নাই, কেবল তাহাতেই তদ্গত হইয়া আছেন। কোন অভাব নাই, কোন চেষ্টা নাই, কোন চিন্তা নাই,—আছে কেবল একটি চিন্তা। সে চিন্তা অভাবের চিন্তা নয়। সে চিন্তা, সে ধ্যান কি এক অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ। মনে হয় যেন কোন অতি আদরের সামগ্রী, বাহিরের বিভীষিকাপূর্ণ শ্মশানভূমিতে রাখিতে কুণ্ঠিত হইয়া অতি যত্নে হৃদয়ের অতি নিভৃতস্থানে রাখিয়া শান্তমনে তাহারই রূপরাশি দেখিতে দেখিতে স্থির হইয়া গিয়াছেন। এমন এই মহাশিব, কেমন করিয়া ইঁহার বস্তু ইঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়? কি করিলে ইঁহার ধ্যান ভাঙ্গে? কোন্ উপায়ে ইঁহার অংশটুকু ইঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া জীব ঋণমুক্ত হইতে পারে?

উপায় আছে। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। সমস্ত কার্য্যই কৌশলে সম্পন্ন হয়। কৌশলে এ কার্য্যও সিদ্ধ হইতে পাবে। প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখ, কি করিলে ইঁহার অংশটুকু ইঁহাকে দিবার উপযুক্ত করা যায়। উপযুক্ত না করিলে কিছুতেই দেওয়া যাইবে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ইহাকে উপযুক্ত করিতে হইবে। একটি কৌশল অবলম্বন করিলেই ইহা অনায়াসে হইতে পারে। সেটি আর কিছুই নয়, কেবলমাত্র শ্মশানের অংশটুকুর প্রতি আসক্তি একেবারে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা। যতক্ষণ শ্মশানের অংশটুকুর প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি থাকে ততক্ষণ ইহা শ্মশানবাসীর উপযুক্ত নহে। এই আসক্তিটুকু ত্যাগ কর, ইহা নির্ম্মল হইবে। তখন নির্ভয়ে ইহা লইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে। কিন্তু শুধু এইটুকু করিলেই চলিবে না। তাঁহাকে ইহা গ্রহণ করাইতে হইলে, তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিতে হইবে। ইহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর কাজ, কিন্তু ইহারও কৌশল আছে।

সকলেরই গরজ আছে। দেখিতে হইবে ইঁহার গরজ কোথায়। সেই-খানে ঘা দিলেই ইনি চক্ষু খুলিবেন। বিচার করিয়া দেখ, ইনি কি লইয়া আছেন। ইনি যাহাকে লইয়া আছেন তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি একটু বলিয়া দিলেই, তোমার আর কোন ভাবনা থাকিবে না। আর যদি তেমন জোর থাকে, তিনি কোলে লইয়া কোলে তুলিয়া দিবেন। ইতি।

আ—

পোষাকী ও আটপৌরে চরিত্র।

তুমি প্রসন্ন হও, একটু আলোচনা করি। তোমারই আজ্ঞা, বিদ্যা চারি প্রকারে উপযুক্তা হইয়া থাকেন। ঠিক ঠিক বিদ্যা যিনি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে (১) গুরুর বা শাস্ত্রের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইবে।

(৩) সেই বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে।

(৪) সেই বিদ্যা শিক্ষামত ব্যবহার করিতে হইবে।

চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈ র্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি। আগম কালেন, স্বাধ্যায় কালেন, প্রবচন কালেন, ব্যবহার কালেনেতি। মহাভাষ্য।

বিদ্যা সম্বন্ধে এই চারিটির কোন একটিরও অভাব যদি থাকিয়া যায়, তবে বিদ্যা ঠিক বিদ্যারূপে আসেন না; বিদ্যা আপনার স্বরূপ দেখান না; বিদ্যা দেখান আপনার বিকৃতরূপ, দেখান আপনার আবৃতরূপ; দেখান অবিদ্যা। বিদ্যার পরিবর্ত্তে অবিদ্যা লাভ করিলে, নিজের দুঃখও বৃদ্ধি হয় এবং জগতের দুঃখও বৃদ্ধি করা হয়।

উপস্থিত সময়ে বিদ্যার পরিবর্ত্তে অবিদ্যালাভের দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যায় না? উত্তরে বলি এত অধিক পাওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যার মুখ বুঝি আর দেখাই যাইতেছে না—শুধুই দেখি অবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হউক।

দেখি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ইংরাজী, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী—সব বিদ্যা লাভ হইয়াছে। যখন এই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বিদ্যার কথা কন, সভাতেই হউক বা বেদীর উপর হইতেই বা আসন হইতেই হউক তখন মনে হয় আহা! ইনি দেবতা। কিন্তু ব্যবহারকালে সেই বিদ্বান্‌কেই দেখা যায়—একটু প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না—কোন অজ্ঞানী যদি একট অপমান করিয়া ফেলে, তবে আর রাগের সীমা থাকে না, তাঁহার মুখনিঃসৃত ঘৃণার তিরস্কারে শুধু অজ্ঞানী সমালোচকের নহে, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত শ্রোতার হৃদয়ে যেন শেলবিদ্ধ হইতে থাকে। এই যে দ্বিবিধ চরিত্র—একটি পোষাকী আর একটি আটপৌরে, এই যে বচনে সাধু কিন্তু কার্য্যে অসাধু ভাব, এই যে মুখে সোঽহং জ্ঞানী, কিন্তু জীবহিংসার প্রবর্ত্তক—এক কথায় এই যে বচনে পাণ্ডিত্য কিন্তু কার্য্যে ঘোর সংসারাসক্তি—ইহারই নাম বিদ্যার পরিবর্ত্তে অবিদ্যা লাভ।

হে সাধু! হে ধার্ম্মিক! হে সন্ন্যাসি! হে পরমহংস! হে ধর্ম্মপ্রচারক! হে সমাজসংস্কারক!—একবার এই দ্বিবিধ চরিত্র ভাঙ্গিয়া কি এক চরিত্রে উদয় হইবে না? চিঠির উপরে শ্রীদুর্গা লিখিয়া শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া জালিয়াতীর কথা, লোকের সর্ব্বনাশের কথা, মিথ্যাকথা, প্রতারণার কথা আর কতদিন চলিবে? শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া অধর্ম্ম কার্য্য আর কতদিন চালাইতে চাও? তোমার ভগবান্ যে মৃত ভগবান্—যে ভগবান্‌কে হৃদয়ে আনিয়া দুষ্প্রবৃত্তির কার্য্য করা হয়। শ্রীভগবানের নাম, মূর্ত্তি গৃহে রাখিয়া সেই গৃহে কি পশুর কার্য্য করা যায়? শ্রীভগবানের ভক্ত হইয়া কি মুখে একরূপ আর কার্য্যে অন্যরূপ আচরণ করা সম্ভব? এস এস একবার জীবন্ত ঈশ্বর, একবার সেই ক্ষমাসার, সেই প্রেমময়, সেই শত্রু-মিত্রে সমান, সেই স্মেরানন, সেই সদাতুষ্ট শ্রীভগবান্‌কে ডাকি। এস এস মনে, মুখে ও কার্য্যে এক হইবার জন্য প্রাণপণ করি।

নিঃশেষ।

রূপ নহে—অনলের শিখা
জ্বলে ধিকি ধিকি ;
ক্ষুদ্রমতি, হাঁরে পতঙ্গিনি!
ও আগুনে পুড়ে মরিবি কি?
আয় আয় নিঃশেষিয়া
দেই তোর সকল কামনা।
ভোগ-তৃপ্ত অব্যাহত
জীবনের কঠোর সাধনা।
নিরর্থক, নিত্যতৃপ্ত
অদম্য সে নিষ্ফল-প্রয়াস।
ধরমের ক্ষীণ-জ্যোতিঃ,
কারারুদ্ধ করমের শ্বাস।
সরমের অভিশাপ—
অনাদৃত মরমের জ্বালা।
ছিন্ন ভিন্ন শত আশা
মাল্য-চ্যুত কুসুম-কোমলা।
আয়, আয়, চিদানন্দে
করি নিরুদ্দেশ।
রাখিব না চিহ্ন আজি
করিব নিঃশেষ।

হ—

ভালবাসা।

জগতে সকলেই ভালবাসে। কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি শিশু, এমন কি পশুপক্ষী আদি সকল জীবই ভালবাসে। ভালবাসেনা এমন জীব নাই। ভাল না বাসিয়া যেন জীব থাকিতে পারে না। কেন জীব ভালবাসে? ইহার উত্তর এই যে, জীব আনন্দের ভিখারী; আনন্দময়ের ক্রীড়নক; আনন্দময় হইতে দূরে আসিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দটুকু ভুলিতে পারে নাই; মানসে সেই পূর্ব্ব আনন্দের স্মৃতি রহিয়াছে, সেই সংস্কার বশতঃ সংসারের চারিদিকে আনন্দের অন্বেষণে ঘুরিতেছে। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আনন্দের বিনিময়ে বিষাদসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, তথাপি আনন্দলাভের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে; এই বিষাদের রাজ্যে যাহার সহিত মিশিয়া, যাহার সহিত আলাপ করিয়া একটু প্রীতি পায়, তাহাকেই ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে এবং তাহাকেই ভালবাসে। বোধ হয় এই ভালবাসার স্রোতে ভাসিয়া জীব তাহার হারানিধি পাইবে মনে করে, তাই ভালবাসার জন্য এত লালায়িত। পূর্ব্বের সেই আনন্দময় অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া যেন জীব ভাল বাসিতে চায়। জীবের মন যেন এই সংসারে ভাল বাসস্থান পায় নাই, তাই ভালবাসা অর্থাৎ ভাল বাসস্থান খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। যেখানে একটু প্রীতি পায় সেই খানেই থাকিতে চাহে এবং তাহাকেই ভালবাসে। তাহা হইলে বুঝা গেল, হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার উপায় ভালবাসা; ইহা যেন বিশ্বস্রষ্টা গোপনে সংসারতাপতাপিত জীবগণকে বলিয়া দিতেছেন, যেন ভ্রান্ত মানবকে তাঁহার পথে ফিরাইবার জন্য এই ভালবাসার প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছেন। পাপীকে নিষ্পাপ করিয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবার জন্যই যেন এই ভালবাসার স্রোত তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। আনন্দময় নিজে যেন এই স্রোতে মাখামাখি হইয়া আছেন। বলিতেছিলাম যে জীব ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। ভালবাসা না থাকিলে জীবজগতের অস্তিত্ব থাকিত না বলিয়া মনে হয়। সকলেই ভালবাসে, কেহ ভালবাসা কি তাহা জানে, অর্থাৎ ইহার তত্ত্ব অবগত আছে; সুতরাং ভালবাসিতে জানে, ইহারা উত্তম। কেহ ভালবাসার তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহে,

আনন্দ পায় বলিয়া ভালবাসে, ভালবাসার জন্য ভালবাসে না, নিজের আনন্দ লক্ষ্য করিয়া ভালবাসে, ইহারা মধ্যম। অবশিষ্ট লোকেরা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজের ভোগ লক্ষ্য করিয়া, ভালবাসার পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া, যাহাকে ভালবাসে তাহার মুখ না চাহিয়া ভালবাসে, ইহারা অধম। উত্তম শ্রেণীর লোকেরা সাত্ত্বিক অথবা নিবৃত্তিমূলক ভালবাসার সেবক, অর্থাৎ তাঁহারা কিছুরই আশা রাখেন না, ভালবাসার পাত্রকে মনপ্রাণ সমস্তই দান করিয়া ভালবাসেন। মনে করেন, যে তুমি ভালবাস আর নাই বাস ভালবাসা আমার প্রাণ, তোমাকে ভাল না বাসিয়া আমি থাকিতে পারি না, তোমার নাম শুনিলে তোমাকে স্মরণ করিলে যে আমার প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিব কিরূপে? মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা রাজসিক অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসার সেবক, অর্থাৎ তাঁহারা যাহাকে ভালবাসেন, তাহার নিকট প্রতিদান পাইবার আশা রাখেন; তুমি ভালবাস তাই তোমায় ভালবাসি এইরূপ মনে করেন। আর অধম শ্রেণীর লোকেরা কিছুই মানে না, যাহাতে আনন্দ পাইবে মনে করে তাহার জন্য কাহারও মুখ না চাহিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ভালবাসে; যেই কার্য্যসিদ্ধ হইল, আর ভালবাসার লেশ নাই, কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; এই শ্রেণীর লোকেরা তামসিক অর্থাৎ পাশব ভালবাসার সেবক। ইহারা আজ একজনকে ভালবাসে আবার তৎক্ষণাৎ তাহাতে আর প্রীতি না পাইয়া তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া অন্যত্র ভালবাসিতে যায়। ইন্দ্রিয়-সেবায় আনন্দ হয় না ভোগকালে যাহা কিছু হইল মাত্র, ভোগাবসানে বিরক্তি আবার ভোগেচ্ছা, আবার তদ্রূপ; সুতরাং ইহাদের ভালবাসা স্থায়ী হয় না এবং ভালবাসার পাত্রাপাত্র নাই। যাহা হউক জীব ভালবাসিতে জানুক আর নাই জানুক, ভালবাসার তত্ত্ব অবগত না হইলেও ভালবাসে। তাহা হইলে বুঝা গেল ভালবাসা বিষাদপূর্ণ সংসারের আধার। মানুষ ভালবাসায় না থাকিলেও ভালবাসা সর্ব্বলোকে আছে। যাহাতে সর্ব্বজীব নাই অথচ যাহা সর্ব্বজীবে বিদ্যমান, তাহা পরমপদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তাহা হইলে এই ভালবাসা পরমপদার্থ, ইহা সামান্য পদার্থ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, করুণাময় বিশ্বেশ্বর যেন ভ্রান্তমানবগণকে তাঁহার সকাশে পুনরানয়ন করিবার জন্য এই প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছেন। এই ভালবাসার

স্রোতে অবগাহন করিলে কলুষপূর্ণ জীবের হৃদয় ধৌত হইয়া নির্ম্মল হইবে, নতুবা নির্ম্মল মঙ্গলময়ের কাছে কিরূপে যাইবে? তাহা. হইলে ভালবাসার স্রোত অতি পবিত্র, পতিতপাবনী গঙ্গাই যেন এই ভালবাসা। আমরা বলি ঠিক তাই; পুরাণে কথিত আছে, ঋষির স্তুতিগানে ব্রহ্ম দ্রবীভূত হইয়া পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা হইয়াছিলেন। এই ভালবাসাও তাই, বিষাদরাজ্য জীবের ক্লেশ ও তন্নিরাকরণকল্পে আনন্দপ্রাপ্তির জন্য অনুতপ্ত জীবের আকুলি বিকুলিরূপ শোক-সঙ্গীতে ব্রহ্ম দ্রবীভূত হইয়া এই ভালবাসা স্রোতস্বিনীরূপে প্রবাহিত হইয়াছেন। ভালবাসা-তরঙ্গিণী ব্রহ্মপাদার্ঘ্য সম্ভূতা। সহস্রার মধ্যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, কল্পবৃক্ষমূলে রত্নবেদিকোপরি সমাসীন, তাঁহার পাদমূল হইতেই এই ভালবাসা গঙ্গা বিনিঃসৃতা। ব্রহ্মা মহিমা বুঝিয়া ইহাকে কমণ্ডলুতে ধারণ করিলেন, তপস্যার সুবিধার নিমিত্ত সঙ্গের সাথী করিলেন। শঙ্কর শিরস্থিত জটাজালে রাখিলেন অর্থাৎ মাথার মণি করিলেন, কারণ এই ভাল-বাসাই ভগবৎ-প্রেমধারা। ক্রমে এই ধারা মৃদুধারে মন্দাকিনী নামে স্বর্গধামে প্রবাহিত হইল। অমরগণ এই প্রেমপ্রবাহে অবগাহন করিয়া প্রেমরসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। সুরতরঙ্গিণী স্বর্গমধ্যে প্রবাহিত হইয়া স্বর্গবাসীদেরই চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে বলিয়া রাখি, জীবদেহে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সবই আছে। কণ্ঠের উর্দ্ধদেশ অর্থাৎ মস্তক স্বর্গ। কণ্ঠ হইতে নাভি, হৃদয়দেশ মর্ত্ত্য এবং নাভির নিম্নদেশ, শিশ্ন ও উদর ভোগের স্থান বলিয়া নরক বা পাতাল। যাহাদের মন সর্ব্বদা নাভির নিম্নদেশে বিরাজ করে, তাঁহারা শিশ্নোদর পরায়ণ; যাহাদের মন হৃদয়দেশে আবদ্ধ তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী এবং যাঁহাদের মন সর্ব্বদা মস্তকে বিরাজিত তাঁহারা নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী সুরপদ-বাচ্য। এই শেষোক্ত লোকেরাই প্রেমবাহিণীর মহিমা অবগত ছিলেন। কেবল ইঁহারাই ভগবৎপ্রেম রসাস্বাদন করিতেন। মর্ত্ত্যবাসী ও নরকবাসীর ভাগ্যে ইহা ছিল না। কালে রাজা ভগীরথ (ভগ = ষড়ৈশ্বর্য্য + ঈ = শক্তি + রথ = দেহরথ) অর্থাৎ এই দেহে ষড়ৈশ্বর্য্যশক্তিসম্পন্ন মুক্তাত্মা মহাপুরুষ স্বীয় পিতৃপুরুষ-গণের অর্থাৎ দেহাভিমানী ভোগপরায়ণ বিষয়াসক্ত বিবেকবিহীন মোহমগ্ন জীব সকলের উদ্ধারার্থে এই সুরতরঙ্গিণীকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়া জীবের কল্যাণসাধন করিলেন। মর্ত্ত্যে আসিবার পথে গজেন্দ্র ঐরাবত অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল মন ভূতলে আসিতে দিবে না বলিয়া অর্থাৎ মনের রাজ্যে ভগবৎপ্রেমধারা প্রবাহিত

হইতে দিবে না বলিয়া মন; প্রবাহের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেই পবিত্র স্রোতবেগে সে মন ভাসিয়া গেল। জহ্নুমুনি পবিত্র স্রোত দেখিয়া আনন্দে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন; পরে জগতের হিতার্থে প্রবাহ তাঁহার জানু-দেশ ভেদ করিয়া ছুটিল। জহ্নুমুনি পবিত্র স্রোতকে কোন দেহদ্বার দিয়া বিনিঃসৃত করিয়া দেন নাই, পাছে ইন্দ্রিয়সংযোগে পবিত্রতার অমর্য্যাদা হয় এই মনে করিয়া। যাহা হউক ভালবাসা হৃদয়ে আসিল, প্রবৃত্তিমূলক হইয়া বহিতে লাগিল, মর্ত্ত্যবাসী চরিতার্থ হইল। প্রবাহিণী নাম ধরিলেন গঙ্গা অর্থাৎ ভূতলগতা। ভালবাসা নিম্নগা হইয়া, প্রবৃত্তিমূলক হইয়া, বহিতে বহিতে নাভির নিম্নদেশে ভোগরাজ্যে ভোগবতী আখ্যায় প্রবাহিতা হইল। ভালবাসা পাশব ভালবাসার পরিণতা হইল, পশুদের উদ্ধারের নিমিত্ত। ভালবাসার প্রভাবে ব্রহ্মশাপনষ্ট ভগীরথের পিতৃপুরুষ সগরসন্ততিগণ উদ্ধার হইলেন। যে মহাত্মা জীবের কল্যাণকল্পে এই পবিত্র ভালবাসাস্রোত ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন, আসুন তাঁহাকে প্রণাম করি। পশুকে পশুভাব হইতে বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ভোগরাজ্যে ভালবাসা ভোগবতীনামে প্রবাহিতা। এই পাশব ভালবাসা হইতে একটু চেষ্টা করিলে জীব রাজস অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসা শিক্ষা করিতে পারে এবং তাহার পর ক্রমশঃ সাত্ত্বিক অর্থাৎ নিবৃত্তিমূলক ভালবাসা বুঝিতে বা ভগবৎ-প্রেমরসাস্বাদন করিতে সক্ষম হয়। ব্রহ্মপাদ বিনিঃসৃতা ভালবাসা-তরঙ্গিণী নিম্নগা হইয়া নিম্নস্থ জীবগণকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রবাহিতা। অপরাধী বালক যেমন ভয়ে পিতার নিকট আসিতে চায় না, পিতার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে, কিন্তু মাতা প্রেমময়ী, প্রেমভরে বালকের পিছু পিছু যাইয়া তাহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সযত্নে কোলে লইয়া বুঝাইতে বুঝাইতে যেমন পিতৃসন্নিধানে আনয়ন করেন, সেইরূপ আমরা বহু অপরাধ করিয়া ভয়বশতঃ পরমপুরুষ হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছি। আর মাতৃস্বরূপিণী এই ভালবাসা-তরঙ্গিণী আমাদের পাছে পাছে আমাদিগকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে পিতৃসন্নিধানে লইয়া যাইবার জন্য এই সুদূর ভোগরাজ্যে আসিয়াছেন। মা আসিয়াছেন, মা অভয় দিতেছেন, ভাই ভয় নাই তিনি পিতাকে বুঝাইয়া বলিবেন, আর আমাদের ভয় কিসের? মা আমার পতিতপাবনী, সব দোষ মার্জ্জনা হইবে, সব পাপ ধৌত হইয়া যাইবে, এস ভাই মার কোলে উঠি। বহুদিন বাটী হইতে বাহির হইয়াছি, মায়ের

কোলে উঠিয়া চল বাটীতে ফিরি। এই ভালবাসা প্রবাহিণীর নিম্নগা প্রবাহে সকলেই ভাসিতেছি, স্রোতে গা ঢালিওনা, নিম্নগ স্রোত খরপ্রবাহে নিম্নে লইয়া যাইবে; একটু যত্ন কর, একটু হাত পা টান, উর্দ্ধদিকে তাকাও, প্রবাহের উৎপত্তি কোথায় দেখ, সেই তোমার গন্তব্য স্থান। উজান বহিয়া চল, ক্রমে তামসী ভালবাসা হইতে রাজসী ভালবাসা অর্থাৎ পাশব ভালবাসা ছাড়িয়া প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসা বুঝিবে এবং তৎপরে সাত্বিকী অর্থাৎ নিবৃত্তিমূলক ভালবাসা বুঝিতে পারিবে। তখন আর ক্লেশস্বীকার করিয়া উজান বাহিতে হইবে না, কারণ ভালবাসা তখন মন্দাকিনী মৃদুস্রোতা, ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে। আর যদি উজান না বাহিয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, ভোগরাজ্য হইতে বাহির হইতে পারিবে না, ভোগের বিরাম নাই, আজীবন পশুভাবে থাকিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ারাম হইয়া একেবারে অপদার্থ হইয়া যাইবে। তাই বলি, এখনও সামর্থ্য আছে, বল থাকিতে থাকিতে উজানে বাইবার চেষ্টা কর। ভোগরাজ্যে অধিক দিন থাকিলে কয়দিন সামর্থ্য থাকিবে? সামর্থ্যবিহীন হইলে পরিতাপের সীমা থাকিবে না; তাই বলি ভাই যে ভালবাসার সেবা না করিয়া থাকিতে পার না, সেই ভালবাসার স্রে তে উজান বাহিয়া চল, গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিবে। বহুদিনতো ভালবাসার স্রোতে ভাসিতেছ, অনেক ভাল বাসিয়াছ, সুখ ত পাইলে না, জন্ম হইতেই ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছ, অনেককে ভাল বাসিলে, যাহাদের ভাল বাসিলে, যাহাদের ভাল বাসিয়াছ, তাহারা কেহ কি তোমার মুখ চাহিয়াছে? হয়তো কাহারও নিকট ভাল-বাসার প্রতিদান পাইয়া থাকিবে, কেহ হয়ত মুখ চাহিয়া থা কবে, তাই একটু আনন্দ পেয়েছিলে, কিন্তু দিন কতকের জন্য ভিন্ন সে ভালবাসা কি অধিক দিন স্থায়ী হয়েছে? কাল কর্ত্তৃক হয়তো তারা তোমার নিকট হ'তে অপহৃত হ'য়েছে, আবার দ্বিগুণ জ্বালা পাইয়াছ, পার্থিব ভালবাসায় প্রাণে বড় দাগা লাগে। তাই বলি ভালবাসাটা যোগ্য পাত্রে অর্পণ কর প্রাণে দাগা লাগিবে না। আলস্য ত্যাগ কর, উজান বাহিয়া চল, দেখিবে যে প্রেমাধার তোমাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইবার জন্যই এই পতিতপাবনী ত্রিলোকবিহারিণী ভালবাসা তরঙ্গিণী তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন, আহা! তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন, তিনি যেন নির্নিমেষলোচনে পশ্যতি তব পন্থানং। তাই বলি ভাই যিনি ভালবাসাস্রোত ভূতলে আনিয়াছিলেন, সেই মহাত্মাকে গুরুস্বীকার করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার

চরণে প্রণাম পূর্ব্বক স্রোতে উজান বাহিয়া চল। ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, যেখান হইতে স্রোত উৎপন্ন সেই দিকে লক্ষ্য কর। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া রাখ, উজান বাহিবার সুবিধা হইবে, পবন অনুকূল হইবে; হস্তপদ সঞ্চালিত কর, অন্ত সঙ্গীদের নিকটে আসিতে দিও না। পশ্চাৎদিকে অবলোকন করিও না, ভোগের দিকে আর লক্ষ্য করিও না। যাহাদের আপন ভাবিতেছ, তাহারা কেহ আপন নয়, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চল; একা আসিয়াছিলে একা যাইতে হইবে। তাই বলি জীবন থাকিতে থাকিতে একাকী চল, সঙ্গে অন্তরালে তিনি আছেন; প্রাণ লইয়া ভূমে আসিয়াছ প্রাণের সঙ্গে চল—যাইবার সুবিধা হইবে। আর অধিক কি বলিব—কাল ফুরাইয়া যায়, পবন অনুকূল থাকিতে থাকিতে ভালবাসা-স্রোতে উজান বাহিয়া জগৎপতির নিকট অভিসার কর। তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হইলে তোমার সর্ব্বদুঃখের মোচন হইবে।

শ্রীপ্র—

বালকব্রহ্মচারী ও অরুণাচল।

১৩১৫ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে কর্ম্মোপলক্ষে আমি একবার শিলচর যাই। তথায় একদিন দ্বিপ্রহরে বড় প্রখর রৌদ্র উঠিয়াছে। আমি গৃহের অলিন্দে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া আলস্যে সময় কর্ত্তন করিতেছি। সম্মুখে রাজপথ, —উদ্দেশ্যবিহীন দৃষ্টিতে সেই দিকে এক একবার চাহিতেছি। রাজপথে লোক-চলাচল একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন সেই দারুণ রৌদ্রে গৃহ হইতে কেহ বাহির হইতে চাহে না। আমি বসিয়া বসিয়া কত ভাবিতেছি। বাহিরে চারিদিক রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন একটা জ্বলন্ত লৌহপিণ্ডবৎ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির এই ভীষণলীলা দেখিতে দেখিতে একবার রাজপথের পানে চাহিলাম। ভীষণ মরুভূমির বুকে স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণীর কুলুগীতিমুখরিত, শ্যামসুন্দর বিটপীমালার 'বিনোদমধুর ছায়াময়' উর্ব্বর ভূমিখণ্ডের ন্যায় প্রকৃতির সেই রোষবহ্নির মাঝে একটী দেবশিশুর সরল মধুর মূর্ত্তি আমার নয়নপথে ভাসিয়া উঠিল। দেখিলাম,—সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া পবিত্রতার জীবন্তমূর্ত্তি অতিপ্রিয়-

দর্শন একটী বালক আমাদের বাসার দিকে আসিতেছে। বালকটী আমাদের গৃহেই আসিল। আমি সম্ভ্রম ও কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার বয়স নয় কি দশ বৎসর হইবে। সুন্দর ললাটে তার রক্ত-বর্ণের তিলক, পরিধানে গৈরিক বসন, অঙ্গে গৈরিক উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষের-মালা। কি সুন্দর বেশ! এ বেশে বালককে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সে সৌন্দর্য্য, সে পবিত্রতা আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব! এ জীবনে এমন তো আর কখনও দেখি নাই। আমি পলকবিহীননেত্রে বালককে দেখিতেছিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ভক্তি ও সম্ভ্রমের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ভাবিতেছিলাম—নদীতরঙ্গে দেবতার পূজার ফুলের মত ভাসিয়া ভাসিয়া কে এ বালক আজ আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল? এ কি নন্দনে কুসুমচয়নরত সুরবালার হস্তচ্যুত একটি পারিজাতকুসুম আমার প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িল? মন্দাকিনীর একটি কুলুনিনাদ কি এই প্রখর মার্ত্তণ্ডের রশ্মি বাহিয়া স্বর্গ হইতে আমার সম্মুখে নামিয়া আসিল? অথবা এ কি বিমানবিহারী দেবর্ষি নারদের স্বর্গীয় বীণার একটা মোহন ঝঙ্কার গগননীলিমার পর পর হইতে আমারি দুয়ারে আসিয়া লুটিয়া পড়িল? জানিতে বড় কৌতূহল হইল,—নগরের বিলাসপঙ্কিলস্রোতে ফুল্লকমলের ন্যায় কে এই বালকব্রহ্মচারী! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, শিলচর-সহরের দেড়ক্রোশ দূরে শ্রীশ্রীঠাকুর দয়ানন্দের প্রতিষ্ঠিত অরুণাচল আশ্রম,—এ বালক আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী। অরুণাচল আশ্রম! কি সুন্দর নাম! এই মনোহরকান্তি বালক সেই আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী! কথাটা হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বারবার ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল! সস্নেহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি সেখানে কি কর?" বালক আমার শ্রবণ-কুহরে সুধাবর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"আমি তথায় হরিসাধন করি। হরিগুণ গান করি।" বালকের কথায় প্রাণ আমার কি একটা অভূতপূর্ব্বভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আজও যার ধূলাখেলা ছাড়িবার দিন যায় নাই, সেই নবমবর্ষীয় বালক বলিতেছে—"আমি হরিসাধন করি; আর হরিগুণ গান করি!" ভগবন্! আজি আমার নয়নের জলে দুঃখ-অমানিশার গভীর আঁধারে তুমি কি এই বালকের মুখে আমায় আশার সঙ্গীত শুনাইয়া গেলে? প্রভো! আবার কি সেই দিন আসিবে? জাহ্নবী-

যমুনার বিশালতটে মৃদুপবনে প্রভাতসন্ধ্যায় আবার কি তোমার নাম বাজিয়া উঠিবে? আর মুগ্ধ বিদেশী নাবিক, প্রেমাবেশে চোখের জলে পথ হারাইবে? প্রেমময়! আবার কি ভারতের ঘরে ঘরে ভারতের শিশু "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নাচিবে? আবার কি ধ্রুবের তপস্যায় অমরের সিংহাসন কম্পিত হইবে? দয়াময়! ভারতের ধ্রুবপ্রহ্লাদ, ভারতের ব্যাসবাল্মীকি, ভারতের রামযুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন আবার কি ভারতে ফিরিয়া আসিবে? ভারতসন্তান আবার কি মায়ের রাজরাজেশ্বরীমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে?

এখন যে কথা বলিতেছিলাম। তখন বালকের কথা শুনিতে শুনিতে জানি না কেন চোখে জল আসিল? একি আনন্দের অশ্রু! না হারাণো জিনিসের শোকে বিগলিত নয়নের ধারা। আমি অশ্রুপ্লাবিতনয়নে উদ্বেলিত-প্রাণে বাহুপাশে বালককে বুকে চাপিয়া ধরিলাম। ধীরে ধীরে তাহাকে কত কথা সুধাইলাম। আমার হৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া বালক আমার সাথে কত কথা কহিল। দেখিলাম, ক্ষুদ্র বালকের অতটুকু প্রাণে কি গভীর ধর্ম্মপিপাসা! কি অটল বিশ্বাস! কি মহতী আকাঙ্ক্ষা! বালকের প্রতিকথায় আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছিলাম। আমার নয়নপথে একটা আশার আলো নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি যেন দিব্যচক্ষে আমার কৈশোরের মধুর স্বপ্ন, যৌবনের একমাত্র বাঞ্ছনীয় মধুময় মূর্ত্তিখানি—যার ধ্যানে ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল গভীর গহনে প্রেমের বাজার দেখিয়াছি, রৌদ্রদীপ্ত প্রচণ্ড মরু ধূ ধূ মাঝে প্রেমমন্দাকিনীর কুলুকুলুধ্বনি শুনিয়াছি প্রলয়পিয়াসী বজ্রের ভৈরব ঘর্ঘরধ্বনিতে করুণার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি, ঝঞ্ঝামথিত বারিধির তাণ্ডব-নর্ত্তনশীল তরঙ্গের মাঝে দু'খানি প্রেমবাহু দর্শন করিয়াছি, অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে আশার কিরণছটা দেখিয়া আনন্দে দু'বাহু তুলিয়া নাচিয়াছি,—আগতপ্রায় ভবিষ্যতের কুসুমসৌরভামোদিত বংশীধ্বনিমুখরিত কনকমন্দিরে কনক আসনে আমি তখন আমার সেই একমাত্র বাঞ্ছিতধনের মহামহিমময় মূর্ত্তিখানি সমাসীন দেখিলাম। দেখিলাম—কোটীচন্দ্রজিনি তাঁর অঙ্গের প্রভায় আঁধারেমগ্ন বিশ্ববাসী নূতন উষায় নূতন আলোক পাইয়া ধন্য হইতেছে। দেখিলাম—বাঞ্ছিত আমার রাজরাজেশ্বর বেশে আমার হৃদয়মন্দিরের উপাস্য-দেবতার বেশে সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত রাজদণ্ড চালনা করিতেছেন। দেখিলাম—প্রাণেশ আমার ভুবনমোহন বেশে—আমার মানসমোহনবেশে—

মোহনমুরলীরতানে সারাজগৎ পাগল করিয়া তুলিতেছেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম।

বিংশশতাব্দীর পঙ্কিলস্রোতে দেশের কত সন্তান ভাসিয়া যাইতেছে। এক-দিন হয়ত যাহাদের প্রতিভায় সমস্ত বিশ্ব আলোকিত হইতে পারিত, এই পাপস্রোতে পড়িয়া তাহারা সর্ব্বস্ব হারাইতেছে। কূলনাশিনী ভীমা তরঙ্গিণীর ন্যায় এই পঙ্কিলপ্রবাহ তাহার করালবাহু প্রসারণ করিয়া, প্রতিদিন শত শত যুবককে আপনার বুকে টানিয়া লইতেছে। দেখিয়া প্রাণে প্রাণে কত দিন কাঁদিয়াছি, কত ব্যর্থশ্বাস আকাশে মিলাইয়াছি। আবার কি রামায়ণ মহাভারতের সেই পুণ্যময় যুগ আসিতে পারে না?—ভারতের কাননে কাননে ঋষির পুণ্যাশ্রম, যজ্ঞধূমে সামগানের মধুর ঝঙ্কারে আকাশ পাগলপারা, ধর্ম্ম-বলে মহাবলীয়ান্ ভারতসন্তান বিশ্বের মঙ্গলমন্দিরে আপনা বিকাইয়া সতত বিশ্বপ্রাণীর সেবায় নিরত—হায়। সেই দিন কি আর আসিতে পারে না? সেদিন কি আর আসিবে না? কত প্রভাত সন্ধ্যা, কত নিশীথিনীর নির্জ্জন-প্রহর সেই ভাবনায় কাটাইয়াছি আজ এই ক্ষুদ্র বালকের ধর্ম্মে অটল আস্থা, ভগবানে অসীম নির্ভরশীলতা দর্শন করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে আমি যেন দেখিতে পাইলাম—প্রেমের যে বিমলধারা আজ এই বালকের হৃদয়ে মধুরনিনাদ তুলিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে, ক্রমে ক্রমে উহা সমস্ত ভারত প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তারপর সেই প্রেমপারাবার তরঙ্গ-বাহু তুলিয়া "আরও চাই" "আরও চাই" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাতে সমস্ত বিশ্ব আপনাকে অঞ্জলি প্রদান করিল। বিশ্বের সকল জ্বালা জুড়াইল। সারাবিশ্ব এক অখণ্ড প্রেমরাজ্যে পরিণত হইল।

তারপর যে কথা বলিতেছিলাম। সেই হরিসাধক বালকের সহিত কত কথা হইল। তার কাজ সারিয়া সে আশ্রমে ফিরিয়া গেল। শুনিলাম, সেই বালকটী অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিল। তাহার পিতামাতা তাহাকে আশ্রমে সমর্পণ করেন। আশ্রমের শিক্ষায় সে আজ সোণা হইয়া গিয়াছে। আশ্রমটী দেখিতে বড়ই সাধ হইল। অনিবার্য্যকারণে সে সাধ আর তখন পূর্ণ হয় হয় নাই। শিলচর হইতে প্রত্যাগমনকালে গাড়ীতে (Train) বসিয়া দেখিলাম—নীল আকাশতলে কালোরূপের ঢেউ তুলিয়া পর্ব্বতশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। আর তাহারই এক রমণীয় স্তূপের উপর প্রকৃতিমাতার শ্যামঅঞ্চলঘেরা নিভৃত

নিকুঞ্জে মরুদগ্ধ শ্রান্ত পান্থের জন্য সুশীতল বারি লইয়া "অরুণাচল" দাঁড়াইয়া আছে। ভক্তিতে প্রাণ আপনা আপনি প্রণত হইল।

তারপর দুই বৎসর চলিয়া গেল। এই দুই বৎসরে ষড়ঋতুর বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়রাজ্যেও কত ঋতু বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে। কভু শারদকৌমুদীর নির্ম্মল-হাসিপ্রাণে আমার কত সোনার স্বপন জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। কভু বৈশাখের ভীমঝঞ্ঝায় আমার সাধের ঘর উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। কভু বসন্তের কোকিলঝঙ্কারে হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে কত হারাণ গান ফিরিয়া আসিয়া, আমায় উধাও করিয়া দিয়াছে। কভু বা বর্ষার বারি ধারায় আমার সারাদিনমানের কত যত্নে, কত আয়াসে সঞ্চিত রত্নে আমায় বঞ্চিত করিয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। আবার কভু বা মাঘের রজনীর তুহিনসম্পাতে আমার সাধের উদ্যানের কত মঞ্জুল কুঞ্জ পত্রপুষ্পহীন ভ্রষ্টশ্রী হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এত বিপর্য্যয়ের ভিতরও সেই বালকের মধুর স্মৃতিসহ পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত সারাদিনমান "পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা" সেই অরুণাচলের সুখময়স্মৃতি নিশিদিন আমি বুকে করিয়া রাখিয়াছিলাম। কত দিন এই অরুণাচলকে নিয়া আমি মনে মনে কত কল্পনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, আর তার রাজভক্ত প্রজা হইয়া সুখে বাস করিয়াছি।

দুই বৎসর পরে অরুণাচল আশ্রম দর্শনের বাসনা পূর্ণ হয়। গত ফাল্গুন মাসের (১৩১৭) এক অপরাহ্নে গাড়ীতে (Train) শিলচর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশন হইতে আশ্রম এক ঘণ্টার পথ। মাঠের উপর দিয়া পথ—সেই পথে আশ্রমে চলিলাম। সন্ধ্যার সময় দূর হইতে আশ্রমের পাহাড়টী দৃষ্টিগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা-আরতির মধুর সঙ্গীত আমার শ্রবণে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই সঙ্গীতে মন্ত্রাকৃষ্টের ন্যায় মুগ্ধহৃদয়ে ধীরে ধীরে আশ্রমপাহাড়ে আরোহণ করিলাম। তখন মায়ের মন্দিরে একতারায় তান ধরিয়া ভক্তগণ

"নমো মাতঃ দুর্গে সিংহবাহিনি"

গানটী গাহিতেছিলেন। সে সঙ্গীতের তালে তালে আশ্রমের বৃক্ষলতাগুলিও যেন নৃত্য করিতেছিল। সন্ধ্যাকাশের তারকা কয়েকটীও যেন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—মা সেখানে কালীরূপে বিরাজ করি-

তেছেন। আশ্রমের আনন্দময় ভক্তগণ আদর করিয়া মাকে **আনন্দময়ী** নাম দিয়াছেন। মা'র মূর্ত্তিছাড়াও মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ, শালগ্রাম শিলা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিত্র আছে। আশ্রমে শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছেন। মায়ের মন্দিরের পশ্চাতে পঞ্চবটীবন। পঞ্চবটীর চারিদিকে ছোট ছোট কয়েকখানি সাধন কুটীর। ভক্তগণ এই সব কুটীরে বসিয়া সাধন করেন।

সে সময় ঠাকুর আশ্রমে ছিলেন না—তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিলেন। স্বামী চিদানন্দ তখন আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার, জীবনে কখনও ভুলিব না। যে কয়দিন আশ্রমে ছিলাম, কি আনন্দেই দিন কয়টী কাটিয়াছিল!

প্রভাতে শিশিরধৌত বনরাজির শ্যামল কান্তিতে যখন শ্যামবনমালীর ভুবনমোহন রূপ তরুণতপনের বিমলকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, ধীর-পবনে হরিৎশস্যক্ষেত্রে যখন শ্যামসুন্দরের পীতবসনখানি কাঁপিয়া উঠিত, বরবক্রের * কুলুনিনাদে যখন তাঁর নূপুরনিক্বণ শ্রবণে আসিত, তরুমর্ম্মরে বিহগকাকলীতে বনে বনে যখন শ্যামের মোহনমুরলী বাজিয়া উঠিত,—প্রেম-পুলকিতপ্রাণে আশ্রমের ভক্তগণ তখন করতালে তালি দিয়া একতারায় মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া

"জাগরে হরি ব'লে জীবগণ,
মোহমায়া নিদ্রাঘোরে কত রবে অচেতন?"

গাহিয়া উঠিতেন। দ্বিপ্রহরে শঙ্খঘণ্টার মধুরনিনাদে চারিদিকের পর্ব্বতমালা যখন মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন মায়ের মাধ্যাহ্নিক ভোগক্রিয়া সম্পাদিত হইত। তার পর সন্ধ্যাবেলায় লোহিতরাগেরঞ্জিত পশ্চিমাকাশের তলদেশে শ্যামা-মা যখন সিন্দূর মাখিয়া, আকাশে কাল চুল এলাইয়া দিয়া ভক্তগণের আরতি গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইতেন, **আনন্দময়ীর** সন্তানগণ তখন মহানন্দে নাচিয়া নাচিয়া মায়ের আরতিসঙ্গীত আরম্ভ করিতেন।

কি মধুর সে সঙ্গীত! যে সঙ্গীতে গাছ নাচে, পাহাড় নাচে, পাহাড়ের নীচে নদী নাচে, প্রান্তর নাচে, যে সঙ্গীতের তালে তালে প্রেমের উচ্ছ্বাসে

---

* আশ্রমের নিকট প্রবাহিত নদীর নাম। প্রচলিত নাম বরাক।

হৃদয়-যমুনা নাচে, হৃদয়-যমুনার তীরে তীরে সুখ নাচে, দুঃখ নাচে, জীবন নাচে, মরণ নাচে,—হরি! হরি!! কেমন করিয়া বলিব সে সঙ্গীতে কত মধু!

সে সঙ্গীতের সে মধুর ঝঙ্কার আজও প্রাণে বাজে। অরুণাচলের সে মধুর স্মৃতি সোণার-নূপুরপায়ে আজও আমার হৃদি-কদম্বমূলে নাচিয়া বেড়ায়। রুদ্ধদুয়ার আঁধার ঘরে আজও তার ব্যাকুল বাঁশরীর তানে চমকিয়া চমকিয়া উঠি।

কালিন্দীরকূলে শ্যামচাঁদের বাঁশরীধ্বনি শুনিয়া উতলা, প্রেমবিহ্বলা ব্রজগোপী যেমন উধাও হইয়া ছুটিত, জানিনা—ঐ বাঁশরীর ব্যাকুলতানে কবে আমিও তেমনি করিয়া ছুটিতে পারিব! জানিনা—ভগবান্ কবে আমার এ-সাধ-করিয়া-পরা মায়ামোহের লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিবেন! কবে আমার তৃষিত প্রাণ, তাঁর চরণ-কমলের মধুপানে সকল তৃষ্ণা জুড়াইবে!

শ্রীধ—

ঈশ্বর ভাবনা।

গত রবিবার হইতে এই রবিবার পর্য্যন্ত একভাবে গেল। আজ সোমবার। অপরাহ্ণ! একই ভাব।

মনে হইল এমন ভাবে থাক কেন? একটু ডাক না।

আগে সাধ্যবস্তু নিশ্চয় করা আবশ্যক। শাস্ত্র যেরূপে সাধ্য নির্ণয় করিয়াছেন, আধুনিক ধর্ম্মজগৎ তাহা সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য সম্প্রদায়ের, শ্রীযুক্ত রাজানুজ সম্প্রদায় আর এক আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের, শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় তৃতীয় সম্প্রদায়ের, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি স্ব স্ব মতে ঈশ্বরকে এক এক রূপ গড়িয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের ঈশ্বর ও শাস্ত্র বিশ্বাস আজ আধুনিক ব্রাহ্মসমাজে স্থান পান না!

শ্রীযুক্ত পরমহংসদেব শাস্ত্র-সম্মান রক্ষা করিয়া ঈশ্বরকে সকলের মধ্যেই এক এবং একেই সকল দেখিতে শিক্ষা দিতেছেন।

শুধু কৃষ্ণ-উপাসনা করিলে হইবে—কালী উপাসনায় হইবে না একথা

শাস্ত্রী কোথাও বলেন না। শুধু নিরাকার ভজিলে হইবে—বিশ্বরূপ ভজিলে বা মূর্ত্তি ভজিলেও হইবে না বেদও একথা কোথাও বলেন নাই। সাক্ষাৎ কৃতকর্ম্মা ঋষিগণ বলিতেছেন,—যিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ ও মূর্ত্তিমান্, তিনিই উপাস্য। ইহার কোনটি বাদ দিলে তুমি ভ্রান্ত। তাই আমাদের সাধ্যনিশ্চয় এইরূপ।

যিনি স্বস্বরূপে অবিজ্ঞাত যাঁহাকে বেদ জানিতে পারে না, মন যাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না, বাক্য যেখানে স্ফুরিত হয় না; আবার যিনি মায়া-অবলম্বনে সগুণ ব্রহ্ম, বিশ্বরূপ; আর মায়া যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া গায়ত্রী, আবার যে গায়ত্রী আপন বিন্দু অংশে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদংকে ছুঁইয়া আছেন এবং যিনি স্থূল আকারে অ উ ম হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত পৃথিবী ছুঁইয়া আছেন, তিনিই জীবের উপাস্য।

দেবি! চিরদিন তুমি প্রণব গায়ত্রী আর যুগে যুগে কখন দানব বিনাশ করিয়া তাণ্ডব নৃত্য কর; কখন বা রাক্ষসগৃহে কুলবধূ সাজিয়া অবস্থান করিয়া তাহার কুলকে সমূলে বিনাশ কর, কখন বা আবার অপরের গৃহে পরকীয়া ভাবে অবস্থান করিয়া সাধককে দেখাইয়া দাও—উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্ত হইয়া কেমন করিয়া ডাকিতে হয়—এই তুমি জীবের সাধ্য বস্তু।

রূপের অন্ত নাই, মহিমার অন্ত নাই। প্রেমের অন্ত নাই, শক্তির অন্ত নাই। কখন মহাসরস্বতী মহালক্ষ্মী মহাকালী; কখন দুর্গা কালী অম্বিকা চণ্ডী কখন বা সীতা শ্রীজানকী কখন বা রাধারাণী—কি তুমি!

তুমি শিবশক্তি। তুমি রামসীতা, তুমিই রাধাকৃষ্ণ। তুমি বিশ্বরূপ, তুমি নির্গুণ ব্রহ্ম।

শিব কে? না শক্তিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন মত চৈতন্য। শক্তি কে? না মণির ঝলকের মত চিন্মণি হইতে স্বভাবতঃ যে চলন তাহাতেই যে চৈতন্যের আরোপ তাহা। শিব কে? শিব, শক্তিই; তাহার উপর চৈতন্য আরোপ। শক্তি কে? শক্তি শিব হইলেও তাঁহার এক দেশ মাত্র।

এই রূপ রাম সীতা এই রূপ রাধা ও কৃষ্ণ।

বেদাদি শাস্ত্রে সাধ্য-নির্ণয় এই রূপ।

সাধ্য নির্ণয় করিয়া যাহাই কেন ইষ্টদেবতা হউক তাঁহাকে সকল ভাবে দেখ; সর্ব্বদা তাঁহার পরম ভাবে লক্ষ্য রাখ; তিনিই যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তিনিই যে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকর্ত্তা—সর্ব্বদা ভাবনা কর।

সর্ব্বাপেক্ষা সুখের চিন্তা।

এই জীবনে যত প্রকার চিন্তা করিলাম—নিজেই করি বা শাস্ত্র বা সাধুমুখে শুনিয়াই করি যত প্রকার চিন্তা করিলাম,সর্ব্বাপেক্ষা সুখের চিন্তাটি আমার ঈশ্বর-চিন্তা। এই চিন্তাটি অপরেরও সুখের চিন্তা কিনা জানিনা; কিন্তু নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এই চিন্তাটিই আমাকে সুখ দেয়, আমাকে সুখ-ভাবনায় নিমজ্জিত করে, আমাকে একটা স্থায়ী সুখের আভাষ দেয়।

কি এই চিন্তা? তাহাই বলিতে যাইতেছি।

তুমি আছ। তুমি আমাতে আছ, তুমি সকলে আছ। লোকে যাহাকে শত্রু বলে তাহাতে আছ, মিত্রেতে আছ। সুন্দরে আছ, কুৎসিতে আছ। রূপে আছ, গুণে আছ। অরূপে আছ, অগুণে আছ। সুস্থতাতে আছ, রোগেও আছ। সুখেও আছ, দুঃখেও আছ। হাস্যে আছ, ক্রন্দনে আছ। যুদ্ধে আছ, সন্ধিতে আছ। লোকক্ষয়ে আছ, লোকজন্মে আছ। সর্ব্বকার্য্যে আছ, সর্ব্ব অকার্য্যে আছ। সর্ব্ব নাশে আছ, সর্ব্ব রক্ষাতে আছ। কিসে নাই তুমি? তুমি যেথা নাই, সেখানে কি আছে বা কি নাই কোন ধারণা কার যায় না। শান্ত ভাবে আছ, দুরন্ত ভাবে আছে। অভিমানে আছ, বিচারে আছ। প্রেমে আছ, বিরহে আছ। হৃদয়-উচ্ছ্বাসে আছ, হৃদয়-অন্ধকারে আছ। শুধু কি মানুষের মনোরাজ্যের ব্যাপারেই আছ? না না সর্ব্ব জীবের, সর্ব্ব জড়ের সর্ব্ব রাজ্যে তোমার প্রতিষ্ঠা।

আকাশে আছ, বিদ্যুতে আছ, বজ্রাঘাতে আছ, চন্দ্রে আছ, তারাতে আছ, সূর্য্যে আছ, সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে আছ। বায়ুতে আছ, মলয়ে আছ, প্রভঞ্জনে আছ।

অগ্নিতে আছ, দাবানলে আছ, বাড়বানলে আছ, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদগমে আছ। সমুদ্রে আছ, নদীতে আছ, জলাশয়ে আছ, সরোবরে আছ। পৃথিবীতে আছ। বনে আছ, উপবনে আছ, গ্রামে আছ, রূপে আছ, রসে আছ, গন্ধে আছ, স্পর্শে আছ, শব্দে আছ। কোথায় নাই তুমি। ইন্দ্রিয়ে আছ, মনে আছ,

বুদ্ধিতে আছ, চিত্তে আছ, অহংকারে আছ, প্রকৃতিতে আছ। অতে আছ, উতে আছ। মতে আছ, নাদে আছ, বিন্দুতে আছ। মহাসরস্বতীতে আছ, মহালক্ষ্মীতে আছ। মহাকালীতে আছ, প্রণবে আছ, অর্দ্ধনারীশ্বরে আছ। সত্ত্বরজস্তমের বৈষম্যে আছ, সাম্যে আছ। অসৎ নামরূপে আছ, সৎ অস্তি ভাতি প্রিয়ে আছ। হে জগদেক বন্ধো কোথায় নাই তুমি ?

আহা ফুল তুমি, ফুলের রূপ তুমি, ফুলের সৌগন্ধও তুমি। কোকিলা তুমি, কুহুরবও তুমি, সহকারও তুমি, ময়ূরও তুমি, ময়ূরের নৃত্যও তুমি, ময়ূরের পুচ্ছও তুমি, আবার ময়ূরপুচ্ছধারীও তুমি।

যে দিকে দেখি, যা দেখি, যা ভাবি, যা অনুভব করি সর্ব্ব তুমি।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তুমি কেমন? সবই তুমি। কিন্তু সমস্তকে যেমন দেখি, যেমন শুনি—সেই রকমই কি তুমি ?

তবে তুমি গোপনে কিরূপে ? সকলের অন্তরালে তুমি কিরূপে ?

একটু বুঝাইয়া দাও বিশ্বরূপে তুমি কিরূপে ?

আহা ! বুঝিতেছি বড় সূক্ষ্ম কথা ! জগৎ যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, অনুভব করিতেছি—এসমস্তকে যে বলি তুমি—সে কেবল ইহাদিগকে আর কিছু দিয়া প্রকাশ করিতে পারি না তাই বলি—নতুবা তুমি জগৎরূপে দাঁড়াইয়া আছ সত্য—তুমিই জগৎ সত্য, কিন্তু শুধু জগৎটা তুমি নও।

তুমিই জগৎ সত্য কিন্তু জগৎটা তুমি নহে। রজ্জুটি আছে—তাহাকে যে সর্প দেখিতেছি—তাহাতে রজ্জু ভুলিয়া রজ্জুর উপরে একটি সর্পমত কিছু দেখিতেছি বটে, কিন্তু দেখাটা ভ্রমে। সেইরূপ তোমাকে যে জগৎ বলিয়া দেখিতেছি সেটা ভ্রমে। বাস্তবিক তুমি তুমিই—তুমি জগৎও নও, তুমি বিশ্বরূপও নও, তুমি কোন রূপও নও, তুমি আপনিই আপনি। গগনং গগনাকারম্। আকাশ কেমন ? আকাশের মতন। তুমি কেমন ? তুমি তোমার মতন। তোমার মতন আর কিছু নাই। কাজেই তুমি আর কারও মতন নও। তুমি তোমারই মতন। যে সকল লোক এই দৃশ্যমান্ জগৎকে তুমি বলে; তাহাদিগকে নমস্তভ্যম্। পরিদৃশ্যমান জগৎ যাই হোক এটা তোমার উপরে ভাসিয়াছে মাত্র।

কথা।

আমাকে একটু ভাল করিয়া দাওনা? তুমি কি মনে কর আমাকে একটু ভাল করিলে আমি তোমার প্রিয় বস্তু সকলের অনিষ্টই করিব; তাই কি ভাল কর না? তুমি কি মনে কর একটু ভাল করিয়া দিলে আমার অহঙ্কার বাড়িয়া যাইবে—আমি তোমার প্রিয় জীবগণকে তুচ্ছ ভাবিব; আমার বিভূতি হইয়াছে অন্যের হয় নাই, সেই জন্য তাহাদিগকে ঘৃণা করিব—এই জন্য কি আমাকে ভাল কর না? শক্তি পাইলে পাছে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী হয়, সেই জন্য কি শক্তি দাও না?

তুমি কৃপা করিলে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে; আমি কি তোমার কৃপা পাইলে খারাপ হইয়া যাইব তাই তুমি তোমার কৃপা অনুভব করাও না?

কিন্তু আমি যে প্রতিদিন, এইরূপ ক্লেশ করিয়া তোমার কাছে যাইতে যেন আর পারি না; যাইব কত কষ্ট করিয়া অতি অল্পক্ষণের জন্য, আবার কিছুক্ষণ থাকিতে না থাকিতেই বিতাড়িত হইব; আবার বহু লোকসঙ্গ করিব, আবার কেমন হইয়া যাইব; আবার পরদিন প্রাণান্ত করিয়া কাছে যাইব, আবার ক্ষণকালের পর বিতাড়িত হইব—জনম ভরিয়াই এরূপ আর পারি না। তুমি আমাকে উদ্ধার কর। যেরূপ করিলে আর আমার পূর্ব্ব কর্ম্ম বল করিতে না পারে তাই করিয়া নির্জ্জনে একান্তে তোমার কাছে রাখ। তোমার জগৎ তুমি রক্ষা কর। জগৎ রক্ষা-ভার আমায় দিয়া তোমা হইতে আমাকে আর বঞ্চিত করিয়া রাখিও না। যাহারা শক্তিসম্পন্ন তাহাদিগকে যা পার কর; আমি বড়ই শক্তিহীন, বড়ই ভক্তিহীন, বড়ই অধম; আমাকে তোমার নিকটেই রাখ। আর আমায়, তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে দিও না। শুনিবে কি এই কথা? যদি না শুন তবে কি ইহা আর বলিব না? তবে বল আমি কি করিব? একবার আসিয়া বলিয়া দাওনা যে, তুমি এই এই কর; আমি তাহা হইলে বড় আনন্দে তাই করিতে থাকি—এ দেহটা ক্ষয় হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। বল তুমি না বলিয়া দিলে—আর যে আমাকে বলিয়া দিবার কেহ নাই! সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা যেরূপে তোমার ইচ্ছা হয় বলিয়া দাও না। আমি যে কিছুই পারি না। তুমি বল, আসিয়া বলিয়া দাও: আমায় উদ্ধার কর।

যদি না বলিয়াই দিবে তবে একান্তে যাইবার বাসনা এত তুল কেন? একান্তেও যাইব আবার জগৎ রক্ষার জন্য—শক্তি নাই তবুও ছাইরাই করিব; আমার দুটা অবস্থা ভাঙ্গিয়া একটা বলিয়া দাও। উদ্ধার কর।

মন তোরে বোঝাবে কেটা।

শ্রীরামপ্রসাদ যেমন প্রত্যহ মনকে সদুপদেশ দিতেন, সর্ব্বদা মনের পশ্চাতে লাগিয়াই ছিলেন—আমি ত তোমাকে কত রকম উপদেশ দিতেছি, কত কথা বলিতেছি—কৈ তুমি তোমার দোষ ছাড়িলে কৈ? কৈ তুমি আমার কথায় প্রত্যয় করিলে যে, তুমি অতি উচ্চবংশের! তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারা গেল না যে তুমিই সেই—যার কথা এত তুমি শুনিলে।

কি দুর্ভাগ্য আমার! তুমি একবার আমার কথা শ্রবণ কর, করিয়া তোমার মহত্ত্ব আমাকে দেখাও; আমিও ধন্য হই—তা নয় যা তা পাও তাতেই মগ্ন হইয়া যাও। অত বড় লোক হইয়াও সামান্য একট কিছু দেখিলে বা সামান্য একটু পাইলে গরিব দুঃখীর মত মগ্ন হইয়া কতই অঙ্গভঙ্গি কর—কি অদ্ভুত! আমি ঘৃণায় লজ্জায় মরিয়া যাই। মনে করি এত প্রতাপশালী যে সেও এইরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া কি লইয়া মগ্ন রহিতেছে। এই কি তোমার কার্য্য! দ্রৌপদী যেমন বিরাটরাজার নিকটে ভীমকে রঙ্গভূমিতে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া ব্যথিত হইতেন, অর্জ্জুনকে দীর্ঘ বেণী রাখিয়া কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া হস্তে বলয় ধারণ করিয়া স্ত্রীবেশে রঙ্গ করিতে দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া থাকিতেন; যেমন রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরকে কঙ্কবেশে বিরাটপার্শ্বে দেখিয়া মনস্তাপ করিতেন; নকুল সহদেবকে গো অশ্বের পালক দেখিয়া যাতনা পাইতেন—আমিও তোমাকে এইরূপ পাগলের মত যা তা করিতে দেখিয়া কতই ক্লেশ অনুভব করি। কতকাল ধরিয়া স্মরণ করিয়া দিতেছি, কৈ তোমার ভ্রম ভাঙ্গিল? ছি ছি! এ সমস্ত জঘন্য কর্ম্ম তোমার নহে। কি প্রমোদমদিরা পানে তুমি উন্মত্ত বল? সিংহ হইয়া মেষশাবকের মত কাপুরুষ হওয়া কি তোমার উচিত? পক্ষীরাজ হইয়া কি পঞ্চবাদ্য ঘোটক হওয়া তোমার কর্ত্তব্য? আমি তোমার চরণে ধরিতেছি একবার তুমি

আত্মস্মরণ কর ; করিয়া নীচত্ব ত্যাগ কর ; করিয়া রাজা তুমি রাজার মত দাঁড়াও—আহা ! কত সুখী তুমি হইবে—আর কত সুখ আমার হইবে তখন।

কিরূপে আত্মস্মরণ করিবে বলিতেছ ? তুমিই সেই একবার বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করিয়া যাহা বলি সেই কার্য্যগুলি কর দেখি—তোমার ভ্রম ভাঙ্গে কি না দেখ !

তুমিই যে আমার আরাধ্য ! তুমি যে সর্ব্বশক্তিমান্ তুমিই যে আমার পুরুষ—তুমিই যে পুরে শয়ান প্রভু ! এস এস জাগ্রত হও। আপনার স্বরূপ চিন্তা করিয়া নিত্য কর্ম্মগুলি কর। তুমিই একাধারে শক্তি ও শক্তিমান জড়িত মূর্ত্তি। হরি হইয়া হরি ভজনা কর। শিব হইয়া শিবার ভজনা কর। কৃষ্ণ হইয়া রাধার ভজনা কর। সীতা হইয়া রামের ভজনা কর। আপনাতে আপনার ভজনা কর, কত সুখ দেখ।

তুমি সত্য সত্যই পরম পদার্থ ! নিজের ভ্রম ভাঙ্গাইবার জন্য আপনার স্বরূপের উপাসনা করাই মুক্তি।

প্রেত কাহারা ?

মৃত্যুর পরেই মানুষ আতিবাহিক বা ভাবনাময় দেহ প্রাপ্ত হয়। পরে অশৌচান্ত দিনে দশপিণ্ড প্রদান করিলে তবে তাহার প্রেতদেহ প্রাপ্তি ঘটে। বৎসরান্তে সপিণ্ডকরণের পর মৃতব্যক্তি প্রেতদেহ ত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়, এবং স্বকীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন করে।

কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহ পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥ রঘুনন্দন ধৃতবচন !

শুদ্ধিতত্ত্বে দৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকম্। মৃত্যুর পরেই আতিবাহিক দেহ হয়। কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ। কেবল মানুষেরই এইরূপ হয়, অন্য প্রাণীর হয় না। প্রেতপিণ্ডৈস্ততো দত্তৈ-দেহমাপ্নোতি ভার্গব। প্রেতপিণ্ড দানের পর তখন ঐ প্রেত, ভোগদেহ লাভ করে।

সপিণ্ডীকরণ যাহদের হয় না, তাহাদের কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত মুক্তি হয় না।

মৃতব্যক্তি শীতবাতাতপোদ্ভব নিদারুণ যাতনা ভোগ করে। এই জন্য সম্বৎসর পূর্ণ হইলে পুত্র বা স্বজন অবশ্যই সপিণ্ডীকরণ করিবে।

যাহাদের কিন্তু শাস্ত্রমত ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম হয় না, অথবা যাহারা ঈশ্বরবিদ্বেষী, তাহারা কর্ম্মোচিত নরক ভোগের পর প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয়।

প্রেতগণের আকার অতি ভয়ানক। ওষ্ঠ লম্বিত, জঙ্ঘা দীর্ঘ ও শিরাবেষ্টিত, পদ দীর্ঘ, তুণ্ড শুষ্ক, চক্ষু কোটরগত ও পিঙ্গলবর্ণ; কেশসমূহ ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত, দেহের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ; জিহ্বা লেলিহমান এবং অস্থিপঞ্জর সমূহ দৃশ্যমান।

অগ্নিপুরাণ হইতে আমরা এক ব্রাহ্মণ ও পঞ্চপ্রেতের বৃত্তান্ত বলিতেছি।

এক ব্রাহ্মণ কোন সময়ে পাঁচটি প্রেত দর্শন করেন। প্রেতগণের বিকটাকার দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের এরূপ আকৃতি কিরূপে হইল। প্রেতগণ বলিতে লাগিল :—

১ম প্রেত—আমার নাম পর্য্যুষিত। আমি সর্ব্বদা স্বাদু দ্রব্য ভোজন করিতাম কিন্তু অন্যকে পর্য্যুসিত (বাসী) অন্ন দিতাম ; তজ্জন্য আমার এই অবস্থা।

২য় প্রেত—আমার নাম সূচক। আমি বিপ্রদিগকে অন্নাদি দান করিবার সূচনা করিতাম, কিন্তু তাহাদিগকে দিতাম না ; তাই আমার এই অবস্থা।

৩য় প্রেত—আমার নাম শীঘ্রক। কোন অতিথি ক্ষুধিত হইয়া আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিলে আমি শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিতাম। তাই আমার অবস্থা এই

৪র্থ প্রেত—আমার নাম রোহক। আমি অতিথিকে কুৎসিৎ অন্ন দান করিয়া তাহাদের ভয়ে স্বয়ং গৃহ মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতাম ও গোপনে উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ করিতাম।

৫ম প্রেত—আমার নাম লেখক। কেহ আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করিলে আমি মৌনভাবে বসিয়া ভূমি-লিখন করিতাম। আমি সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ ছিলাম। লেখক মেঢ্র দ্বারা, রোহক পার্শ্বদেশ দ্বারা গমন করে এবং শীঘ্রক পঙ্গু ও সূচীমুখ সূচীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিজ তখন প্রেতগণের আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রেত বলিল সর্ব্বজীবের মধ্যে নিন্দিত খাদ্য যাহা, যাহা শ্লেষ্মা মূত্র বা পুরীষ-সংপৃষ্ট তাহাই আমাদের খাদ্য। যে গৃহ প্রতিদিন পরিষ্কৃত না হয়, সেই গৃহই আমাদের ভোজন-স্থান। যে গৃহে কেবল স্ত্রীলোকমাত্র ভোজন করে, যাহা জীর্ণ, সঙ্কীর্ণ ও মলাদি দ্বারা দূষিত, সেই গৃহই আমাদের ভোজনস্থান। যে গৃহে ভয় বা লজ্জা নাই, যাহাতে পতিত ব্যক্তি বাস করে, যাহা দস্যুগণের বাসভূমি, সেই গৃহই আমাদের ভোজনস্থান। যে স্থান শোক কলহাদিযুক্ত, যে ভাণ্ড বিষ্ঠামূত্রাদি-দুষ্ট তাহাতেই আমরা ভোজন করি। যে স্থান

বলি মন্ত্র নিয়ম ব্রতাদি বিহীন, যে স্থানে গুরু ব্যক্তি পূজিত হন না, যেখানে স্ত্রীজাতির প্রভুত্ব যাহা ক্রোধযুক্ত এবং অপবিত্র, সেই স্থানেই আমাদের ভোজন। ভগ্নপাত্র, পরস্পরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য, মক্ষিকাস্পৃষ্ট দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত প্রভৃতি কদন্ন প্রেতগণের খাদ্য। উলঙ্গভাবে ভোজন, উত্তরীয়বিহীন বা নিরাসনে ভোজন বা বিছানায় বসিয়া ভোজন প্রেতগণের আহার-প্রণালী।

অর্দ্ধগ্রাসে, বৃহৎগ্রাসে বা উৎক্ষেপণপূর্ব্বক ভোজন এবং মুখ হইতে পতিতান্ন, সূতিকান্ন বা মৃতকাশৌচান্ন, ধূলিদ্বারা কলুষিতান্ন—এই সমস্ত প্রেতের আহার। অন্ধকারে কৃমির ন্যায় যে আহার তাহাও প্রেতের আহার।

আজকাল অনেকেই আহারের নিয়ম করেন না। কিন্তু হিন্দুর গৃহে গৃহে এখনও প্রায় সকল নিয়মই পালন করা হয়। যদি শাস্ত্র মিথ্যা হয় তবে না হয় কিছুই হইল না। কিন্তু যদি শাস্ত্র সত্য হয় তবে ত এইরূপে যাহারা আহার করে তাহারা প্রেত হইবেই।

কি কর্ম্ম করিলে প্রেত হইতে হয় তাহাও শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণ বলেন—যাহারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে না, গোবিন্দকে অর্চ্চনা করে না, যাহারা আত্মবিদ্যা লাভে যত্ন করে না, যাহারা পুণ্যতীর্থে গমন করে না, যাহারা আর্ত্তব্যক্তিকে ফল, জল, বস্ত্র, তাম্বুল, সুবর্ণ দান করে না তাহার প্রেত হয়।

যে সকল ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক লোভ হেতু ছলে বলে কৌশলে ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে, স্ত্রীধন হরণ করে, যাহারা নাস্তিক, যাহারা কুহকবিদ্যাশালী, যাহারা বকধাম্মিক, যাহারা বালক বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রীলোকের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করে, যাহারা ঘরে আগুন দেয়, বিষপ্রয়োগে নরহত্যা করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহারা প্রেত হয়।

যাহারা অগম্যগামী, গ্রাম্যযাজী, যাহারা ব্যাধের ন্যায় হিংসাবৃত্তিপরায়ণ, যাহারা বর্ণাশ্রমবিহীন, যাহারা উপদেবতা, দৈত্য, রাক্ষসাদি ভজনা করে, তাহারা প্রেত হয়।

যাহারা মদ্যপানে মত্ত, হরিদ্বেষী, যাহারা উচ্ছিষ্টান্ন, পতিতান্ন বা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে, যাহারা নিয়ত অসৎকর্ম্ম করে, যাহারা পাষণ্ড, যাহারা পুরোহিত-বৃত্তি-জীবী, যাহারা পিতা, মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র ইহাদিগকে পরিত্যাগ করে, যাহারা বেদের নিন্দা করে, যাহারা গঙ্গাদিক্ষেত্রে দান গ্রহণ করে, যাহারা পরের অনিষ্ট করে, যাহারা বিপদে প্রভুকে ত্যাগ করে, যাহারা শরণাগতকে ত্যাগ করে, যাহারা গো বা ভূমি হরণ করে, যাহারা প্রাণিহিংসা করে, যাহারা পরের অপবাদ কীর্ত্তন করে, যাহারা দেবতা বা গুরুর নিন্দা ঘোষণা করে, যাহারা প্রতিগ্রাহী—তাহারা পুনঃ পুনঃ প্রেত, পিশাচ, রাক্ষসাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবেই।

দ।